হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত
হযরত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর
অমূল্য বাণীসমূহের ঐতিহাসিক সংকলন

মাজালিসে
হাকীমুল উম্মত

مجالس حکیم الامت

মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ.

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত
হযরত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর
অমূল্য বাণীসমূহের ঐতিহাসিক সংকলন

মাজালিসে হাকীমুল উম্মত

সংকলন

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ)

বিশিষ্ট খলীফা ঃ হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ)
মুফতীয়ে আযম, পাকিস্তান

উস্তাযুল আসাতিয়া, শাইখুল হাদীস
হযরত মাওলানা আব্দুল হাই পাহাড়পুরী (দাঃ বাঃ)-এর
দু'আ, ইজাযত ও তত্ত্বাবধানে

মাওলানা খন্দকার মুশতাক আহমদ শরীয়তপুরী
মুদাররিস, জামি'আ ইসলামিয়া, তাঁতীবাজার, ঢাকা
কর্তৃক অনূদিত

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত
হযরত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর
অমূল্য বাণীসমূহের ঐতিহাসিক সংকলন

মাজালিসে হাকীমুল উম্মত

সংকলন ঃ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.)
অনুবাদ ঃ মাওলানা খন্দকার মুশতাক আহমদ শরীয়তপুরী

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১১-৪৫১৭৬৪

চতুর্থ মুদ্রণ ঃ রবিউল আউয়াল ১৪৩২ হিজরী
তৃতীয় মুদ্রণ ঃ রবিউল আউয়াল ১৪৩০ হিজরী
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ শাবান ১৪২৭ হিজরী
প্রথম মুদ্রণ ঃ শাবান ১৪২৫ হিজরী

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/২, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-8291-34-2

মূল্য : তিনশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

MAJALISE HAKIMUL UMMAT
By : Mufti Muhammad Shafi (Rh.)
Price : TK. 350.00 US $ 27.00 only

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

অর্পণ

মরহুম আব্বাজানের
রূহের মাগফিরাত ও
দরজা বুলন্দীর উদ্দেশ্যে।

ত্যাগ ও কুরবানীতে
পূর্ণ ছিলো যার জীবন,
সাধনা ও অধ্যাবসায় ছিলো
যার জীবনের এক মহান ব্রত।

আয় আল্লাহ!
তুমি মুহতারাম ওয়ালিদ
সাহেব মরহুমকে দান কর
জান্নাতুল ফিরদাউসের
সুউচ্চ মকাম॥

—*মুশ্‌তাক আহ্‌মদ*

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

আমীরে শরীয়ত হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ)-এর
সুযোগ্য খলীফা, উস্তাযুল আসাতিযা, শাইখুল হাদীস

হযরত মাওলানা আবদুল হাই পাহাড়পুরী (দা. বা.)-এর

দু'আ ও অভিমত

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যমে মানবজীবনকে সার্থক ও সফলকাম করার জন্য 'তাসাওউফ' বা আধ্যাত্মিক দীক্ষার কোন বিকল্প নেই। প্রতিটি ক্ষেত্রেই যেমন উস্তাদ বা শিক্ষকের প্রয়োজন হয় তেমনি তাসাওউফের দীক্ষা গ্রহণের জন্যও উস্তাদ বা রাহবরের প্রয়োজন—একটি অনস্বীকার্য বাস্তব সত্য।

যুগে যুগে যেসব মহামনীষী তাদের নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ও অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে মহান মাওলা পাকের নৈকট্যলাভের দ্বারা বিশেষ মর্যাদার আসনে সমাসীন হয়েছেন,, যারা মানবাত্মার দক্ষ ও যোগ্য চিকিৎসক হিসেবে গোটা উম্মতের বিশেষ কল্যাণ সাধন করেছেন হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) তাদের অন্যতম।

আধ্যাত্মিক জগতের অন্যতম প্রাণপুরুষ, তাসাওউফ ও মা'রিফাত জগতের উপমাহীন সম্রাট হযরত হাকীমুল উম্মতের একটু সংস্পর্শ, তার উপদেশ ও নসীহত মুমিন বান্দাদের জন্য যেন তৃষ্ণার্ত কলিজায় ঠাণ্ডা পানি।

একজন মানুষকে প্রকৃত ও পরিশুদ্ধ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে হলে বুযুর্গানে দ্বীনের হিদায়াত, পরামর্শ ও তাদের বাণীসমূহ শ্রবণ ও পঠন একটি অপরিহার্য বিষয়।

আল্লাহ পাকের নৈকট্যপ্রাপ্ত ওলী বুযুর্গগণের জীবদ্দশায় তো তাদের পবিত্র দর্শন লাভ ও সরাসরি তাদের যবান থেকে উপদেশ বাণী শুনবার সুযোগ থাকে। কিন্তু তাদের ইন্তিকালের পরও তাদের মূল্যবান জীবন

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

থেকে উপকৃত হওয়া যায় তাদের লিখা পাঠ ও মালফূযাত মুতালা'আর মাধ্যমে। এর দ্বারাও মানুষ চেষ্টা করলে তাদের জীবন গড়তে পারে, তৈরী হতে পারে প্রকৃত মানুষ রূপে। সাথে সাথে এ আশাও করা যায় যে, আল্লাহ পাক বুযুর্গানে দ্বীনের লিখিত মালফূয দ্বারাও সে বরকত দান করবেন যা তাদের মুখ নিঃসৃত বাণী সরাসরি শুনলে লাভ হয়ে থাকে। সে মহান উদ্দেশ্যেই আমরা হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)-এর মালফূযাত তথা তাঁর বাণী সংকলন পাঠের সৌভাগ্য লাভ করতে পারি। কারণ মালফূয পাঠ যেন সরাসরি সে বুযুর্গের মুখ থেকেই তার কথা শ্রবণ করা।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ)-এর অগণিত কিতাব ও সংকলিত মালফূযসমূহের মাঝে হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব (রহঃ) কর্তৃক সংকলিত 'মাজালিসে হাকীমুল উম্মত' একটি উল্লেখযোগ্য দুর্লভ কিতাব। কোন কোন বিজ্ঞ আলেমের মতে এটি আধ্যাত্মিক সাধকদের জন্য সিলেবাসতুল্য অবশ্যপাঠ্য কিতাবসমূহের একটি।

মনের মাঝে দীর্ঘদিন যাবৎ আমি এ আশা লালন করে আসছিলাম যে, 'মাজালিসে হাকীমুল উম্মত' বাংলা ভাষায় অনুবাদ হোক। কারণ এর দ্বারা এ মূল্যবান বাণীসমূহ থেকে বাংলা ভাষাভাষী ভাইবোনেরাও উপকৃত হতে পারবে।

আলহামদুলিল্লাহ আমার একান্ত স্নেহভাজন সাগরেদ মাওলানা খন্দকার মুশতাক আহমদের প্রচেষ্টায় আমার সে আশা পূরণ হয়েছে। যথেষ্ট শ্রমসাধ্য এ কাজটি সে সম্পাদন করেছে অত্যন্ত যত্ন সহকারে। এ জন্য তাকে আমি আন্তরিক দু'আ ও মুবারকবাদ জানাই। ইতিপূর্বে সে হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)-এর রূহে তাসাওউফ সহ আরো কয়েকটি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেছে। তার সে অনুবাদ উলামায়ে কিরাম ও পাঠক মহলে বেশ সমাদৃত হয়েছে। মহান আল্লাহ তাকে 'জাযায়ে খায়ের' দান করুন, আমীন।

আমার দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ নিয়েই সে অনুবাদ কর্মটি সম্পাদন করেছে। যেসব জায়গা তার কাছে অস্পষ্ট মনে হয়েছে তা আমার কাছ থেকে বুঝে নিয়েছে। অনুবাদ সম্পন্ন হওয়ার পর দীর্ঘ পাণ্ডুলিপিটির অনেক জায়গা বেশ সময় নিয়ে আমাকে পাঠ করে শুনানো হয়েছে, এরপর তা প্রকাশের জন্য দেয়া হয়েছে।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

এ গ্রন্থে অধমের যে শ্রমটুকু যুক্ত হয়েছে মহান আল্লাহ যেন তাকে অসীলা করে অধমকে বুযুর্গানে দ্বীনের অনুসৃত পথে কায়েম রাখেন এবং উম্মতের কল্যাণে বেশী বেশী কাজ করার তাওফীক দান করেন এজন্য আমি সকলের খেদমতে দু'আর আরয করছি।

গ্রন্থটি উম্মতের জন্য যথেষ্ট প্রয়োজনীয় ও উপকারী বিধায় মুমিন মুসলমানদের এটি পাঠাধীন রাখা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। মহান আল্লাহ যেন এ খেদমত কবুল করেন এবং এর সংকলক, অনুবাদক, প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করেন এ দু'আ করছি।

মা'আস সালাম

(শাইখুল হাদীস আল্লামা আবদুল হাই পাহাড়পুরী)
শাইখ, জামি'আ ইসলামিয়া লালমাটিয়া, ঢাকা।
চেয়ারম্যান, মারকাযুল ইলমী বাংলাদেশ।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

মাকতাবাতুল আশরাফ

কর্তৃক প্রকাশিত মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ) ও মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানীর শ্রেষ্ঠ কয়েকটি বই

আত্মশুদ্ধি
মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ)
মূল্য ঃ ৭০.০০ টাকা মাত্র

আল্লাহ্ ওয়ালা
মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ)
মূল্য ঃ ৭০.০০ টাকা মাত্র

আপন ঘর বাঁচান
মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা মাত্র

ইসলাম ও আধুনিকতা
মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
মূল্য ঃ ৭০.০০ টাকা মাত্র

অভিশাপ ও রহমত
মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
মূল্য ঃ ৭৮.০০ টাকা মাত্র

দুনিয়ার ওপারে
মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা মাত্র

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

প্রকাশকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

পাকিস্তানের মুফতী আযম, মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহঃ) সংকলিত গ্রন্থ 'মাজালিসে হাকীমুল উম্মত'-এর সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তায, ইলমে হাদীসের জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া পাকিস্তান-এর সম্মানিত সদর, শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সলীমুল্লাহ খান ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমের ইসলাহী মজলিসে।

নব্বই দশকের শুরুতে হযরত যখন স্বীয় শাগরেদ ও সহকর্মীদের বারংবার অনুরোধের প্রেক্ষিতে ইসলাহী মজলিস শুরু করেন, তখন প্রথম দিনের মজলিস থেকেই তিনি নিজের পক্ষ হতে কিছু বলার চেয়ে আকাবিরদের কিতাব-পত্র পড়ে শোনানোকেই বেশী পসন্দ করতেন। প্রথম মজলিসের দৃশ্য এখনো আমার চোখে ভাসে—আছরের নামাযের পর জামি'আ ফারুকিয়ার সুপ্রশস্ত মেহমানখানায় হযরতের অপেক্ষায় সবাই বসে আছে, হযরত ডান হাতে দু'টি (অথবা তিনটি) কিতাব নিয়ে প্রবেশ করলেন। সে কিতাবগুলোর একটি হলো, 'মাজালিসে হাকীমুল উম্মত'। এরপর থেকে সকল মজলিসেই হযরত এ কিতাব থেকে হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ)-এর বাণী পাঠ করে শোনাতেন এবং নিজ চোখে দেখা হযরত থানবী (রহঃ)-এর বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনার মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করতেন। সে সময় থেকেই আমি এ কিতাবটির ভক্ত হয়ে যাই।

পরবর্তীতে মাকতাবাতুল আশরাফ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের ইচ্ছা অন্তরের অন্তঃস্থলে লালন করি, এটি তার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু নিজের বিভিন্ন ব্যস্ততা ও যোগ্য অনুবাদকের অভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ কিতাবটির অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজ বিলম্বিত হতে থাকে। এর এক পর্যায়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ও সম্পাদক জনাব মাওলানা মুশতাক আহমাদ শরীয়তপুরী ছাহেবকে অনুরোধ করলে তিনি এ কাজে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক জগতের অন্যতম ব্যক্তিত্ব হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ)-এর একান্ত স্নেহভাজন খলীফা ও জামাতা শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা আবদুল হাই পাহাড়পুরী দামাত বারাকাতুহুমের নেগরানীতে অতি অল্প

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সময়েই অনুবাদকর্ম শেষ করেন।

অনিবার্যকারণবশতঃ কম্পোজ শেষ হওয়ার পরও প্রায় ২/৩ বৎসর এ গ্রন্থের প্রকাশনা কাজ স্থগিত থাকে। আলহামদু লিল্লাহ! এখন সকল বাধার পাহাড় ডিঙ্গিয়ে শরী'অত, তরীকত, হাকীকত ও মা'রেফাতের আকর এ গ্রন্থটি আল্লাহর পথের মহান অভিযাত্রীদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আল্লাহ পাকের শোকরিয়া আদায় করছি— আলহামদুলিল্লাহ! সেই সাথে আল্লাহ পাকের ঐ সকল নিষ্ঠাবান প্রেমিকেরও শোকরিয়া আদায় করছি, যারা গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য বার বার জোর তাকীদ দিয়েছেন এবং সর্বপ্রকার সহযোগিতা করেছেন, দু'আ করেছেন। বিশেষ করে হযরত পাহাড়পুরী হুযূর ও মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেবের শোকরিয়া আদায় করছি যে, তাঁরা উভয়ে কিতাবটির জটিল বিষয়সমূহ অনুবাদের ক্ষেত্রে নিজ নিজ সাধ্যানুসারে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ পাক সকল কাজে তাঁদের সহযোগিতা করুন।

আমরা বইটিকে সর্বাঙ্গিন সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত করার জন্য আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। তারপরও কারো দৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি ধরা পড়লে আমাদেরকে জানানোর অনুরোধ করছি। ইনশাআল্লাহ! পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নিবো। আল্লাহ পাক অনুবাদ গ্রন্থটিকেও মূলের মতোই উপকারী বানিয়ে দিন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত—
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
জামেয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া
তাঁতীবাজার, ঢাকা–১১০০

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

অনুবাদকের আরয

الحمد لله الذى وحده والصلوة والسلام على من لانبى بعده

বুযুর্গানে দ্বীনের মালফূয ও তাদের উপদেশসমূহ এক বিশেষ প্রয়োজনীয় ইলম। আমলের ক্ষেত্রে তা রূহ বা প্রাণতুল্য, যা মুমিনের ঈমানকে করে আরো তীক্ষ্ণ করে শানিত।

এজন্য পূর্বসূরী ওলী বুযুর্গদের মালফূয যেন মুমিন হৃদয়ের আবে হায়াত। আর সে মালফূয পঠন ও শ্রবণ নিঃসন্দেহে মুমিনের আত্মাকে করে পরিতৃপ্ত, দান করে শীতলতা ও প্রশান্তি।

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) ছিলেন তাসাওউফ ও আধ্যাত্মিক জগতের দীপ্তিমান চন্দ্রতুল্য এক মহান ব্যক্তিত্ব।

আধ্যাত্মিক দীক্ষাগুরু হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)কে যারা দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, তার পবিত্র যবান থেকে সরাসরি কথা শুনবার খোশ কিসমত যাদের হয়েছে তারাই শুধু বুঝতে পেরেছেন হযরত (রহঃ)–এর মুক্তাতুল্য বাণী কত যে মধুর আর কত প্রয়োজনীয়।

আমরা যারা হযরত (রহঃ)কে দেখার সৌভাগ্য লাভ করতে পারিনি তাদের জন্য হযরত (রহঃ)–এর সংকলিত মালফূয পাঠ করে হৃদয়তৃপ্ত করার পথ খোলা আছে। কবি সুন্দর বলেছেন—

حرف از زبان دوست شنیدن چہ خوش بود

یا از زبان آنکہ شنید از زبان دوست

অর্থ ঃ বন্ধুর যবান থেকে কোন কথা শোনার সৌভাগ্য কতই না মধুর অথবা এমন ব্যক্তির কাছ থেকে কথা শোনা যে, আমার বন্ধুর যবান থেকে শুনেছে।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ)–এর মালফূযাত পাঠ করে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান ভাইবোনদের উপকৃত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্য হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব (রহঃ) কর্তৃক সংকলিত হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)–এর মালফূযসমূহের এক ব্যতিক্রমধর্মী সংকলন 'মাজালিসে হাকীমুল উম্মত' কিতাবখানা বাংলায় অনূদিত হওয়া খুবই প্রয়োজন ছিলো।

মাকতাবাতুল আশরাফের স্বত্বাধিকারী, নির্ভীক আলেমে দ্বীন বন্ধুবর জনাব মাওলানা মুফতী হাবীবুর রহমান খান সাহেব এ প্রয়োজনীয়তা

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

উপলব্ধি করেই হয়তো মূল উর্দূ কিতাবটি আমাকে সংগ্রহ করে দিয়ে তা অনুবাদ করতে বলেন। তবে আমি আমার সার্বিক অবস্থা চিন্তা করে এত বড় কাজে হাত দিতে সাহস করছিলাম না।

কিন্তু আমার মুহতারাম শাইখ, তরীকতের অন্যতম রাহবর, শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা আবদুল হাই পাহাড়পুরী সাহেব (দাঃ বাঃ)–এর সাথে বিষয়টি আলাপ করলে হযরত আমাকে এ কাজটি করার জন্য দারুনভাবে উৎসাহিত করেন এবং বেশ কিছু দিক নির্দেশনা দিয়ে দেন। হিম্মত ও সাহস দিয়ে হযরত আমাকে বলেন, 'কাজ শুরু করো, আমি তো আছি, আমি দু'আ করছি তুমি আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করে সামনে এগিয়ে যাও'। হযরতের সে দু'আ ও হিম্মত দানের ফলেই এ মহৎ কাজে হাত দেয়ার সাহস হয়েছিলো।

মহান আল্লাহ পাকের দরবারে লাখো কোটি শোকর হযরত শাইখের সক্রিয় তত্ত্বাবধানে দীর্ঘ এক বৎসরেরও অধিক সময়ে মাজালিসে হাকীমুল উম্মতের অনুবাদ কার্য সম্পন্ন হয়।

অনুবাদের ক্ষেত্রে যেসব স্থান আমার কাছে অস্পষ্ট মনে হয়েছে তা নিয়েই ছুটে গিয়েছি হযরতের দরবারে। তিনি ধৈর্যের সাথে সময় দিয়ে সহাস্য চিত্তে আমাকে জায়গাগুলো বুঝিয়ে দিয়েছেন।

মনে পড়ে এক রমযানের কথা। যে রমযানে বার বার মুসলিম বাজারস্থ মসজিদে (হযরতের বাসার কাছে) গিয়ে মাজালিসে হাকীমুল উম্মতের বিভিন্ন জায়গা বুঝে নিয়েছিলাম। বিশেষতঃ এ কিতাবের শে'রগুলো প্রায় সবই হযরত (দাঃ বাঃ)–এর অনুবাদ বলা চলে।

ছোটখাটো কলমী খিদমতের সাথে পূর্ব থেকেই জড়িত থাকার পরেও এটি অতীতের সব খেদমতের চাইতে বড় ও মর্যাদার বিচারে ঊর্ধ্বে। আমার মত একজন সাধারণ মানুষের দ্বারা যে খিদমত সম্পন্ন হওয়া অত্যন্ত সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয়।

কুদসীর একটি শে'র আছে এ রকম—

روز قیامت ہر کسے آید بدست نامۂ

من نیز حاضری شوم تصویر جاناں در بغل

অর্থ ঃ কিয়ামত দিবসে প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ আমলনামা সাথে নিয়ে উপস্থিত হবে। আমিও সেদিন আমার প্রেমাস্পদের ছবি বোগলে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

নিয়ে হাজির হবো।

শাহ আবদুল আজীজ (রহঃ) শে'রের শেষ পংক্তিটি কিছুটা পরিবর্তন করে এভাবে পড়তেন—

من نیز حاضر می شوم تفسیر قرآن در بغل

অর্থ ঃ আমিও সেদিন (আমার কৃত) তাফসীরে কুরআন বোগলে নিয়ে উপস্থিত হবো।

উপরোক্ত শেরের শেষ পংক্তিটি আমিও খানিকটা পরিবর্তন করে এভাবে বলতে চাই—

من نیز حاضر می شوم مجلس حاکم در بغل

অর্থ ঃ আমিও সেদিন 'মাজালিসে হাকীমুল উম্মত' বোগলে নিয়ে হাজির হবো।

আয় আল্লাহ তুমি কবুল করো এবং এ খিদমতকে আমার নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দাও আমীন, তাকাব্বাল ইয়া রাব্বাল আলামীন।

এ মূল্যবান গ্রন্থটি অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি সাধ্যমত সতর্কতা অবলম্বন করেছি। প্রায় পুরো কিতাবটি উর্দূর সাথে অনুবাদ করতে চেষ্টা করেছি। অনুবাদ করতে গিয়ে আমি নিজেও যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি এবং পর্যাপ্ত স্বাদও পেয়েছি। বেশ কিছুদিন তো এমনও হয়েছে যে, ইশার নামাযের পরে লিখতে বসেছি সে বৈঠকে ফজরের আযান পর্যন্ত লিখেছি। এতে আমার কোন ক্লান্তি বা বিরক্তি আসেনি এটা নিঃসন্দেহে হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ)–এর মালফূযাতের বরকত।

পরিশেষে আমি সম্মানিত পাঠকবর্গের খিদমতে ভুল–ত্রুটি ক্ষমা চেয়ে দু'আর বিনীত দরখাস্ত পেশ করছি। দু'আর দরখাস্ত করছি মুহতারাম শাইখ হযরত পাহাড়পুরী হুযূর (দাঃ বাঃ)–এর নেক হায়াত দারাজী ও সুস্বাস্থ্যের জন্য। এছাড়া গ্রন্থটির প্রকাশকসহ এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে যেন আল্লাহ পাক নেক জাযা দান করেন এ কামনা করছি।

وما ذالك على الله بعزيز

বিনয়াবনত

খন্দকার মুশতাক আহমদ

আংগারিয়া, শরীয়তপুর

১০ সফর ১৪২৫ হিঃ, রাত ৩টা ১৫ মিঃ

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

মাকতাবাতুল আশরাফ
কর্তৃক প্রকাশিত
শিশু-কিশোর উপযোগী কয়েকটি বই

নীল দরিয়ার নামে
(গল্প সংকলন)
মূল্য ঃ ৪০.০০ টাকা মাত্র

শহীদানের গল্প শোন
(সিরিজ ১-১০)
মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা (প্রতি খণ্ড)

আলোর ফোয়ারা
(আরবী শিশু সাহিত্য অবলম্বনে রচিত)
মূল্য ঃ ৪০.০০ টাকা মাত্র

কিশোর সাহাবী
(সিরিজ ১-১০)
মূল্য ঃ ৪০.০০ টাকা (প্রতি খণ্ড)

আলোর মিছিল (১ম-৫ম খণ্ড)
(তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন)
মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা (প্রতি খণ্ড)

কিসরার মুকুট
(সাহাবায়ে কেরামের গল্প)
মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা মাত্র

অজানা দ্বীপের কাহিনী
(হাদীস শরীফে বর্ণিত বিস্ময়কর ঘটনাবলী)
মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা মাত্র

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

মাজালিসে হাকীমুল উম্মত

পবিত্র রমযান ১৩৪৬ হিজরীর শেষ দশক

হযরত থানবী (রহঃ)–এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ৩৭
গ্রন্থকারের ভূমিকা ৪৯
রমযানুল মুবারক ১৩৪৭ হিজরী ৭৩
২৯শে শাবান ১৩৪৭ হিজরী ৭৬
দ্বীন ও দুনিয়ার প্রত্যেক কাজে নিয়ম–শৃংখলা রক্ষা করার গুরুত্ব ৭৬
নিরর্থক ও বেহুদা আলোচনা মানুষকে বড় গোনাহে লিপ্ত করে ৭৭
লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্কতার শিক্ষা ৭৮
প্রত্যেক কাজ সীমার মধ্যে থেকে করার প্রয়োজনীয়তা ৭৯
দেওবন্দের বিশিষ্ট মুরব্বীগণের মাঝে আল্লাহ পাকের ভয় ও বিরোধীদের সাথে আচরণ ৮০
হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম (রহঃ) ৮১
কানপুর মাদরাসার দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ ৮১
ঋণগ্রস্ততার অস্থিরতা ও হযরত গাংগুহী (রহঃ)–এর পরামর্শ ৮৩
আল্লাহর ভয় ও নম্রতার মাহাত্ম্য ও পরামর্শের গুরুত্ব ৮৪
প্রচলিত আধুনিক শিক্ষা থেকে সৃষ্ট কিছু সন্দেহ ও ভুল ধারণার মূল ভিত্তি ৮৬
এশরাফে নফস–এর হাকীকত ৮৬
বুযুর্গানে দ্বীনের তাবীয সাধারণ আমেলদের তাবীযের মত নয় ৮৮
তাফসীর ও তাসাওউফের সাথে হযরত (রহঃ)–এর সম্পর্ক ও হাজী সাহেব (রহঃ)–এর ভবিষ্যদ্বাণী ৮৯
জান্নাতবাসীদের মাঝে কোন হিংসা বিদ্বেষ থাকবে না ৮৯
দ্বন্দ্ব সৃষ্টির জন্য ফাতাওয়া গ্রহণ প্রসঙ্গে ৯০
চাকরকেও তার সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেয়া জায়েয নয় ৯০
বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে বেয়াদবী আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে বড়ই ক্ষতিকর ৯০

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
কাফের দু'আ করলেও তা কবুল হতে পারে	৯১
তাসাওউফের মূল কথা হলো নিজেকে (আমিত্বকে) নিঃশেষ করে দেয়া	৯২
বাতেনী রোগের চিকিৎসা না করিয়ে শুধু যিকির–শোগল ক্ষতিকর	৯৩
তরীকতের আসল উদ্দেশ্য মানুষের বাতেন সংশোধন করা	৯৪
ইসলাহের বিশেষ কিছু আদব	৯৬
উন্নত পোশাক পরিধান করা প্রসঙ্গে	৯৯
'কাশফ' মূলতঃ কোন বুযুর্গী নয়	১০০
অসহায়ত্ব ও দুর্বলতা একটি নিয়ামত	১০১
হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত খিযির (আঃ) ঃ কিছু প্রশ্ন ও তার জবাব	১০৩
কোন বুযুর্গের মর্যাদা বুঝার উপায়	১০৭
নেককার লোকদের দ্বারাও ভুল হতে পারে	১০৮

১৪ই রমযান ১৩৪৭ হিজরী

একটি সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক দু'আ	১০৯
হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)–এর বিজ্ঞজনোচিত উপদেশ	১০৯
কম বয়সের ছেলেদের ব্যাপারে সতর্কতা	১১০

মানবাত্মার সংশোধনের উত্তম পদ্ধতি অবলম্বনের কয়েকটি ঘটনা

মদ্যপান থেকে তওবা	১১০
একজন কলেজ ছাত্রের কাহিনী	১১৩
অপর এক ছাত্রের ঘটনা	১১৬
ভাল কাজের যে কোন পদক্ষেপেই লাভ	১১৭
হযরত ইয়াকূব সাহেব (রহঃ)–এর বিশেষ দু'আ	১১৭
কাউকে পিছন থেকে ডাকা প্রসঙ্গে	১১৮
আর্থিক অস্থিরতা দূর করার উপায়	১১৮
নিয়ম–কানূন মেনে চলার গুরুত্ব	১১৯

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
কুরআন তিলাওয়াত কিভাবে সুন্দর হয়	১১৯
পরিভাষাসমূহকে সহজ করা	১১৯
নবী (আঃ)গণের বিচ্যুতিও রহমতস্বরূপ	১২০
হজ্জ সফরের শর্ত ও আদবসমূহ	১২০
হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)–এর একটি কথা	১২১
রামপুরে হযরত নানুতবী (রহঃ)	১২১
জীন অনুগত করার আমল	১২২
একটি মাসআলার সঠিক বিশ্লেষণ	১২২
নিকটাত্মীয়দের বাই'আত করা প্রসঙ্গে	১২৪
তাওক্কুলের সঠিক মর্ম	১২৫
ইবাদতে একাগ্রতা	১২৬
সম্পদের ক্ষেত্রে হক সংরক্ষণ	১২৭
নাবালেগের হক	১২৮
পবিত্র কুরআনের তরজমা প্রসঙ্গে	১২৯
এক ব্যক্তির প্রশ্নের জবাব	১২৯
খাজা আযীযুল হাসান মাজযূব (রহঃ) প্রসঙ্গে	১৩১
বিভিন্ন প্রকারের যিকির	১৩১
হাদিয়া গ্রহণ করা প্রসঙ্গে	১৩২
হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব ছাহেব (রহঃ)	১৩৩
আল্লামা শিবলী নো'মানী (রহঃ)–এর কথা	১৩৪
মেহমানের সম্মান	১৩৪
শরীয়ত বিরোধী রাজনৈতিক কর্মসূচী মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর নয়	১৩৪
প্রত্যেক কাজে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব	১৩৬
বুযুর্গানে দ্বীনের প্রতি ভক্তি–বিশ্বাসের মাপকাঠি	
একটি আয়াতের তাফসীর থেকে সংশয় নিরসন	১৩৭
কাজের মাধ্যমে কিছু দাবী করাও নিষিদ্ধ	১৩৭
সাধারণ লোকের আস্থা অর্জন লক্ষ্যণীয় নয়	১৩৯
লেবাস–পোশাকে লৌকিকতা	১৩৯
আল্লাহ পাকের রহমতের একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা	১৪০

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
এক বুযুর্গের একটি কারামত	১৪১
হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ) প্রসঙ্গে হযরত নানূতবী (রহঃ)–এর সাক্ষ্য	১৪৩
অসুস্থাবস্থায় হযরত নানূতবী (রহঃ)	১৪৩
ইলমের খাদেমগণের জন্য প্রশাসনিক কাজ থেকে দূরে থাকাই শোভনীয়	১৪৪
উচ্চস্বরে যিকির এবং বিদ'আত	১৪৪
মুফতী এলাহী বখ্শ (রহঃ)–এর কথা	১৪৬
একজন বুযুর্গ শিক্ষকের কথা	১৪৬
হযরত জুনাইদ (রহঃ)–এর ঘটনা	১৪৭
সম্পদের দ্বারা আত্মশুদ্ধি	১৪৮
একটি সংশয়ের নিরসন	১৪৮
একটি উপদেশমূলক ঘটনা	১৪৯

১৩৪৮ হিজরীর রমযান মাসের মালফূযাত

জালিমের প্রতি মিথ্যা অপবাদ প্রসঙ্গে	১৫১
মতপার্থক্যের সময় পারস্পরিক সম্পর্ক	১৫১
বুযুর্গদের সংস্পর্শের আসল উদ্দেশ্য	১৫২
একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর	১৫২
পূর্ববর্তী মাশাইখগণের প্রতি আদব	১৫৪
সংশয়ের তুলনায় জবাব বুঝা মুশকিল কেন?	১৫৪
হযরত থানবী (রহঃ)–এর উন্নত পোশাক প্রসঙ্গে	১৫৪
একটি পসন্দনীয় শে'র	১৫৫
মহিলাদের মহরের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি	১৫৫
ফিৎনা থেকে বেঁচে থাকার দু'আ	১৫৬
শরীয়তসম্মত হীলা	১৫৭
তাবীয–কবয প্রসঙ্গে	১৫৮
জোশালো বয়ান	১৫৯
দ্বীনী ব্যাপারে অনধিকার চর্চা	১৬১
বুযুর্গানে দ্বীনের বরকত	১৬২
মুসলমানদের আর্থিক সচ্ছলতাও একটি নি'আমত	১৬২

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিনয় থেকে ঐক্যের সৃষ্টি হয়	১৬৩
একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর	১৬৩
বিরুদ্ধবাদীদের সাথে হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ)–এর আচরণ	১৬৪
মসনবী কিতাবের সারমর্ম	১৬৫
হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)–এর কিতাব অধ্যয়ন	১৬৬
সাহাবায়ে কিরামের (রাযিঃ) বিশেষ মর্যাদা	১৬৬
নিয়্যতের গুরুত্ব	১৬৭
দ্বীনী মাদরাসার বিশেষ গুরুত্ব	১৬৭
প্রকাশ্য এবং গোপন ইবাদত	১৬৮
স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা	১৬৮
কাউকে কেবলা বা কা'বা বলা	১৬৯
সুন্নাতে নববী (সাঃ)–এর বরকত	১৬৯
আত্মার সাথে সম্পৃক্ত কিছু শে'র	১৬৯
একটি বাণী	১৭০
ঘুষের সংজ্ঞা	১৭১
সুফিয়ায়ে কিরামের তরীকা	১৭১

রমযানুল মুবারক, ১৩৫০ হিজরী

সেমা' জায়েয হওয়ার শর্তসমূহ	১৭৩
কামেল লোক চেনার মাপকাঠি	১৭৪
রাসূল (সাঃ)কে খাবে দেখা	১৭৫
বাহাদুরী ও দয়া একে অপরের পরিপূরক	১৭৫
যার স্ত্রী বেপর্দায় চলে	১৭৬
স্যার সৈয়দ এবং মাওলানা ইয়াকুব (রহঃ)	১৭৬
যে অঞ্চলে ইশার নামাযের ওয়াক্ত হয় না	১৭৭
দৃষ্টি আকর্ষণ	১৮০
নির্ভেজাল কাশফও শরীয়তের দলীল নয়	১৮১
মসনবীর একটি শে'রের ব্যাখ্যা	১৮২
কম কথা বলা সম্পর্কে একটি হাদীস	১৮৩
সালেকদের প্রতি একটি বিশেষ উপদেশ	১৮৪

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১৬ সফর, ১৩৫৫ হিজরীর মালফূযাত	
নফস এবং শয়তানের প্রবঞ্চনার পার্থক্য	১৮৬
শে'র-এর ব্যাপারে বুযুর্গানে দ্বীনের ভারসাম্যতা	১৮৭
তাবীয–কবয	১৮৮
ইংরেজদের সাথে বন্ধুত্ব ও দুশমনী উভয়টাই ফিতনা	১৮৯
বৃদ্ধ বয়সে সতর্কতা	১৮৯
কারো ব্যক্তিসত্ত্বার উপর আঘাত না করা	১৯০
রমযানুল মুবারক ১৩৪৮ হিজরীর মজলিস	
যারা কাজের লোক তাদের সংশয় কম হয় কিছু হলেও তা দ্রুত দূর হয়ে যায়	১৯৫
কাউকে কাফির বা ফাসিক বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা	১৯৭
তাকাব্বুরীর হাকীকত ও একটি প্রশ্নের জবাব	১৯৮
জীন–ভূত হাযির করা এক ধরনের ভেল্কীবাজী	১৯৯
ইলমে কালাম (কালাম শাস্ত্র) এর সঠিক অবস্থান	২০০
কাজের ক্ষেত্রে সতর্কতা ও অন্যের প্রতি কুধারণার পার্থক্য	২০১
মা'রিফাতের লাইনের প্রথম পদক্ষেপ	২০২
পঙ্কিলতামুক্ত রমণী	২০৩
বিবিকে অতিরিক্ত হাত খরচ প্রদান	২০৩
আমীর উমরাদের সাথে আচরণ	২০৪
আমানত ও দিয়ানত	২০৫
তাকদীরের প্রতি ঈমান	২০৬
নিস্প্রয়োজনীয় কথাই ক্ষতিকর	২০৭
দ্বীনের ক্ষেত্রে সংশয় সৃষ্টির আসল কারণ	২০৭
মাদরাসাসমূহের ব্যাপারে একটি উপকারী পরামর্শ	২০৯
তাসাওউফের বিধান মূলতঃ শরীয়তেরই বিধান	২১০
শাইখের মজলিসে বসে করণীয়	২১১
নামাযে একাগ্রচিত্ত হওয়ার সহজ পথ	২১১
সুফীগণের তুলনায় আলিমগণের প্রাধান্য	২১২
তরীকতপন্থীদের জন্য উপদেশ	২১৩

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সহজভাবে কাজের হুকুম দেয়া	২১৩
একমাত্র নববী ইলমই হলো সান্ত্বনার বস্তু	২১৩
তরীকতের শুরু ও শেষ স্তরের পার্থক্য	২১৪
মহান আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার পদ্ধতি	২১৫
ইমামগণ সকলেই আল্লাহ পাকের ওলী ছিলেন	২১৬
কোন বিশেষ ব্যক্তির অনুসরণ	২১৭
মহিলাদের মাঝে দ্বীনী ইলম	২১৭
চিঠির গায়েই তার জবাব লিখা	২১৮
মাদরাসার চাঁদার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ	২১৮
'ইচ্ছা' মানুষের এখতিয়ারভুক্ত নয়	২১৯
আল্লাহ পাকের দিকে ধাবিত হওয়ার বরকত	২১৯
হাকীমসুলভ জবাব	২১৯
হাদীস শরীফে বর্ণিত দরূদ ও সালাম	২২০
হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহঃ)–এর কথা	২২০
বুযুর্গদের ইতিহাস একজন ইংরেজের কলমে	২২০
আল্লাহর ওলীগণের সরল জীবন	২২০

১১ই রমাযান ১৩৪৮ হিজরীর মালফূযাত

বুযুর্গীকে প্রকাশ বা গোপন করা	২২২
মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে উদারতা	২২২
মুত্তাকী লোকের দ্বারাই জাতি উপকৃত হয়	২২৩

১৩৯০ হিজরীর মালফূযাত

বিগত জীবনের প্রতি অনুশোচনা

আল্লাহর ওলীগণের দ্বারা মুসলমানগণ উপকৃত হন	২২৫
শাইখের সংস্পর্শের একটি বিশেষ আদব	২২৫
দুটি পরস্পর বিরোধী বস্তুর সমন্বয় সাধন	২২৬
কারো স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করো না	২২৭
কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো	২২৯
হানাফী, শাফী ও মুহাম্মদী	২২৯

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঈসায়ী ১৮৫৭ সালের জিহাদ	২৩০
নম্রতা ও কঠোরতা	২৩১
মীলাদ মাহফিল	২৩১
খারাপ বিষয় সংশোধনের এক বিশেষ পদ্ধতি	২৩৪
মহান আল্লাহ ও নিজ নফসের প্রতি ভয়	২৩৪
মুতালা'আর ব্যাপারে একটি উপদেশ	২৩৪
ফিকহী কাওয়ায়েদ এবং আলিমগণের মতপার্থক্য	২৩৫
হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) প্রসঙ্গে	২৩৬
শব্দ ও নামের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া	২৩৬
শাহ আবদুল আযীয (রহঃ)-এর তীক্ষ্ণ ধীশক্তি	২৩৭
গাইরুল্লার জন্য মানত	২৩৮
সাধনা মুজাহাদা আসল উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হাসিলের মাধ্যম মাত্র	২৩৯
১৭ই রমযান ১৩৪৮ হিজরীর মালফূযাত	
দুই বুযুর্গের মাঝে আলোচনা	২৪১
মহিলাদের চেহারাও ঢেকে রাখতে হবে	২৪২
দারিদ্র থাকা সত্ত্বেও মুখাপেক্ষীহীনতাই হলো বুযুর্গী	২৪৩
একটি মজার কথা	২৪৪
মুরীদের সংশয়ের সংশোধন	২৪৪
ইনসাফপূর্ণ শিষ্টাচার শিক্ষা	২৪৪
স্পষ্টবাদিতার স্তর	২৪৬
বুযুর্গানে দ্বীনের কঠোরতা প্রদর্শনের হাকীকত	২৪৭
নিজের চেষ্টা ও মহান আল্লাহর প্রতি ভরসা	২৪৭
প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাকওয়া অবলম্বন করা	২৪৭
জীনেরাও আল্লাহ পাকের ওলীগণকে সম্মান করে	২৪৮
আলিমের সম্মান	২৪৯
একটি রহস্যময় কথা	২৪৯

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
২১শে রমাযান ১৩৪৮ হিজরী	
জুমআর পরের মালফূযাত	
আল্লাহ পাকের ইশকে পাগল ও সাধারণ পাগলের মধ্যে পার্থক্য	২৫০
ইলমে কালাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের আকায়েদ	২৫০
ওহী ও ইলহামের পার্থক্য	২৫২
একটি শে'র-এর বিশ্লেষণ	২৫২
মানুষকে গাল-মন্দ করার কুফল	২৫৩
লোকালয় ও নির্জনতার অবস্থা	২৫৪
হযরত মাওলানা রহতুল্লাহ সাহেব-এর স্মৃতিশক্তি	২৫৪
বুযুর্গানে দ্বীনের আদব ও সম্মান	২৫৫
দ্বীনের ব্যাপারে অযৌক্তিক ধৃষ্টতা	২৫৫
একজন সাধারণ লোকের মূল্যবান কথা	২৫৬
বুযুর্গানে দ্বীনের বিনয়	২৫৬
আমল সংশোধনের মুরাকাবা	২৫৭
আল্লাহওয়ালাদের সাথে বেয়াদবীর কুফল	২৫৭
মাখলূকের খিদমত দ্বারাও আল্লাহর দিদার লাভ হতে পারে	২৫৮
২৬শে রমযান ১৩৪৮ হিজরীর মালফূযাত	
তাওহীদ-এর হাকীকত	২৫৯
প্রচলিত সবীনা	২৫৯
পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত রমযানের শ্রেষ্ঠ ইবাদত	২৫৯
সময়ের মধ্যে বরকত	২৬০
হযরত মির্যা মাযহার জানে জাঁনা শহীদ (রহঃ)	২৬০
মাদরাসার ব্যাপারে কথা	২৬১
প্রশংসাকারীর জবাব	২৬২
একটি হাদীসের ব্যাখ্যা	২৬৩
হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ)-এর একটি হিকমতের কথা	২৬৩
তাবীয-কবয সম্পর্কে কথা	২৬৪
বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে তুলনা	২৬৪
'আফযাল' এবং 'আকমাল'-এর পার্থক্য	২৬৫

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
২১শে জুমাদাল উলা ১৩৫৭ হিজরী বৃহস্পতিবারের সকালের বৈঠকের মালফূযাত	
বুযুর্গানে দ্বীনের বাতানো পদ্ধতি ও শিক্ষার অধিকাংশ ব্যবস্থাপনামূলক এজন্য কুরআন–হাদীসের প্রমাণ আবশ্যকীয় নয়	২৬৬
শাইখের প্রতি মহব্বত থাকা অত্যন্ত যরুরী	২৬৯
ওয়ায ও তাবলীগের গুরুত্বপূর্ণ আদব	২৭০
আরো একটি ঘটনা	২৭৩
জুমাদাস সানিয়াহ ১৩৫৭ হিজরীর বৈঠক	
তাসাওউফের সারবস্তু খুবই সহজ	২৭৬
১১ই শাবান ১৩৫৪ হিজরীর মালফূযাত	
মযলূম অপদস্থ হয় না	২৭৮
দেওবন্দের মাসিক পত্রিকা সম্পর্কে বক্তব্য	২৭৮
প্রয়োজন পরিমাণে ইলম ও আমলই ওলী হওয়ার জন্য যথেষ্ট	২৭৯
আলিমগণের মতপার্থক্যে সাধারণ লোকের করণীয়	২৮০
একটি আয়াতের তাফসীর ও তাহকীক	২৮১
২৫শে শা'বান ১৩৫৪ হিজরীর মালফূযাত	
'ইবনে মানসূর' সম্পর্কে তাহকীক	২৮৩
দুনিয়াদার ব্যক্তিদের সাথে আল্লাহওয়ালাদের সাক্ষাতের নিয়ম	২৮৩
সগীরা ও কবীরা গুনাহ	২৮৪
নবী (আঃ)গণ থেকে সগীরা গুনাহও প্রকাশ পায় না	২৮৫
একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী কথা	২৮৫
কারামতের স্তর	২৮৬
৪ঠা রমযান ১৩৫০ হিজরীর মালফূযাত	
কাশফ সম্পর্কে একটি কথা	২৮৮
বুযুর্গানে দ্বীনের কথা প্রসঙ্গে	২৮৮
বিনয় সম্পর্কিত একটি ঘটনা	২৮৯

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সেমা' সংক্রান্ত বিশ্লেষণ	২৮৯
ইংরেজদের সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)–এর একটি বিজ্ঞ মন্তব্য	২৯০
একটি জ্ঞাতব্য বিষয়	২৯০
হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)–এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অসীয়্যত	২৯১
তাসাওউফ স্বভাবজাত ইলমের অন্তর্ভুক্ত	২৯১
'সাওয়াদে আযম'–এর ব্যাখ্যা	২৯১
তাসাওউফ–এর সারবস্তু	২৯২
খুশু' বা একাগ্রতার হাকীকত	২৯২
কাশফ ও কারামতের পার্থক্য	২৯৩
১৩ই রমযান ১৩৫০ হিজরী, শুক্রবারর মালফূযাত	
অনুভব শক্তির তীক্ষ্ণতা প্রসঙ্গে	২৯৪
জান্নাতবাসীদের কোন অনুশোচনা হবে না	২৯৫
বুযুর্গানে দ্বীনের চিঠিতে শে'র লিখা	২৯৫
ফতওয়া লিখা সম্পর্কে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)–এর দিক নির্দেশ	২৯৭
মুজাদ্দিদ ও কুতুব–এর কিছু নিদর্শন	২৯৭
আল্লাহ পাকের হিফাযত	২৯৭
নবী (আঃ)গণ থেকে কোন গুনাহ প্রকাশ পায় না	২৯৮
একজন আলিম এবং একজন আরিফ	২৯৮
পূর্বকালের ও বর্তমানকালের ছাত্রের পার্থক্য	২৯৯
পরবর্তী বুযুর্গদের মাঝে কারামত অধিক হওয়ার কারণ	২৯৯
একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ	৩০০
শা'বান ও রমযান ১৩৪৯ হিজরীর মালফূযাত	
একটি শে'র ও তার মর্ম	৩০২
আল্লাহ পাকের গুণাবলী সম্পর্কে	৩০২
মিরাজের আয়াতের বিশ্লেষণ	৩০২
একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ	৩০৩

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
একজন ইংরেজ ঐতিহাসিকের কথা	৩০৩
আজমীর শরীফ	৩০৪
উলামায়ে কিরামের পারস্পরিক মতপার্থক্য	৩০৪
হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ)–এর কথা	৩০৪
প্রতিশোধ গ্রহণ ও ধৈর্যধারণের মূলনীতি	৩০৫
সময়ের মাঝে বরকত	৩০৭
বুযুর্গানে দ্বীনের লৌকিকতামুক্ত মেহমানদারী	৩০৮
হযরত গাংগুহী (রহঃ) প্রসঙ্গে	৩০৮
একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ	৩০৯
লোকদেরকে অস্থিরতা থেকে বাঁচানো	৩০৯
হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)–এর বাণী	৩০৯
ইলমে মুকাশাফার তাহকীক না করা	৩১০
নিজের মাঝে যোগ্যতা সৃষ্টি করা	৩১০
এক পাগলের সচেতনতা	৩১০
একটি দার্শনিক ও মানতেকী বিষয়	৩১১
একটি মজার কৌতুক	৩১১
বুযুর্গানে দ্বীনের একটি কথা	৩১২
সংযত নীতি	৩১২
কিয়াম ও মীলাদ	৩১২
বেয়াদবীর পরিণাম	৩১৩
তাবীয–কবয	৩১৩
আমলের ক্ষেত্রে ইখলাস	৩১৪
হযরত থানবী (রহঃ)–এর বাণী	৩১৪
নিজ প্রবৃত্তির হিসাব–নিকাশ	৩১৫
মানুষের নামের প্রতিক্রিয়া	৩১৫
‘নিসবত’ অর্জন করার পথ	৩১৫
মাদরাসা ও ছাত্রদের জন্য বিশেষ নসীহত	৩১৬
হায়াতুল মুসলিমীন–এর বৈশিষ্ট্য	৩১৭
মাওলানা মুযাফফর হুসাইন সাহেব (রহঃ)	৩১৮
সম্পদ ও সম্মানের সঠিক উপকারিতা	৩১৮

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
বাদশাহ্ আকবরের ভ্রান্ত মতবাদ প্রসঙ্গে	৩১৯
স্যার সৈয়্যদ–এর নযরে উলামায়ে দেওবন্দ	৩১৯
শিশুদের মেধা ঃ একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত	৩২০
প্রয়োজন পরিমাণে অমুসলিমদের সম্মান	৩২২
সাধারণ লোকদের দ্বীন ও ঈমানের ঠিকানা	৩২২
অমুসলিম শাসকদের সাথে সম্পর্ক	৩২২
গায়রে মাহ্রাম মহিলাদের প্রতি নযর	৩২৩
পত্রে লিখা সালামের উত্তর দেয়াও ওয়াজিব	৩২৩
দরূদ ও সালাম সংক্ষিপ্তকরণ প্রসঙ্গে	৩২৪
জনৈক 'সৈয়্যদ সাহেব' এর ঘটনা	৩২৫
পবিত্র চুল মুবারক	৩২৫
নিজের বিরোধীদের সাথে আলিমগণের আচরণ	৩২৬
মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন ছাহেবের ন্যায়পরায়ণতা	৩২৬
একটি হাদীসের ব্যাখ্যা	৩২৭
নামাযে কাতার সোজা করার গুরুত্ব	৩২৭
ইলমে কালাম দ্বীনের কোন মৌলিক বিষয় নয়	৩২৮
ইজতেহাদী মাসয়ালার ব্যাপারে আকাবীরে দেওবন্দের উদারতা	৩২৯
মাওলানা আবদুল হক খায়রাবাদীর একটি ঘটনা	৩৩০
ঐক্যবদ্ধ কাজ প্রসঙ্গে	৩৩০
কোন ব্যাপারে বাড়াবাড়ি নিজের জন্যই ক্ষতিকর	৩৩০
তাফসীরে বয়ানুল কুরআনের শিরোনাম	৩৩১
ইজতিহাদী মাসআলার ক্ষেত্রে তাহ্কীকের স্তর	৩৩১
হযরত শাহ ইসহাক সাহেব (রহঃ)–এর একটি ঘটনা	৩৩২
একটি দু'আর বরকত	৩৩৩
জবর ও কদর সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক কথা	৩৩৪
একটি আয়াতের তাফসীর ও তাহ্কীক	৩৩৪
দুনিয়াদার দরবেশের পরিচয়	৩৩৫
আদাবে মুআশারাত–এর গুরুত্ব	৩৩৬
দু'জন বুযুর্গ প্রসঙ্গে কথা	৩৩৭
বাকীর কারণে মূল্য বাড়িয়ে দেয়া প্রসঙ্গে	৩৪১

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
দুনিয়াদারদের নযরে বুযুর্গানে দ্বীনের সংস্পর্শ	৩৪২
অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও হাদিয়া গ্রহণ	৩৪২
হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ)	৩৪২
প্রসিদ্ধি কামনা একটি বড় ফিৎনা	৩৪৩
ইসলামের এক আশ্চর্য পদ্ধতি	৩৪৪
বাহ্যিক মান-মর্যাদা কামনা প্রসঙ্গে	৩৪৪
হযরত গাংগুহী (রহঃ)-এর কসম	৩৪৫
লোকদের সাথে আচার-আচরণে পার্থক্য	৩৪৫
মাদরাসা ও খানকার চাঁদা	৩৪৬
দেওবন্দী কাফেলায় হযরত গাংগুহী (রহঃ)-এর অবস্থান	৩৪৭
কিতাব নিয়ে কি করবো?	৩৪৭
হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)-এর খিদমতে ছয় মাস	৩৪৭
রমযান শরীফে ইবাদত	৩৪৮
হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)-এর শাজারা	৩৪৮
ইলহাম অবশ্য পালনীয় বিষয় নয়	৩৪৮
আউলিয়ায়ে কিরামের মাযার থেকে ফায়েয হাসিল	৩৪৯
নিসবত 'সলব' করার হাকীকত	৩৫০
ওলীগণের 'নিসবত' কাকে বলে?	৩৫১
একটি আয়াতের সংশয় ও তার অপনোদন	৩৫১
একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ	৩৫২
হযরত শাহ ইসহাক (রহঃ) ও তার ভাই	
হযরত শাহ ইয়াকুব (রহঃ)	৩৫২
সুপারিশ সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা	৩৫৪
আশ্চর্য মেহমানদারী	৩৫৪
বুযুর্গানে দ্বীনের ধৈর্য ও দয়া	৩৫৫
নির্জনতা অবলম্বনের কারণ	৩৫৫
ধৈর্যের শক্তি ঃ একটি ঘটনা	৩৫৫
হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ)-এর একটি ঘটনা	৩৫৬
হাঁচি ও তার জবাব	৩৫৭
যাহেরী ও বাতেনী বিষয়ে ফিকাহ ও ইজতিহাদ	৩৫৭

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অন্যান্য প্রাণী ও মানুষের মাঝে পার্থক্যের কারণ	৩৫৮
হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)–এর একটি অসীয়্যত	৩৫৯
চিকিৎসার ক্ষেত্রে ইজতিহাদ	৩৬১
একটি আয়াতের তাফসীর ও সংশয় নিরসন	৩৬১
ভ্রান্তলোকদের লিখা পাঠ করা ভয়ানক ক্ষতিকর	৩৬২
একটি হাদীসের মর্ম	৩৬২
একটি প্রশ্ন ও তার জবাব	৩৬৩
মানুষের দ্বারা বেশী কাজ না নেয়ার কারণ	৩৬৪
হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)–এর কয়েকটি বাণী	৩৬৪
দারুল উলূম দেওবন্দ সম্পর্কে হযরত আলী (কাঃ ওয়াঃ)	৩৬৫
মক্কায় জীবন মদীনায় মরণ	৩৬৬
আযাদীর ভালমন্দ	৩৬৬
নেককার লোকদের ইজতিমার বরকত	৩৬৬
কৃপণতা ও অপব্যয়	৩৬৭
একজন বক্তার ধৃষ্টতা	৩৬৮
হযরত নানুতবী (রহঃ) ও ইমাম রাযী (রহঃ)	৩৬৮
হযরত শাহ আবদুর রহীম দেহলভী (রহঃ)	৩৬৯
কারামত দ্বারা নৈকট্য বৃদ্ধি পায় না	৩৭১
আত্মিক যিকির প্রসঙ্গে	৩৭১
ঘুমের কারণে নবী (আঃ)গণের উযূ ভঙ্গ হয় না	৩৭১
ইবাদত ও তাকওয়া অবলম্বন	৩৭২
ফকীহগণের শ্রেষ্ঠত্ব	৩৭৩
হযরত শুরাইহ (রহঃ)–এর একটি কথা	৩৭৩
শুভ ও অশুভ লক্ষণ প্রসঙ্গে	৩৭৪
হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)–এর ভবিষ্যদ্বাণী	৩৭৫
নাবালেগ ছেলের ইমামতীতে তারাবীহ নামায	৩৭৫
আশ্চর্যজনক ও বিরল তিন কিতাব	৩৭৬
হযরত (রহঃ)–এর উপদেশ কৌশল প্রদান	৩৭৬
তাফসীরে কুরআন সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ	৩৭৭

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
হাদীস পড়ানোর প্রাথমিক অবস্থায়	৩৭৮
হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)–এর কাশফ	৩৭৮
দারুল উলূম দেওবন্দের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে ইস্তিফা	৩৭৯
রামপুরে একটি বিবাহের অনুষ্ঠান	৩৮০
হানাফী মাযহাব সূর্যের মত	৩৮১
হযরত গাংগুহী (রহঃ) ও হযরত নানুতবী (রহঃ)	৩৮২
সাধারণ লোকদের ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করা	৩৮২
রিয়ার সম্ভাবনা আছে বলে আমল ছেড়ে দিবে না	৩৮৩
মুরীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ	৩৮৩
তালীমের ক্ষেত্রে সহজতা	৩৮৪
যিয়াউল কুলূবে বর্ণিত যিকির–মোরাকাবার শর্ত	৩৮৪
আমল নয় আসল উদ্দেশ্য আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি	৩৮৪
সুফীর পরিচয়	৩৮৫
হযরত মীর যাহেদ (রহঃ)	৩৮৬
হুক্কা পান করার হুকুম	৩৮৬
হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহঃ)–এর অসুস্থতা	৩৮৬
প্রচলিত মুনাযারার প্রতি অনীহা	৩৮৭
হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)–এর কথা	৩৮৭
মির্যা কাদিয়ানীর ব্যাপারে আকাবিরে দেওবন্দ	৩৮৮
সুধারণা ও কুধারণার ব্যাপারে স্থিতিশীলতা	৩৮৮
বুযুর্গদের দু'আ ও আল্লাহ পাকের নামের সম্মান	৩৮৯
হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ) সম্পর্কে হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)–এর বক্তব্য	৩৮৯
রমযানুল মুবারক ১৩৫০ হিজরীর মালফূযাত	
মাওলানা ফযলুর রহমান সাহেব–এর কিছু কথা	৩৯০
একটি গুরুত্বপূর্ণ হিদায়াত	৩৯০
অমুসলিমদের সাথে আচরণ	৩৯১
হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ (রহঃ)	৩৯২
মাওলানা ফয়যুল হাসান সাহারানপুরী (রহঃ)	৩৯২

www.banglakitab.weebly.com   www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
জীন অধীনস্থ করার আমল প্রসংগে	৩৯৩
মৌলভী গাউস আলী শাহ্ পানীপতী (রহঃ)	৩৯৪
একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল	৩৯৪
উম্মুল মুমিনীন (রাযিঃ)গণের পূর্ণ বৎসরের খোরাক প্রদান প্রসঙ্গ	৩৯৪
উম্মতে মুহাম্মদীর সফলতা	৩৯৪
পূর্ব যুগের বুযুর্গানে দ্বীনের মামূল	৩৯৫
রমযানুল মুবারক ১৩৫৪ হিজরীর মালফূযাত	
ইখতিলাফী মাসাইলের ক্ষেত্রে ন্যায়সংগত স্থিতিশীলতা	৩৯৬
সাধকের সৃষ্ট পরিস্থিতির উপর সন্তুষ্ট থাকা	৩৯৭
প্রকৃত স্বপ্নে একটা নূর থাকে	৩৯৭
একটি গুরুত্বপূর্ণ নসীহত	৩৯৮
সর্বদা অন্তরের নেগরানী করা উচিত	৩৯৮
হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)–এর অসুস্থতা	৩৯৯
হযরত (রহঃ)–এর কাছে জিন্নাহ সাহেবের চিঠি	৪০১
শাইখের প্রতি হৃদ্যতা ও আকর্ষণ	৪০২
হযরত থানবী (রহঃ)–এর একটি কারামত	৪০৩
আরেফ ব্যক্তির ইবাদত	৪০৩
সকল ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করা	৪০৩
আসরের পরের ভ্রমণের মধ্যে কিতাবের দরস	৪০৫
মহিলাদের হজ্জ সফর প্রসঙ্গে	৪০৫
হযরত হাসান (রহঃ)–এর একটি শে'র	৪০৬
হযরত খাজা আযীযুল হাসান মাজযূব (রহঃ)–এর একটি শে'র	৪০৭
রবিউল আউয়াল ১৩৫৮ হিজরীর মালফূযাত	
'আল্লাহ' 'আল্লাহ' ইসমে যাতের যিকির	৪০৮
নিজের বিনয় ও মুরীদের মঙ্গল	৪০৯
উম্মতের লাভ ও ক্ষতি	৪১০
শাইখ ইরাকী (রহঃ) ও আল্লামা শামসে তাবরীয (রহঃ)	৪১০
হরফ ও কালেমার আদব	৪১২

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
মোল্লা দো পেয়াযে	৪১২
পোশাক ভাল হওয়া কোন দোষ নয়	৪১২
বুযুর্গানে দ্বীনের মাঝে মর্যাদার পার্থক্য নিরূপণ	৪১৩
একটি শে'র এর জবাব	৪১৪
মাঝে মাঝে মুরীদ থেকে শাইখের এবং সাগরেদ থেকে উস্তাদের ফায়েয লাভ হয়	৪১৬
হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) থেকে শোনা মুহতারাম পিতার একটি ঘটনা	৪১৭
একটি আয়াতের তাফসীর	৪১৯
মাওলানা জামী (রহঃ)–এর একটি শে'র	৪২০
ভূত–প্রেতের প্রতিক্রিয়া দূর করার জন্য জীন হাযির করা	৪২০
দুনিয়ার কারো সাথে সম্পর্কের উপর ভরসা করা বোকামী	৪২১
উলামাগণের মতপার্থক্যের মুহূর্তে হযরত (রহঃ)–এর স্থিতিশীলতা	৪২২
নি'আমত ও ইস্তিদরাজ–এর পার্থক্য	৪২৪
একটি কৌতুক	৪২৪
এক কংগ্রেসী মাওলানা সাহেবের ঘটনা	৪২৫
বাতেনী রোগের চিকিৎসা ঃ আল্লাহ পাকের দেয়া যোগ্যতা	৪২৫
একটি আয়াতের সংশয় নিরসন	৪২৬
প্রত্যেক মানুষের সৃষ্টিগত মৌলিক জ্ঞান	৪২৭
'সূফী' কাকে বলে?	৪২৮
একটি হাদীসের ব্যাখ্যা	৪২৯
উলামা–মাশাইখগণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অসিয়্যত	৪৩০
ঐক্য ও অনৈক্যের মূল কারণ	৪৩০
একটি ভুল ধারণার অবসান	৪৩০
একজন ইংরেজী শিক্ষিত লোকের চিঠির জবাব	৪৩২
ইলমে দ্বীনের অতুলনীয় আদব	৪৩৩
মসনবীর একটি শে'রের সঠিক ব্যাখ্যা	৪৩৪

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
মাহে শা'বান ১৩৫০ হিজরীর মালফূযাত	
কিতাব লেখকদের প্রতি বিশেষ হিদায়াত	৪৩৫
শরীয়তের মূলনীতির সাথে মানুষের মানসিকতাও লক্ষণীয়	৪৩৫
শুকরে নি'আমত	৪৩৭
একত্রে কয়েকজনের ইসালে সওয়াব	৪৩৮
শয়তান ফেরেশতাদের শিক্ষক কিনা ?	৪৩৮
কারো প্রতি কুধারণা সৃষ্টি করে দেয়ার রহস্য	৪৩৯
দুনিয়ার চাইতে আখিরাতের চিন্তার অগ্রগণ্যতা	৪৩৯
কষ্টের আকারে মেহেরবানী	৪৪০
একটি আয়াতের উপর প্রশ্ন ও তার জবাব	৪৪০
বিজ্ঞজনোচিত উত্তর	৪৪২
আকীদা-ই-তাকদীর এর হিকমত	৪৪৩
দ্বীনী মাদরাসাসমূহের চাঁদা	৪৪৪
মামূনুর রশীদের একটি শিক্ষণীয় ঘটনা	৪৪৫
শাহ ইসহাক সাহেব (রহঃ)-এর একটি আশ্চর্য ঘটনা	৪৪৬
'ফিকাহ' সবচাইতে বেশী কঠিন	৪৪৬
মোল্লা খালেদ নকশবন্দী তুরকী (রহঃ)	৪৪৭
১৯ রবিউস সানী ১৩৫৮ হিজরীর মালফূযাত	
আকাবীরে দেওবন্দের ন্যায়পরায়ণতা ও স্থিতিশীলতা	৪৪৮
'মাদহে সাহাবা' সমাবেশ প্রসঙ্গে কথা	৪৪৮
একটি আয়াতের সংশয় ও তার জবাব	৪৫২
হাকীমুল উম্মত থানবী (রহঃ)-এর বিশেষ বিনয়	৪৫৩
দ্বিতীয় খলীফার জামায় একুশ তালি	৪৫৩
বুযুর্গানে দ্বীনের সন্তুষ্টি অর্জন	৪৫৪
তাকওয়ার উপর গর্ব করার নিন্দা	৪৫৫
একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা	৪৫৫
হযরত আলী (রাযিঃ)-এর দুটি শে'র	৪৫৫
"ضاد" (যোয়াদ) হরফটি উচ্চারণ প্রসঙ্গে	৪৫৬
মুনাযারা ও বিতর্ক	৪৫৭

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত মাওলানা শাইখ মুহাম্মদ সাহেব (রহঃ)–এর মুনাযারা	৪৫৭
উলামায়ে রব্বানীর ধৈর্য ও অনুগ্রহ	৪৫৮
আল্লাহ পাক পর্যন্ত পৌছার দুটি তরীকা	৪৫৮
এক ব্যক্তির স্বপ্ন ও হযরত থানবী (রহঃ)–এর উপদেশ	৪৬০
হযরত থানবী (রহঃ)কে হত্যার হুমকি	৪৬১
কুরআন শরীফের তাজভীদ প্রসঙ্গে	৪৬২
পানিপতী এবং মিসরী পদ্ধতি	৪৬৩
কুরআন শরীফে ওয়াকফ করা ও না করা	৪৬৩
আখবার ও আহবাবের প্রতি নির্ভরতা	৪৬৪
প্রত্যেক কাজে সীমা সংরক্ষণ	৪৬৪
একটি অভিজ্ঞতার কথা	৪৬৫
ইলমী ব্যাপারে অধঃপতন	৪৬৫
দ্বীনী মযবুতী ও বাহ্যিক হিকমত	৪৬৫
তাকওয়া পরহেযগারীর ক্ষেত্রে শরীয়তের সীমার সাথে মানুষের মনের প্রতিও লক্ষ্য রাখা উচিত	৪৬৬
হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)–এর প্রতি হযরত মাওলানা মুযাফফর হুসাইন সাহেব (রহঃ)–এর ভক্তি	৪৬৭
ইসলাহ ও হিদায়াত লাভের জন্য নিজের ইচ্ছা থাকা আবশ্যক	৪৬৭
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত একটি কথা	৪৬৮
দুনিয়ার হাকীকত	৪৬৯
নফসানী এবং রূহানী হালাত	৪৭০
হাল ও মাকাম–এর মধ্যে পার্থক্য	৪৭২
হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)–এর মারপিট	৪৭২
আল্লাহ পাকের একটি বড় পুরস্কার	৪৭৩
শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ)	৪৭৩
একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ	৪৭৪
একজন গাইরে মুকাল্লিদ হযরত থানবী (রহঃ)–এর দরবারে	৪৭৪
তরীকতপন্থীদের জন্য একটি পরীক্ষিত মূল্যবান ব্যবস্থা	৪৭৫
নাজাত ও মুক্তির দুটি উপায়	৪৭৫
হযরত গাংগুহী (রহঃ)–এর একটি উপদেশ	৪৭৬

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ	৪৭৭
প্রত্যেকের উচিত তার বড়কে অনুসরণ করা	৪৭৭
হযরত খিযির (আঃ) কি জীবিত?	৪৭৭
পোশাকে লৌকিকতা বেকারত্বের লক্ষণ	৪৭৮
বুযুর্গানে দেওবন্দের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণ	৪৭৮
কুরআন শরীফের শিক্ষক গাংগুহ–এর এক হাফেয	৪৭৮
হযরত থানবী (রহঃ)–এর পসন্দনীয় একটি শে'র	৪৭৯
ইরাক বিজয়ের মুহূর্তে হযরত ফারূক–ই–আযম (রাযিঃ)–এর দু'আ	৪৮০
শাহ সুজা কিরমানী (রহঃ)–এর মেয়ে	৪৮১
আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে মাল খরচ করা	৪৮৪
একজন তুর্কী দরবেশ খলীল পাশা	৪৮৪
দেওবন্দের বুযুর্গানে দ্বীনের আসল বৈশিষ্ট্য	৪৮৫
ইমাম গাযযালী (রহঃ)–এর একটি কথা ও তার ব্যাখ্যা	৪৮৬
প্রত্যেক যুগেই কামেল লোকের সংখ্যা কম ছিলো	৪৮৭
মাওলানা আবদুল খালেক সাহেব (রহঃ)	৪৮৭
নিআমত শুকরিয়ার সাথে ব্যবহার করা	৪৮৮
আত্মশুদ্ধিতে চিন্তা ও অস্থিরতার ভূমিকা	৪৮৮
হযরত থানবী (রহঃ)–এর নিজের একটি শে'র	৪৮৮
শুকুর ও নাশুকুরীর ভিত্তি	৪৮৮
অসুস্থতার কারণে আহ! উহ! করা	৪৮৯
শাইখ নির্বাচনের মাপকাঠি	৪৯০
পরিচিত কোন মানুষের আকৃতিতে আল্লাহ পাকের গায়েবী সাহায্য	৪৯১
অধিক কষ্ট করে অধিক সওয়াব লাভ প্রসঙ্গে	৪৯২
সুন্নাত তরীকার আমল কষ্টকর নয়	৪৯৩
আল্লাহ পাকের নি'আমত উপেক্ষা করা বড় বেয়াদবী	৪৯৩
জান্নাতে কোন আকাংখা থাকবে না থাকবে শুধু তৃপ্তি আর শান্তি	৪৯৩
বেহুদা ও অহেতুক প্রশ্ন ও তাহকীক	৪৯৪

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পদশালী লোকদের থেকে আলিমগণকে অমুখাপেক্ষী থাকতে হবে	৪৯৫
একটি বিজ্ঞজনোচিত উপদেশ	৪৯৬
দ্বীনী মাদরাসাসমূহে কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রসঙ্গে	৪৯৭
দুনিয়ার হাজারো ঝামেলার মধ্যেও কামেল লোকেরা থাকেন শান্ত ও স্থিতিশীল	৪৯৭
ইয়া মুহাম্মদ (সাঃ) ইয়া রাসূল (সাঃ) বলে ডাকা প্রসঙ্গে	৪৯৮
একটি আশ্চর্য ঘটনা	৪৯৯
‘তাকলীদ’ ও ‘ইজতিহাদ’ সম্পর্কে আলোচনা	৫০০
সম্মান ও মর্যাদা কামনার নিন্দনীয়তা	৫০৩
কাশফ মানুষের জন্য কোন কামাল নয়	৫০৪
মজাদার খানা গ্রহণ পরিত্যাগ করা আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভের কারণ হয় না	৫০৪
হযরত থানবী (রহঃ)–এর ইসলাহ ও তারবীয়্যতের বিশেষ ধরন	৫০৫
মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)–এর কাশফ	৫০৬
উস্তাদ ও বুযুর্গানে দ্বীনের প্রতি হযরত থানবী (রহঃ)–এর মহব্বত	৫০৯
হযরত নানুতবী (রহঃ)–এর একটি বাণী	৫০৯
হযরত মাদানী (রহঃ) সম্পর্কিত একটি স্বপ্ন প্রসঙ্গে	৫১০
আল্লাহ পাকের নি'আমতসমূহের হিফাযত	৫১২
একটি খাব ও তার তা'বীর	৫১২
জালিম শাসকদের সাথে ন্যায় ও স্থিতিশীল আচরণ	৫১৩
যারা খারাপ কথা বলে তাদের এলাজ	৫১৫
মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) ও সংগীত বিদ্যা	৫১৫
হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম (রহঃ) ও মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)	৫১৭
সুয়ালের হাত বাড়ানোই প্রকৃত অপমান	৫১৮
শেষ কথা	৫১৯

॥ ॥ ॥

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

যে সকল মহামনীষী মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন, যাঁরা দুনিয়ার মানুষদেরে ভাল কথা শুনিয়েছেন, মন্দ হতে ফিরিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছেন, যাঁদের পরশে মানব জীবনে মঙ্গল এসেছে, তাদের ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার পথ উন্মুক্ত হয়েছে তাঁদের মধ্যে প্রাচ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দ্বীনী আলেম, বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক সাধক পুরুষ, মুজাদ্দিদে যামান হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

চলতি শতাব্দীতে হযরত থানবী (রহঃ)-কে মুসলিম উম্মাহর জন্য তার রূহানী খেদমত ও বিশেষ সংস্কারধর্মী অবদান রাখার জন্য 'হাকীমুল উম্মত' ও মুজাদ্দিদে মিল্লাত উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিলো। হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)-এর আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞার স্পর্শে অসংখ্য মানুষ রূহানী ফয়েয, বরকত ও তাসাওউফের দীক্ষা লাভে নিজেদের ধন্য ও সৌভাগ্যশালী করে গড়ে তুলেছিলেন। পরবর্তীতে যাঁরা হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)-এর ধারায় সামাজিক ও আধ্যাত্মিক খেদমত অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন, আজো গোটা বিশ্বে বিশেষতঃ এ উপমহাদেশে সে ধারা অক্ষুন্ন আছে।

জন্ম ও বাল্যকাল ঃ

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) ১২৮০ হিজরী সনের ৫ রবিউস সানী বুধবার সুবহে সাদিকের সময় জন্মগ্রহণ করেন। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও জন্মগ্রহণ করেছিলেন সুবহে সাদিকের সময়। হযরত থানবী (রহঃ)-এর ছোট ভাই আকবর আলী অল্প সময়ের ব্যবধানে (১৪ মাস পরে) জন্মগ্রহণের ফলে তাঁর মায়ের দুধ দুই ভাইয়ের জন্য যথেষ্ট হচ্ছিলো না বিধায় তার জন্য একজন দুধমাতার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছিলো।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হযরত থানবী (রহঃ) যখন সবে মাত্র পঞ্চম বৎসরে পদার্পন করেছেন তখনই তাঁর স্নেহময়ী আম্মা পরলোকগমন করেন। ফলে তিনি প্রধানতঃ তার পিতার হাতেই লালিত পালিত হন। হযরতের পিতার অকৃত্রিম স্নেহ ও মমতার পরশে তিনি মাতৃবিয়োগ ব্যথা ভুলে থাকতে সক্ষম হন। তবে এর পরেও তিনি মাঝে মাঝে মাতৃশূন্যতায় হৃদয় মাঝে এক চরম হাহাকার ও বিয়োগ ব্যথা অনুভব করতেন। এমনি এক ব্যথাকাতর অবস্থাতেই তিনি ধীরে ধীরে বড় হতে থাকেন।

বাল্যকাল থেকেই হযরত থানবী (রহঃ) ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত ও সততার অধিকারী। তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক কথা সে সময় থেকেই অনেককে মুগ্ধ করতো। ফলে তিনি তখন থেকেই ছিলেন সকলের স্নেহ ও আদরের পাত্র। এ বিষয়ে হযরত থানবী (রহঃ) নিজেই বলতেন—

"আল্লাহ পাকের ফযলে বাল্যকাল থেকে আমি যেখানেই থেকেছি, দোস্ত-আহবাব, আত্মীয়-স্বজন, নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকলেরই প্রিয়ভাজন হয়ে থেকেছি, অথচ বাল্যকালে আমি খুবই কৌতুক করতাম। তবে এখনকার দুষ্টু ছেলেদের মত নোংরা কৌতুক করতাম না। তাই বিরক্তি উৎপাদনের স্থলে আমার কৌতুকগুলি সকলের ভালই মনে হত।"

(আশরাফ চরিত, পৃঃ ৫৭)

শৈশব থেকে নামায ও নেক আমলের প্রতি তিনি ছিলেন চরম উৎসাহী। ফলে তিনি খেলার মাঝেও সাথীদের নিয়ে নামাযের অভিনয় করতেন। এছাড়া বাল্যকাল থেকে ওয়ায করার প্রতিও ছিলেন তিনি যথেষ্ট আগ্রহী। ফলে বিভিন্ন সময় তিনি রাস্তার পাশের খালি মসজিদে প্রবেশ করে ইমাম সাহেবের মত মিম্বারে বসে ওয়ায করতেন আবার দাঁড়িয়ে খুতবা পাঠের মত করে কিছু পড়তেন। এভাবেই তিনি আনন্দ উপভোগ করতেন।

বাল্যকাল থেকে তিনি এতটাই ধর্মপরায়ণ ও নেক আমলের প্রতি সচেতন ছিলেন যে, তার বয়স যখন মাত্র বার/তের বৎসর, যখন তিনি মাদরাসার প্রাথমিক শ্রেণীগুলোতে পড়াশুনা করতেন সে সময় থেকে গভীর রাতে জেগে উঠতেন, তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন, বিভিন্ন যিকির-আযকার করতেন, এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য কেঁদে কেঁদে ফরিয়াদ করতেন।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত নাজুক স্বভাবের মানুষ। তিনি কারো অনাবৃত

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

পেট দেখতে পারতেন না। এতে তাঁর বমি এসে যেতো। দুর্গন্ধ মোটেও সহ্য করতে পারতেন না এমনকি কোথাও তীব্র সুগন্ধি থাকলেও সেখানে তিনি বসতে পারতেন না। এছাড়া এলোমেলো ও ছড়ানো ছিটানো জিনিসপত্র দেখলেও তিনি মাথা ব্যথা অনুভব করতেন। পরিপাটি ও গোছানো অবস্থাই তিনি সর্বদা পসন্দ করতেন।

শিক্ষা জীবন ঃ

.হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) শিক্ষা জীবনের শুরুতেই পবিত্র কুরআন শরীফ পূর্ণ হিফয করেন। তার হিফযের উস্তাদ ছিলেন দু'জন, একজন ছিলেন হাফেয হুসাইন আলী আর অপরজনের নাম ছিলো হাফেয আখওয়ানজী।

অতঃপর তিনি মিরাঠে ফার্সী ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর থানাভবনে মাওলানা ফাতেহ মুহাম্মদ (রহঃ)–এর কাছ থেকে ফার্সী ভাষার মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করেন। এ ভাষার চূড়ান্ত শিক্ষা তিনি নিজ মামা ওয়াজেদ আলী (রহঃ)–এর কাছ থেকে লাভ করেন।

হিজরী ১২৯৫ সনে তিনি ইলমে দ্বীনের উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দে গমন করেন। সেখানে তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে আরবী–ফার্সী ও উর্দূ ভাষায় বিভিন্ন জ্ঞানগ্রন্থ অধ্যয়ন করতে থাকেন। তার ইলমে দ্বীন শিক্ষায় গভীর লিপ্ততা ও নিজ মেধার কারণে অল্পদিনেই তিনি সকল উস্তাদের নেক দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন।

হিজরী ১৩০০ সনে তিনি তাঁর দারুল উলূম দেওবন্দের শিক্ষা সমাপন করেন। মাত্র পাঁচ বছরে শিক্ষার এ উচ্চতর স্তরে পৌঁছে যাওয়া ছিলো তার কঠোর সাধনা ও গভীর লিপ্ততারই ফসল। তখন হযরত থানবী (রহঃ)–এর বয়স ছিলো মাত্র উনিশ বা বিশ বছর। এভাবে দারুল উলূম থেকে এক গৌরবময় ও সম্মানজনক আসন অর্জন করে অসংখ্য খ্যাতি ও সুনাম কুড়িয়ে তিনি তথা হতে ফিরে আসেন।

শিক্ষকতা ঃ

ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করে তিনি ১৩০১ হিজরী সনে প্রথমে কানপুরের মাদরাসায়

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

ফয়যে আম–এ শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৩০১ হিজরী থেকে ১৩১৫ হিজরী পর্যন্ত দীর্ঘ চৌদ্দ বছরকাল যাবৎ তিনি এ কানপুরে থেকেই দ্বীনী শিক্ষার সুমহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে থাকেন। সাথে সাথে এ সময়ে তিনি ওয়ায মাহফিলে বয়ান বক্তৃতাও চালিয়ে যান এবং দ্বীনী বিভিন্ন বিষয়ে অনেক অমূল্য গ্রন্থাদিও রচনা করেন। প্রতিভাদীপ্ত এ আলেমে দ্বীন অল্প দিনেই সারা ভারতবর্ষে খ্যাতিসম্পন্ন হয়ে উঠেন।

ছাত্রদের পাঠদানের ক্ষেত্রে তার রীতি ছিলো অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয়। অত্যন্ত কঠিন বিষয় হলেও তিনি এমন সহজবোধ্যভাবে তা শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতেন যাতে শিক্ষার্থীরা বিষয়টির কাঠিন্য মোটেও আঁচ করতে পারতো না। অতি সহজেই তারা জটিল বিষয়গুলো বুঝে ফেলতে পারতো। এ কারণে প্রধানতঃ জটিল বিষয়গুলোই তাকে পড়াতে দেয়া হতো, ছাত্ররাও তার কাছে পড়ার ব্যাপারে ছিলো বেদম উৎসাহী। এটি ছিলো হযরত থানবী (রহঃ)–এর বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি অন্যতম দিক।

তিনি উলামায়ে কিরামের মাধ্যমে চাঁদা তোলার বিষয়টিকে খুবই ঘৃণা করতেন। তিনি মাদরাসায় শিক্ষকতার পাশাপাশি সাধারণ জনগণের সাথেও অত্যন্ত সদ্ভাব বজায় রেখে চলতেন বিধায় গ্রামবাসীরাও তার কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে উপকৃত হতো। ফলে তিনি সর্বমহলে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হন।

ওয়ায–নসীহত ঃ

ছোট সময় থেকে হযরত থানবী (রহঃ) ওয়াযের চর্চা করতেন বিধায় ওয়ায–নসীহত ও দ্বীনী বয়ানের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। সুকৌশলে সুন্দর উপস্থাপনায় কুরআন হাদীস ভিত্তিক প্রামাণ্য ওয়ায ও নসীহত করা ছিলো তাঁর অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

তাঁর পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের গভীরতা এতই উচ্চাঙ্গের ছিলো যে, তাঁর ওয়ায সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জনাব মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ মুস্তাফা বলেন, "আমি নিজে একই হাদীসের উপর হযরত থানবী (রহঃ)–এর বয়ান অন্ততঃ পঞ্চাশবার শুনেছি কিন্তু তাতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সন্নিবেশিত ছিলো কখনো বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি করতে শুনিনি।"

তার বয়ানের আকর্ষণের কারণে কোথাও তিনি বয়ান করবেন

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

জানতে পারলে সর্বস্তরের লোক দলে দলে সেখানে গিয়ে বিশাল জমায়েতে পরিণত হতো। এবং দীর্ঘ সময় ধরে একাগ্রতার সাথে তাঁর ওয়ায শুনতো। তার বয়ানে গদ্যের মধ্যেও পদ্যের স্বাদ অনুভূত হতো। এক কথায় মাধুর্যপূর্ণ ভাষা ও সুন্দর প্রামাণ্য উপস্থাপনার ফলে তা ছিলো বে-নযীর ও হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হযরতের সেসব মূল্যবান ওয়ায সব লিখে রাখার ব্যবস্থা হয়নি ফলে অনেক প্রয়োজনীয় সম্পদ হাতছাড়া হয়েছে সন্দেহ নেই। তবে যা লিখা হয়েছে তার মধ্যে হযরত থানবী (রহঃ)-এর চারশোর মত বয়ান ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। যা প্রায় ৩০/৪০টি ভলিউমে শেষ হয়েছে। তাঁর বেশ কিছু ওয়ায ইতিমধ্যে বাংলা ভাষায়ও অনুবাদ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। যা দ্বারা বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের বিরাট উপকার সাধিত হচ্ছে।

আধ্যাত্মিক সাধনা ঃ

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ)-এর ধরায় আগমন ছিলো মুসলিম উম্মাহর জন্য এক মহান সৌভাগ্যের বিষয়। মুসলিম জাতির সংস্কার ও তাদের রূহানী বা আত্মিক উন্নতি সাধনের অন্যতম ব্রত নিয়েই তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত থানবী শৈশব কাল থেকেই অত্যন্ত আমল সচেতন ছিলেন। সেমতে ইলমে যাহেরী অর্জন 'করার পর ইলমে বাতেনী অর্জনের জন্য তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। সে অদম্য আগ্রহের ভিত্তিতেই তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে অধ্যয়নরত অবস্থাতেই কুতুবুল ইরশাদ হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহঃ)-এর খিদমতে ইসলাহী বাই'আত-এর আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তিনি বাই'আত করেননি। কি কারণে করেননি সে ব্যাপারে পরবর্তী আলোচনাই প্রমাণ বহন করে যে, হযরত গাংগুহী (রহঃ) তার রূহানী ইলমের মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, হযরত থানবী (রহঃ) হবেন হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহঃ)-এর ইসলাহী সাগরেদ।

হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) (হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহঃ) যেহেতু সে সময় মক্কা শরীফে অবস্থান করছিলেন সেহেতু হযরত থানবী (রহঃ) হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)-এর খিদমতে এই বলে পত্র লিখলেন যে, আমি হযরত গাংগুহীর খিদমতে বাই'আতের দরখাস্ত করেছিলাম

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

কিন্তু তিনি আমাকে বাই'আত করেননি। দয়া করে আপনি তাঁকে বলে দিবেন যেন তিনি আমাকে বাই'আত করে নেন। হযরত থানবী (রহঃ) এ চিঠিটি হযরত গাংগুহী (রহঃ) হজ্জে যাওয়ার সময় তাঁর মাধ্যমেই হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)–এর খিদমতে পাঠিয়েছিলেন।

পত্র পেয়ে হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) হযরত গাংগুহী (রহঃ)–এর সাথে কি আলোচনা করেছিলেন তা আমাদের অবগতির বাইরে কিন্তু পরিশেষে তিনি সুপারিশ না করে বরং নিজেই হযরত থানবী (রহঃ)–কে গায়েবানা বাই'আত করে নিলেন। এর দ্বারা বুঝা যায় এ কারণেই হযরত গাংগুহী (রহঃ) হযরত থানবী (রহঃ)–কে বাই'আত করতে অস্বীকার করেছিলেন।

এরপর হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) হযরত থানবী (রহঃ)–এর পিতাকে পরবর্তী হজ্জের মৌসুমে হজ্জ করার জন্য মক্কায় যাওয়ার আহ্বান জানালেন এবং এও বলে দিলেন যে, সাথে করে তোমার বড় ছেলে আশরাফ আলীকে নিয়ে আসবে। উল্লেখ্য যে, হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) ছিলেন হযরত থানবী (রহঃ)–এর পিতার ইসলাহী শাইখ বা পীর। শাইখের নির্দেশ মতে ছেলেকে নিয়ে তিনি হযরত হাজী সাহেবের দরবারে হাযির হলে তিনি হযরত থানবী (রহঃ)–কে এবার হাতে হাতে বাই'আত করে নিলেন। এভাবেই হযরত থানবী (রহঃ)–এর আধ্যাত্মিক সাধনার নিয়মতান্ত্রিক সূচনা হলো।

এরপর থেকে হযরত থানবী (রহঃ)–এর একমাত্র কাজই হয়ে দাঁড়ালো আধ্যাত্মিক সাধনা। এর প্রায় তিন বৎসর পর তিনি পুনরায় হযরত হাজী সাহেবের দরবারে হাজির হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। সেমতে ১৩১০ হিজরী সনে পুনরায় হযরত থানবী (রহঃ) আপন মুর্শিদের দরবারে গিয়ে হাজির হলেন। মুর্শিদও তার একনিষ্ঠ এ সাগরেদকে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ দানের কাজ শুরু করলেন। দীর্ঘ ছয় মাস হযরত থানবী (রহঃ) হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)–এর দরবারে থেকে ইলমে মা'রিফাতের উচ্চাঙ্গের দীক্ষা গ্রহণ করে আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করে শাইখের কাছ থেকে খেলাফত লাভ করেন। এরপর তথা হতে দেশে ফিরে এসে পুনরায় কানপুর মাদরাসায় ইলমে শরীয়তের এবং জনসাধারণের মাঝে ইলমে মা'রিফাতের যুগপত শিক্ষা কার্যক্রম আঞ্জাম দিতে থাকেন। হযরত থানবী (রহঃ)–এর সংস্পর্শ

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

লাভে অল্প সময়েই মাদরাসাটি একদিকে ইলমে শরীয়তের কেন্দ্র ও অপরদিকে ইলমে মা'রিফতের খানকায় পরিণত হলো।

বিদায়লগ্নে হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) হযরত থানবী (রহঃ)-কে উপদেশ হিসেবে বলে দিয়েছিলেন, "দেশে ফিরার পর তোমার মাঝে তুমি এক অপূর্ব অনুভূতি ও অবস্থা লক্ষ্য করবে সে সময় অস্থির হয়ে পড়বে না বরং ধীরস্থিরভাবে সব কাজ আঞ্জাম দিবে। আর কানপুর মাদরাসায় পড়াতে ইচ্ছা না হলে তোমার নিজ এলাকা থানাভবনে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করবে। অন্য কোথাও যাওয়ার কথা ভাববে না।"

খানকায়ে ইমদাদিয়া ঃ

দেশে ফিরে এসে কানপুর এলাকায় আরো কয়েক বছর খেদমত করার পর তিনি সেখানে থাকার উৎসাহ হারিয়ে ফেললেন। ফলে হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)-এর উপদেশ মত তিনি থানাভবন চলে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। সেমতে দীর্ঘ চৌদ্দ বছর কানপুরে ইলমী খিদমত আঞ্জাম দেয়ার পর ১৩১৫ হিজরী সনে তিনি থানাভবন চলে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে খানকায়ে ইমদাদিয়াকে পুনরায় সচল করে তুললেন। হযরত থানবী (রহঃ)-এর শাইখ হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) এ খবর শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং নিজ সাগরেদকে প্রাণভরে দু'আ করলেন।

পুরোনো স্মৃতি বিজড়িত খানকায়ে ইমদাদিয়ায় দিবা-নিশি তিনি বিরামহীন সাধনা চালিয়ে যেতে থাকলেন। এ সময় বিভিন্ন দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খিদমতের জন্য আহ্বান এলেও তিনি নিজ শাইখের নির্দেশ হেতু অন্য কোথাও যাওয়ার ব্যাপারে সম্মত হননি।

হযরত থানবী (রহঃ)-এর কাছে বাই'আত হওয়াও সহজ ব্যাপার ছিলো না। বরং তার কাছে বাই'আত হতে হলে যেসব কঠিন বিষয়াবলীর উপস্থিতি প্রয়োজন হতো তা অনেকের মধ্যেই প্রথম অবস্থায় পাওয়া যেত না। ধীরে ধীরে তার মাঝে শর্তাধীন বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই হযরতের কাছে বাই'আত হওয়া সম্ভব হতো।

হযরত থানবী (রহঃ) ছিলেন কঠোর নিয়মানুবর্তিতার অনুসারী, তিনি নিজে যেমন নিয়মমাফিক চলতেন তেমনি নিজ সাগরেদদেরকেও নিয়মানুবর্তিতার অনুসারী হতে হতো। সামান্য নিয়ম বহির্ভূত কিছু দেখলেই তিনি খুব রেগে যেতেন। এমনিভাবেই খানকায়ে ইমদাদিয়া হয়ে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

উঠলো কঠোর নিয়ম নীতিতে সমৃদ্ধ এক সুশৃংখল আধ্যাত্মিক সাধনাকেন্দ্র।

কেউ যদি হযরত থানবী (রহঃ)–এর কাছ থেকে এই বলে অনুমতি গ্রহণ করতো যে, 'আমি সাক্ষাৎ করতে চাই' তবে তাকে শুধু সাক্ষাৎ করেই বিদায় নিতে হতো একটি কথা বলারও অনুমতি থাকতো না।

কলমের খেদমত ঃ

ইলমে দ্বীন শিক্ষাদান, ওয়ায–নসীহত ইত্যাদির সাথে হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী (রহঃ)–এর কলমের খিদমতও ছিলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিকগণের মতে হযরত থানবী (রহঃ)–এর পূর্ব পর্যন্ত আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহঃ) ছিলেন কলমী খিদমত তথা রচনা–সংকলনের ক্ষেত্রে সকলের শীর্ষে কিন্তু হযরত থানবী (রহঃ)–এর কলমের পরিধি এতই ব্যাপক ছিলো এবং তার এ খিদমত এতটাই সম্প্রসারিত হয়েছিলো যে, তিনি হযরত জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)–কেও অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন।

ইসলামের এমন কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নেই যে বিষয়ে তিনি কলম ধরেননি। তাঁর লিখার মধ্যে ছিলো এক অসাধারণ নূরানী আকর্ষণ। যে কোন পাঠককেই সে লেখা পুলকিত করে, করে আলোড়িত। আজো তিনি গ্রন্থকার হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের আসনেই রয়েছেন। তার রচনাবলীর সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গেছে। শুধু তাঁর মাতৃভাযাতেই নয় বরং আরবী, ফার্সী, উর্দূ ভাষায় রয়েছে তার অসংখ্য রচনাবলী। যা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের আনাচে কানাচে। শুধু সাধারণ রচনাবলীই নয় বরং পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে হযরত (রহঃ)–এর বেশ কিছু কিতাব।

হযরত থানবী (রহঃ)–এর জীবদ্দশাতেই তাঁর রচনাবলী ব্যাপক খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। যেমনটি আর কারো ব্যাপারে হতে দেখা যায়নি। হযরত (রহঃ)–এর রচনা হাজার হাজার কপি এমনকি কোনটা লক্ষ লক্ষ কপি মুদ্রিত হয়েও প্রচারিত হয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশে এমন কোন দ্বীনী পরিবার নেই যাদের ঘরে হযরত থানবী (রহঃ)–এর দু' চারটি রচনা নেই। এটা হযরত (রহঃ)–এর ইখলাস ও নিষ্ঠার বরকতেই সম্ভব হয়েছে।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

নিয়মতান্ত্রিক রচনাবলী ছাড়াও হযরত থানবী (রহঃ)–এর সাধারণ কথাবার্তাও এত প্রমাণভিত্তিক ও গোছানো ছিলো যা লিপিবদ্ধ করা হলেই তা একটি রচনার রূপ লাভ করতো। তাঁর লেখায় কোন লৌকিকতা নেই বরং সে লেখায় আছে মায়া–মমতা ও দরদ। সে লেখার আবেদন ছিলো অসাধারণ। যেকোন পাঠক মাত্রই তাঁর যে কোন ভাষার একটি রচনা বা অনুবাদ পাঠ করলেই তা অনুভব করতে পারেন।

ছাত্র ও সাগরেদবৃন্দ ঃ

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)–এর কাছে যারা শিক্ষা লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, তাদের তালিকা হতে শুধু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের তালিকা প্রণয়ন করা হলেও তা একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে পরিণত হবে, সন্দেহ নেই। তবে তার কাছ থেকে যারা ইসলাহী খেলাফত লাভ করে ধন্য হতে পেরেছিলেন তাদের সংখ্যাও ছিলো প্রায় একশত। তন্মধ্যে হযরত (রহঃ)–এর ইন্তিকালের সময়ে অন্ততঃ পঁচাত্তর জন জীবিত ছিলেন। খুশির কথা হযরত (রহঃ)–এর খলীফাগণের মধ্যে দশজন ছিলেন বাংলাদেশী। যাঁদের মাঝে হযরত মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ), হযরত মাওলানা আবদুল ওয়াহহাব সাহেব পীরজী হুযূর (রহঃ), হযরত মাওলানা আতহার আলী সাহেব (রহঃ) প্রমূখের নাম ব্যাপকভাবে পরিচিত।

হযরত থানবী (রহঃ)–এর দরবার থেকে খেলাফত লাভ করাই ছিলো আধ্যাত্মিক জগতে পূর্ণতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কারণ যার দরবারে মুরীদ হওয়াই ছিলো অত্যন্ত কঠিন তার কাছ থেকে খেলাফত লাভ করা যে কোন মামুলী ব্যাপার ছিলো না তা এমনিতেই অনুমেয়। তদুপরি তিনি মহান প্রভুর ইশারা ছাড়া কাউকেই যে খেলাফত দিতেন না তা তাঁর আলোচনা থেকেই বুঝা যেত।

কারামত ঃ

কারামত বা অলৌকিক বিষয়াদি যদিও কারো হক বা সত্যতার প্রমাণ নয় তদুপরি আল্লাহ পাকের খাঁটি বান্দাদের জীবনে অনেক কারামত লক্ষ্য করা যায়। হযরত থানবী (রহঃ)–এর জীবনেও এরূপ অসংখ্য কারামত সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু তিনি এ বিষয়গুলোকে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

বর্ণনা করে বুঝাতে চাইতেন যে, এটা কোন কারামত বা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোন আশ্চর্য বিষয় নয়। কখনো বলতেন, এটা এমনিতেই হয়ে গেছে, এখানে আমার কিছুই ছিলো না। আবার কখনো বলতেন, এটা আল্লাহ পাকের নিআমত ইত্যাদি।

শৈশবকালে তিনি যখন কোথাও যাওয়ার জন্য বের হতেন তখন আল্লাহর মেহেরবাণীতে আকাশে মেঘ সৃষ্টি হয়ে তাঁকে ছায়া দান করতো। কোন সাগরেদ কোন বিষয়ে হযরত (রহঃ)–এর খেদমতে জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্যে হাজির হলে প্রশ্ন করার আগেই তিনি আগন্তুককে সে বিষয়ে বলতে থাকতেন। নিঃসন্দেহে এটা ছিলো হযরত থানবী (রহঃ)–এর অন্তর্দৃষ্টির প্রখরতা ও কারামত। হযরত যে রাতে ইন্তিকাল করেন সেদিন সকালেই তিনি বলেছিলেন আজ আমি চলে যাবো।

দ্বীনী সফর ঃ

হযরত থানবী (রহঃ) একাকিত্বে বসে মহান আল্লাহকে ঘনিষ্ঠভাবে পাওয়ার জন্য, তার নৈকট্য লাভের জন্য সাধনা, মুরাকাবা ও মুজাহাদাকেই অধিক পসন্দ করতেন। তা সত্ত্বেও উম্মতের উপকারের প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি মানুষের সাথে মিলতেন, কথা বলতেন, নসীহত করতেন। কিন্তু সফর করার প্রতি তিনি ছিলেন খুবই নিরুৎসাহী। তাঁর অমূল্য উপদেশাবলীর মধ্যে একটি উপদেশ এমনও ছিলো যে, প্রয়োজন ব্যতিরেকে সফর করবে না কারণ সফরে দ্বীন ও ঈমান–আমলের ক্ষতি হয়।

কিন্তু তা হলে কি হবে তিনি সফর যতই অপসন্দ করুন উম্মতের দাবী পূরণে মুসলিম সমাজের সংস্কার ও দ্বীনী উন্নতির প্রয়োজনে তাঁকে বাধ্য হয়েই অনেক সফর করতে হয়েছে। তবে হযরত থানবী (রহঃ) কোথাও সফরে গেলে সেখানে পূর্ব থেকেই অনেক শক্ত শর্তাবলী আরোপ করে দিতেন। তার ব্যতিক্রম কিছু লক্ষ্য করলে তৎক্ষণাৎ তিনি তথা হতে ফেরত চলে আসতেন। কোথাও হযরত (রহঃ)–কে সম্বর্ধনা দেয়ার ব্যবস্থা করা হলে সে স্থানে তিনি যেতেন না। হাজার হাজার আবেদনের মধ্য থেকে শরীর স্বাস্থ্য ও প্রয়োজন বিবেচনা করে শুধুমাত্র অধিক প্রয়োজনীয় স্থানগুলোতেই তিনি সফর করতেন।

ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ সাহেব একবার হযরত থানবী (রহঃ)–কে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

ঢাকায় দাওয়াত করলে হযরত থানবী (রহঃ) বেশ কিছু শর্ত সাপেক্ষে তা মঞ্জুর করেন এবং ঢাকায় সফর করেন। হযরত (রহঃ)–এর আরোপিত শর্তসমূহ ছিলো এ রকম ঃ

১. কোন টাকা–পয়সা বা হাদিয়া দেয়া যাবে না।

২. অবস্থানের জন্য কোন বিশেষ নিরিবিলি কামরা হতে হবে।

৩. জনগণের সাক্ষাতের জন্য ভিন্ন কামরা থাকতে হবে। যেখানে সকলে অবাধে এসে সাক্ষাত করতে পারে।

৪. নবাব শুধু নির্দিষ্ট সময়েই আমার সাথে সাক্ষাত করতে পারবেন।

৫. ওয়াযের জন্য কোন বিষয় নির্ধারণ করে দেয়া যাবে না, ইত্যাদি।

হযরত থানবী (রহঃ)–কে সম্বর্ধনা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো কিন্তু তিনি তা জানতে পেরে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। এ কারণে সম্বর্ধনার ব্যবস্থাপনাতো বাতিল হলো ঠিক কিন্তু হযরত (রহঃ)–এর আগমন বার্তা জানতে পেরে আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দাগণ দলে দলে এসে যেভাবে জনতার ঢল তৈরী করেছিলো, তাতে সেটিও একটি অঘোষিত বিশাল গণসম্বর্ধনার রূপ নিয়েছিলো।

হাদিয়া দেয়া যাবে না এটা পূর্ব থেকে শর্তারোপ করা থাকলেও নবাব সাহেব এক কৌশলে একটি মজলিসে কিছু হাদিয়া দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। হযরত থানবী (রহঃ) বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। নবাব সাহেব লজ্জিত হবেন ভেবে সে মজলিসে উক্ত হাদিয়া কবুল করলেন ঠিক কিন্তু মজলিস শেষে তিনি নবাব সাহেবকে একাকী ডেকে তা আবার ফেরত দিয়ে দিলেন। এটা ছিলো হযরত (রহঃ)–এর দুনিয়া বিমুখতার একটি ছোট্ট উপমা।

আখেরাতের সফর ঃ

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) মুসলিম উম্মাহর জন্য ছিলেন এক পরম সম্পদ। মুসলমানদের ইহ ও পারলৌকিক উন্নতি ও মুক্তি চিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন তিনি সারাটি জীবন। এমনকি ইন্তিকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তও তিনি মানুষের কল্যাণ কামনায় লিপ্ত ছিলেন।

পূর্ণ জীবন দিবানিশি অক্লান্ত পরিশ্রম করে হাকীমুল উম্মত (রহঃ) তাঁর উপর অর্পিত মহান আল্লাহর বান্দাদের পথপ্রদর্শনের মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে থাকেন। বিরামহীন সে শ্রমের কারণেই হযরত (রহঃ)

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

একসময় স্বাস্থ্যগত দিক থেকে ভেঙ্গে পড়েন। বিভিন্ন রোগ ও বার্ধক্য সত্ত্বেও হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ) যথাসম্ভব দ্বীনের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন।

একসময় হযরত থানবী (রহঃ) এমনভাবে অসুস্থ হয়ে যান যখন আর কোন কাজ করার শক্তি তাঁর থাকলো না। পবিত্র কুরআন শরীফের ঘোষণা মতে প্রত্যেককেই মৃত্যুর সুধা পান করতে হয়। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। হযরত থানবী (রহঃ)ও একজন মানুষ ছিলেন তাই এ স্বাভাবিক নিয়মের ধারায় তাকেও দুনিয়া থেকে পরপারে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হলো।

পরিশেষে দ্বীনের এ নিরলস রাহবর, হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) পূর্ণ জীবন দ্বীনের খেদমতের মাধ্যমে উম্মতে মুসলিমার সীমাহীন কল্যাণ সাধনের পর তার বিশ্বব্যাপী অসংখ্য ভক্ত মুরীদদের রূহানী পিতৃহীন ইয়াতীম করে ১৩৬২ হিজরী সনের ১৬ই রজব মুতাবিক ১৯৪৩ ইংরেজী সনের ১৯শে জুলাই সোমবার দিবাগত রাত দশটায় সকলকে শোক সাগরে ভাসিয়ে মহান প্রভু আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যে পরপারে যাত্রা করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

ইন্তিকালের সময় হযরত থানবী (রহঃ)–এর বয়স হয়েছিলো ৮২ বছর ৩ মাস ১১ দিন। হযরত থানবী (রহঃ)–এর ইন্তিকালে গোটা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ এক চরম বিয়োগ ব্যথায় আহত হয়ে পড়ে। যাদের সম্ভব ছিলো পাগলপারা হয়ে হযরত (রহঃ)–এর জানাযায় শরীক হতে তারা ছুটে আসেন।

অতঃপর জানাযার নামায সম্পন্ন হলো। জানাযায় ইমামতি করলেন হযরত (রহঃ)–এর ভাগিনা জনাব মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী সাহেব (রহঃ)। জানাযা সমাপ্তির পর বহু ভক্ত অনুরক্তের উপস্থিতিতে হযরত হাকীমুল উম্মতকে চিরদিনের জন্য সমাহিত করে দেয়া হলো।

[হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ)–এর জীবনী
'আশরাফ চরিত' হতে সংগৃহিত]

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

গ্রন্থকার
মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব (রহঃ)-এর
কথা

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى سيما على سيدنا المصطفى و من يهديه اهتدے

ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রত্যেক যুগেই 'খলকুল্লাহ' তথা আল্লাহ পাকের বান্দাদের শিক্ষা-দীক্ষা তাদের আখলাক ও আমলের সংশোধনীর জন্য উলামা, সালেহীন এবং আল্লাহ পাকের ওলীগণের মজলিসসমূহ পরশ পাথর তুল্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ অধম অকর্মণ্য (মুহাম্মদ শফী)কে মহান আল্লাহ তা'আলা এমন এক পরিবেশে সৃষ্টি করেছেন যেখানে জীবনের শুরু থেকেই এ জাতীয় মজলিসসমূহের আলোচনা শোনার সুযোগ হয়েছে। মুহতারাম পিতা হযরত মওলানা মুহাম্মদ ইয়াসীন সাহেব (রহঃ) কুতবে আলম হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহঃ)-এর বিশেষ মুরীদ, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)-এর সাগরেদ ছিলেন এবং তিনি সকল আকাবিরে দেওবন্দের খেদমতের মাধ্যমে ফয়েয ও বরকত লাভে ধন্য এবং ঐ সকল বুযুর্গানে দ্বীনের জীবন্ত স্মরণিকাতুল্য ছিলেন।

এমন এক পরিবেশে আমার চোখ খুলেছে যেখানে চোখ খুলেই হযরত গাংগুহী (রহঃ)-এর আলোচনা শুনেছি। এবং শৈশবকালের পরিপূর্ণ অনুভূতিহীন সে সময়ের একথা এখনো স্মরণ আছে, যখন ঘরে কোন চিন্তা বা অস্থিরতার বিষয় ঘটতো তখন হযরত গাংগুহী (রহঃ)কে দু'আর জন্য পত্র লিখা হতো। তার জবাবে হযরত গাংগুহী (রহঃ)-এর দু'আ সম্বলিত যে চিঠি আসতো তা পাঠ করে সকলকে শোনানো হতো। তখন থেকে এ কথাও শুনতাম যে, আমার নাম 'মুহাম্মদ শফী' হযরত গাংগুহী (রহঃ)-এর সিদ্ধান্তে রাখা হয়েছে। এরপর কুরআন শরীফ পড়ার জন্য আমাকে যখন মক্তবে বসিয়ে দেয়া হলো তখন হযরত (রহঃ)-এর

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

খিদমতে দু'আর জন্য পত্র লিখা হয়েছিলো। ঐ সময় হযরত গাংগুহী (রহঃ)–এর মজলিসসমূহ ছিলো গোটা উম্মতের জন্য একটি আকর্ষণীয় ও উদ্দীপনাসহ উপস্থিত হওয়ার স্থান। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হওয়ার কোন সুযোগই আমার ছিলো না। আমার বয়স তখন আট নয় বৎসর হবে, সে সময় ১৩২৩ হিজরীতে হযরত গাংগুহী (রহঃ)–এর ইন্তিকাল হয়ে গেলো।

আমার শৈশব কেটেছে দারুল উলূম দেওবন্দের পরিবেশে। যেখানে ছোট–বড় সকলের মুখেই 'বড় মৌলভী সাহেব' (বড় হুযূর)–এর নাম শুনতাম। শহরের লোকেরাও ঐ নামে একটি বাড়ীর ঠিকানা বলে দিতো যা সকলের মাঝে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ছিলো। পিতা মুহতারমের কাছে শুনেছি এই 'বড় মৌলভী সাহেব' তাঁর উস্তায এবং বড় বুযূর্গ ব্যক্তি। যখন আমার শিক্ষার কিছুটা অগ্রগতি হলো এবং আমি পড়াশুনায় লেগে গেলাম তখন জানতে পারলাম এই বড় মৌলভী সাহেব তখনকার সময়ের দারুল উলূম দেওবন্দের সদরুল মুদাররিস বা প্রধান শিক্ষক। তিনি হাদীস পড়ান। দারুল উলূমের সকল শিক্ষক এবং দায়িত্বশীলগণ তাঁর সাগরেদ এবং ভক্ত। সে সময় 'হযরত' এবং 'মাওলানা' জাতীয় লৌকিকতাপূর্ণ শব্দ ব্যবহারের প্রচলন কোথাও ছিলো না। বুযুর্গানে দ্বীনের মাহাত্ম্য ও মহব্বত জীবনকে উৎসর্গ করে দেয়ার পর্যায় পর্যন্তও পৌছে গিয়েছিলো কিন্তু সে সময় শাইখুল হাদীস, শাইখুল কুল, হযরত, শাইখ ইত্যাদি উপাধীর নামনিশানা কোথাও ছিলো না। বুযুর্গানে দ্বীনের মাহাত্ম্য ও মহব্বত লোপ পাওয়ার এ যুগে এসে এ সকল উপাধীর মৌখিক জমা–খরচের প্রচলন শুরু হয়েছে। সে সময়ে সমস্ত ভক্তি–বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবেই সকলে তাকে শুধু 'বড় মৌলভী সাহেব' (বড় হুযূর) বলতো। পরে জানতে পেরেছি যে, তার সম্মানিত নাম হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান। এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই 'শাইখুল হিন্দ' হিসেবে তার উপাধি প্রসিদ্ধ হয়ে গেলো।

একদিন আমি শুনতে পেলাম যে, আজকে বড় মৌলভী সাহেবের ওখানে বুখারী শরীফের দরস শুরু হচ্ছে। বরকত লাভের আশায় সকল আলেম ও ছাত্রবৃন্দ তাতে অংশগ্রহণের জন্য যাচ্ছে। তাই আমিও তাদের সাথী হয়ে গেলাম। সেখানে গিয়ে বুখারী শরীফের 'বাদউল ওহী' বা ওহীর সূচনা অধ্যায়ের আলোচনা এবং তার প্রথম হাদীসটির বয়ান শুনলাম।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

অনুরূপভাবে বুখারী শরীফের খতমের সময়ও ইজতিমা হলো। সেখানে গিয়ে শেষ হাদীসের বয়ান শুনলাম। এরপর থেকে মনে এই আকাংখা ও লোভ সৃষ্টি হলো যে, যদি প্রতি বছরই বুখারী শরীফের শুরু এবং শেষের দরসে হাযির হওয়ার সৌভাগ্য হতো। তখন শৈশবকালের সে স্মরণশক্তি দিয়ে শুনা কথাগুলোর কিছু কিছু শব্দ এখনো মনে আছে। অথচ সে সময় হাদীস তো দূরের কথা কোন বিষয়েই কোন অভিজ্ঞতা আমার ছিলো না। তখন আমি ফার্সী উর্দূ ও গণিতের কিতাবসমূহ পড়তাম।

এভাবে ধীরে ধীরে ঐ বড় মৌলভী সাহেবের (বড় হুযূরের) বাড়ীতে আসরের পরে যে মজলিস হতো, পিতা মুহতারমের সাথে মাঝে মাঝে সেখানে যেতে লাগলাম। সেখানে বড় বড় উলামায়ে কিরাম এবং বুযুর্গানে দ্বীনের খুব মূল্যবান এবং দুর্লভ মজমা হতো। তাদের কথা তো তেমন বুঝতাম না কিন্তু কোন কারণ ছাড়াই সে মজলিসে বসার একটা প্রেরণা মনে সৃষ্টি হয়ে গেলো এবং এবার 'আব্বা মুহতারমের সাথে' এবং 'বাদ আসর'–এর সীমাবদ্ধতাও উঠে গেলো। যখনই মনে চাইতো সেটা যে সময়ই হতো হযরতের দরবারে হাযির হয়ে যেতাম। আকাবির বুযুর্গানে দ্বীনের সাধারণতঃ ছোটদের প্রতি যে স্নেহ–মমতা থাকে তা আমিও লাভ করতে লাগলাম। এবং ছাত্র জীবনের প্রথম দিকে অবসরের পরের সময়টা খেলাধুলা ও ঘোরাফেরা করে না কাটিয়ে হযরত (রহঃ)–এর মজলিসেই কাটতে লাগলো। রমযানুল মুবারকে হযরত (রহঃ)–এর অভ্যাস ছিলো, সারারাত তিনি নফল কিংবা তারাবীহের নামাযে কুরআন শরীফের তিলাওয়াত শুনতেন। আল্লাহ পাক দুই বৎসর সেখানে আমাকেও হাযির হওয়ার তাওফীক দান করেছেন। আমার আরবী শিক্ষার প্রাথমিক যুগ শুরু হয়েছিলো ১৩৩০ হিজরীতে। সে সময়ও দারুল উলূমের নাযেমে তা'লীমাত ছিলেন হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ)। এ কারণে তা'লীমী বিষয়াদি নিয়েও হযরত (রহঃ)–এর খিদমতে যাতায়াতের সুযোগ পেতে লাগলাম। আর এর ফলে হযরত (রহঃ)–এর স্নেহ–মমতা ও নেকদৃষ্টি আরো বৃদ্ধি পেলো। অতঃপর ১৩৩২ হিজরীতে আমার শিক্ষা গ্রহণ মাঝামাঝি পর্যায়ে পৌছেছিলো, তখন আমি হিদায়া ইত্যাদি পড়ি। সে সময় সারাদেশে তুর্কী শাসন ব্যবস্থার উপর ইউরোপীয় আক্রমণের কাহিনী সর্বদা সকলের মুখে মুখে ছিলো। সকলের দৃষ্টি থাকতো প্রতিদিনের সংবাদপত্রের উপর। এ সময় হযরত (রহঃ)–এর

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

মজলিসের ধরনে কিছুটা পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হতে লাগলো। বেশীর ভাগ আলোচনাই তৎকালীন পরিস্থিতি ও ঘটনাপ্রবাহের উপর হতে লাগলো এবং সে পরিস্থিতি সংশোধনের চিন্তা-ভাবনার মধ্যেই সময় ব্যয় হতে থাকলো। দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহ আরো শক্তিশালী হয়ে উঠলো। হযরত (রহঃ)-এর দৃষ্টি দারুল উলূমের তা'লীমী খিদমতের তুলনায় হিন্দুস্থানকে ইংরেজী আধিপত্য থেকে মুক্ত করে ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার জিহাদের প্রতিই অধিক নিবদ্ধ হলো। এরপর যা কিছু হয়েছে তার বিবরণ দেয়ার ক্ষেত্র এটা নয়। কিন্তু এত কিছুর মধ্য দিয়েও দারুল উলূমে বুখারী শরীফের দরসের ধারাবাহিকতা ১৩৩৩ হিজরী পর্যন্ত বিরামহীমভাবেই অব্যাহত থাকলো। ১৩৩৩ হিজরীতে আমি চেষ্টা করে মিশকাত ও জালালাইনের ঐ সমস্ত নিসাব পূর্ণ করে নিলাম যার পর দাওরায়ে হাদীসের দরসে অংশ গ্রহণের ধারাবাহিকতা রয়েছে। আমার আকাংখা ছিলো পরবর্তী বৎসর হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ)-এর কাছে সহীহ বুখারী শরীফ পড়ার সুযোগ লাভ করবো। কিন্তু সে বৎসর রমযান মাস থেকেই এ খবর ছড়িয়ে পড়লো যে, হযরত (রহঃ) হজ্জ সফরের ইচ্ছা করেছেন। এরপর ধীরে ধীরে দেখতে পেলাম হযরত (রহঃ) সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কেউ কেউ বললো যে, তিনি হিজরত করে চলে যাচ্ছেন। আবার কারো খেয়াল ছিলো তুর্কী প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্যই এ সফর। আমি অত্যন্ত অনুশোচনা সহকারে এ দৃশ্যাবলী দেখতে থাকলাম। পরিশেষে হযরত (রহঃ) হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এদিকে শুরু হলো ব্যাপক বিশ্বযুদ্ধ। ১৩৩৪ হিজরীর পূর্ণ সময়টাই হযরত (রহঃ) হিজাযে কাটালেন। অধম সে বৎসর নিজের দাওরায়ে হাদীস পড়ার বিষয়টি এ কারণে মুলতবী রাখলাম, যাতে হযরত (রহঃ) ফিরে আসলে তার কাছে দাওরায়ে হাদীস পড়তে পারি। সে বৎসর আমি ফনুনাতের (বিভিন্ন বিষয়ের জরুরী) অবশিষ্ট কিতাবসমূহ পড়তে থাকলাম। কিন্তু আল্লাহ পাকের মর্যী এবং ভাগ্যের লিখন পরের বৎসর ১৩৩৫ হিজরীতে হযরত (রহঃ)কে বন্দী করে মাল্টার কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হলো। ফলে আমার সকল আশা-ভরসাই মুখ থুবড়ে পড়লো। অতঃপর ১৩৩৫ হিজরীতে অধমের দাওরায়ে হাদীস হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ সাহেব (রহঃ)-এর সামনে পূর্ণ হলো। ১৩৩৫ হিজরীর এ দাওরায়ে হাদীসের মধ্য দিয়েই

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

দরসে নিযামীর পাঠ্য তালিকা প্রায় পূর্ণ হয়ে গেলো। শুধু কিছু ফনুনাতের (বিভিন্ন বিষয়ের জরুরী) কিতাব পড়া বাকী থাকলো। ১৩৩৬ হিজরীতে সেসব কিতাব পড়াও শেষ হলো।

দাওরায়ে হাদীস থেকে ফারেগ হওয়ার পর, দরস ও তালীম, ইলমী গবেষণার আগ্রহ, কিতাব অধ্যয়নের উদ্দীপনা এবং ইলমী বিষয়াদির উপর আলাপ-আলোচনা সবই চলছিলো কিন্তু আমার অন্তর চক্ষু শুধু সে ধরনের মজলিস খুঁজে বেড়াচ্ছিলো যেখানে অন্তরে সান্তনা ও প্রশান্তি লাভ হয়। হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ)-এর দরবারে কিছুদিন হাযির হয়ে যার প্রেরণা ও আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। সে সময় থানাভবনে হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)-এর মজলিস ব্যাপকভাবে মুসলিম জনসাধারণের উপস্থিতি ও উপকৃত হওয়ার কেন্দ্রে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)-এর বিভিন্ন লিখনী ও গ্রন্থাবলী দেখে নিজের জ্ঞানের সীমিত পরিসরেও হযরত (রহঃ)-এর ইলমী কামাল সম্পর্কে কিছুটা অবগতি আমার ছিলো। আমাদের ঘরের সকল মেয়েরাই হযরত থানবী (রহঃ)-এর লিখা বেহেশতী জেওর পাঠ করতো। থানাভবনের খানকাহ এবং তথাকার মজলিসসমূহের অবস্থা আমার পিতা মুহতারমের কাছ থেকে প্রায়ই শুনতাম। হযরত (রহঃ) যখন দেওবন্দে তাশরীফ আনতেন তখন তাঁর বয়ানের মজলিসসমূহে অত্যন্ত আগ্রহ ও ভক্তি সহকারে অংশগ্রহণ করতাম। আমাদের পিতা মুহ্তারম একবার আমাদের বাড়ীতেও হযরত (রহঃ)কে এনে ওয়ায করানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। যার কিছু কিছু শব্দ আমার সর্বদাই স্মরণ থাকে। আমার মুহ্তারম পিতা (রহঃ) যদিও হযরত (রহঃ)-এর সমবয়স্ক ছিলেন এবং একই সাথে লেখাপড়া করেছেন তা সত্ত্বেও তিনি হযরত থানবী (রহঃ)-এর বুযুর্গী তাকওয়া ও পবিত্রতার প্রতি খুব ভক্তি ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

থানাভবনে সর্বপ্রথম উপস্থিতি

আমার পিতা মুহতারম তখন দারুল উলূমের মুদাররিস ছিলেন। শা'বান মাসের শেষের দিকে আট-দশ দিনের জন্য মাদরাসা ছুটি ছিলো। পিতা মুহতারমের অভ্যাস ছিলো তিনি এই আট-দশ দিন হযরত গাংগুহী (রহঃ)-এর খিদমতে কাটাতেন। ১৩২৩ হিজরীতে হযরত গাংগুহী (রহঃ)-এর ইন্তিকাল হয়ে যাওয়ার পরও তাঁর অভ্যাস আগের মতই

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

থাকলো। তাই তিনি বন্ধের সময়টা গাংগুহে হযরত গাংগুহী (রহঃ)–এর মাযারে উপস্থিত হতেন। অতঃপর জীবিত বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য রায়পুর, থানাভবন ইত্যাদি অঞ্চলে সফর করতেন। দু' একবার উভয় স্থানে আমাকেও সাথে নিয়ে গেছেন। রামপুরে হযরত মাওলানা আবদুর রহীম রায়পুরী (রহঃ)–এর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ পিতা মুহতারমের সাথে গিয়েই হয়েছিলো। অনুরূপভাবে একবার থানাভবনে প্রথম বারের মত উপস্থিতি আমার পিতা মুহতারমের সাথে এমন বয়সে হয়েছে যখন আমার মাঝে পরিপূর্ণ বুঝ ও অনুভূতি সৃষ্টি হয়নি। সে সময়ের উপস্থিতিতে হযরত (রহঃ)–এর দর্শন লাভ এবং ছোটদের প্রতি হযরত (রহঃ)–এর স্নেহ–মমতার সামান্য চিত্র ছায়ার মত এখনো মনে আছে। কিন্তু সে সময়ের কোন একটি কথা এবং সন ও তারিখ কিছুই মনে নেই।

থানাভবনে দ্বিতীয়বার উপস্থিতি

১৩৩২ হিজরীতে যখন আমার শিক্ষা গ্রহণের ধারাবাহিকতায় গ্রীক দর্শনের কিতাব 'মাইবুযী' পাঠ করার সময় হলো, তখন আমার মুহতারম পিতার কাছে শুনা একটি কথা স্মরণ হলো। কথাটি হলো, দ্বীনী মাদরাসাসমূহে গ্রীক দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে হযরত গাংগুহী (রহঃ) সম্মত ছিলেন না। এবং সম্ভবতঃ তিনি কোন একসময় দারুল উলূমের পাঠ্যতালিকা থেকে গ্রীক দর্শন শাস্ত্রের কিতাব 'মাইবুযী' বাদ দিয়ে দেয়ার পরামর্শও দিয়েছিলেন। সে সময় আমার মাঝেও দ্বিধা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হলো—এটা পড়বো কি না।

আমার মুহতারম পিতা যদিও হযরত গাংগুহী (রহঃ)–এর প্রতি চূড়ান্ত পর্যায়ের গভীর ভক্তি–শ্রদ্ধা পোষণ করতেন কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি একটি বিজ্ঞজনোচিত সিদ্ধান্ত এভাবে দিলেন যে, হযরত গাংগুহী (রহঃ) তো এখন দুনিয়াতে বেঁচে নেই, তার পরে আমি হযরত মাওলানা আশরাফ আলী সাহেব থানবী (রহঃ)কে হযরত গাংগুহী (রহঃ)–এর স্থলাভিষিক্ত মনে করি। এ কারণে উচিত হলো, তোমার ব্যাপারে হযরত থানবী (রহঃ)–এর সাথে পরামর্শ করা। এ উদ্দেশ্যেই তিনি আমাকে সাথে নিয়ে থানাভবন সফর করলেন।

আমার সে ছাত্র জীবনে হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)–এর প্রতি আমার পরিপূর্ণ ভক্তি বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও সেখানে উপস্থিত হতে খুব ভয়

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

লাগতো। কারণ দূর থেকে একথা খুব শুনতাম যে, হযরত (রহঃ)–এর সেখানে নিয়ম–কানূনের প্রতি খুব যত্ন নেয়া হয়। কোন কিছু নিয়মের ব্যতিক্রম হলে হযরত (রহঃ)–এর অসন্তুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এবার মুহতারম আব্বার আদেশে তার সাথে যাওয়ার সাহস করলাম। সেমতে দুপুর বেলা আমাদের গাড়ী ষ্টেশনে এসে পৌছলো। সেসময় গাড়ীর ষ্টেশন থানাভবনে ছিলো না, থানাভবন থেকে তিন মাইল দূরের এক ষ্টেশনে নেমে তথা হতে থানাভবন যেতে হতো। সে সময় পাকা রাস্তা এবং ইঞ্জিন চালিত মোটর গাড়ী ছিলো না। তাই তিন মাইল পথ পায়ে হেঁটে আমরা থানাভবন পৌছলাম। তখনো যোহরের আযানের কিছু বাকী ছিলো, তাই মেহমানখানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

যোহরের নামাযের আযান হলে হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ) উযূ করার জন্য হাউযে এলেন। তখন পিতা মুহতারম সেখানেই হযরত (রহঃ)–এর সাথে সাক্ষাত করলেন। যেহেতু হযরত (রহঃ)–এর সাথে একই সময় তিনি পড়াশুনা করেছিলেন তাই মুহতারম পিতার সাথে হযরত (রহঃ)–এর সে লৌকিকতামুক্ত সাক্ষাৎ ছিলো দেখার মত। মুহতারম আব্বা প্রথম সাক্ষাতেই বললেন, এ সময় আমার এখানে আসার কারণ এ ছেলেটি। আমি সামনে এগুলাম হযরত (রহঃ) আমাকে অত্যন্ত স্নেহভরে নিজের বুকের সাথে লাগালেন এবং আমার মাথায় হাত বুলালেন। আব্বাজান একথাও বললেন যে, এখানে আসার সময় সে এজন্য খুব ভয় পাচ্ছিলো যে, এখানে তো অনেক আইন–কানুন এবং নিয়ম–নীতি আছে সেগুলো কিভাবে পালন করবো।

হযরত (রহঃ) খুব স্নেহভরে বললেন, ভাই, অযথা লোকেরা আমার বদনাম করেছে। আমি নিজের পক্ষ থেকে কোন নিয়ম–নীতিই তৈরী করি না। মানুষের ভুল নিয়ম–নীতি দেখে আমি আগন্তুকদের জন্য একটা সময় এবং নিয়ম–নীতি বানিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। অন্যথায় তারা তো আমাকে কোন একটি সময় একবারও আল্লাহ পাকের নাম নেয়ার সুযোগটুকু পর্যন্ত দিবে না। অন্যান্য কাজ এবং আরাম–বিশ্রামের কথা আর কি বলবো।

অতঃপর হযরত (রহঃ) বলেন, তুমি তো আমার সন্তানের মত তোমার এত চিন্তার কি আছে। যখন মনে চায় চলে আসবে। আর আমার এখানে যে সকল নিয়ম–নীতি আছে তার মধ্যে ছাড় ও ব্যতিক্রম

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

এত বেশী যে মূল কানুনের চেয়ে ছাড় ও ব্যতিক্রমের সংখ্যাই বেশী। সুতরাং তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকো।

হযরত (রহঃ)–এর সে স্নেহ–মমতা এবং দয়া ও মেহেরবানী প্রথম বারেই আমার অন্তরে এমনভাবে জায়গা করে নিলো, যার ফলে সেখান থেকে ফিরে আসতে ইচ্ছা হচ্ছিলো না। সে সময়টিতো নামাযের সময় ছিলো এবং যোহরের নামাযের পরেই বয়ানের সাধারণ মজলিস। আল্লাহ পাক সে মজলিসে শরীক হওয়ার তাওফীক দান করলেন। সন্ধ্যায় হযরত (রহঃ) বিশেষ সাক্ষাতের সুযোগ দিলেন। তখন মুহতারম আব্বাজান আমার আসার উদ্দেশ্যের কথা হযরত (রহঃ)–এর কাছে প্রকাশ করলেন।

সব শুনে হযরত (রহঃ) বললেন, হ্যাঁ আমারও জানা আছে যে, এ ব্যাপারে হযরত নানুতবী (রহঃ) ও হযরত গাংগুহী (রহঃ)–এর মতের মাঝে ভিন্নতা ছিলো। হযরত নানুতবী (রহঃ) গ্রীক দর্শন শাস্ত্র পড়া এবং পড়ানোর ব্যাপারে এ কারণেই সম্মত ছিলেন, যাতে গ্রীক দর্শনের আলোকে ইসলামী আকায়েদের উপর যেসব প্রশ্ন ও অভিযোগ উত্থাপিত হয় তার সমুচিত জবাব গ্রীক–দর্শনের নীতিমালার আলোকেই দেয়া যায়। এবং হযরত গাংগুহী (রহঃ)–এর দৃষ্টি ছিলো এইদিকে যে, সে দর্শন শাস্ত্রের অনেক বিষয় এমন আছে যা ইসলামী আকীদা পরিপন্থী। তাই সেগুলো দ্বীনী মাদরাসাসমূহে পাঠ্যসূচী হিসেবে ক্লাসে পড়ানো হলে তা ছাত্রদের মনে বিভিন্ন সংশয় সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কারণ হতে পারে।

অতঃপর হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ) বলেন, উভয় বুযুর্গই আমাদের মুরব্বী এবং অনুসরণীয় সুতরাং তাদের যে কারো মতের উপর কেউ আমল করবে সেটা তার জন্য মঙ্গলজনকই হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু তোমার ব্যাপারে আমার পরামর্শ হলো, তুমি অবশ্যই এ বিষয়ে পড়াশুনা কর এবং খুব মেহনত করে পড়। যাতে তোমার নিজের কাছেই তার ভ্রান্ততা পরিস্কার হয়ে যায়। আমার আশা এই যে, হযরত গাংগুহী (রহঃ) এ বিষয়ে পড়াশুনা করলে যে ক্ষতির আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন, তোমার সে ক্ষতি হবে না ইনশাআল্লাহ।

এরপর হযরত (রহঃ) আরো বলেন, এ বিষয়টি পড়ার ক্ষেত্রে আরো একটি বিবেচ্য ও মঙ্গলজনক দিক হলো, বর্তমানে সকল দ্বীনী মাদরাসাগুলোতে এ বিষয়টি পড়ানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে তুমি যদি বিষয়টি না পড়, তাহলে এ দর্শন শাস্ত্রে অবগতিসম্পন্ন আলেমদের সামনে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

তোমার মাঝে এক ধরনের আতংক ও ভয়ের ভাব সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং তুমি যদি এ শাস্ত্রটি ভালভাবে বুঝে পড়ে নাও, তবে সে আতংক ও ভয় আর তোমার মাঝে আসতে পারবে না। এবং এ শাস্ত্রের ভ্রান্ত দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গীর অসারতা ও ভ্রান্ততা ইনশাআল্লাহ পুরোপুরিভাবে তোমার জানা হয়ে যাবে।

হযরত (রহঃ)–এর কাছ থেকে অর্জন করা এটাই ছিলো আমার জীবনের প্রথম শিক্ষা, এরপর সেখান থেকে ফিরে এসে 'মাইবুযী' পড়তে শুরু করলাম এরপর 'সদরা', 'শামসে বাজেগাহ' ইত্যাদিসহ পাঠ্যতালিকাভুক্ত দর্শন শাস্ত্রের সমস্ত কিতাব পড়লাম।

এরপর মহান আল্লাহ এ সুযোগও দান করলেন যে, আমাদের উস্তাদ মুহতারম হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ সাহেব (রহঃ) কিছু ছাত্রকে 'আধুনিক দর্শন' (ফালসাফায়ে জাদীদ) পড়ানোর ওয়াদা করলেন। সেমতে অধমও তার সে দরসে অংশ গ্রহণ করলাম। এরপর অবস্থা এই ছিলো যে, 'ফালসাফা' বা দর্শন শাস্ত্রের কোন বিষয়ে আমার কখনো কোন প্রশ্ন দেখা দেয়নি এবং হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)–এর ভবিষ্যদ্বাণী মতে ফালসাফার ভ্রান্ত দর্শনগুলোর ভ্রান্ততা আমার কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যেতে লাগলো।

১৩৩৫ হিজরীতে অধমের দাওরায়ে হাদীস পূর্ণ হলো। কিছু ফুনুনাতের (বিভিন্ন বিষয়ের জরুরী) কিতাব পড়া বাকী ছিলো, যা ১৩৩৬ হিজরীতে পড়ে নেয়া হলো। সে বৎসরই দারুল উলূম–এর মুহতামিম হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেব কয়েকটি কিতাব পড়ানোর জন্য তা আমার দায়িত্বে দিয়ে দিলেন।

প্রথম থেকেই আমার পিতা মুহতারমের অভিমত ছিলো, আরবী ইলম শিক্ষা শেষ করার পর কোন বুযুর্গের সংস্পর্শে এবং খিদমতে থেকে আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহ পাকের যিকির করা না হলে যাহেরী ইলম নিষ্প্রাণ থেকে যায়। তাই কোন বুযুর্গের সংস্পর্শে থাকা খুবই যরুরী। সে সময় হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ) তো মাল্টার বন্দীশালায় আবদ্ধ ছিলেন। হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহেব সাহারানপুরী (রহঃ)ও হিন্দুস্থানে আসছিলেন না। তাই তখন দু'জন বুযুর্গের প্রতিই নযর পড়তো। একজন হলেন হযরত মাওলানা শাহ আবদুর রহীম রায়পুরী (রহঃ) আর অপরজন হলেন হযরত থানবী (রহঃ)।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

মুহতারম আব্বাজানের মতানুসারে এটাই প্রাধান্য পেলো যে, হযরত থানবী (রহঃ)–এর দরবারেই হাযির হতে হবে। কেননা ইতিপূর্বে হযরত (রহঃ)–এর দরবারে গিয়ে তাঁর শিক্ষা লাভ করে হযরত (রহঃ)–এর সাথে একটা সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে গেছে।

থানাভবনে তৃতীয়বার উপস্থিতি

সময়টা খুবসম্ভব ১৩৩৭ হিজরী ছিল। তখন আমার মুহতারম পিতা আমাকে সাথে নিয়ে পুনরায় থানাভবন সফর করলেন। এবারের উদ্দেশ্য ছিলো আমাকে হযরত (রহঃ)–এর হাতে সোপর্দ করে দেয়া। এবং আমাকে তাসাওউফ ও তরীকতের শিক্ষা দান করা। তৃতীয় বারের এই উপস্থিতিতে পূর্বে হযরত (রহঃ)–এর কাছ থেকে লাভ করা স্নেহ–মমতা ও অনুগ্রহের ভিত্তিতে হযরত (রহঃ)–এর সাথে কথা বলার মত কিছুটা হিম্মত ও সাহস পেলাম। যখন পিতা মুহতারম আমাকে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যের কথা হযরত (রহঃ)–এর কাছে ব্যক্ত করলেন তখন হযরত (রহঃ) আমার কাছে কিছু অবস্থা জানতে চাইলেন। আমার পূর্ব থেকেই একথা জানা ছিলো যে, হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ) পরিস্কার এবং সত্য কথা খুব পসন্দ করেন। তাই আমি জবাব দিলাম, আল্লাহ পাক আমাকে কিছু সময় হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ)–এর দরবারে হাযির হওয়ার তাওফীক দান করেছেন। আমার মনের একান্ত ইচ্ছা ছিলো তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করবো। কিন্তু হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ) বর্তমানে বন্দী আছেন। বলা যায় না তিনি কখন মুক্তি পাবেন। এখন আমি হযরত (রহঃ)–এর খিদমতেই পরামর্শ প্রার্থনা করছি যে, আমার এখন কি করণীয়।

হযরত (রহঃ) খুব খুশী প্রকাশ করে আমাকে বললেন, এখানে আর প্রশ্নের কি অবকাশ। কারণ তাসাওউফ এবং তরীকত হলো বাতেনী আমলের সংশোধনীর নাম, যা এমনই একটি ফরয কাজ যেমন বাহ্যিক আমল (নামায, রোযা ইত্যাদি) সংশোধন করা ফরয। সুতরাং এটাকে বিলম্বিত করা আমার মতে দুরস্ত নয়। তবে এরজন্য বাই'আত হওয়া কোন শর্ত নয়। বাই'আতের জন্য তুমি হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ)–এর অপেক্ষা করো আর হযরত (রহঃ)–এর ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত আমি খিদমত করার জন্য উপস্থিত আছি। আমার পরামর্শ মতে ইসলাহে বাতেন–এর কাজ শুরু করে দাও। আমার কাছে এ বিষয়টি একটি বহুত

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

বড় বিষয় ছিলো যা অত্যন্ত সহজেই অতিক্রম করতে পারলাম।

এরপর পূর্বের ন্যায় সরলভাবেই আমার দ্বিতীয় কথাটি আমি হযরত (রহঃ)–এর খিদমতে আরয করলাম যে, হযরত! আমার মনে তো অনেক আকাংখা যে, আমি তাসাওউফ ও তরীকতের স্তরগুলো অতিক্রম করবো। কিন্তু শুনে আসছি যে, এ কাজের জন্য খুব অরসরতা, সাধনা–মুজাহাদা এবং ত্যাগ ও মেহনতের প্রয়োজন। আমি সৃষ্টিগতভাবেই একজন দুর্বল মানুষ। খুব বেশী মেহনত সহ্য করার উপযুক্ত আমি নই। এবং আমার অবসর ও সুযোগ খুবই কম। আমার পূর্ণ সময়টাই পড়া–পড়ানো এবং মুতালা'আর কাজে কেটে যায়। এমতাবস্থাতেও কি আমার দ্বারা কিছু লাভ করা সম্ভব হতে পারে?

আমার এ প্রশ্নের জবাবে হযরত (রহঃ) খুব স্নেহ–মমতা ভরে আমাকে বললেন, এটা তুমি কি বললে? তবে কি আল্লাহ পাকের রাস্তা শুধু শক্তিমান লোকদের জন্যই, দুর্বলদের জন্য নয়? শুধু অবসর লোকদের জন্যই? ব্যস্ত ও স্বল্প অবসরের লোকদের জন্য নয়? প্রকৃত কথা হলো, রাস্তা সকলের জন্যই উন্মুক্ত, তবে হাঁ প্রত্যেকের জন্য আমলের তরীকা ভিন্ন। বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন—

طرق الوصول الى الله بعدد انفس الخلائق

অর্থাত, আল্লাহ পাক পর্যন্ত পৌছার পথ এতই অধিক ও অগণিত যেমন মানুষের সংখ্যা অধিক (অর্থাত যত মানুষ তত পথ)।

এটা কোন হাতুড়ে ডাক্তারের দোকান নয় যে, সবাইকে একই বড়ি দিয়ে বিদায় করা হবে। আমি তোমাকে এমন পদ্ধতি বাতলে দিবো যেখানে খুব বেশী শক্তিরও প্রয়োজন হবে না এবং খুব সুযোগ ও অবসরেরও দরকার হবে না।

অতঃপর হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ) বলেন, ফরয, ওয়াজিব এবং সুন্নাত ইত্যাদি যা প্রত্যেক মুসলমানই আদায় করে থাকে তা তো তার নিজ স্থানে ঠিকই থাকবে। এখন তুমি শুধু তিনটি জিনিসকে গুরুত্ব সহকারে অনুসরণ করে চলবে। ইনশাআল্লাহ তাসাওউফের সকল স্তর এর দ্বারাই অতিক্রান্ত হয়ে যাবে।

১. সর্বাবস্থায় 'তাকওয়া' অবলম্বন করবে। এর মর্ম তোমাকে বলে বুঝানোর প্রয়োজন নেই। তবে তাকওয়া শুধু নামায, রোযা এবং বাহ্যিক মুআমালার মধ্যেই সীমিত থাকবে না বরং বাতেনী আমলের ক্ষেত্রেও

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

তাকওয়া অনুরূপই প্রয়োজন যেরূপ প্রয়োজন যাহেরী আমলের ক্ষেত্রে।

২. প্রত্যেক নিষ্প্রয়োজনীয় (নিরর্থক) কথা, কাজ, বৈঠক এবং সাক্ষাতকে পরিহার করে চলবে। অতঃপর বলেন, 'নিরর্থক' বলার দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঐ সকল কথা বা কাজ যাতে দ্বীনের কোন ফায়েদা যেমন নেই তেমনি দুনিয়ারও কোন ফায়েদা নেই। গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝে আসবে যে, আমাদের অনেক কাজ, কথা এবং বৈঠক অনেক সময় এমনভাবে কেটে যায় যেখানে কাজের কথা হয় অল্প আর বেফায়েদা ও অতিরিক্ত কথা হয় বেশী। এ বিষয়গুলো পরিহার করে চলবে।

৩. নিজের শক্তি, তাওফীক ও সুযোগ পরিমাণে প্রতিদিন কিছু কুরআন শরীফের তিলাওয়াত করবে।

অতঃপর হযরত (রহঃ) ইরশাদ করেন, এবার বলো যে, উপরোক্ত ব্যবস্থার মধ্যে কোন্ জিনিসটি এমন যা মেহনত এবং খুব অবসরতা ছাড়া সম্পাদন করা সম্ভব নয়। যদি চিন্তা করে দেখ তবে বুঝে আসবে যে, এতে শক্তি ও মেহনত ব্যয় নয় বরং তা আরো বেশী সংরক্ষিত থাকবে। কেননা, তাকওয়া এমন বস্তু যা এমন অনেক কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে, যে কাজ মানুষের শক্তিকে নষ্ট করে দেয়। এবং যখন তুমি নিষ্প্রয়োজনীয় ও নিরর্থক কথা, কাজ, সাক্ষাত এবং বৈঠকসমূহ হতে বিরত থাকবে তখন ইলমী ব্যাপারে লিপ্ততার জন্য তোমার অবসরতা ও সুযোগ আরো বেড়ে যাবে।

পরিশেষে তিনি বললেন, মামুল ও ব্যবস্থা তো তোমার জন্য এতটুকুই, এরপরও যদি মনে চায় এবং যদি সুযোগও থাকে তবে সকাল-বিকাল 'সুবহানাল্লাহ' 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' একশ' বার করে এবং ইস্তিগফার ও দরূদ শরীফ একশ' বার করে পড়ে নিবে। এবং প্রত্যেক নামাযের পর তাসবীহে ফাতেমীর উপর আবশ্যকীয়ভাবে আমল করতে থাকবে।

এ পর্যায়ে মজলিস শেষ হলো। এবং মুহতারম আব্বাজানের সাথে অতিরিক্ত আরো একদিন সেখানে অবস্থান করে হযরত (রহঃ)-এর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। হযরত (রহঃ)-এর সাথে এই মজলিস (বৈঠক) এবং শিক্ষা তো আমার অন্তরে বসে গেছে কিন্তু সেখান থেকে ফিরে এসেই আমি দারুল উলূমে পাঠদানের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়লাম। এছাড়া সে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সময়টিও ছিলো ঐ সময় যখন ১৯১৪ ঈসায়ী সালের বিশ্বযুদ্ধ গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিলো। ইউরোপীয়দের ঐক্যবদ্ধ ষড়যন্ত্রসমূহ এবং বিভিন্নমূখী চেষ্টার দ্বারা উসমানী বংশোদ্ভূত তুর্কি শাসন ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ) এ সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতেই মাল্টার কারাগারে নযরবন্দী হয়ে কালাতিপাত করছিলেন। আর যেহেতু তুর্কি খেলাফত ধ্বংসের ব্যাপারে ইংরেজদের হাত ছিলো তাই হিন্দুস্থানের মুসলমানদের মাঝে ইংরেজ শাসন বিরোধী স্পৃহা উথলে উঠলো, দেশে ইংরেজ শাসন বিরোধী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হলো এবং অল্প দিনের মধ্যেই তা গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়লো। হিন্দুস্থানকে ইংরেজ আধিপত্য থেকে মুক্ত করার আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলো। সাথে সাথে হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ)কে কারাগার থেকে মুক্ত করার আন্দোলনও শক্তিশালী হয়ে উঠলো। হিন্দুস্থানের সকল মুসলমান বিশেষতঃ উলামায়ে কিরাম, পীর, মাশায়েখ এবং দ্বীনী মাদরাসাসমূহে এ আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাব পড়লো। ফলে সে সময় দ্বীনী মাদরাসাসমূহে শিক্ষা ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখাও কোন সহজ ব্যাপার থাকলো না। গোটা রাষ্ট্রেই তখন চলছিলো এক বিরাট হাঙ্গামা।

পরিশেষে ২০শে রমযান ১৩৩৮হিজরী মুতাবিক ১৯২০ ঈসায়ী সালের মার্চ মাসে হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ) মাল্টার কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পর দেওবন্দে আগমন করলেন। ফলে খেলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং হিন্দুস্থানের আযাদী আন্দোলন মুহূর্তের মধ্যে বিশাল শক্তি লাভ করে আরো তীব্র আকার ধারণ করলো। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ)–এর দর্শন ও সাক্ষাত লাভের জন্য মানুষের ঢল নামতে শুরু করলো। হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ) নিজের দুর্বলতা ও অসুস্থতা সত্ত্বেও সেসব আন্দোলনসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ও ব্যস্ত থাকলেন। এখানে তার অবস্থার বিস্তারিত বিশ্লেষণ পেশ করার ক্ষেত্র নয়। শুধু এতটুকুই আলোচনা করা দরকার যে, হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ) ২০শে রমযান ১৩৩৮ হিজরীতে মাল্টা থেকে ফিরে এলেন এবং ১৮ রবিউল আউয়াল ১৩৩৯ হিজরী মুতাবিক ১৯২১ ঈসায়ী সালের অক্টোবর মাসে দিল্লীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন)।

কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর তিনি সর্বমোট এক বৎসর ছয় মাস

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সময় পেয়েছেন। তাও চূড়ান্ত পর্যায়ের ব্যস্ততার মধ্যে ছিলেন। এর মধ্যেই একদিন সুযোগ পেয়ে অধম এবং দ্বীনী ভাই দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম মাওলানা মুহাম্মদ তাইয়্যেব সাহেব এবং আরো কয়েকজন মিলে আমরা হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ)–এর হাতে তরীকতের বাই'আত গ্রহণ করে নিলাম। হযরত (রহঃ) আমাদেরকে কিছু তাসবীহ শিখিয়ে দিলেন। তরীকতের লাইনে হযরত (রহঃ)–এর কাছ থেকে এর চাইতে বেশী ফায়দা অর্জন করার মত সুযোগ তখন ছিলো না। আমাদের জন্য এটাও কোন সাধারণ ব্যাপার ছিলো না যে, আমাদের হযরত (রহঃ)–এর হাতে বাই'আত হওয়ার দীর্ঘ দিনের আকাংখা পূর্ণ হলো।

হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ)–এর ইন্তিকালের পর দেশে বিভিন্ন অরাজকতা ও দাঙ্গা–হাঙ্গামা, নতুন নতুন উদ্ভাবিত বিভিন্ন আন্দোলন এবং ফিৎনার যেন একটি ঝড় বয়ে যেতে লাগলো। অপরদিকে সন্তান–সন্ততিও বেড়ে গেলো। তাদের নিয়ে বিভিন্ন লিপ্ততা ও আলসেমীর কারণে কিছুটা গাফলতীর এমন পর্দা ও অন্তরায় সৃষ্টি হলো—মনে হলো যেন সে সবকই আমি ভুলে গেছি। সে সময় তালীমের সাথে কিছুটা রচনা ও সংকলনের কাজও চলছিলো, কিন্তু বুযুর্গানে দ্বীনের খিদমতে থেকে রুহানী ফয়েয হাসিল করার সেই পুরোনো উদ্দীপনা অনেকটা স্থিমিত হয়ে গেলো। ৩৯ হিজরী থেকে ৪৫ হিজরী পর্যন্ত এমনি অবস্থার মধ্য দিয়েই কাটলো। ১৩৪৫ হিজরীতে কিছুটা সজাগ ও সজীবতা সৃষ্টি হলো। সে সময় হযরত মাওলানা শাহ আবদুর রহীম রায়পুরী (রহঃ)–এরও ইন্তিকাল হয়ে গিয়েছিলো। বিধায় এখন থানাভবন ছাড়া এ উদ্দেশ্য হাসিলের আর কোন পানাহগাহ বাকী থাকলো না, কিন্তু এক্ষেত্রে একটি সমস্যা সামনে আসলো, তাহলো, হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ)–এর ফিরে আসা এবং তার হাতে বাই'আত গ্রহণ করার পর সর্বরকম কলবী সম্পর্ক এবং অনুকরণ, অনুসরণের মেরুদণ্ড ছিলেন হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ)। তাঁর ইশারাতেই এ অধমও নিজের সাধ্যানুসারে হিন্দুস্থানের আযাদী আন্দোলনে লিপ্ত থেকেছি।

আমার রাহবর হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ) যদিও হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ)–এর সাগরেদ এবং তার প্রতি খুবই ভক্তি ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ)–এর জিহাদের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পূর্ণ

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

একমত ছিলেন কিন্তু তৎকালীন সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলনে হিন্দুদের অংশগ্রহণ এবং শরীয়তের বিধি-নিষেধ সম্পর্কে নাওয়াকেফ এবং বেপরওয়া লিডারদের এ আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্টতার ফলে তা কিছুটা এমন ধরনের হয় গিয়েছিল যে, বিভিন্ন সভা সমিতিতে এবং ভরমজলিসে শরীয়তবিরোধী কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ বেপরওয়াভাবেই করা হতো। হিন্দুদের সাথে একত্রে কাজ করার কারণে ইসলামী নিদর্শনসমূহ এবং শরীয়তের সীমা সংরক্ষণের ব্যাপারে কোন লক্ষ্যই ছিলো না। এ কারণে সে আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেননি।

হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ) যিনি সে সময় সে আন্দোলনের ইমাম ছিলেন। তিনি নিজেও এ বিষয়টি অনুভব করতে পারার কারণেই 'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ' নামে একটি ভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যাতে সে আন্দোলনের সাথে উলামায়ে কিরামের পথপ্রদর্শনের মাধ্যমে সেসব অপসন্দনীয় ও শরীয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে মুক্তিলাভ করা সম্ভব হয়। যে সংগঠনের প্রথম সভা দিল্লীতে হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ)-এর সভাপতিত্বেই অনুষ্ঠিত হলো। সভাপতির ভাষণে তিনি সেসব নিন্দনীয় ও শরীয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ডের সুস্পষ্ট বিরোধিতা করেন।

কিন্তু হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)-এর দৃষ্টিতে সে সময় আন্দোলন এমন ধরনের লিডারদের নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিলো যাদের অধিকাংশের কাছ থেকেই উলামায়ে কিরামের অনুসরণ এবং শরীয়তের বিধি-নিষেধ সংরক্ষণের আশা করা যায় না। বিশেষতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে যে ভিত্তিতে ঐক্য গড়ে উঠছিলো তাতে কোন অবস্থাতেই এ আশা করা যাচ্ছিলো না যে, এ আন্দোলন দ্বারা কোন ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এজন্য হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ) সে আন্দোলন থেকে নিজেকে দূরে রেখেছেন। উভয় বুযুর্গের মাঝে পরস্পর এই মতপার্থক্য দ্বীন ও শরীয়তসম্মত কারণেই বিদ্যমান ছিলো। এবং তা মতপার্থক্যের মূলনীতি ও সীমারেখার উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলো। হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ) যেহেতু হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ)-এর সাগরেদ ছিলেন তাই তিনি হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ)-এর প্রতি চূড়ান্ত পর্যায়ের আদব ও সম্মান পোষণ করতেন। আর স্বয়ং উস্তাদ মুহতারাম (শাইখুল হিন্দ) (রহঃ)-এরও অবস্থা এরূপ ছিলো যে, তাকে থানাভবনে খেলাফতের

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সমাবেশে সভাপতিত্ব করার জন্য এলাকার লোকেরা যখন দাওয়াত দিলো, সে সময় অধিকাংশ দিনই তিনি এ জাতীয় সভা–সমাবেশের জন্য সফরও করতেন কিন্তু থানাভবনের লোকদের আবেদনের জবাবে তিনি বললেন, থানাভবন ছাড়া অন্য যে কোন স্থানে আপনারা সভা করলে আমি ইনশাআল্লাহ সেখানে অংশগ্রহণ করবো। কিন্তু থানাভবন গিয়ে সমাবেশ করা আমার পসন্দ নয়। কারণ মাওলানা থানবী (রহঃ)–এর আমার মতের সাথে যে দ্বিমত রয়েছে তাও দ্বীনী এবং শরীয়তসম্মত কারণেই। এক্ষেত্রে যদি আমি সেখানে সমাবেশ করতে যাই তবে সে তার ফিকহী এবং শরীয়তসম্মত মতের ভিত্তিতে তাতে অংশ গ্রহণ করতে. পারবে না। আর এ অংশ গ্রহণ করতে না পারার কারণে তার মনে খুব কষ্ট ও আড়ষ্টতা অনুভূত হবে। আমি তা সহ্য করতে পারবো না।

যা হোক সারকথা হচ্ছে, উভয় বুযুর্গের মতই নির্ভেজাল দ্বীনী ও শরীয়তসম্মত কারণসমূহের ভিত্তিতেই ভিন্ন ভিন্ন ছিলো। আমাদের মত মানুষ তখন তো দূরের কথা বর্তমানেও এমন অবস্থায় নেই যে, তাদের মতের ব্যাপারে কোন সালিসী করে সিদ্ধান্ত দিবো। এক্ষেত্রে এতটুকুই হওয়া সম্ভব যে, যার প্রতি মনের আকর্ষণ ও চাহিদা বেশী হয় তার অনুসরণ করা যায়। আর এ দৃষ্টিভঙ্গীতেই আমি হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ)–এর আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছি। তবে আলহামদুলিল্লাহ হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)–এর ব্যাপারেও আমার মনে ভক্তি শ্রদ্ধার কোন কমতি সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু যেহেতু আমি তার মতের উপর আমল করিনি এ কারণে মনে এক ধরনের অন্তরায় সৃষ্টি হয়ে গেছে। এছাড়া প্রায় দীর্ঘ আট বৎসর পর্যন্ত থানাভবনে যাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকা এবং চিঠিপত্রের আদান–প্রদান বন্ধ থাকায় একটা শরমের অনুভূতিও মাথায় চেপেছিলো। যা তখন আমার জন্য থানাভবনে যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

আমার মুহতারম পিতা (রহঃ) আমাকে পরামর্শ দিলেন যে, এ জাতীয় লাজ–শরমকে তরীকতের পথে অন্তরায় হতে দেয়া উচিত নয়। সুতরাং তুমি অবশ্যই থানাভবনে যাও এবং নিজের সকল অবস্থা পরিষ্কারভাবে হযরত (রহঃ)–এর সামনে পেশ করো। তুমি তো পূর্বেই দেখেছো যে, হযরত (রহঃ) স্পষ্টবাদী ব্যক্তিকে খুব স্নেহ–মমতা ও অত্যন্ত অনুগ্রহের নযরে দেখে থাকেন।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

থানাভবনে চতুর্থবার উপস্থিতি

হযরত পিতা মুহতারমের হুকুমের কারণে আমার মনের সংকল্প আরো দৃঢ় হলো। ফলে ১৩৪৫ হিজরীতে দীর্ঘ আট বৎসর পরে পুনরায় থানাভবন গিয়ে হাযির হলাম। আমার ঠিক স্মরণ নেই এ সময় আব্বাজানও সাথে ছিলেন নাকি আমি একাই গিয়েছিলাম। তবে এতটুকু স্মরণ আছে যে, যখন সেখানে গেলাম এবং দীর্ঘদিন অনুপস্থিতি এবং সম্পর্কহীনতার ব্যাপারে উযর ও অপারগতা প্রকাশ করলাম তখন হযরত (রহঃ) আমার প্রতি অনুরূপ স্নেহ–মমতা ও অনুগ্রহের আচরণ করলেন যেমনটি এর আগে প্রত্যক্ষ করেছিলাম। এ দীর্ঘ সময়ের অনুপস্থিতি এবং সম্পর্কহীনতার কোন ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়া হযরত (রহঃ)–এর আচরণে প্রকাশ পেলো না।

এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবে থানাভবন যাতায়াত করা শুরু হলো এবং সতেরো বৎসর পর ১৩৬২ হিজরীতে যখন হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ) ইন্তিকাল করলেন তখন শেষ হলো। এবং ১৩৪৬ হিজরী থেকে রমযানুল মুবারকের পূর্ণ বন্ধটা থানাভবনে কাটাতে লাগলাম। এবং এ ধারাবাহিকতাও প্রায় ১৩৬০ হিজরী পর্যন্ত অব্যাহত থাকলো। এরপর ১৩৬২ হিজরীতে হযরত (রহঃ)–এর পরামর্শ ও অনুমতিতে দারুল উলূম দেওবন্দের দায়িত্ব থেকে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ইস্তিফা দিয়ে দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেলাম। তখন হযরত (রহঃ) 'আহকামুল কুরআন' লিখার জন্য আমাকে স্বতন্ত্রভাবে থানাভবনে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু নিতান্তই আফসুস যে, এই শেষ বারের উপস্থিতির মাত্র কয়েক মাস পরেই ১৬ রজব ১৩৬২ হিজরীতে হযরত (রহঃ)–এর ইন্তিকাল আমাকে এতটা মর্মাহত ও ভগ্নহৃদয় করে দিলো যে, আমি কোন কাজ করার মত শক্তি ও সাহস খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

এই শেষ যমানায় মহান আল্লাহ আমার মুনিব হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)কে দ্বীনের দীক্ষা এবং উম্মতের ইসলাহ ও শুদ্ধির জন্য নির্বাচন করেছিলেন। হযরত (রহঃ)–এর মজলিসসমূহ ইলম ও মারিফাত সহ যাহেরী ও বাতেনী সংশোধনের ক্ষেত্রে যে প্রভাব রাখে তাতো শুধু সেই বুঝতে পারে যার সে দরবারে কখনো উপস্থিত হওয়ার তাওফীক নসীব হয়েছে। তা কোন ভাষা, বর্ণনা বা ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝানো সম্ভব নয়।

হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)–এর মজলিসে যারা উপস্থিত থাকতেন

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

তাদের অনেকেই মালফূযাত খুব গুরুত্ব সহকারে লিখতেন, যা হযরত (রহঃ)কে দেখানোর পর গ্রন্থরূপে প্রকাশও করা হতো। এ অধমের এমন সাহস খুব কম হতো যে, মজলিসে বসে লিখার প্রতি মনোনিবেশ করবো, এ কারণে গুরুত্ব সহকারে বিস্তারিতভাবে লিখা তো সম্ভব হয়নি তবে গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ বিশেষ কথা নিজের স্মরণ থাকার জন্য লিখে রাখতাম। এভাবে লিখতে লিখতেও একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষ ভাণ্ডার তৈরী হয়ে গেলো।

মাজালিসে হাকীমুল উম্মত সম্পর্কে হযরত মাওলানা যাফর আহমাদ উসমানী সাহেব (রহঃ)-এর চিঠি

হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)-এর নির্দেশ ছিলো, যারা হযরত (রহঃ)-এর মালফূয লিখবে তারা তা লিখার পর হযরত (রহঃ)কে দেখিয়ে অনুমতি না নিয়ে প্রকাশ ও প্রচার করবে না। তিনি তাঁর অসীয়্যত নামার মধ্যে একটি অসীয়্যত এও লিখে দিয়েছিলেন যে, আমার ইন্তিকালের পরে যদি আমার কোন ওয়ায বা মালফূয কারো কাছে অপ্রকাশিত (পাণ্ডুলিপি আকারে) থেকে থাকে যা আমাকে দেখানো হয়নি, তবে তা প্রকাশের জন্য তিনি নিজের বিশেষ কয়েকজন খলীফার নাম উল্লেখ করে এভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, তারা দেখে অনুমতি দিলে তাই যথেষ্ট হবে।

সে সময়ের কর্মব্যস্ততার কারণে হযরত (রহঃ)-এর মালফূযাত পরিস্কার করে লিখে পেশ করার মত সুযোগ ছিলো না। এর কিছু দিন পরে তা প্রকাশ ও প্রচার করার খেয়ালই অন্তর থেকে দূর হয়ে গেলো। বর্তমানে আমার নিজের আগ্রহ এবং কিছু দোস্ত আহবাবের চাহিদার ভিত্তিতে অধম যখন এমন ইচ্ছা করলাম যে, দারুল উলূমের মাসিক পত্রিকা 'আল-বালাগ'-এর মধ্যে 'মাজালিসে হাকীমুল উম্মত' নামে একটি নিয়মিত কলাম চালু করবো। সে কলামে হযরত (রহঃ)-এর বিশেষ শিক্ষাসমূহ এবং মালফূযাত প্রকাশ করা হবে। সেসময় আমার কিছু দোস্ত-আহবাব আমার সংরক্ষিত ও নির্বাচিত মালফূযাতের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। কিন্তু এখনকার অবস্থা তো এরূপ যেমন কোন কবি বলেছেন— آں قدح بشکست وآں ساقی نماند

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

অর্থাত, এখন তো সে পিয়ালা ভেঙ্গে গেছে আর এখন (পরিতৃপ্তকারী) সে সাকীও নেই।

হযরত (রহঃ) তাঁর যে সকল খলীফার নাম অসীয়্যতনামার মধ্যে লিখে দিয়েছিলেন তাদেরও অধিকাংশের ইন্তিকাল হয়ে গেছে। এরপরও বিষয়টিকে এজন্য গনীমত (বিশেষ মূল্যবান সম্পদ) মনে করলাম যেহেতু এখনো দু' এক হযরত জীবিত আছেন তাদেরকে যদি দেখিয়ে নেয়া হয়, তবে হযরত (রহঃ)–এর শর্তানুযায়ী মালফূযগুলো প্রকাশ করার উপযোগী হয়ে যাবে। এবং আমার কাছে সংরক্ষিত হযরত (রহঃ)–এর মালফূযের ভাণ্ডারও কাজে লেগে যাবে। হতে পারে তার দ্বারা আল্লাহ পাকের নেক বান্দাগণ কিছুটা উপকৃত হবেন। ফলে আমার জন্যও তা পরকালের সামান হয়ে যাবে।

হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)–এর ওসীয়তের উপর আমল করার উদ্দেশ্যে অধম 'মাজালিসে হাকীমুল উম্মত'–এর পাণ্ডুলিপি সিন্ধু প্রদেশস্থ ট্যাণ্ডলা ইয়ারের দারুল উলূম ইসলামিয়া মাদরাসার তৎকালীন শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী সাহেব (রহঃ)–এর খিদমতে পেশ করার অনুমতি চেয়ে আবেদন করলাম। তখন প্রথমে তিনি তার উত্তরে লিখলেন—

"হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ) নিজের মাওয়ায়েয ও মালফূযাত (ওয়ায ও বাণী) প্রকাশ ও প্রচার করার জন্য হযরত (রহঃ)–এর ইন্তিকালের পর যাঁদেরকে দেখানোর শর্ত আরোপ করেছেন, তার মর্ম হলো, ঐ মালফূয বা ওয়াযের লিখক যদি যাদের দেখাতে বলা হয়েছে তাদের তুলনায় ইলম ও মারিফাতের দিক থেকে কম হয়ে থাকেন তবে তিনি দেখানোর পর প্রকাশ করবেন। কিন্তু মালফূয যিনি লিখেছেন তিনি যদি উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের চাইতে ইলম ও মারিফাতে অগ্রগামী হন, তবে একথা পরিস্কার যে, তিনি এ শর্তের আওতাভুক্ত নন, আপনার সংকলিত 'মাজালিসে হাকীমুল উম্মত' অন্য কাউকে দেখানোর প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

ওয়াস সালাম
দু'আর মুখাপেক্ষী
যাফর আহমদ উসমানী
১৫, মহররম, ১৩৯৩ হিজরী

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

কিন্তু হযরত মাওলানার একথা বলা সত্ত্বেও অধমের মনে এই খেয়াল সৃষ্টি হলো যে, হযরত মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী সাহেবের মাধ্যমে হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)–এর হুকুমের প্রতি সরাসরি আমল করা যায় সুতরাং এ দূরবর্তী ব্যাখ্যার উপর কেন আমল করবো। এজন্য পূর্ণ পাণ্ডুলিপি আমি হযরত মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী সাহেব (রহঃ)–এর খিদমতে পাঠিয়ে দিলাম, যার জবাবে হযরত উসমানী সাহেব (রহঃ) আমাকে লিখলেন—

"মুহতারাম হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব (দামাত বারাকাতুহুম) আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

আপনি আমার কাছে 'মাজালিসে হাকীমুল উম্মত'–এর পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছেন। সেমতে তার কিছু অংশ আমি ধারাবাহিকভাবে এবং বাকী অংশ একটু দ্রুত নযরে দেখেছি। 'মাশাআল্লাহ' আপনি খুব সুন্দরভাবেই লিপিবদ্ধ করেছেন। কোন কোন স্থানে উর্দু ভাষায় সংযোগ স্থাপনকারী অব্যয় কা, কো, কী, মে, সে বাদ পড়ে গেছে সেগুলো দেখে ঠিক করে দিলেই হবে। এছাড়া কোন কোন স্থানে বাক্য কিছুটা অস্পষ্ট রয়ে গেছে সেগুলো একটু পরিষ্কার করে দিলেই চলবে। আমি শুধু আপনার হুকুম পালন করেছি। অন্যথায় আপনার লিপিবদ্ধ করা মালফূযাত কারো দেখার প্রয়োজন ছিলো না।

আমার যাহেরী ও বাতেনী সুস্থতা এবং খাতিমা বিল খায়র (ভাল অবস্থায় ইন্তিকাল) হওয়ার জন্য বিশেষভাবে দু'আ করতে থাকবেন।

ওয়াস সালাম
যাফর আহমদ উসমানী
২২শে মহররম, ১৩৯৩ হিজরী

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

মাজালিসে হাকীমুল উম্মত

পবিত্র রমযান ১৩৪৬ হিজরীর শেষ দশক

এ বৎসরই প্রথম পবিত্র রমযান মাসে দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মাদ তাইয়্যেব সাহেব (রহঃ)–এর সাথে থানাভবনে গমন করি। স্বাভাবিকভাবেই তো সেখানে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত খোদাপ্রেমিকগণের ভীড় লেগে থাকতো। আর হযরত (রহঃ)–এর সাথে যারা সম্পর্ক রাখেন তাদের বেশীর ভাগই আলিম এবং দ্বীনী মাদরাসার তালিবে ইলম। রমযান মাসে তাদের ছুটি থাকে। এছাড়া পবিত্র রমযান মাস হলো ইবাদত–বন্দেগীর এক বিশেষ মাস, এ কারণে রমযান মাসে বিপুল পরিমাণে লোক পূর্ণ মাসের জন্য হযরত (রহঃ)–এর দরবারে চলে আসতো।

হযরত (রহঃ) ব্যক্তিগতভাবে যদিও রমযান মাসে এ ধরনের সম্মিলিত কাজ পসন্দ করতেন না। বরং তিনি নির্জনে বসে ইবাদত বন্দেগী করতেই বেশী পসন্দ করতেন। তা সত্ত্বেও তিনি বলতেন, আহলে ইলম (আলিম ও তালিবে ইলম) দোস্তদের অন্য সময় সুযোগ হয় না, তাদের তো একটিই সুযোগ। তাই আমি বিষয়টিকে মেনে নিয়েছি।

রমযান মাসে হযরত (রহঃ)–এর দরবারে আগত লোকদের সংখ্যা প্রতি বৎসরই বৃদ্ধি পেতে থাকে। হযরত (রহঃ)–এর ইন্তিকালের কয়েক বৎসর আগ থেকেই এমন অবস্থা হয়েছিলো যে, খানকার পূর্ণ জায়গাসহ সকল রুমগুলোতেও লোকের জায়গা হতো না। বরং খানকার আঙ্গিনায় সামিয়ানা টানাতে হতো। এরপর লোকসংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাওয়ায় এক বৎসর তো খানকার বাইরেও সামিয়ানা টানাতে হয়েছিলো।

রমযান মাসের এই মুবারক পরিবেশে ১৩৪৭ হিজরীর ২০শে রমযান আমি সর্বপ্রথম মাওলানা ক্বারী মুহাম্মাদ তাইয়্যেব সাহেব–এর সঙ্গে উপস্থিত হই। হযরত ক্বারী সাহেব একদিকে যেমন বিজ্ঞ আলিম ছিলেন, অপর দিকে তিনি ছিলেন একজন ভাল ক্বারী। তিনি দেওবন্দে ঊনিশ দিনে কুরআন শরীফ খতম করে এখানে এসেছেন। দেওবন্দেও ক্বারী মুহাম্মাদ তাইয়্যেব সাহেবের তিলাওয়াত শুনার আগ্রহ নিয়ে অনেক দূর–দূরান্ত থেকে মুসল্লীগণ দারুল উলূমের মসজিদে তারাবীহ নামায

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

পড়তে চলে আসতেন।

আমরা থানাভবন পৌঁছে জানতে পেলাম হযরত (রহঃ) খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছেন। এতটাই দুর্বল ছিলেন, যে কারণে তিনি খানকায় তারাবীহ নামাযের ইমামতি এবং খতমে কুরআন করতেও অপারগ ছিলেন। এজন্য শুধু ইশার ফরয নামায জামাআতের সাথে খানকায় আদায় করে তিনি নিজের ঘরে চলে যেতেন এবং সেখানে তারাবীহতে পূর্ণ কুরআন শরীফ খতম করতেন। ঘরের মহিলাগণসহ অন্যান্য মহিলাগণও পর্দা রক্ষা করে হযরত–এর সাথে তারাবীহর জামাতে অংশ গ্রহণ করতেন। অন্য একজন ক্বারী সাহেব খানকায় তারাবীহ নামাযের ইমামতি করতেন। এবং পূর্ণ মাসে পবিত্র কুরআন খতম করতেন।

ক্বারী মুহাম্মাদ তাইয়্যেব সাহেব যখন সেখানে পৌঁছলেন, তখন খানকায় অবস্থানকারীদের ইচ্ছা হলো, যেহেতু এখনো রমযানের দশদিন বাকী আছে। এ দশদিনে তারা ক্বারী মুহাম্মাদ তাইয়্যেব সাহেবের পিছনে পবিত্র কুরআন শরীফের একটি খতম পূর্ণ করবেন। তাই তারা বিষয়টি হযরত (রহঃ)–এর সামনে পেশ করে তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তারা বললেন, খানকার তারাবীহ শেষ হওয়ার পর ক্বারী সাহেব তিলাওয়াত ও নামায শুরু করবেন এবং প্রতিদিন তিন পারা করে তিলাওয়াত করবেন।

হযরত (রহঃ) মানুষের হকসমূহ এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে সীমালংঘন না করে বরং সীমা সংরক্ষণের প্রতি পূর্ণরূপে লক্ষ্য রাখতেন। নিজের ইবাদতের আগ্রহের কারণে অন্যের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ হযরত (রহঃ) মোটেও পসন্দ করতেন না এবং এ ব্যাপারে অন্যদেরকেও তিনি খুব গুরুত্ব সহকারে বলতেন। তাই যদি খানকার মধ্যে এই পদ্ধতি তারাবীহর পরে চালু করা হয়, তবে অনেকের হয়তো অপারগতা থাকতে পারে যারা তাতে অংশগ্রহণ পসন্দ করবে না ফলে তাদের ঘুমে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে, যা তাদের জন্য একটি মানসিক বোঝা হয়ে যাবে, শেষ পর্যন্ত হয়তো অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা ঐ আমলে শরীক হতে বাধ্য হবে। এসব বিষয় চিন্তা করে হযরত (রহঃ) খানকার মধ্যে এমনটি করার অনুমতি দিলেন না। কিন্তু যারা ক্বারী মুহাম্মাদ তাইয়্যেব সাহেব (রহঃ)–এর পিছনে কুরআন শরীফ খতম করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন তাদের সে ইচ্ছাকে পূর্ণ করে তাদের মনতুষ্টির বিষয়টিও বিবেচনায় ছিলো। এজন্য

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হযরত (রহঃ) খানকার পার্শ্ববর্তী একটি ছোট্ট মসজিদকে এ আমলের স্থান হিসাবে নির্ধারণ করে দিলেন। সেখানে লোকেরা তারাবীহর নামায পড়ে চলে যাওয়ার পর মসজিদ খালি পড়ে থাকতো। সিদ্ধান্ত মোতাবেক কারী সাহেব সেখানে একবার পবিত্র কুরআন খতম করলেন।

বর্তমানে অনেক হাফেয সাহেব ও কারী সাহেবগণ রমযানুল মুবারকের রাতে শবীনা (সারারাতব্যাপী নফল নামাযে কুরআন তিলাওয়াত) করে থাকেন। তারা এ বিষয়টি মোটেও লক্ষ্য করেন না যে, অনেক লোক এমন আছেন যারা দুর্বল, অসুস্থ আবার অনেক এমন লোকও আছেন যারা সারাদিন মজদুরী করে কিংবা অফিসের কাজে ব্যস্ত সময় ব্যয় করে এসেছেন বিধায় তাদের রাতে আরাম করা খুবই প্রয়োজন, এমন লোকদের সে শবীনায় কি পরিমাণ কষ্ট হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। কোন কোন মসজিদে তো আরো বাড়াবাড়ি করা হয়, মসজিদে লাউড স্পিকার লাগিয়ে দিয়ে খতমে কুরআন শুরু করে দেয় ফলে এলাকাবাসীর ঘুমের বারটা বাজে। এসবকিছু বাহ্যিকভাবে যদিও নেকের কাজ এবং এতে সওয়াবও রয়েছে কিন্তু অন্যের কষ্টের কারণ হয় বিধায় এগুলো সওয়াবের চাইতে আযাবের কারণই বেশীর ভাগ হয়।

হযরত থানবী (রহঃ) বলতেন, এ পর্যায়ের ইবাদতের বিধিগত অবস্থান তো অত্যন্ত পরিষ্কার যে, এগুলো হলো নফল ইবাদত। আর মুসলমানকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা হলো ওয়াজিব। আর ওয়াজিবকে লংঘন করা হচ্ছে গুনাহে কবীরা।

দেওবন্দে আমাদের অভ্যাস ছিলো তারাবীহর নামাযের পর আমরা কিছু দোস্ত–আহবাব একত্রিত হতাম। সেখানে চা পানের হৃদ্যতাপূর্ণ মজলিস বেশ কিছুক্ষণ স্থায়ী হত। থানাভোনেও আমরা যখন খানকার পার্শ্ববর্তী সে মসজিদ থেকে দ্বিতীয় দফা কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ শেষ করে ফিরে আসতাম তখন খানকার অভ্যন্তরে আমাদের রুমে—যেখানে আমি (মুফতী শফী (রহঃ)) এবং মাওলানা ক্বারী মুহাম্মাদ তাইয়্যেব সাহেব অবস্থান করতাম সেখানে কিছুক্ষণ ঐ ধরনের মজলিস চলতো। খানকার নিয়ম ছিলো, ইশার নামাযের পর থেকে রাত্র তিনটা পর্যন্ত কেউ উচ্চ স্বরে যিকির কিংবা তেলাওয়াত করতে পারবে না। যাতে শেষ রাতে যারা উঠে ইবাদত–বন্দেগী করবেন তাদের ঘুমে কোন অসুবিধা না হয়, সে ক্ষেত্রে দোস্ত আহবাবদের নিয়ে চায়ের মজলিস করার তো প্রশ্নই আসে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

না। আর এ কারণে ইশার নামাযের পর থেকেই খানকা নিরব নিস্তব্ধ হয়ে যেতো। ফলে আমাদের ছোট আওয়াযের কথাগুলোও অনেক দূর পর্যন্ত চলে যেত। খানকার দায়িত্বশীলদের এ বিষয়টি জানা ছিলো যে, হযরত (রহঃ) আমাদের দু'জনের ব্যাপারে বিশেষ সহানুভূতিমূলক দৃষ্টি রাখেন। এজন্য তারা প্রথম দু'একদিন আমাদেরকে কিছুই বললেন না। কিন্তু তৃতীয় রাতে যখন আমরা কথা বলছিলাম, তখন খানকার খাদেম এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে সামান্য উঁচু আওয়াযে বললো, ইশার নামাযের পর উচ্চ আওয়াযে কথা বলা খানকায় নিষিদ্ধ। একথা শুনার পর আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পারলাম এবং সতর্ক হলাম। এরপর থেকে আমরা নামায শেষ করে এসে চুপে চুপে রুমে ঢুকে শুয়ে পড়ার নিয়ম বানিয়ে নিলাম। থানাভোনের খানকায় আমরা এ নিয়ম–পদ্ধতি দেখলাম এবং শিখলাম। এরপর হযরত ফারুক–ই–আযম (রাযিঃ) ও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) দ্বয় থেকে বর্ণিত নিম্নের রেওয়ায়েতটির প্রতি আমাদের লক্ষ্য স্থির হলো। যারা ইশার পরে অহেতুক জাগ্রত থেকে নিষ্প্রয়োজনীয় কথাবার্তায় লিপ্ত থাকতো তাদেরকে হযরত ফারুক–ই–আযম (রাযিঃ) বলতেন, যাও এখন গিয়ে শুয়ে ঘুমাও। لعلكم ترزقون صلوة অর্থাত, একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লে হয়তো শেষ রাতে জেগে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার সৌভাগ্য তোমার হতে পারে। এ জাতীয় একটি রেওয়ায়েত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) থেকেও বর্ণিত রয়েছে।

এবার এই সরল ও সাধারণ কথার সুদূর প্রসারী ফলাফলের বিষয়ে চিন্তা করে দেখুন, আর তাহলো এমন পরিবেশে যে ব্যক্তি অবস্থান করবে সে কিভাবে তাহাজ্জুদ নামাযে অভ্যস্ত না হয়ে পারে? আর তাহাজ্জুদ পড়ায় অভ্যস্ত হলে তো ফজরের নামায এবং জামা'আতের পাবন্দী এমনিতেই হয়ে যাবে। এর অন্যথা হওয়ার তো কোন সম্ভাবনাই থাকবে না।

বর্তমানে আমরা যে পরিবেশে বসবাস করে থাকি তাতে অর্ধ রাতেও মনে হয় যেন এখনো রাতই হয়নি। কোন এক ভাই একবার আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন যে, করাচীতে যখন রাত্র বারটা বাজে তখন মনে হয় যে, কিছুটা মাত্র রাত হয়েছে।

আর এ পরিবেশের ফলাফল লক্ষ্য করলে সবখানেই এ বিষয়টি নযরে আসে যে, ফজরের জামা'আত তো অনেক দূরের কথা সময় মতো

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

একাকী নামায পড়াও নিয়মিত নামাযী লোকদের জন্য কষ্টকর হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে আজাদ মনমানসিকতার বেনামাযী লোকদের কথা আর কি বলবো। আবদুল মজীদ লাহোরী (রহঃ) বর্তমান অবস্থাকে পূর্বেকার দ্বীনী অবস্থার সাথে তুলনা করেছেন দু'টি পংক্তির মাধ্যমে।

পূর্বেকার অবস্থা ঃ نماز فجر ادا کرتے ہیں پھر قرآن پڑھتے ہیں!

বর্তমান অবস্থা ঃ یہ سوکر نو بجے اٹھتے ہیں اٹھ کر ڈان پڑھتے ہیں

অর্থাত, আগেকার দ্বীনী অবস্থা তো এই ছিলো যে, মুসলমানেরা উঠে ফজরের নামায আদায় করতো এরপর পবিত্র কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতো। আর বর্তমান অবস্থা হচ্ছে, মুসলমানেরাও ঘুম থেকে উঠে সকাল নয়টায় এরপর 'ডন' (The Daily Don পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ দৈনিক ইংরেজী পত্রিকা) পড়তে লেগে যায়।

যে সকল লোকের দ্বীন ও আখেরাতের কিছু চিন্তা মাথায় আছে তাদের জন্য একটি অত্যন্ত জরুরী বিষয় হচ্ছে তাদের পরিবেশ এবং তাদের ঘরের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করা। এমনটি করা হলে নিজেও যেমন নামায রোযার পূর্ণ অনুসরণ করতে পারবে সাথে সাথে তার সাথে সম্পৃক্ত লোকদেরকেও নামায রোযা তথা দ্বীন ও শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। মহান আল্লাহ্ পাকই হলেন তাওফীক দানকারী এবং সহায়তা প্রদানকারী।

(১৩৪৬ হিজরীর অন্যান্য বৈঠকসমূহের মালফূয ও নসীহত লিখিত আকারে সংরক্ষিত নেই।)

রমযানুল মুবারক ১৩৪৭ হিজরী

এই রমযান ছিলো প্রথম রমযান, যে রমযানে আমি পূর্ণ সময় থানাভবনে থাকার ইচ্ছা করলাম। বিষয়টি হযরত (রহঃ)কেও জানালাম। এ সময় আমার বিবি সাহেবা আমাকে বললো, আমরা মহিলারাতো বুযুর্গানে দ্বীনের ফয়েয বরকত থেকে বঞ্চিত থাকি তাই আমাকে যদি আপনার সাথে যাওয়ার অনুমতি দেন তবে পরিবেশ মতে আমিও কিছু ফয়েয বরকতের ভাগী হতে পারতাম। এখানে আমার মনে একটি খেয়াল সৃষ্টি হলো যে, আমি যদি সেখানেও আমার বিবি–বাচ্চা নিয়ে যাই তবে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাধনা–মুজাহাদা করার যে সাধ সেটা আমি

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

লাভ করতে পারবো না। অতঃপর বিষয়টির ফায়সালা হযরত (রহঃ)–এর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিলাম। সবকিছু জানিয়ে চিঠি লেখার পর হযরত (রহঃ)–এর পক্ষ থেকে জবাব এলো, 'তাদেরকেও সাথে নিয়ে আসুন।' এতে একাগ্রচিত্ততা বেশী হবে বলে আশা করা যায়। আর তরীকতের লাইনে একাগ্রতার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

আমরা যে বিষয়টাকে একাগ্রতার জন্য অন্তরায় মনে করছিলাম হযরত (রহঃ) সেটিকেই একাগ্রতার সহায়ক স্থির করলেন। বাস্তব ক্ষেত্রে আমি তার সত্যতাও অনুধাবন করলাম। কারণ বাচ্চাদের অসুখ–বিসুখ তো লেগেই থাকে, এক্ষেত্রে তারা কাছে থাকলে তাদের প্রতি লক্ষ্য নেয়া এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসাদি করাতে ঐ ধরনের অস্থিরতার শিকার হতে হয় না যে ধরনের অস্থিরতা সৃষ্টি হয় দূর থেকে অসুস্থতার সংবাদ পেলে। আর এ জাতীয় কোন একটি সংবাদই একাগ্রতাকে সমূলে বিনাশ করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

পূর্ব সিদ্ধান্তমতে রমযানের একদিন পূর্বে বিবি–বাচ্চাসহ থানাভবনে গিয়ে হাযির হলাম। হযরত (রহঃ) আমার থাকার জন্য হযরত (রহঃ)–এর বাসার সাথের একটি বাসা ভাড়ায় গ্রহণ করার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমার উপস্থিতি ও বাসাটি আমার দেখে নেয়ার উপর মওকুফ রেখেছিলেন। আমি উপস্থিত হয়ে ঘরটি দেখার পর আমার খুবই পসন্দ হলো। কারণ, সে ঘরটি খানকাহ এবং হযরত (রহঃ)–এর বাড়ীর সাথে একেবারে মিলানো ছিলো। অত্যন্ত সন্তুষ্টি ও আনন্দচিত্তে আমার সফরের সামানপত্র সে ঘরে নিয়ে রাখলাম। দিনে–রাতে সার্বক্ষণিক হযরত (রহঃ)–এর সংস্পর্শ ও সান্নিধ্যের কারণে আমার কাছে যেন প্রতিটি রাত শবে কদর আর প্রতিটি দিন ঈদের দিনের মত মনে হতে লাগলো।

مے ناب وکنار آب ویار مہربان ساقی

دلا کے بہ شود کارت اگر اکنوں نخواہد شد

অর্থাত, মূল্যবান শরাবের পিয়ালা, দরিয়ার পাড়ের মোহনীয় পরিবেশ আর প্রিয় ও দয়ালু বন্ধু হলো সাকী, ওহে দিল! এখনো যদি তোমার কাজ উত্তম আর উন্নতভাবে সমাধা না হয় (উদ্দেশ্য হাসিল না হয়) তবে আর কখন হবে!

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

আমি তো ঐ ঘরের মধ্যে আমার স্থানে আমার কাজে লিপ্ত ছিলাম কিন্তু সে বাড়ীর আঙ্গিনায় কিছু বরই গাছ এবং লতাপাতা মিলে কিছুটা ঝাড়–জঙ্গলের মত হয়েছিল। তেমন পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন ছিলো না। হযরত (রহঃ)–এর ছোট বিবি সাহেবা সেখানে গেলেন এবং অবস্থা দেখে তিনি আশঙ্কা করলেন যে, মহিলা ও বাচ্চারা হয়তো এখানে ভয় পাবে। এর দু' তিন দিন পর হযরত (রহঃ) আমাকে ডেকে বললেন, আমি আমার ঘর পরিবর্তন করার ইচ্ছা করেছি। বর্তমানে যে ঘরে আমার ছোট বিবি সাহেবার অবস্থান, সে ঘরটি খালি হচ্ছে। সুতরাং আপনি আপনার বিবি–বাচ্চাদের নিয়ে এ ঘরে চলে আসুন। কথাটি হযরত (রহঃ) এমনভাবে আমার সামনে পেশ করলেন যেন তিনি তাঁর নিজের প্রয়োজনেই ঘর পরিবর্তন করছেন। এ কারণে কোন ওযর–অপারগতা প্রকাশেরও সুযোগ পেলাম না। এরপর থেকে হযরত (রহঃ)–এর ছোট ঘরেই রমযানুল মুবারকের বাকী সময়টা কাটালাম।

কিছুদিন যাবত হযরত (রহঃ)–এর নিয়ম এরূপ চলছিলো যে, যোহরের নামাযের পর থেকে আছর পর্যন্ত সাধারণ মজলিস চলতো। এই সময় কারো প্রতি কোন বিশেষ কাজের নির্দেশও থাকতো না। আর সকালে হযরত (রহঃ) নিজের প্রয়োজন ও আমল সম্পন্ন করে প্রায় দশটার দিকে একটি বিশেষ মজলিস করতেন, যেখানে হযরত (রহঃ) আগন্তুকদের মধ্যে বিশেষ লোকদের সাথে সাক্ষাত করতেন, কথা বলতেন। সেখানে শুধু তারাই উপস্থিত হতে পারতো যাদেরকে হযরত (রহঃ)–এর পক্ষ থেকে উপস্থিত হওয়ার জন্য বলা হতো। ঐ মজলিসে উপস্থিত হওয়ার জন্য সংবাদ কিভাবে কোন শব্দ দ্বারা দিতে হবে তাও হযরত নিজেই বলে দিতেন। সংবাদ দেয়ার জন্য সর্বদা যে কথাগুলো নির্ধারিত ছিলো তাহলো "অমুক সময় হযরতের মজলিস অনুষ্ঠিত হবে যদি আপনি ইচ্ছা করেন তবে সেখানে যেতে পারেন" এভাবে বলার কারণ এই ছিলো যাতে কেউ সেটাকে নির্দেশ মনে না করে এবং যাতে আগন্তুকদের স্বাধীনতা বিঘ্নিত না হয়। কারণ, কারো হয়তো কোন বিশেষ কাজ বা অপারগতা থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে যেন উপস্থিতিটা কারো মানসিক বোঝার কারণ না হয়।

ঐসব মজলিসের মালফূযাত বা বয়ান মজলিসের অনেকেই লিপিবদ্ধ করতো কিন্তু হযরত (রহঃ)–এর বয়ানের সময় লেখার দিকে মন দেয়া

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

আমার কাছে খুব কষ্টকর মনে হতো। এ কারণে পরবর্তীতে কথাগুলো যাতে স্মরণ করা যায় সেজন্য অল্প কথায় কিছু ইশারা খাতায় টুকে নিতাম। তার মধ্য থেকে কিছু কথা নিম্নে আলোচনা করা হচ্ছে।

২৯শে শাবান ১৩৪৭ হিজরী

এ দিন হযরত (রহঃ) বলেন, হাদীস শরীফে এসেছে—

من جلس مجلسا لم يذكر الله فيه كان عليه ترة يوم القيامة

অর্থাত, যদি কেউ কোন মজলিসে বসে এবং (মজলিস চলাকালীন) পূর্ণ সময় সেখানে কাটায় কিন্তু সে সময়ের মধ্যে যদি একবারও আল্লাহ পাকের যিকির না করে, তবে কিয়ামতের দিন এই মজলিস তার জন্য আফসোস ও অনুশোচনার কারণ হবে।

হযরত (রহঃ) বলেন যে, এ বিষয়টির প্রতি তোমরা সর্বদা লক্ষ্য রাখবে এবং নিজের কোন বৈঠক বা চলাফেরা ও অবস্থান যাতে আল্লাহ পাকের যিকির থেকে খালি না যায় সেদিকে খেয়াল রাখবে।

দ্বীন ও দুনিয়ার প্রত্যেক কাজে নিয়ম-শৃংখলা রক্ষা করার গুরুত্ব

হযরত (রহঃ) বলেন, দুনিয়ার কোন কাজের মধ্যে যদি বিশৃংখলা এবং অনিয়ম করা হয়, যেমন এক জায়গার জিনিস অন্য জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে দিলো, খানাপিনার ব্যাপারে সামঞ্জস্যতা ও নিয়মের লক্ষ্য রাখা হলো না, এমনটি যেমন দুনিয়ার বিচারে ক্ষতিকর তেমনিভাবে বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম আত্মিক বা বাতেনী কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রেও ক্ষতিকর।

এক বুযুর্গের ঘটনা, সে বুযুর্গের দরবারের নিয়ম ছিলো যখন কেউ তার কাছে মুরীদ হওয়ার জন্য আসতো তখন ঐ বুযুর্গ সাথে সাথেই তার সাথে সাক্ষাত করতেন না বরং খানা খাওয়ার সময় হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করতেন। দরবারের খাদেমদের প্রতি হুকুম ছিলো, কোন নতুন আগন্তুকের জন্য খানা নিয়ে যাওয়ার সময় প্রথমে ঐ খানা বুযুর্গকে দেখিয়ে নিতে হবে। আবার যখন তার খানা শেষ হবে তখন অবশিষ্ট খানা ফেরত নেয়ার সময়ও বুযুর্গকে দেখিয়ে নিতে হবে। এ নিয়মে ঐ

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

বুযুর্গ অবশিষ্ট খানা দেখে ধারণা করে নিতেন যে, লোকটির মাঝে নিয়মতান্ত্রিকতা ও শৃঙ্খলাবোধ আছে কিনা। যেমন লোকটি যে পরিমাণ রুটি খেয়েছে সে পরিমাণ বোল–তরকারী খেয়েছে কিনা। যদি এমনটি হয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে সে বিশুদ্ধ মানসিকতা সম্পন্ন লোক। পক্ষান্তরে যদি কমবেশী হয় তবে তা লোকটির বিশৃঙ্খল হওয়ার প্রমাণ।

এরপর যার মাঝে এ ধরনের অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করতেন তাকে মুরীদ করার ব্যাপারে বুযুর্গ অপারগতা প্রকাশ করে দিয়ে বলতেন, আমার এখানে বাই'আত হয়ে তোমার ফায়দা হবে না, তোমার মানসিকতার মাঝে অনিয়ম ও শৃঙ্খলাহীনতা রয়েছে। তুমি অন্য কোন শাইখের দরবারে গিয়ে বাই'আত হও।

নিরর্থক ও বেহুদা আলোচনা মানুষকে বড় গোনাহে লিপ্ত করে

হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহঃ)–এর দরবারে একবার দু'জন লোক এলো বাইয়াত হওয়ার জন্য। তারা মসজিদের হাউযে উযূ করতে বসে পরস্পর কথা বলতে শুরু করলো। একজন বললো, আমাদের হাউযটি এ হাউয থেকে অনেক বড়। হঠাৎ শাইখ একথাটি শুনে ফেললেন। এরপর তারা দু'জন শাইখের দরবারে উপস্থিত হলো এবং তাদেরকে বাই'আত করার আবেদন জানালো। তখন শাইখ প্রশ্ন করলেন, আপনাদের হাউযটি এখানকার হাউয থেকে কতটুকু বড়? একজন জবাব দিলো, তা তো বলতে পারবো না। তখন শাইখ বললেন, যান বাড়ী গিয়ে মাপঝোক করে আসুন। শাইখের কথামত তাদের পুনরায় সফর করে নিজেদের বাড়ীতে পৌছতে হলো। তারা বাড়ী পৌছে পরিমাপ করে দেখলো যে, তাদের হাউযটি মাত্র এক বিঘত বড়। এরপর তারা পুনরায় দরবারে ফিরে এলো এবং জানালো যে, হযরত আমি পরিমাপ করে এসেছি সে হাউযটি এ হাউয থেকে মাত্র এক বিঘত বড়। একথা শুনে শাইখ বললেন, আপনি তো বলেছিলেন অনেক বড়, এক বিঘত বড় হলে তা তো অনেক বড় হয় না।

আপনাদের একথার দ্বারা বুঝা যায় যে, আপনাদের মন–মানসিকতায় সত্য–মিথ্যার ব্যাপারে সতর্কতা নেই, সুতরাং আপনারা এ তরীকতের পথে চলবেন কি করে।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

উপরের বিষয়টি থেকে বুঝা যায় যে, বিশিষ্ট বুযুর্গানে দ্বীনের পদ্ধতি এই ছিলো যে, তারা মুরীদদেরকে বিভিন্ন ওযীফা ও নফল আমলের সবক দেয়ার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক শিক্ষাদান শুরু করার পূর্বে তাদের বাহ্যিক আমলকে দুরস্ত করে নিতেন এবং বিভিন্ন খারাপ স্বভাব থেকে বেঁচে থাকার অভ্যাস সৃষ্টি করাতেন। বর্তমানে অনেক মাশাইখ এসব বিষয় লক্ষ্য করেন না। যার কারণে ফলাফল এই হয় যে, যিকির–আযকার ও ওযীফা তাদের খুব মশক হয় ঠিক, কিন্তু খারাপ অভ্যাসগুলো আগের মতই ভিতরে থেকে যায়। হালাল–হারামের পার্থক্য, সত্য–মিথ্যার ব্যাপারে সতর্কতা ইত্যাদি ভাল স্বভাবগুলো ভিতরে আসে না, ফলে তারা তরীকতের দুর্নামের কারণ হয়।

লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্কতার শিক্ষা

এক ব্যক্তি হযরত (রহঃ)–এর বরাবরে চিঠি লিখলো যে, আমি অমুক বুযুর্গের হাতে বাই'আত হয়েছি। এমতাবস্থায় একবার আমি খাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর যিয়ারত লাভ করেছি। তিনি আমাকে বলেছেন, তুমি যে বুযুর্গের হাতে বাই'আত হয়েছো তার সাথে তোমার লৌকিকতামুক্ত অবস্থা খুব বেশী, তাই তার দ্বারা তোমার উপকার হবে না, বিধায় তুমি মাওলানা আশরাফ আলী সাহেবের কাছে গিয়ে তার থেকে শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ কর।

হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ) এ পত্রের জবাবে লিখলেন, তুমি তোমার বর্তমান শাইখ থেকে তোমার ব্যাপারে আমার কাছে এ কথা লিখিয়ে পাঠাও যে, 'এ লোকটি নির্ভরযোগ্য, তার কথা নির্ভর করার মত।' (অর্থাত, হযরত বলতে চাচ্ছেন যে, তুমি যে খাবের কথা আমার কাছে লিখেছো, তা যে তুমি ঠিকই লিখেছো তা আমি বুঝবো কিভাবে, এ ব্যাপারে বর্তমান শাইখ যদি আমাকে একথা বলে দেন যে, তুমি যা বলবে তা নির্ভর করার মত—তবেই আমি তোমার কথা বিশ্বাস করে তোমাকে আমার কাছে বাই'আত হওয়ার অনুমতি দিতে পারি।)

অনেক ক্ষেত্রেই এরূপ দেখা গেছে যে, অনেকে বুযুর্গানে দ্বীনের নৈকট্যলাভের জন্য বিভিন্ন অবাস্তব ঘটনা ও স্বপ্নের কথা বর্ণনা করে থাকে, যা তাদের নিজেদের জন্য ফিৎনার কারণ আর অন্যদের জন্য পেরিশানী ও অস্থিরতার কারণ হয়। হযরত (রহঃ) নিজে এ পদ্ধতির

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

মাধ্যমে সর্বরকম অনিষ্টতার বিষয়গুলো সমূলে বিদূরিত করে রেখেছেন এবং পূর্বের শাইখের অন্তরকে ব্যথিত করা থেকেও রক্ষা করেছেন।

প্রত্যেক কাজ সীমার মধ্যে থেকে করার প্রয়োজনীয়তা

হযরত (রহঃ) বলেন, আল্লাহ পাকের খাশিয়্যত ও ভয়ই হলো সকল সৌন্দর্য ও মঙ্গলের উৎসমূল এবং এর ফযীলতও বিরাট। এর পরেও যদি সীমা অতিক্রম করে তবে তা মানুষকে অকর্মণ্য ও বেকার করে দেয়। এজন্য হাদীসে পাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে খাশিয়্যতুল্লাহ বা আল্লাহর ভয় জাগ্রত করার জন্য যে দু'আর কথা বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাও বলেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لِىْ مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهٖ بَيْنِىْ وَ بَيْنَ مَعَاصِيْكَ

অর্থাত, আয় আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার খাশিয়্যত ও ভয় এ পরিমাণ দান করুন যা আমার গুনাহ করার পথে অন্তরায় ও প্রতিবন্ধক হতে পারে।

উপরের আলোচনায় 'আপনার ভয় এই পরিমাণ দান করুন যা আমার গুনাহ করার ক্ষেত্রে অন্তরায় হতে পারে' বলে যে কথাটি বলা হয়েছে তা থেকে বুঝা যায় যে, যদি ভয় মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে যায় তবে তা মানুষের সহ্যসীমার ভিতরে থাকে না, ফলে তা মানুষকে বেকার ও অথর্ব বানিয়ে দেয়।

এর মোকাবেলায় আল্লাহ পাকের সাক্ষাত লাভ ও দর্শনাকাংখাও অনেক বড় নেয়ামত। তবে সেক্ষেত্রে দু'আ করার জন্যও হাদীস শরীফের বাক্য নিম্নরূপ—

وَشَوْقًا اِلٰى لِقَائِكَ فِىْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ

অর্থাত, আয় আল্লাহ! আমাকে আপনার সাক্ষাত লাভ ও দর্শনাকাংখা দান করুন এবং তা যেন এমন কোন কঠিন রোগ কিংবা কঠিন বিপদ ও ফিৎনার কারণ না হয়, যে রোগ বা বিপদের কারণে আমি মউতের আকাংখা করতে বাধ্য হই।

মহান আল্লাহর সাক্ষাত ও দর্শন লাভের পথ তো পরিস্কার আর তা

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হলো ইন্তেকাল। ইন্তেকাল করা ছাড়া এমনটি সম্ভব নয়। এ কারণে মউতকে আল্লাহ পাকের সাক্ষাত ও দর্শন লাভের জন্য প্রিয় মনে করাটাও একটা বড় নি'আমত। কিন্তু কোন কোন সময় মানুষ কোন অসহ্য কষ্ট কিংবা বিপদের কারণে মউতের আকাংখা করতে বাধ্য হয়। সে ধরনের মুসীবততো প্রশংসনীয় নয়। এ কারণে আল্লাহ পাকের সাক্ষাত লাভের আগ্রহের বিষয়টিকেও এ কথাটির সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

দেওবন্দের বিশিষ্ট মুরব্বীগণের মাঝে আল্লাহ পাকের ভয় ও বিরোধীদের সাথে আচরণ

সাইয়্যেদুত্তায়েফাহ বা আধ্যাত্মিক কাফেলার সরদার হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গংগুহী (রহঃ) যখন বিদ'আতী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে খণ্ডনমূলক কিছু পুস্তক লিখলেন তখন বিদ'আতী সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে গালিগালাজ–এর ঝড় বইতে লাগলো। দু'একজন কট্টর ও প্রসিদ্ধ বিদ'আতী হযরত গংগুহী (রহঃ)–এর বিরুদ্ধে বেশ কিছু বইপত্রও লিখলো। যার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হযরত গংগুহী (রহঃ)–এর প্রতি বিভিন্ন কটুক্তি ও গালমন্দে পূর্ণ ছিলো। সেসব বইপত্র তারা একের পর এক ধারাবাহিকভাবে প্রচার করে যাচ্ছিলো। হযরত গংগুহী (রহঃ) তখন দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। তখন (হযরত শাইখুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া (রহঃ)–এর পিতা) মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহইয়া সাহেব কান্ধলভী (রহঃ) হযরত (রহঃ)–এর বিশেষ খাদেম ও হযরতের (রহঃ) বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। যেসব চিঠি হযরত গংগুহী (রহঃ)–এর বরাবরে আসতো সেগুলো তিনি হযরত (রহঃ)কে পাঠ করে শুনাতেন এবং জবাব লিখার দায়িত্বও তাঁর উপরই ন্যস্ত ছিলো। ঐ সব চিঠির সাথে ঐ বিদ'আতীদের লেখা বইপত্রও থাকতো। (হযরত (রহঃ)কে সেগুলো পড়েও শুনানো হতো)। হঠাৎ বেশ কিছুদিন যাবৎ হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব ঐ ধরনের কোন বইপত্র হযরত (রহঃ)কে পড়ে শুনাচ্ছেন না দেখে হযরত গংগুহী (রহঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'মৌলভী ইয়াহইয়া! আমার বন্ধুরা কি এখন আমাকে স্মরণ করা ছেড়ে দিয়েছে? অনেক দিন হলো তাদের কোন চিঠিপত্র আসছে না যে? তখন মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহইয়া সাহেব আরয করলেন যে, ওদের বই তো

সূচীপত্র

বেশ কয়েকটাই এসেছে কিন্তু সেগুলো আমার পড়তে ইচ্ছা করে না। হযরত (রহঃ) জানতে চাইলেন, কেন? তখন মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব বললেন, ওগুলো তো গালিগালাজে পূর্ণ। একথা শুনে প্রথমে হযরত (রহঃ) বললেন, 'আরে মিয়া দূর থেকে গালী দিলে তাও কি মানুষের গায়ে লাগে নাকি? এরপর তিনি বললেন, সে বই ও চিঠিগুলো আমাকে অবশ্যই পাঠ করে শোনাও। আমরা তো এ নিয়্যতে শুনবো যে, তার মধ্যে কোন কথা যদি গ্রহণযোগ্য হয় তবে তা গ্রহণ করবো আর সঠিক অর্থেই যদি তারা আমাদের কোন ভুলের ব্যাপারে সতর্ক করে থাকে তবে সেমতে আমরা নিজেদের সংশোধন করে নিব।

এরাই হলেন সত্য সন্ধানী, আল্লাহভীরু আলেম। যাঁদের কারো সাথে কোন মতপার্থক্যের সৃষ্টি হলে তাও হতো একমাত্র আল্লাহপাকের সন্তুষ্টির জন্য এবং যারা বিরুদ্ধবাদীদের গালমন্দের সময়ও প্রতিশোধ স্পৃহা এবং নিজের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ ও বিভিন্ন তাবীল বা ব্যাখ্যা খোঁজ করার পরিবর্তে নিজের শুদ্ধি ও সত্যানুসন্ধানের পথ খুঁজে নেন।

ঐসব লোক কত বড় যালিম যারা এ সকল বুযুর্গানে দ্বীনের উপর বিভিন্ন অপবাদ লাগিয়ে তাদের দুর্নাম ছড়িয়েছে এবং সাধারণ লোকদেরকে তাঁদের লিখা বইপত্র পড়তে এবং তাদের সান্নিধ্যে গমন করতে বারণ করছে। একটা বাস্তব কথা হচ্ছে, যারা শুধু দূরে বসে বুযুর্গানে দ্বীনের প্রতি বদনাম-দুর্নাম ও কুধারণা করে বসে থাকেনি বরং তাদের কাছে এসে তাদের সংস্পর্শ লাভ করেছে, তাঁদের লেখা বইপত্র ইনসাফের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পাঠ করেছে তারা এমনিতেই তাদের সকল প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছে। তাদের ভুল ধারণাও ভেঙ্গে গেছে। বিভিন্ন মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে যদি এ পন্থা অবলম্বন করা হয়, তবে মুসলমানদের মধ্যকার পারস্পারিক লড়াই ঝগড়ার ফিৎনা-ফ্যাসাদ আর বাকী থাকতে পারে না। মতপার্থক্যও তার নির্ধারিত সীমার মধ্যে সীমিত থাকতে পারে। কিন্তু এজন্য প্রয়োজন আল্লাহ পাকের ভয় ও অহংকারমুক্ত হৃদয়। বর্তমানে যার ব্যাপক অভাব ও দুর্ভিক্ষ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম (রহঃ)

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম (রহঃ)-এর ইলমী ও আমলী যোগ্যতা ও পূর্ণতা সম্পর্কে অবগত নন এমন কোন সচেতন মুসলমান

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সম্ভবত খুঁজে পাওয়া যাবে না, তার বিনয় ও নম্রতার অবস্থা এই ছিলো যে, যখন তিনি জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রয়োজনীয়তার দিক অনুভব করলেন তখন তা পূর্ণ করার জন্য দিল্লীর একটি প্রকাশনীতে (মুজতাবায়ী প্রকাশনী) কিতাবপত্র শুদ্ধ করার দায়িত্ব নিয়ে কর্মচারী হিসেবে নিয়োজিত হলেন। সেখানে হযরত নানুতবী (রহঃ)–এর সর্বমোট ওযীফা ছিলো দশ টাকা। হঠাৎ একবার এ দশ টাকা গ্রহণ করার ব্যাপারেও তাঁর মনের মাঝে যখন দ্বিধা–সংকোচ অনুভব করলেন তখন তিনি আপন শাইখ হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহঃ)–এর সাথে এই বলে পরামর্শ করলেন যে, এই ওযীফা গ্রহণটাও ছেড়ে দিতে চাই এবং যা–ই খেদমত করবো তা আল্লাহর ওয়াস্তে বিনা বেতনেই করতে চাই।

হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) তৎকালীন যুগের ইমাম ছিলেন। তিনি তখন বললেন, আপনি মাসিক ওযীফা ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে আমার কাছে পরামর্শ চেয়েছেন। কোন ব্যাপারে পরামর্শ চাওয়া সে ব্যাপারে দ্বিধা–দ্বন্দ্ব থাকার প্রমাণ বহন করে, আর দ্বিধা–দ্বন্দ্বের অবস্থায় কামাই–রুযীর উপকরণ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা একটি বাড়তি অস্থিরতার কারণ হয়। উপায়–উপকরণ পরিত্যাগ করা তো শুধু ঐ সময় জায়েয হয় যখন মানুষ তার অবস্থা ও হালতের কাছে মাগলুব বা পরাজিত হয়ে যায়। হযরত (রহঃ) বলেন, হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)–এর তাওক্কুল বা ভরসা ছিলো অত্যন্ত উচু স্তরের ক্ষুধা ও দারিদ্রের কঠিনতম অবস্থা তিনি অতিক্রম করেছেন, তা সত্ত্বেও তিনি নিজের মুরীদদের ব্যাপারে সর্বদাই এ সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন যাতে তাদেরকে কোনরূপ অস্থিরতায় নিপতিত হতে না হয়।

কানপুর মাদরাসার দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ

হযরত (রহঃ) বলেন, আমি যখন জামেউল উলূম কানপুর মাদরাসায় ওযীফা (বেতন) গ্রহণ করে দরসী খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছিলাম সে সময় হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)–এর একান্ত ইচ্ছা ছিলো আমি যেন সে দায়িত্ব ছেড়ে দেই। কিন্তু আমার পেরেশানী হবে এই এই খেয়াল করে হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) আমাকে সে দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে সরাসরি আদেশ করছিলেন না। আমাকে শুধু এতটুকু বললেন যে, যদি

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

কখনো কানপুরের দায়িত্ব ছেড়ে দাও তবে অন্য কোন দায়িত্ব আর গ্রহণ করো না। আমি তখন নিজে নিজে বলছিলাম, ঐ খিদমত আমি ছাড়বো কেন? এটা তো দ্বীনী খেদমত, আর দ্বীনী খেদমত করে ওযীফা গ্রহণ করাতো কোন নাজায়েয কাজ নয়, কিন্তু এর মাত্র অল্পদিন পরেই হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)-এর ইচ্ছা বাস্তব রূপ নিতে শুরু করলো। একাগ্রতা ও নির্জনতার আগ্রহ আমার মাঝে এত অধিক বৃদ্ধি পেলো যার ফলে মাদরাসার দায়িত্ব পালন করা কঠিন হয়ে পড়লো। পরিশেষে আমি মাদরাসা থেকে ইস্তিফা দিতে বাধ্য হলাম। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ আমার কাছে বারবার লোক পাঠাতে লাগলেন, চিঠিপত্র লিখলেন। তাদের কথা ছিলো আপনার এখানে যদি কষ্ট হয় তবে তার সমাধান আমরা করবো, তারপরও আপনি মাদরাসায় থাকুন। পরিশেষে আমি তাদের সামনে মুখ খুলতে বাধ্য হলাম এবং পুরো বিষয়টি তাদের সামনে খুলে বললাম। আর তাদের চিঠিপত্রের জবাবে আমি তাদের বরাবরে নিম্নোক্ত পংক্তি দুটি লিখে পাঠিয়ে দিলাম।

از قیل وقال مدرسہ حالے دلم گرفت

یک چند نیز خدمت معشوق دے کنم

অর্থাত, মাদরাসার পাঠ্য বক্তব্য ও বর্ণনা থেকে মনের আকর্ষণ উঠে গেছে। অন্তত কিছু সময় হলেও একাগ্রচিত্তে প্রিয় মাশুকের খিদমতে লেগে থাকতে চাই।

ঋণগ্রস্ততার অস্থিরতা ও হযরত গাংগুহী (রহঃ)-এর পরামর্শ

কানপুর মাদরাসার দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার পর হযরত থানবী (রহঃ) সম্পূর্ণ সামানহীনভাবে আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করে থানাভবনের খানকায় অবস্থান করতে থাকলেন। সে সময় ঘরের টুকিটাকি প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে প্রায় দেড়শত টাকা করয হয়ে গেলো। তখন হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) আর দুনিয়াতে নেই। হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)-এর পর হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ) হযরত গাংগুহী (রহঃ)কে নিজের শাইখের স্থলাভিষিক্ত মনে করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁর স্মরণাপন্ন হতেন। সে মতে তখনকার অবস্থা ও করয আদায়ের জন্য দু'আর দরখাস্তসহ হযরত গাংগুহী (রহঃ)-এর বরাবরে চিঠি লিখলেন।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

জবাব এলো—দেওবন্দ মাদরাসায় খেদমতের একটি পদ খালি আছে, যদি আপনি সম্মত থাকেন তবে আমি তাদেরকে এ ব্যাপারে লিখে দিতে পারি। হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, এ চিঠি পেয়ে আমি একটু দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। কারণ, এখন যদি আমি দেওবন্দে খিদমতের দায়িত্ব গ্রহণ করি তবে হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)-এর কথা রক্ষা করা হয় না। আর যদি এ দায়িত্ব গ্রহণ না করি, তবে হযরত গাংগুহী (রহঃ)-এর সাথে বেয়াদবী হয়। কারণ, তিনি নিজে আগ্রহ করে বিষয়টি আমাকে বলার পরেও তা গ্রহণ না করাটা তো বেয়াদবীই হয়। কিন্তু আল্লাহ পাক দয়া করে অন্তরে একটা সুন্দর জবাব উদয় করে দিলেন, আমি হযরত গাংগুহী (রহঃ)-এর পত্রের জবাবে লিখলাম—'হযরত! আমার পূর্বের পত্রের উদ্দেশ্য ছিলো শুধু দু'আর আবেদন করা, কোন চাকুরী বা জীবন ধারণের উপকরণ অন্বেষণ আমার উদ্দেশ্য ছিলো না। কারণ, হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) আমাকে এ উপদেশ দিয়েছিলেন যে, কানপুরের দায়িত্ব ছেড়ে দিলে আর কখনো কোথাও দায়িত্ব নিও না।

বর্তমানে আমি আপনাকেই হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত বলে মনে করি। সুতরাং এখন এমতাবস্থায় হযরতের হুকুম মতে যদি আমি পুনরায় কোন দায়িত্ব গ্রহণ করি তবে সেটাকেও আমি হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)-এর হুকুম বলেই ধরে নিব। এবং পূর্বের হুকুমকে রহিত বলে ধরে নিয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করে নিব। এ কথার উপর হযরত গাংগুহী (রহঃ) জবাব পাঠালেন—'আপনি এখন আর কোন চাকুরী বা দায়িত্ব নিবেন না। ইনশা'আল্লাহ আপনার কোন অস্থিরতাও আর থাকবে না।

আল্লাহর ভয় ও নম্রতার মাহাত্ম্য ও পরামর্শের গুরুত্ব

হযরত থানবী (রহঃ)-এর সম্মানিত পিতা বংশগতভাবে সচ্ছল ও যথেষ্ট প্রতিপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তার উপার্জনের পথও কোন অবৈধ পথ ছিলো না। কিন্তু হযরত থানবী (রহঃ)-এর নযরে কিছু সন্দেহ থাকায় তাঁর পিতা ইন্তিকালের পর পরিত্যাক্ত সম্পত্তি থেকে নিজের অংশের বিষয়টি যখন সামনে এলো তখন তিনি তা গ্রহণের ব্যাপারে কিছুটা দ্বিধা সংকোচে পড়ে গেলেন। হযরত থানবী (রহঃ)-এর নিজে নিজে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভ্যাস ছিলো না। তাই তিনি

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হযরত গাংগুহী (রহঃ)–এর বরাবরে চিঠি লিখলেন এবং জানতে চাইলেন, মিরাসী সম্পদের ব্যাপারে আমার কিছু সন্দেহ হওয়ার কারণে মিরাসে অংশ গ্রহণ করতে আমার দ্বিধা সংকোচ হচ্ছে। আবার গ্রহণ না করে আমার অংশ ছেড়ে দেয়ার ক্ষেত্রেও দ্বিধা হচ্ছে। কারণ পরবর্তীতে এ কারণে আমি কোন অস্থিরতায় লিপ্ত হয়ে পড়ি কিনা?

হযরত গাংগুহী (রহঃ)–এর পক্ষ থেকে চিঠির উত্তর এলো 'সম্পদে নিজের অংশ যদি গ্রহণ করা হয় তবে ফাতওয়ার দৃষ্টিতে তা জায়েয, আর যদি তা গ্রহণ না করে ছেড়ে দেয়া হয় তবে তা হবে তাকওয়া। আর গ্রহণ না করার কারণে ইনশাআল্লাহ কোনদিন কোন অস্থিরতার সম্মুখীন হতে হবে না।'

পত্রের এ জবাব পেয়ে হযরত থানবী (রহঃ) তাকওয়ার দিকটিই অবলম্বন করলেন এবং মিরাসে নিজের অংশ ভাইদের জন্য ছেড়ে দিলেন। যা ছিল ধনসম্পদের এক বিরাট অংশ।

অধম (লেখক) শ্রদ্ধেয় পিতার কাছে শুনেছি, তিনি বলেছেন, হযরত গাংগুহী (রহঃ) বলতেন যে, মাওলানা আশরাফ আলী (রহঃ)–এর ন্যূনতম তাকওয়া হলো যে, তিনি তাঁর পিতার মিরাসের অংশ গ্রহণ করেননি।

এ বিষয়টি একদিকে তো তাকওয়া অপরদিকে শুধু নিজের মতের উপর নির্ভর না করা এবং বুযুর্গানে দ্বীনের পরামর্শের উপর আমল করার বহুত বড় একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ মূলনীতি। যে মূলনীতির অনুসরণ সর্বদা হযরত থানবী (রহঃ) নিজে করেছেন এবং অন্যদেরকেও তা অনুসরণ করার জন্য তাকীদ করেছেন। হযরত থানবী (রহঃ) বলতেন—

'মানুষের কস্মিনকালেও শুধু নিজের মতের উপর আমল করা উচিত নয়, বরং যতক্ষণ পর্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে নিজের তুলনায় বড় ব্যক্তিবর্গ মওজুদ থাকেন ততক্ষণ তাদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করা উচিত। কিন্তু যদি স্বাভাবিক নিয়মে নিজের বড় কেউ না থাকেন, তবে সে ক্ষেত্রে সমপর্যায়ভুক্তদের সাথে পরামর্শ করে সেমতে কাজ করতে হবে। যদি নিজের সমপর্যায়ভুক্ত কাউকেও না পাওয়া যায় তবে নিজের তুলনায় ছোটদের সাথে পরামর্শ করে সেমতে কাজ করবে। হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন যে, 'স্বাভাবিক নিয়মে বড়' কথাটা এজন্য বললাম যেহেতু প্রকৃতপক্ষে কে বড় তা তো শুধু আল্লাহ পাকই জানেন।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

প্রচলিত আধুনিক শিক্ষা থেকে সৃষ্ট কিছু সন্দেহ ও ভুল ধারণার মূল ভিত্তি

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, প্রচলিত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের যত রকম অমূলক ধারণা ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে সৃষ্টি হয়ে থাকে, সেগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার পর সে সবের মূলে যে বিষয়টি বুঝে আসে তা হলো, প্রচলিত আধুনিক শিক্ষার দ্বারা মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহু ও তার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাহাত্ম্য ও মহব্বত অন্তর থেকে বিদূরীত হয়ে যায়। যখন এ দুটি বিষয় অন্তরে বিদ্যমান থাকে না তখন ইসলামের প্রতিটি বিধানের উপর শত শত প্রশ্ন সৃষ্টি হতে থাকে। কারো মাহাত্ম্য ও মহব্বত যদি অন্তরে বিদ্যমান থাকে তবে তার কথা ও বিধি-নিষেধের প্রতি কোন প্রশ্নই মনে সৃষ্টি হয় না। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, বর্তমান প্রশাসনের মাহাত্ম্য একরকম জবরদস্তীমূলকভাবেই মানুষের অন্তরে ছেয়ে আছে। এ কারণে তার নির্ধারিত আইন-কানূনের ব্যাপারে কোন কারণ বা হিকমত জিজ্ঞাসা করার দিকে কারো লক্ষ্যই যায় না। যেমন ডাক বিভাগের ফি দেয়ার ক্ষেত্রে আড়াই তোলা পর্যন্ত দুই পয়সা, আড়াই তোলার উপরে পাঁচ তোলা পর্যন্ত এক আনা ডাক খরচ দিতে হয়। এই বিধানের উপর সকলেই ঠিকভাবে আমল করে যাচ্ছে। আলেম-জাহেল, শিক্ষিত-অশিক্ষিত কেউই এর উপর আমল করা বাদ দেয় না। কারো এ কথাটুকু জিজ্ঞাসা করার মত সাহসও হয় না যে, এই বিধানের মধ্যে হিকমত বা রহস্য কি? কখনো যদি কেউ কারো কাছে এ ধরনের প্রশ্ন করেও তবে যাকে প্রশ্ন করা হয় সে প্রশ্নকারীকে এতটুকু বলে দেয়াই যথেষ্ট মনে করে যে, 'ভাই এটা সরকারী আইন' কিন্তু ইসলামের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে এতটুকু জবাব যথেষ্ট মনে করা হয় না যে, 'এটা আল্লাহ পাক অথবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হুকুম।'

এসব কিছুর কারণ একটাই আর তা হলো, আল্লাহ পাক ও রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহব্বত অন্তর থেকে দূর হয়ে যাওয়া বা কমে যাওয়া।

এশরাফে নফস-এর হাকীকত

একটি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

করেন, 'যে হাদিয়া কোনরূপ লোভ বা 'এশরাফে নফস' ছাড়াই লাভ হয় তার মধ্যে বরকত হয়ে থাকে। আর 'এশরাফে নফস' থাকলে সে ক্ষেত্রে বরকত থাকে না।

'এশরাফ' শব্দের অর্থ হলো অপেক্ষায় থাকা। এর মর্ম হলো এই যে, যদি পূর্ব থেকেই কোন হাদিয়া পাওয়ার আশা থাকে এবং নিজের মন সে হাদিয়া পাওয়ার জন্য অপেক্ষমান থাকে যে, অমুক ব্যক্তি থেকে আমি এ হাদিয়া লাভ করবো, তবে একে বলা হয় এশরাফে নফস। অন্তরে এভাব বিরাজমান থাকা অবস্থায় হাদিয়া গ্রহণ করা আহলে বাতেন বা আধ্যাত্মিক পন্থীদের নিকট কারো কাছে কিছু চেয়ে নেয়ার মত। 'এশরাফে নফস' সম্পর্কে হযরত থানবী (রহঃ) হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী মুহাজিরে মাদানী (রহঃ)–এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। ঘটনাটি হলো—

বাহওয়ালপুর এলাকায় একজন প্রভাবশালী দ্বীনদার জমিদার ছিলেন। তিনি মাঝে মধ্যেই আলেম–উলামা এবং দ্বীনদার ব্যক্তিদের দাওয়াত দিয়ে মেহমানদারী করতেন এবং বিদায়ের সময় সকলকেই কিছু হাদিয়াও দিয়ে দিতেন।

একবার দেওবন্দ সাহারানপুরের বিশিষ্ট আলেম ও বুযুর্গ ব্যক্তিদের তিনি দাওয়াত করলেন। হযরত থানবী (রহঃ)কেও সে সাথে দাওয়াত করা হলো। হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহঃ) ছিলেন সে সময়কার একজন বিশিষ্ট ফকীহ এবং বড় বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব। তাঁর মধ্যে এই খেয়াল সৃষ্টি হলো যে, এ জমিদার ব্যক্তির অভ্যাস ও নিয়মতো আমাদের পূর্ব থেকেই জানা আছে যে, সে প্রতিবারই যাদেরকে দাওয়াত করে তাদেরকে কিছু হাদিয়াও দিয়ে থাকে। এজন্য এখানে আসলেই মনে এই আশঙ্কা উদয় হয় যে, সে কিছু দিলে তা গ্রহণ করা 'এশরাফে নফস' এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় কিনা। তাই মনের এহেন অবস্থায় হাদিয়া কবুল করা উচিত নয়। হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী (রহঃ)–এর একথা শুনে আমি বললাম, আমার নিকট এমন বিষয় এশরাফে নফসের অন্তর্ভুক্ত যার ব্যতিক্রম হলে মনে কষ্ট লাগে এবং অন্তরে অভিযোগের সৃষ্টি হয়। আর মনে কোন কষ্ট বা অভিযোগ না এলে সেটা শয়তানের একটা ওয়াসওয়াসা মাত্র, এর নাম ইশরাফ নয়।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহেব (রহঃ) আমার একথা পছন্দ করলেন এবং আমার বক্তব্যকে তিনিও সমর্থন করলেন।

বুযুর্গানে দ্বীনের তাবীয সাধারণ আমেলদের তাবীযের মত নয়

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, বিভিন্ন তদবীর এবং তাবীয–কবয সম্পর্কে যারা অবগতি রাখেন তারা অনেক শর্ত–শরায়েতসহ তাবীয–কবয লিখে থাকেন। মূলতঃ সেটি একটি ভিন্ন বিষয়, কিন্তু দ্বীনের বিশিষ্ট বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রকৃত বিষয় হলো মহান আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ এবং তার দরবারে দু'আ। এ বিষয়টিকেই তারা তাবীয আকারে যে কোন ভাষায় যে কোন পদ্ধতিতে লিখে দিয়ে থাকেন এবং লোকেরা তার দ্বারা উপকৃতও হয়ে থাকে। আমি হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) [(হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহঃ)]–এর কাছ থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আহমদ সাহেব বেরেলোভী (রহঃ)–এর কাছে লোকেরা বিভিন্ন রোগ–শোক ও বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য তাবীয নিতে আসতো। তিনি সকল প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সবাইকে একটি কথাই লিখে দিতেন এবং আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে তাতেই সকলে উপকৃত হতো। যে কথাটি তিনি লিখে দিতেন তা হলো—

"خداوندا اگر منظور داری حاجتش را براری"

অর্থাত, আয় আল্লাহ! আপনার যদি ইচ্ছা হয় তবে দয়া করে এই ব্যক্তির প্রয়োজন পূর্ণ করে দিন।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, অনুরূপ কোন এক ব্যক্তি কোন একটি বিশেষ কার্যসিদ্ধির জন্য হযরত গাংগুহী (রহঃ)–এর কাছে একটি তাবীয চাইলো। হযরত গাংগুহী (রহঃ) জবাব দিলেন, এর কোন তাবীয আমি জানি না। কিন্তু লোকটি কোনভাবেই কথাটা মেনে নিতে চাইলো না। বরং বারবার সে তাবীয চাইতেই থাকলো। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে হযরত গাংগুহী (রহঃ) নিম্নের বাক্যগুলো লিখে দিলেন—

"یا اللہ میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں۔ آپ کے قبضہ میں سب کچھ ہے۔ اس کی مراد پوری فرما دیجئے"۔

অর্থাত, 'ইয়া আল্লাহ! আমি জানি না, এ লোকটি মানে না, আপনার কুদরতী হাতেই রয়েছে সবকিছু; তার উদ্দেশ্য আপনি পূর্ণ করে দিন।'

এর উসীলাতেই আল্লাহ পাক লোকটির প্রয়োজন পূর্ণ করে দিলেন।

তাফসীর ও তাসাওউফের সাথে হযরত থানবী (রহঃ)-এর সম্পর্ক ও হযরত হাজী ছাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) [হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহঃ)] আমার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন যে, ইলমে তাফসীর এবং ইলমে তাসাওউফের সাথে তোমার বিশেষ সম্পৃক্ততা থাকবে, আলহামদুলিল্লাহ হযরত (রহঃ)-এর সে ভবিষ্যদ্বাণীর বরকতেই এ দুটি বিষয়ে আমার অন্তরে সংশয় সন্দেহ খুব কমই থাকে। মহান আল্লাহ পাক এ দুটি ইলমের যে কোন বিষয় সম্পর্কেই আমার অন্তরে সঠিক বুঝ সৃষ্টি করে দেন।

জান্নাতবাসীদের মাঝে কোন হিংসা বিদ্বেষ থাকবে না

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, একথা পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত যে, জান্নাতবাসীদের স্তর ও মর্যাদা বিভিন্ন প্রকারের হবে। এক স্তরের সাথে অপর স্তরের বিরাট ব্যবধান থাকবে। এক্ষেত্রে মানুষের স্বাভাবিক চাহিদা হলো, তুলনামূলক একটু নিম্নস্তরের লোকেরা উপরের স্তরের লোকদের প্রতি হিংসা পোষণ করবে। তা না হলেও অন্ততঃ 'গিবতা' প্রকাশ করবে। অর্থাত নিম্নস্তরের ব্যক্তি কামনা করবে যে, আমিও যদি অনুরূপ উচ্চস্তরের লোক হতে পারতাম। এর দ্বারা অন্তরে এক ধরনের আফসোস ও অনুশোচনার সৃষ্টি হয়ে থাকে। জান্নাতে কোনরূপ হিংসা বিদ্বেষ তো মোটেই হবে না, কারণ হিংসা করা হারাম। তবে প্রশ্ন থেকে যায় যে, যদি 'গিবতা' হয় তবে তার মধ্যেও তো এক ধরনের দুঃখ ও অনুশোচনা রয়েছে। অথচ জান্নাত হবে সকল দুঃখ কষ্ট ও অনুশোচনামুক্ত। সেখানে কারো কোন দুঃখ-কষ্ট থাকা উচিত নয়। হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, জান্নাতের অবস্থাকে দুনিয়ার অবস্থার সাথে তুলনা করা চলে না। সেখানে মহান আল্লাহ সকলের মাঝে আপন প্রাপ্তির উপর সন্তুষ্ট থাকার এক বিশেষ গুণ সৃষ্টি করে দিবেন। ফলে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

প্রত্যেক জান্নাতবাসী নিজের অবস্থার উপর সন্তুষ্ট ও আনন্দিত থাকবে। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতবাসীদের দেখে তাদের মনে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা বা অস্থিরতা সৃষ্টি হবে না।

দ্বন্দ্ব সৃষ্টির জন্য ফাতাওয়া গ্রহণ প্রসঙ্গে

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, অনেক লোক এমন আছে, যাদের নিজেদের কোন খবর নেই। হালাল–হারামের কোন পার্থক্য না করে যা পায় তাই ভোগ করে। অথচ অন্য লোকের ভুল ধরে তাদের সাথে ঝগড়া–বিবাদ ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করার জন্য আলেমগণের কাছ থেকে ফাতাওয়া সংগ্রহ করে বেড়ায়। তাই কোন ব্যক্তি সম্পর্কে আমার যখন এ ধরনের ধারণা সৃষ্টি হয় তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখী হয়েছেন? এবং আমল করার উদ্দেশ্যেই কি আপনি এ বিষয়ে জানতে চেয়েছেন? নাকি এর পিছনে আপনার অন্য কোন উদ্দেশ্য রয়েছে? এর জবাবে সে যদি অন্য কোন উদ্দেশ্যের কথা বা অন্য কোন ব্যক্তিকে পাকড়াও করার কথা বলে, তবে আমি তার সে প্রশ্নের উত্তর দেয়া থেকে বিরত থাকি। এবং তাকে বলে দেই—বিষয়টি যার তাকেই পাঠিয়ে দিন অথবা সে নিজে চিঠিপত্রের মাধ্যমে আমার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে বিষয়টি জেনে নিবে।

চাকরকেও তার সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেয়া জায়েয নয়

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, এ বিষয়টি আমি খুব লক্ষ্য রাখি যাতে কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার দ্বারা কোন কাজ নেয়া না হয়। আমি আমার নিজের কর্মচারীদেরকেও একথা বলে দিয়ে থাকি যে, তোমাদের উপর যে কাজটি কঠিন মনে হয় সাথে সাথে তা আমাকে বলে দিবে যে, এটি আমার দ্বারা মুশকিল হবে, আমি সে কাজটির জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে বেয়াদবী আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে বড়ই ক্ষতিকর

হযরত গাংগুহী (রহঃ) বর্ণনা করেন, সূরায়ে ইউসুফের কাব্যাকারে ব্যাখ্যাতা, 'সূরায়ে ইউসুফ মানযুম' নামক গ্রন্থের লেখক আশরাফ মিয়া

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হযরত নূর মুহাম্মাদ মিয়াজী সাহেব (রহঃ) সম্পর্কে কিছু বেয়াদবীমূলক কথা বলতো। এরপর এ ব্যাপারে যখন সতর্ক হলো তখন সে তাওবা করলো এবং হযরত মিয়াজী সাহেব (রহঃ)–এর খিদমতে বাই'আত হওয়ার আবেদন করলো। হযরত মিয়াজী (রহঃ) তাকে বাই'আত করে নিলেন। কিন্তু এর কিছুদিন পর হযরত মিয়াজী সাহেব (রহঃ) ঐ লোকটিকে একাকী ডেকে বললেন, মিয়া আশরাফ! এই তরীকতের লাইনের ভিত্তি ইখলাস ও নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ কারণে আমি কথাটি তোমার কাছে গোপন রাখতে চাই না। কথাটি হলো, আমি যখন রুহানী ফয়েয দানের লক্ষ্যে তোমার প্রতি মনোনিবেশ করি, তখন তুমি পূর্বে আমার প্রতি যেসব কটুক্তি করেছিলে সেগুলো আমার সামনে এসে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আমি যতই তোমাকে ফায়েদা পৌঁছাবার চেষ্টা করি কোনক্রমেই আমি তাতে সক্ষম হই না। সুতরাং তোমার জন্য উত্তম হলো, তুমি অন্য কোন শাইখের হাতে বাই'আত হয়ে যাও, আমিও তোমার ব্যাপারে সুপারিশ করে দিব।

এখানে অধম সংকলকের কথা হলো, এ ধরনের স্পষ্টবাদী কথা কোন হিংসা বা বিদ্বেষ নয় বরং এটি একটি অনিচ্ছাকৃত বিষয়, যা মানুষের প্রতি বিধিবদ্ধ নয় বা যে ব্যাপারে মানুষ দায়বদ্ধ নয়। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হামযা (রাযিঃ)–এর হত্যাকারী হযরত ওয়াহশী (রাযিঃ)কে মুসলমান হওয়ার পরেও এ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তুমি আমার সামনে এসো না। কারণ, তোমাকে দেখলেই আমার হযরত হামযা (রাযিঃ)–এর কথা নতুন করে অন্তরে জেগে উঠে। আর এমনটি তোমার জন্য ক্ষতিকর।

কাফের দু'আ করলেও তা কবুল হতে পারে

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, পবিত্র কুরআনের আয়াত

وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلَالٍ

(অর্থাত, কাফেরদের দু'আ কেবল নিষ্ফলই হবে)–এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করে একথা বুঝে নেয়া ঠিক নয় যে, কাফেরদের দু'আ কবুল হয় না। কারণ এ আয়াত হলো পরকালের ব্যাপারে। সেখানে কারো কোন দু'আই কবুল হবে না। দুনিয়ায় আল্লাহ তা'আলা সকলের দু'আই কবুল

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

করে থাকেন। এমনকি সবচাইতে বড় কাফের ইবলিসের দু'আও তিনি কবুল করেছেন। তাও এমন অদ্ভুদ ধরনের দু'আ যে, হে আল্লাহ! আমাকে আপনি কিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘ হায়াত দান করুন। যাতে আমি আদম সন্তানদের পথভ্রষ্ট করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারি। আল্লাহ পাক তার এহেন অযৌক্তিক দু'আকেও কবুল করে নেন এবং ঘোষণা করেন— إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ অর্থাত, নিঃসন্দেহে তোমার দু'আ মনযূর করা হলো।

তাসাওউফের মূল কথা হলো নিজেকে (আমিত্ব) নিঃশেষ করে দেয়া

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, লোকেরা এই তরীকতের লাইনে 'সালেক' (সাধক) হওয়াকেই বড় কিছু মনে করে থাকে। কিন্তু প্রকৃত কথা হলো, সালেক হওয়া আসল বিষয় নয় বরং আসল বিষয় হলো 'হালেক' হওয়া (নিজেকে (আমিত্ব) নিঃশেষ করে দেয়া) অর্থাত, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মিটিয়ে দেয়া। আর সে মিটিয়ে দেয়াটাও এমন পর্যায়ে হতে হবে যাতে সে মিটিয়ে দেয়াটাও অন্তর থেকে মিটে যায় এবং মনের মাঝে এমন খেয়ালও না থাকে যে, আমি নিজেকে মিটিয়ে দিয়েছি। যেমন প্রকৃত ও গভীর ঘুম তো তাকেই বলে যেখানে ঘুমন্ত ব্যক্তির নিজের ঘুমেরও কোন খবর থাকে না এমন অবস্থা না হলে তো সেটা ঘুমই হলো না, সেটা হয় তন্দ্রা। মাওলানা রুমী (রহঃ) চমৎকার বলেছেন—

فہم وخاطر تیز کردن نیست راہ!

جز شکستہ می نگیرد فضل شاہ

অর্থাত, নিজের জ্ঞানবুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ ও সমৃদ্ধ করাই প্রকৃত সফলতার পথ নয়, বরং ভগ্ন হৃদয়ে নিজেকে মিটিয়ে দেয়া ছাড়া আল্লাহ পাকের দয়া-অনুগ্রহ লাভ করা যায় না।

হযরত থানবী (রহঃ) এখানে ইবাদত এবং ইতা'আতের (বাধ্যগত হওয়ার) আসল রূহ বা প্রকৃত বস্তুর দিকেই পথ প্রদর্শন করেছেন। অর্থাত ইলমী ও আমলী পূর্ণতা যতই হোক, সাধনা মুজাহাদা ও ইবাদত যত বেশী পরিমাণেই থাকুক এগুলো মূলতঃ প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ জাল্লা শানুহুকে রাযী ও খুশি করা। আর আল্লাহ

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

পাকের সন্তুষ্টি মানুষের নিজের অপারগতা, নম্রতা, ভগ্ন হৃদয়তার অনুভূতির মধ্যেই নিহিত। একজন মানুষ সবকিছু করার পরও নিজেকে নিতান্ত অপারগ মনে করবে এবং নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য মহান আল্লাহর দরবারে ইস্তিগফার করতে থাকবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)-এর সম পরিমাণ ইবাদত-বন্দেগী করতে পারে এমন লোক কে আছে? তাদেরও আমল ছিলো যে, সারা রাত জেগে আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগী করার পরও তাঁরা ইস্তিগফার করাকে আবশ্যকীয় মনে করতেন।

পবিত্র কুরআনের ইরশাদ—

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

অর্থাত, আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দা ঐসব লোক, যারা রাতের সিংহভাগ সময় ইবাদত বন্দেগীর মধ্য দিয়ে কাটায় এবং শেষ রাতে আল্লাহ পাকের দরবারে ইস্তিগফার করে।

এ আয়াতের মধ্যে আলেম, বক্তা ও লেখকগণের জন্য এবং যারাই দ্বীন ও ইসলামের ব্যাপারে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ রয়েছে। আর তা হলো, দ্বীনের কাজ করতে পারা কোন গর্ব বা অহংকার করার বিষয় নয় বরং ভাল কাজে কৃতিত্ব অর্জন করা বা কোন নেক আমল সম্পাদন করতে পারাকে মহান আল্লাহ পাকের একটি বিশেষ অনুদান মনে করে সে ব্যাপারে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করতে থাকবে। এবং সে নেক আমলগুলো মহান আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য ও বিশালত্ব অনুযায়ী না হওয়ার যে আবশ্যকীয় ত্রুটি থেকে যায় সে জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে তাওবা-ইস্তিগফার করতে হবে।

বাতেনী রোগের চিকিৎসা না করিয়ে শুধু যিকির-শোগল ক্ষতিকর

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, যার পেটের মধ্যে রোগ জীবাণু বিদ্যমান রয়েছে, তাকে যদি উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয় তবে তার রোগই বরং বৃদ্ধি পাবে। এজন্য প্রথমে তার পেটকে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। তাকে জোলাপ ধরনের কিছু দিয়ে তার পেট পরিষ্কার করে এরপর

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

তাকে শক্তিবর্ধক উন্নতমানের খাবার দিতে হবে তবেই তার স্বাস্থ্যের জন্য সেটা উপকারী হবে।

অনুরূপভাবে কারো মাঝে যদি বাতেনী রোগ অহংকার, তাকাব্বুরী এবং লোক দেখানো মনোভাব বিদ্যমান থাকে, এমতাবস্থায় অধিক পরিমাণে যিকির ও ওযীফা পাঠ কোন কোন ক্ষেত্রে তার ওসব বাতেনী রোগকে আরো বৃদ্ধি করে দেয়। এখানেও মুজাহাদার ক্ষেত্রে বাতেনী 'মসহিল' (আভ্যন্তরীণ ব্যাধি নিরামক) ব্যবস্থাপত্রের প্রয়োজন। যাতে সে নেক আমল করে অহংকার ও তাকাব্বুরীর মধ্যে লিপ্ত হয়ে না পড়ে।

সারকথা হলো, বাতেনী রোগের সংশোধনী আগে করে নেয়া উচিত। এরপর যিকির ও ওযীফা দেয়া উচিত।

পূর্ব যুগের বুযুর্গানে দ্বীনের মাঝে এ বিষয়টির যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। বর্তমানে লোকদের মাঝে সে ধরনের লক্ষ্য ও একাগ্রতা নেই বিধায় তারা মাশায়েখগণের খেদমতে থেকে যিকির-শোগলে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও অনেকের ইসলাহ ও আত্মিক সংশোধন হয় না। বাতেনী রোগ যা প্রকৃতপক্ষে কবীরা গুনাহ তা যেমনটি পূর্বে ছিলো তেমনই থেকে যায়। তারা দু'চারটা ভাল খাব দেখেই নিজেদেরকে ওলী-বুযুর্গ মনে করতে থাকে। অথচ গুনাহের কাজের অভ্যাস থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তি ওলী-বুযুর্গ কিংবা আল্লাহর দরবারে মকবুল কস্মিনকালেও হতে পারে না।

তরীকতের আসল উদ্দেশ্য মানুষের বাতেন সংশোধন করা

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, যে কোন ক্ষেত্রেই যখন রসম ও রেওয়াজ প্রাধান্য লাভ করে তখন প্রকৃত বিষয়টি ঢাকা পড়ে যায়। আধ্যাত্মিকতা ও তরীকতের লাইনে প্রকৃত উদ্দেশ্য শুধু যিকির শোগল আর ওযীফা নয়। তবে এগুলো আসল উদ্দেশ্য অর্জনের পথে সহায়ক তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ লাইনে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের বাতেনী আমলকে সংশোধন করা, যতক্ষণ এই উদ্দেশ্য অর্জিত না হবে ততক্ষণ যিকির-শোগল ও ওযীফার পূর্ণ ফায়েদাও লাভ হবে না। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে এসব যিকির-শোগল দ্বারা অহংকার ও তাকাব্বুরীতে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণে তা ক্ষতিকর বলেও বিবেচিত হয়।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, যদি কেউ একথা বলে যে, বাতেনী

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

আমল সংশোধনের পদ্ধতিতো তাসাওউফ বা তরীকতের কিতাবসমূহে লিখা রয়েছে, সেসব লিখা পড়েইতো মানুষ তার বাতেনকে সংশোধন করে নিতে পারে, এক্ষেত্রে আবার শাইখের কি প্রয়োজন? তবে তার জবাব হলো, মানুষের শারীরিক বিভিন্ন রোগ এবং তার চিকিৎসার কথাও তো বিভিন্ন ডাক্তারী বইপুস্তকে পুরোপুরিভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে এর পরেও আবার ডাক্তার কবিরাজের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয় কেন? এখানে যে কারণে ডাক্তারের প্রয়োজন রয়েছে, ঠিক সে কারণেই আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও শাইখের প্রয়োজন রয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, শারীরিক রোগের দ্বারা মানুষের শরীরে যে কষ্ট হয় তা রোগাক্রান্ত ব্যক্তি নিজেও অনুভব করতে পারে আর সেজন্যই সে ডাক্তার কবিরাজ তালাশ করে। এখানে রোগের মূল কারণ নির্ধারণ এবং তার জন্য উপযুক্ত ঔষধ নির্বাচনের জন্য ডাক্তারের প্রয়োজন হয়। পক্ষান্তরে বাতেনী রোগ যাকে পরিভাষায় 'রাযায়েল' (মন্দ স্বভাব) বলা হয়ে থাকে যেমন, অহংকার, আত্মগরিমা, তাকাব্বুরী, লৌকিকতা, দুনিয়ার লোভ, হিংসা ইত্যাদি এগুলো এমন গোপন রোগ যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নিজেরও এসব রোগের অনুভূতি পর্যন্ত থাকে না, সে নিজেও বুঝতে পারে না যে, আমি রোগাক্রান্ত। এ কারণে কোন ঔষধ বা চিকিৎসা গ্রহণের প্রতি তার খেয়ালও হয় না। একজন কামেল শাইখ যিনি বাতেনী রোগের একজন দক্ষ ডাক্তার হয়ে থাকেন তাকে এ কাজটিও করতে হয় যে, তিনি বাতেনী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে একথা বলে দিবেন যে, তোমার মধ্যে অমুক রোগ রয়েছে।

ডাক্তার কবিরাজদের সাধারণতঃ দুটি কাজ। একটি হলো রোগ নির্ধারণ আর অপরটি হচ্ছে ঔষধ নির্বাচন। কিন্তু এ বাতেনী রোগের ডাক্তারদের তৃতীয় আরো একটি কাজ করতে হয়। তাহলো, নিজের রোগ সম্পর্কে অজ্ঞ ও অসচেতন রুগী যে নিজেকে সুস্থ মনে করে থাকে তাকে তার রোগ সম্পর্কেও অবগত করাতে হয়। বর্তমানে বেশীর ভাগ লোকের অবস্থাই এরূপ। কিতাবপত্র খুব ব্যাপক হয়ে যাওয়ার কারণে এবং গাফলতী ও অসচেতনতার উপকরণ অধিক হয়ে যাওয়ার ফলে লোকেরা সাধারণতঃ নিজেদের বাতেনী রোগের প্রতি লক্ষ্যই করে না। সাধারণ লোকের কথা আর কি বলবো, খাসভাবে উলামায়ে কিরামের মধ্যেও

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

অনেকেই এর মধ্যে নিমজ্জিত। কারো মাঝে বাতেনী রোগ আছে কিনা সেটা অবগত হওয়া এবং সে ব্যাপারে সতর্কতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন বুযুর্গানে দ্বীনের সংস্পর্শ, তাদের কিতাবপত্র পাঠ করা এবং তাদের পক্ষ থেকে সতর্কী করণ। এছাড়া বাতেনী রোগ থেকে সতর্ক হওয়ার আর কোন পথ নেই।

ইসলাহের বিশেষ কিছু আদব

ঢাকার নবাব সলীমুল্লাহ সাহেব হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)-এর খুব ভক্ত ছিলেন। তার দিলের আকাংখা ছিলো, কোনভাবে হযরত থানবী (রহঃ)কে একবার ঢাকায় নিয়ে আসা। যাতে ঢাকার সকল শ্রেণী ও নবাব গোত্রের লোকেরাসহ সাধারণ মুসলমানগণ হযরত থানবী (রহঃ) থেকে উপকৃত হতে পারে। নবাব সাহেবের দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর বেশ কিছু শর্ত আরোপ করে হযরত থানবী (রহঃ) ঢাকা আগমনে সম্মত হলেন। সে শর্তসমূহের মাঝে একটি শর্ত এটিও ছিলো যে, আমাকে কোন হাদিয়া দেয়া যাবে না। অপর একটি শর্ত ছিলো এই যে, আমার দ্বারা নবাবজাদা এবং আমীর উমারাদের জন্য বিশেষভাবে কোন মজলিস করানো যাবে না। অর্থাত, আমার কোন মজলিস এমন হবে না যেখানে শুধু নবাব পরিবারের সদস্য ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গই উপস্থিত থাকবেন যেখানে সাধারণ লোকদের প্রবেশের অনুমতি থাকবে না। মজলিস হবে সকলের জন্য উন্মুক্ত। সেখানে সাধারণ গরীব লোকেরাও উপস্থিত থাকবে আবার নবাব আমীরগণও উপস্থিত থাকবেন। আমীর বা নেতৃস্থানীয় লোকদের জন্য কোন বিশেষ বা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকবে না। হযরত থানবী (রহঃ)কে ঢাকায় আনার অত্যধিক আগ্রহ ও আকাংখা হেতু নবাব সলীমুল্লাহ সাহেব সকল শর্তই মেনে নিলেন। নবাব সাহেবের ইচ্ছা হলো হযরত থানবী (রহঃ)কে তিনি এমন রাজকীয়ভাবে সম্বর্ধনা দিবেন, যেমনিভাবে রাষ্ট্রীয় বিশেষ অতিথিবর্গকে সম্বর্ধনা দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি জানতেন যে, হযরত থানবী (রহঃ)-এর অনুমতি ছাড়া যদি কোন কাজ করা হয় তবে তিনি সেখান থেকেই ফিরে চলে যাবেন। তাই তিনি টেলিগ্রাফের মাধ্যমে হযরত থানবী (রহঃ)-এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। হযরত থানবী (রহঃ) তার জবাবে বললেন 'এমনটি শরীয়ত পরিপন্থী।' এরপর নবাব সাহেব দ্বিতীয় দফা টেলিগ্রাফ করে হযরত থানবী

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

(রহঃ)–এর খেদমতে আরয করলেন, খুব সাদাসিধা ও অনাড়ম্বরভাবে বিপুল পরিমাণ লোকের সমাগম ঘটানোর অনুমতি প্রার্থনা করছি। এর জবাবে হযরত থানবী (রহঃ) জানালেন 'এমনটি আমার তবীয়ত পরিপন্থী' (আমার রুচি বিরুদ্ধ)। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে অত্যন্ত সাধারণভাবে হযরত থানবী (রহঃ)কে এস্তেকবাল করা হলো।

হযরত থানবী (রহঃ) ঢাকায় অবস্থানকালীন সময়ে তাঁকে কোনরূপ হাদিয়া না দেয়া এবং বিভিন্ন মজলিসে নবাবদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা না থাকার যে শর্ত ছিলো—এ দু'টি শর্তই রক্ষা করা নবাব সাহেবের জন্য খুব কঠিন ছিলো। এজন্য নবাব সাহেব একটি বিশেষ কৌশল অবলম্বন করলেন। কৌশলটি হলো, নবাব গোত্রীয় ছোট বাচ্চাদের দ্বীনী শিক্ষার সূচনা হযরত থানবী (রহঃ)কে দ্বারা করানো হলো। নবাবী প্রথামতে সে অনুষ্ঠানে তাদের আত্মীয়–স্বজন ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে খুব শান–শওকতের সাথে দাওয়াত করা হলো। এরপর নবাব সাহেব হযরত থানবী (রহঃ)–এর কাছে এসে আরয করলেন যে, আমাদের গোত্রে বংশগতভাবে এ নিয়ম চলে আসছে যে, এ জাতীয় অনুষ্ঠানে নিজেদের মুরব্বী ও বুযুর্গ ব্যক্তিগণের খেদমতে কিছু হাদিয়া পেশ করা হয়। আমি শর্ত অনুযায়ী আমার ওয়াদা রক্ষা করতে প্রস্তুত। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে আমি যদি কিছু হাদিয়া পেশ না করি তবে তা বংশগতভাবে আমার জন্য একটা অপমানের কারণ হবে। যদি হযরত এ ক্ষেত্রটাকে উল্লিখিত শর্তের বাইরে বিবেচনা করে এই হাদিয়া গ্রহণ করেন, তবে আমি অপমানের হাত থেকে বেঁচে যেতে পারি। এ কথা শুনে হযরত থানবী (রহঃ)–এর বুঝতে বাকী রইলো না যে, এত সব ধান্ধা শুধু কিছু হাদিয়া দেয়ার জন্যই করা হয়েছে।

হযরত থানবী (রহঃ) বললেন, এতে অসুবিধার কি আছে? আপনি আপনার বংশীয় লোক ও বন্ধু–বান্ধবের সামনে আমাকে যা হাদিয়া দিতে চান দিবেন। আমি সকলের সামনে তা গ্রহণ করে নিব। কিন্তু পরে একাকী আপনাকে সেগুলো আবার ফেরত নিতে হবে। এতে একদিকে আপনার যেমন কোন অপমান হলো না, অন্যদিকে আমার নিয়মতান্ত্রিকতাও রক্ষা পেলো। একথা শুনে নবাব সাহেব হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং নিজের পরিকল্পনায় ব্যর্থ হলেন।

অধম সংকলক বলছে, এর পরবর্তী ঘটনা আমার স্মরণ নেই। নবাব

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সাহেব কি হাদিয়া পেশ করে এরপর শর্ত মোতাবেক একাকী তা ফেরত নিয়েছিলেন নাকি নিজের কৌশল কার্যকরী হচ্ছে না দেখে হাদিয়া দেয়ার ইচ্ছাই ছেড়ে দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় শর্ত যেটি ছিলো যে, মজলিসে নবাবজাদাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকতে পারবে না। এ শর্তটি রক্ষা করাও নবাব সাহেবের জন্য এ কারণে কষ্টকর ছিলো যে, নবাব সন্তানেরা নবাবী স্বভাব মতে সাধারণ লোক এবং গরীবদের সাথে এসে মিলেঝিলে বসাকে আপন সম্মানের পরিপন্থী মনে করতো। ফলে তারা সাধারণ মজলিসে উপস্থিত হতো না। যার কারণে তারা হযরত থানবী (রহঃ)–এর কাছ থেকে ফায়দা ও বরকত লাভ থেকে বঞ্চিত থাকতো। নবাব সাহেবও নিজের মেনে নেয়া শর্তের কারণে মজলিসে কোন বিশেষ ব্যবস্থা করতে পারছিলেন না।

এবারও নবাব সাহেব একটি কৌশল খুঁজে বের করলেন। তা হলো, শহর থেকে পনেরো বিশ মাইল দূরে কোন একটি বাগানে হযরত থানবী (রহঃ)কে নিয়ে যাওয়ার প্রোগ্রাম তৈরী করলেন এবং সকল নবাবজাদা ও নেতৃস্থানীয় লোকদের সেখানে একত্রিত করলেন। বিষয়টি খুব গোপনে করা হলো। এ ব্যাপারটি মোটেও প্রচার করা হলো না। এরপর হযরত থানবী (রহঃ) সেখানে গেলেন। কিছু গরীব ও সাধারণ লোক খবর পেয়ে তারাও ঐ স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলো। এরপর হযরত থানবী (রহঃ)–এর শর্ত মোতাবেক গরীব–আমীর একইভাবে একই মজলিসে বসলো। এবার হযরত থানবী (রহঃ)–এর জন্য ওয়াজের আলোচ্য বিষয়ও নির্ধারিত হয়ে গেলো। কারণ, শুধু ওয়াজ করার জন্য হযরত থানবী (রহঃ) কখনোই ওয়াজ করেননি বরং পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতার প্রয়োজন এবং শ্রোতাদের বিশেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি ওয়াজের কোন একটা বিষয় নির্ধারণ করে নিতেন। আর এমনটি করার জন্য অনেক চিন্তা–ভাবনা আবার ক্ষেত্র বিশেষে এলাকার হাল–অবস্থা জেনে নেয়ারও প্রয়োজন হতো। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তেমন কিছু প্রয়োজন হলো না। বরং এখানে আলোচ্য বিষয় 'নেতৃত্বের অহমিকা ও তার সংশোধন' নির্ধারিত হয়ে গেলো। সেখানে হযরত থানবী (রহঃ) যে বয়ান দিয়েছিলেন তা তো ছিল বেশ দীর্ঘ। যা এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে সে বয়ানের তাৎক্ষণিক সুফল এই প্রকাশ পেল যে, নবাব সন্তানেরা এবং গরীব লোকদের থেকে যারা পৃথক থাকতে চায় এমন আমীর পর্যায়ের লোকেরা

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

তাদের ভুল বুঝতে পারলো এবং সাধারণ মজলিসে অনুপস্থিত থাকার মানসিকতাটাই শেষ হয়ে গেলো। এরপর থেকে হযরতের (রহঃ) সাধারণ মজলিসসমূহেও সকলে উপস্থিত হতে থাকলো।

এটা ছিলো হযরত থানবী (রহঃ)–এর দাওয়াত ও তাবলীগের এমন বিজ্ঞজনোচিত ও নবী (আঃ)গণের অনুসৃত পদ্ধতি যার মাধ্যমে অনেক বড় বড় অহংকারী ও মুতাকাব্বিরদের মাঝে সংশোধনী এসে তারা সোজা হয়েছে।

হযরত থানবী (রহঃ) বলতেন, আমি জানি যে, হাদিয়া কবুল করা সুন্নাত আর এ কারণে অধিকাংশ হাদিয়া কবুল করেও থাকি। তবে শর্ত হলো, সে হাদিয়া কবুল করার দ্বারা আমার নিজের নফসের বা হাদিয়া দানকারী ব্যক্তির নফসের যাতে কোন দ্বীনী ক্ষতি না হয়। নবাব এবং আমীর পর্যায়ের লোকদের ইসলাহের জন্য একটি আবশ্যকীয় বিষয় হলো, তাদের অন্তরে একথার দৃঢ় বিশ্বাস বদ্ধমূল থাকতে হবে যে, এখানে আমাদের টাকা–পয়সার কারণে কোন বিশেষ নৈকট্য বা বৈশিষ্ট্য অর্জিত হবে না বরং শুধু আমলের সংশোধন এবং দ্বীনী আখলাকের মাধ্যমেই বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। এ মনোভাব সৃষ্টি করা না গেলে তাদের সংশোধন ও ইসলাহ অত্যন্তই দুঃসাধ্য। এ পর্যায়ের লোকদের সাথে তোশামোদ ও খোশামোদের নীতি অবলম্বন করা যেমন দুরস্ত নয় তেমনি অবজ্ঞা ও কঠোরতার নীতি অবলম্বন করাও সুন্নাতের পরিপন্থী এবং এমনটি দাওয়াতের আদব লংঘন করার শামিল। বর্তমানে দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত উম্মতের মুসলেহ এবং শাইখগণ আমীর ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ব্যাপারে এ ধরনের বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়ে পড়েন বিধায় তেমন কোন ভাল ফল হয় না বরং অনেক ক্ষেত্রে ফল হয় উল্টো।

উন্নত পোশাক পরিধান করা প্রসঙ্গে

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, কেউ যদি ভাল ও উন্নত পোশাক পরিধান করে নিজের মনতুষ্টির জন্য তাহলে তা জায়েয। কিন্তু যদি এর দ্বারা আত্মগরিমা ও অহংকার সৃষ্টি হয় তবে তা জায়েয হবে না। কাপড় পরার দ্বারা মনতুষ্টি উদ্দেশ্য না অহংকার প্রকাশ করা লক্ষ্য—এটা বুঝার উপায় হলো, যে ব্যক্তি একাকীত্বে ও লোকালয়ে কোন পার্থক্য করে না বরং সর্বাবস্থায় ভাল পোশাক পরিধান করে তবে এটাই প্রমাণ যে, তার

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

অন্তর অহংকারমুক্ত ও পবিত্র। এমনটিতে কোন ক্ষতি নেই। আর যদি এ দুই অবস্থায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, অর্থাত সে যদি একাকিত্বে সাধারণ পোশাক পরিধান করে আর লোকালয়ে উন্নত পোশাক পরিধান করে, তবে এটা একথার প্রমাণ যে, তার মাঝে আত্মগরিমা ও অহংকার রয়েছে। আর এমনটি হলো হারাম।

'কাশফ' মূলতঃ কোন বুযুর্গী নয়

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, গায়েবী বস্তুসমূহ কিংবা ভবিষ্যৎ কোন বিষয়ে আগাম কিছু বলতে পারা বা কাশফ হওয়া দ্বীনী ব্যাপারে পূর্ণতার যেমন কোন প্রমাণ নয় তেমনি এমনটি আল্লাহ পাকের নৈকট্যপ্রাপ্তিরও কোন নিদর্শন নয়। এ ধরনের কাশফ হওয়ার জন্য মুসলমান হওয়া কিংবা সুস্থ জ্ঞানের অধিকারী হওয়াও শর্ত নয় বরং এমনটি অমুসলিমের এবং পাগলেরও হতে পারে।

ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'শরহে আসবাব'–এর মধ্যে মস্তিস্কের রোগ অধ্যায়ে লিখেছে, অনেক পাগলেরও কাশফ বা ভবিষ্যত বাণী শুদ্ধ হয়ে যায়। আর কাফের এবং ফাসেকদের কাশফ শুদ্ধ হওয়ার তো শত শত ঘটনা দুনিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধ রয়েছে।

এক ব্যক্তি ছিলো, যার নাম কুদরতুল্লাহ। তার একবার অবস্থা এই হলো যে, এমনিতেই তার কবরের কাশফ হতে শুরু করলো এবং তার অধিকাংশ কাশফই শুদ্ধ হতে থাকলো। কিন্তু সে ঠিকমত নামাযও পড়তো না। সে একবার এক কবরের কাছে গিয়ে বললো, এ কবরের লোকটি কবরের মধ্যে দাঁড়িয়ে চন্দন কাঠের তাসবীহ পাঠ করছে। বিষয়টি যখন তাহকীক করা হলো এবং এ ব্যাপারে খোঁজ–খবর নেয়া হলো তখন ঐ কবরবাসীর এক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি জানালো, আসলেই আমার ঐ কবরবাসী বন্ধু চন্দন কাঠের তাসবীহ বেশী পসন্দ করতেন এবং সর্বদা তা সাথেই রাখতেন এবং তিনি ইন্তেকালের পূর্বে আমাকে বলে রেখেছিলেন যে, আমার দাফনের সময় আমার কবরের মধ্যে চন্দন কাঠের এই তাসবীহ রেখে দিবেন। তার সে কথামত ঐ তাসবীহ তার কবরের মধ্যে রেখে দেয়া হয়েছিলো।

একবার ঐ কুদরতুল্লাহ নামের লোকটি একটি কবরের কাছে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে শুরু করলো। হঠাৎ সে চমকে উঠে বললো, এ কবরের

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

মুর্দার ব্যক্তির আযাব হচ্ছে। আর তার আযাবের কারণ হলো, তার কাছে এক ব্যক্তির কিছু আমানত ছিলো। যখন সে লোকটি তার আমানতের বস্তু ফেরত চাইলো, তখন সে তার সাথে প্রতারণা করে তা তাকে ফেরত দেয়নি। অথচ এই কুদরতুল্লাহ সাহেব ঐ মুর্দা ব্যক্তি সম্পর্কে ইতিপূর্বে কিছুই জানতো না। এ বিষয়টি সম্পর্কে যখন খোঁজ-খবর নেয়া হলো তখন ঐ মুর্দার ব্যক্তির স্ত্রী তার স্বামীর আমানতের খেয়ানত করার বিষয়টি স্বীকার করলো। সে বললো, হাঁ ঐ কবরের ব্যক্তি আমার স্বামী। সে অমুক ব্যক্তির আমানত গ্রহণ করে তা ফেরত দিতে অস্বীকার করেছিলো।

সারকথা হলো, অদৃশ্য বস্তুসমূহের এসব কাশফ শরীরের একটি অদৃশ্য শক্তির অধীনে হয়ে থাকে। যা কাফের, ফাসেক ও পাগল ব্যক্তিরও হতে পারে এবং তারাও বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে কাশফের মাধ্যমে অনেক কিছু জানতে পারে এবং তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুদ্ধও হয়ে থাকে। সুতরাং এসব জিনিসের কারণে কাউকে আল্লাহ পাকের নৈকট্যপ্রাপ্ত কিংবা বুযুর্গ ব্যক্তি বলে মনে করা যাবে না। বর্তমানে লোকেরা আশ্চর্য বস্তুকে খুব পসন্দ করে। কেউ কোন অদৃশ্য বিষয়ে কিছু বলে দিতে পারলেই লোকেরা তার ভক্ত হয়ে যায়। অথচ এ ধরনের অদৃশ্য সংবাদ দাতাদের মধ্যে অনেকে নিজেও হয়ে থাকে পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ এবং অন্যকেও তারা অনুরূপ পথভ্রষ্ট করে দেয়।

হক-বাতিল এবং গ্রহণযোগ্য ও উপেক্ষিত হওয়ার প্রকৃত মাপকাঠি হচ্ছে, শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসরণ। এ মৌলিক মাপকাঠির বিচারে যে সঠিক ও যথার্থ বলে বিবেচিত না হবে সে কখনো ওলী বা অনুসরণযোগ্য নয় বরং পথভ্রষ্ট-গোমরাহ। এক্ষেত্রে তার যতই কাশফ হোক না কেন এবং তা যতই শুদ্ধ ও সঠিক হোক না কেন তা সে ব্যক্তির গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে ন্যূনতম প্রমাণও বহন করবে না।

অসহায়ত্ব ও দুর্বলতা একটি নিয়ামত

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, দুর্বল, অসহায় ও সহায় সম্বলহীন ব্যক্তির ব্যথিত ও অস্থির হওয়ার পরিবর্তে খুশি হওয়া উচিত। কারণ, একটা স্বাভাবিক নিয়ম হচ্ছে, পিতা-মাতা দুর্বল সন্তানের হেফাযতের ব্যাপারে অধিক লক্ষ্য নিয়ে থাকেন।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

অধম সংকলক বলছে, মহান আল্লাহ যিনি সমস্ত সৃষ্টি জীবের মুরব্বী সুতরাং তাঁর কুদরতী নযরও ঐ সকল বান্দাদের প্রতি বেশী থাকবে, যারা দুর্বল ও সহায় সম্বলহীন। একটি বর্ণনায় এসেছে—

انا عند المنكسرة قلوبهم

অর্থাত,আমি ঐ সকল লোকদের কাছে থাকি যারা ভগ্ন হৃদয় বিশিষ্ট।

আল্লামা রুমী (রহঃ) কত সুন্দর বলেছেন—

طفل تا گیراں وتا پویاں نبود　　مرکبش جز گردن بابا نبود

অর্থাত, সন্তান যতক্ষণ নিজে চলতে ফিরতে না শিখে ততক্ষণ বাপের কাঁধই হয় তার একমাত্র সাওয়ারী।

অন্যত্র তিনি চমৎকার বলেছেন—

کاہلم من سایہ خسپم در وجود　　خفتم اندر سایۂ احسان وجود

کاہلاں وسایہ خسپاں را مگر　　روزئے بنہادۂ نی نوع دگر

طفل را چوں پا نباشد مادرش　　آید و ریزد وظیفہ بر سرش

چوں زمیں را پا نباشد جود تو　　ابر را راند بسوئے او دو تو

অর্থাত, (মর্মার্থ) আমি দুর্বল, ছায়ার কোলই হলো আমার আশ্রয়। অনুগ্রহ আর বদান্যতার ছায়াতেই আমি আরামে আছি। আমার মত দুর্বল আর ছায়ায় যারা শুয়ে থাকে, তাদের জন্যই তো খোরাক এনে সামনে হাজির করা হয়, অন্যদের জন্য নয়। ছোট শিশুর যখন চলার ক্ষমতা হয় না তখন তার খাবার নিয়ে তার মা–ই তার সিথানে হাজির হয়ে যায়। ঠিক তদ্রূপ জমিনেরও পা নেই বিধায় হে প্রভু! তোমার মেঘমালাকে তুমিই বৃষ্টির নেয়ামত নিয়ে পাঠিয়ে থাকো।

শক্তি ও দুর্বলতা, স্বাবলম্বীতা ও সহায় সম্বলহীনতা সবই মহান স্রষ্টা ও সবকিছুর মালিক আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে প্রতিটি বিষয়ের সাথে তার প্রতিক্রিয়া আনুসাঙ্গিক বিষয়াদি ও বৈশিষ্ট্যসমূহও উপস্থিত হয়ে থাকে এবং প্রত্যেকটার সাথে বিভিন্ন আকৃতি ও বিভিন্নরূপে মহান আল্লাহর রহমতের আগমন ঘটে থাকে। এজন্য মানুষের ইচ্ছা ও শক্তি বহির্ভূত বিষয়াদিতে মহান আল্লাহ যাকে যেভাবে যে অবস্থায় সৃষ্টি

www.banglakitab.weebly.com　www.islamfind.wordpress.com

করেছেন এবং যে অবস্থায় রেখেছেন তাকেই হিকমত ও সুলক্ষণ মনে করে তার উপর রাযী ও খুশী থাকা উচিত। মানুষের ইচ্ছা বহির্ভূত কাজগুলো চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানোর ক্ষেত্র নয়।

সৃষ্টিগত দুর্বল যদি শক্তিশালী বাহাদুর হওয়ার আকাংখা করে, কালো মানুষ যদি সুন্দর হওয়ার ইচ্ছা করে, বংশগতভাবে দুর্বল ও নিম্নস্তরের কেউ যদি উঁচু বংশীয় হওয়ার চেষ্টা করে, তবে এ সবই হবে নিরর্থক ও বেকার। এ ধরনের লোকদের বোঝা উচিত যে, মহান আল্লাহ পাক হলেন প্রজ্ঞাবান, তিনি আমাদেরকে যে অবস্থায় রেখেছেন আমাদের জন্য তাই উত্তম ও মঙ্গলজনক। বর্তমান অবস্থা ছাড়া যদি অন্য কোন অবস্থা আমাদের হত, তবে আমাদের জানা নেই যে, কোন ধরনের ভ্রান্তি ও গোমরাহীর শিকার আমরা হয়ে পড়তাম।

পবিত্র কুরআনের ইরশাদ হচ্ছে—

لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ

অর্থাত, এমন বিষয়ে তোমরা আকাংখা করো না, যে বিষয়ে মহান আল্লাহ্ তোমাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

এখানে যে আদেশ করা হয়েছে তার সম্পর্ক হলো মানুষের শক্তিবহির্ভূত বিষয়গুলোর সাথে। আর যেসব বিষয় মানুষের চেষ্টা-প্রচেষ্টার আওতায় সে সব বিষয়ে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ ভিন্নতর। আর তাহলো, তোমাদের শক্তির আওতাভুক্ত ভাল বিষয়ে চেষ্টা মেহনত করে একে অপরের অগ্রগামী হওয়ার চিন্তা কর। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে—

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ

অর্থাত, তোমরা অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করো, মহান আল্লাহর ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা সমস্ত আসমান ও জমীনকে বেষ্টন করে রেখেছে।

হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত খিযির (আঃ) ঃ কিছু প্রশ্ন ও তার জবাব

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, পবিত্র কুরআনে হযরত মূসা (আঃ)-এর ইলমী পূর্ণতার জন্য হযরত খিযির (আঃ)-এর কাছে গমন সংক্রান্ত যে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

কথা আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে হযরত খিযির (আঃ) হযরত মুসা (আঃ)–এর কাছ থেকে আগেই এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, হযরত মুসা (আঃ) তার কোন কাজের উপর প্রশ্ন তুলতে পারবেন না। এরপরও হযরত মুসা (আঃ) নিজের কৃত সে ওয়াদার উপর কেন টিকে থাকতে পারলেন না। বরং বারবার হযরত খিযির (আঃ)–এর বিভিন্ন কাজের উপর প্রশ্ন ও আপত্তি উত্থাপন করলেন?

এর জবাবে হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, প্রকৃত কথা হলো, ওয়াদা পূর্ণ করা ঐ অবস্থায় ওয়াজিব হয়, যখন তার মধ্যকার কোন কাজ শরীয়ত পরিপন্থী না হয়। শরীয়ত পরিপন্থী কিছু হলে সে ক্ষেত্রে ওয়াদা ভঙ্গ করা আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। অনুরূপ এমন ওয়াদা যার খেলাফ করা হলে বিপরীত ফরীক বা অপরপক্ষের কোন ক্ষতির বা লোকসানের সম্ভাবনা থাকে না সে ওয়াদা পূর্ণ করাও ওয়াজিব হয় না।

তিনটি বিষয় এমন ছিলো যে ব্যাপারে হযরত মূসা (আঃ) হযরত খিযির (আঃ)–এর উপর প্রশ্ন ও আপত্তি উত্থাপন করেছেন। তার মধ্যে একটি বিষয়তো ছিলো প্রকাশ্য শরীয়ত পরিপন্থী। তা হলো, একটি নিরপরাধ ছেলেকে হত্যা করা। এছাড়া অপর দুটি বিষয় যেমন, নৌকা ভেঙ্গে দেয়া এবং দেয়াল সোজা করে দেয়া এগুলো যদিও প্রকাশ্যভাবে শরীয়ত বিরোধী বা নাজায়েয ছিলো না কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুস্তাহাবের পরিপন্থী স্বাভাবিক মানসিকতা বিরোধী ছিলো। আর নবী (আঃ)গণ এহেন কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ না করে পারেন না এবং এ জাতীয় কাজ দেখার পর নবী (আঃ)গণের জন্য চুপ করে ধৈর্যধারণ করাও উচিত নয়। এজন্য বাধ্য হয়েই হযরত মূসা (আঃ) বিষয়গুলো সম্পর্কে আপত্তি তুলেছেন। আর বিশেষতঃ এ কথাটি তো হযরত মূসা (আঃ)–এর জানা ছিলো যে, এখানে প্রশ্ন করা বা আপত্তি তোলার কারণে হযরত খিযির (আঃ)–এর কোন ক্ষতি বা লোকসান হবে না।

এখানে দুটি বিষয় শরীয়তের আদব ও শিষ্টাচারের সাথে সম্পৃক্ত ও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। প্রথম বিষয় হচ্ছে, শুরুতে তো হযরত মূসা (আঃ)–এর একথা জানা ছিলো না যে, এমন ঘটনা সামনে আসবে যা শরীয়ত পরিপন্থী। তাই তিনি এই বলে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলেন—

سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِىْ لَكَ اَمْرًا

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

অর্থাত, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল হিসেবে পাবেন ইনশা'আল্লাহ। আর আমি আপনার কোন হুকুম অমান্য করবো না।

এরপর যখন নৌকা ভাঙ্গার ঘটনা সামনে এলো, তখন তাকে স্বাভাবিক মানবিকতা ও আদর্শ পরিপন্থী ভেবে হযরত মূসা (আঃ) বলে উঠলেন—

لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا

অর্থাত, এটি তো আপনি একটি অদ্ভূত কাজ করলেন। (আপনি আপনার প্রতি অনুগ্রহকারী নায়ের মাঝির ক্ষতি করে দিলেন।)

এ সময় হযরত খিযির (আঃ) যখন হযরত মূসা (আঃ)কে তার ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, তখন হযরত মূসা (আঃ) 'ভুল হয়ে গেছে' বলে উযর পেশ করে এরপর থেকে ওয়াদা রক্ষা করার পুনঃ অঙ্গীকার করলেন।

কিন্তু এরপর যখন হযরত খিযির (আঃ) একটি বাচ্চা ছেলেকে হত্যা করে ফেললেন, যা ছিলো বাহ্যিক শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে হারাম। বিধায় এ বিষয়টির উপর হযরত মূসা (আঃ) কঠোরভাবে আপত্তি উথাপন করলেন। হযরত খিযির (আঃ) পুনরায় হযরত মূসা (আঃ)কে তাঁর পিছনের কথা ও ওয়াদার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিলেন। এবার হযরত মূসা (আঃ) কোন ভুল বা অন্য কোন অপারগতার কথাও প্রকাশ করলেন না এবং ভবিষ্যতে পূর্বের কৃত সে ওয়াদা রক্ষা করার কথাও বললেন না। বরং তিনি শুধু এতটুকু বললেন যে, এরপর যদি আমি আপনার কোন কাজের উপর প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে আর আপনার সাথে রাখবেন না। এর কারণ ছিলো, আল্লাহ পাকের কোন নবী তার নবীসুলভ দায়িত্ব হেতু প্রকাশ্য শরীয়ত বিরোধী কাজ হতে দেখার পরও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারেন না এবং এর উপর ওয়াদাও করতে পারেন না।

হযরত মূসা (আঃ)–এর নবীসুলভ দায়িত্ব হেতু শরীয়তের আদব ও শিষ্টাচার সংরক্ষণের বিষয়টিতো এভাবে পরিস্কার হয়ে গেলো, অপরদিকে হযরত খিযির (আঃ)ও বাহ্যিক শরীয়তের বিষয়টির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। আর তাহলো, একটি ছেলেকে তিনি হত্যা করার পর হযরত মূসা (আঃ) যে আপত্তি তুললেন, সে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

আপত্তির উপর ভিত্তি করে তিনি হযরত মূসা (আঃ)কে পৃথক করে দেননি। কারণ, এটি বাহ্যিক শরীয়তের বিচারে ছিলো হারাম (তাই হযরত মূসা (আঃ)–এর আপত্তি এখানে অমূলক ছিলো না)। এরপর তৃতীয় ঘটনা অর্থাত হযরত খিযির (আঃ) একটি বাঁকা দেয়ালকে যখন সোজা করে দিলেন—এটি কোনক্রমেই শরীয়ত বিরোধী কাজ ছিলো না বরং এটাকে 'মুসলিহাত' পরিপন্থী বা স্বাভাবিক কল্যাণ পন্থার ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। এ বিষয়টির উপরও যখন হযরত মূসা (আঃ) প্রশ্ন তুললেন, তখন হযরত খিযির (আঃ) বললেন—

هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ

অর্থাত, এবার আপনার ও আমার পৃথক হওয়ার ক্ষেত্র এসে গেছে।

লক্ষ্য করুন, উপরের পূর্ণ ঘটনাটির মাঝেই উভয় ব্যক্তির পক্ষ থেকে শরীয়তের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দিকটি কিভাবে লক্ষ্য রাখা হলো, অথচ তাসাওউফের মূর্খ ও ভুয়া দাবীদারগণ এ ঘটনার এসব জটিল বিষয়গুলো বুঝতে না পেরে তারা এর জবাব এই প্রস্তুত করেছে যে, শরীয়ত হলো এক জিনিস আর তরীকত হলো অন্য জিনিস। যেসব জিনিস শরীয়তে হারাম তা তরীকতে জায়েয হতে পারে। নাউযুবিল্লাহ! এমন কথা পরিস্কারভাবে শরীয়তকে অস্বীকার করার শামিল। কারণ তরীকতের মূল কথা শরীয়তের উপর আমল করা ছাড়া অন্য কিছু নয়। যে তরীকত শরীয়তের পরিপন্থী সে তরীকত বদদ্বীনী ও যিন্দীকী ছাড়া কিছুই নয়।

এখানে একটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন আর তা হলো, উপরোক্ত ঘটনায় হযরত খিযির (আঃ) শরীয়ত পরিপন্থী কাজ কিভাবে করলেন, যে কাজের প্রতি হযরত মূসা (আঃ)কে আপত্তি তুলতে হলো। এর কারণ হচ্ছে, হযরত খিযির (আঃ)ও আল্লাহ পাকের নবী ছিলেন, তাঁর কাছেও ওহী আসতো। তিনি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে হুকুম পেয়েই এমনটি করেছিলেন। আর আল্লাহ পাকের ওহীর মাধ্যমে শরীয়তে নির্ধারিত নিয়ম–নীতি ও বিধি–বিধানের মধ্যে কোন পরিবর্তন সাধন করা বা ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন বিধান আরোপ করা কোন অস্বাভাবিক বিষয় নয়। হযরত খিযির (আঃ) ওহীর মাধ্যমে সে আদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, হযরত মূসা (আঃ)–এর সে বিষয়ে অবগতি ছিলো না। আর সে ওহীর কারণেই হযরত খিযির (আঃ)–এর জন্য এ ঘটনাটি

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

শরীয়ত নির্ধারিত বিধি-বিধান থেকে ভিন্নতর ছিলো। বিধায় হযরত খিযির (আঃ)-এর কাজ যেমন শরীয়ত বিরোধী ছিলো না তেমনি আপাত দৃষ্টিতে শরীয়ত পরিপন্থী দেখা যাওয়ার কারণে শরীয়তের নিয়ম মতে হযরত মূসা (আঃ) তার প্রতি আপত্তি করা প্রয়োজন মনে করেছেন।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনায় তার পক্ষ থেকে ভাইদের প্রতি চুরির অভিযোগ করার যে বিষয়টি আলোচিত আছে, সেখানে তারা প্রকৃতপক্ষে চুরি করেনি বিধায় তাদের প্রতি চুরির অভিযোগ শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয ছিলো না। তারপরও হযরত ইউসুফ (আঃ) এমনটি কিভাবে করলেন?

এখানেও ঐ একই ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) আল্লাহ পাকের নবী ছিলেন, তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হতো, তাঁকে হয়তো আল্লাহ পাক সাধারণ শরীয়তের ব্যতিক্রম এ বিষয়টির ব্যাপারে ওহীর মাধ্যমে অনুমতি দিয়েছিলেন। তবে এখানে একথা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, এমনটি শুধু ঐ ব্যক্তির দ্বারাই সম্ভব হতে পারে, যিনি কোন নবী এবং ওহীর অধিকারী ব্যক্তি হন। কোন ওলী বা ইলহাম ও কাশফের অধিকারী ব্যক্তি এমনটি কস্মিনকালেও করতে পারে না। কেননা কাশফ ও ইলহাম শরীয়তের কোন দলীল বা প্রমাণ নয়। বিধায় এর দ্বারা শরীয়তের কোন বিধানের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন বা কোন বিষয়কে বিধান থেকে বের করে ভিন্ন হুকুম আরোপ করা শুদ্ধ হতে পারে না। মূর্খ সুফীরা যারা হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত খিযির (আঃ)-এর এ ঘটনাকে শরীয়ত পরিপন্থী কাজ করা জায়েয করার জন্য একটা প্রমাণ বানিয়ে নিয়েছে, তারা নিঃসন্দেহে গোমরাহ এবং ভ্রান্ত। বর্তমানে যেমন আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না, তেমনি কোন ওহীও নাযিল হবে না। সুতরাং শরীয়তের বিধানের মধ্যে কোন ভিন্নতা বা বিশেষ কোন ঘটনাকে সাধারণ বিধান থেকে বের করে আনারও কোন সুযোগ বর্তমানে আর বাকি নেই।

কোন বুযুর্গের মর্যাদা বুঝার উপায়

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, শুধু পরিপূর্ণ গুণাবলী ও দলীল দ্বারা একথা নির্ধারণ করা যায় না যে, অমুক বুযুর্গ অমুক বুযুর্গ থেকে উত্তম। বরং কে উত্তম তা নির্বাচনের প্রকৃত মাপকাঠি হচ্ছে, সমকালীন ও

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

সমসাময়িক বুযুর্গানে দ্বীন ও উলামায়ে কেরাম দু'জনের মধ্যে কাকে উত্তম ও বড় মনে করেন। বুযুর্গানে দ্বীন এবং উলামায়ে কেরাম যাকে উত্তম মনে করেন, তিনিই হবেন প্রকৃতপক্ষে উত্তম।

নেককার লোকদের দ্বারাও ভুল হতে পারে

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) যিনি দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম যুগের সদরুল মুদাররিস ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে কিছুদিন সরকারী চাকুরী করেছেন। তিনি আজমীর শরীফের মাদরাসাসমূহের পরিদর্শক (ইন্সপেক্টর) নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেখানে একজন লোক ছিলেন যিনি সঙ্গীত বিদ্যায় খুব পারদর্শী উস্তাদ ছিলেন। হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) তো বিভিন্ন জ্ঞান-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং প্রত্যেক বিষয়ে তিনি অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। প্রতিটি বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করার ব্যাপক আগ্রহও তাঁর মাঝে বিরাজমান ছিলো, সেমতে তিনি ঐ সঙ্গীতে পারদর্শী ব্যক্তির কাছ থেকে এ বিষয়টি শিখে নিলেন এবং এতে তিনি বেশ পারদর্শিতা ও প্রসিদ্ধি লাভ করলেন।

একবার তিনি নিজের বালাখানায় সঙ্গীতচর্চায় লিপ্ত ছিলেন। তখন সেখান দিয়ে আল্লাহর কোন এক ওলী যাচ্ছিলেন। মাওলানা সাহেবকে এ অবস্থায় দেখে তিনি চিৎকার করে বললেন—'আরে মৌলভী! এ কাজ তো তোমার নয়, তুমি অন্য কাজের জন্য।'

একথা শোনার সাথে সাথে মাওলানার অন্তরে এ কাজের ব্যাপারে একটা ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে গেলো এবং তৎক্ষণাত তিনি এ কাজ থেকে তাওবা করে নিলেন। মাওলানার এই তাওবার খবর যখন তার সঙ্গীতের উস্তাদের কাছে পৌছলো, তখন তিনিও এ থেকে তাওবা করে নিলেন।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

১৪ই রমযান ১৩৪৭ হিজরী

একটি সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক দু'আ

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, প্রত্যেক নামাযের পরে পড়ার জন্য আমি একটি সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক দু'আ নির্ধারণ করে রেখেছি। যার মধ্যে নিজের জন্য এবং সকল মুসলমানদের জন্য দ্বীন ও দুনিয়ার সকল মাকসাদ ও মঙ্গলের দু'আ শামিল হয়ে যায়। দু'আটি হচ্ছে এই—

اَللّٰهُمَّ كُلَّ خَيْرٍ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَّ مُسْلِمَةٍ

অর্থাত, আয় আল্লাহ! তুমি সকল মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য সর্বক্ষেত্রে সর্বরকম কল্যাণ ও মঙ্গল দান কর।

হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)-এর বিজ্ঞজনোচিত উপদেশ

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান ও বিজ্ঞ-বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজের ছাত্র ও মুরীদদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, ইলমী সবক পড়ার বিষয় হোক কিংবা যিকির বা তাসবীহ পাঠের বিষয় হোক তার জন্য যতটুকু সময় নির্ধারণ করে নিয়েছো তার একেবারে শেষ সময় পর্যন্ত যিকির-তাসবীহ বা সবক পড়বে না বরং তার একটু আগেই বন্ধ করে দিবে। এমনটি করলে তার সুফল এই হবে যে, দ্বিতীয়বার আবার সেই আমল করার ক্ষেত্রে দ্রুত আগ্রহ সৃষ্টি হবে। পক্ষান্তরে যদি নির্ধারিত সময় পূর্ণ করে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে ক্ষ্যান্ত করো, তবে দ্বিতীয়বার তার প্রতি দ্রুত আগ্রহ সৃষ্টি হবে না। যেমন চিকিৎসাবিদগণ বলে থাকেন, খানা একেবারে পেট পুরে খাবে না বরং কিছুটা ক্ষুধা ও খানার প্রতি আগ্রহ ও চাহিদা বাকী থাকতেই খানা বন্ধ করে দিতে হবে। তাহলে পরের বেলায় ভালভাবে ক্ষুধা সৃষ্টি হবে।

হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন যে, তোমরা ছোট বাচ্চাদের খেলনা চাক্কী এবং চরকার ক্ষেত্রে যেমন দেখে থাকো যে, সেটা চালানোর সময় দু'এক প্যাচ বাকী থাকতে ছেড়ে দিলে ওটা পুনরায় সুন্দরভাবে ঘুরে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

আসে। কিন্তু যদি সুতার সকল প্যাচ খোলার পরে ছাড়া হয় তবে পুনরায় উল্টা দিকে পেঁচিয়ে আনতে বেশ সময় লেগে যায়।

কম বয়সের ছেলেদের ব্যাপারে সতর্কতা

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আমি আমার লোকদেরকে নিষেধ করে দিয়েছিলাম, যাতে তারা আমার লিখার কক্ষে যেখানে শুধু আমি একা থাকি সেখানে কোন কমবয়সের ছেলেকে না পাঠায়। কারণ, আমার নফসের উপর আমার এতটুকু ভরসাও নেই, আমার সে নিষেধাজ্ঞার ভাল ফল এই হলো যে, খানকার সকল লোকেরা কম বয়সের ছেলেদের সাথে উঠাবসা বন্ধ করে দিলো এবং তাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে শুরু করলো।

মানবাত্মার সংশোধনের উত্তম পদ্ধতি অবলম্বনের কয়েকটি ঘটনা

মদ্যপান থেকে তাওবা

হযরত জিগার মুরাদাবাদী (রহঃ) উর্দূ ভাষার একজন খ্যাতিমান কবি ছিলেন। তার কবিসুলভ আযাদীর সময়ে তিনি মদ্যপানের এই মুসীবতে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং এ কাজে তিনি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর অন্তরে বুযুর্গানে দ্বীনের মহব্বত ও তাদের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস বাকী রেখেছিলেন। এর ফলেই একসময় তিনি এ দুনিয়া ও আখিরাতের আযাব থেকে পরিপূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন (মদ্যপানের অভ্যাস পরিত্যাগ করতে পেরেছিলেন।)

এরূপ ঘটনা ঘটলো যে, একদিন হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)-এর মজলিসে আমি অধমও উপস্থিত ছিলাম, তখন আমাদের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র বুযুর্গ খাজা আযীযুল হাসান (রহঃ) বললেন যে, জিগার মুরাদাবাদীর সাথে একবার আমার সাক্ষাত হলে সে আমাকে বলতে লাগলো, আমার খুবই ইচ্ছা হয় যে, আমি থানাভবনে গিয়ে হযরতের সাথে সাক্ষাত করি। কিন্তু আমি মদ্যপানের মুসীবতে এমনভাবে লিপ্ত যে, তা ছাড়তেও পারছি না। এ কারণে আমি হযরতের দরবারে যেতে অক্ষম, কারণ আমি কোন্ মুখে হযরতের সাথে গিয়ে সাক্ষাত করবো।

একথা শুনে হযরত থানবী (রহঃ) হযরত খাজা সাহেব (রহঃ)কে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

জিজ্ঞাসা করলেন, এরপর আপনি তাকে কি উত্তর দিলেন? এর জবাবে হযরত খাজা সাহেব বললেন, আমি তাকে বলেছি যে, হাঁ একথা তো ঠিক যে এমন অবস্থায় বুযুর্গানে দ্বীনের মজলিসে যাওয়া কিভাবে উচিত হতে পারে। একথা শুনে হযরত থানবী (রহঃ) বললেন, আহ্ খাজা সাহেব আমরা তো মনে করতেছিলাম যে, এখন আপনি তরীকতকে বুঝে নিয়েছেন। কিন্তু এখন বুঝতে পারলাম যে, আমাদের সে ধারণা ভুল ছিলো। খাজা সাহেব একথা শুনে আশ্চর্য হয়ে বললেন, হযরত! এক্ষেত্রে আমার এ উত্তর দেয়া ছাড়া আর কিইবা বলার ছিলো? হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ) বললেন, আপনি তাকে বলে দিতেন, যে অবস্থায় আছো সে অবস্থাতেই চলে যাও! এ উপস্থিতি ও সাক্ষাতই তোমার ঐ বালা থেকে মুক্তি লাভের কারণ হয়ে যেতে পারে। হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ) প্রকৃতপক্ষেই মানবাত্মার রোগসমূহের জন্য একজন দক্ষ ও বিচক্ষণ চিকিৎসক ছিলেন। তিনি হযরত জিগার মুরাদাবাদীর কথা বলার ধরণ, তার নিজের কৃতকর্মের উপর অনুতপ্ততা এবং বুযুর্গানে দ্বীনের প্রতি তার মহব্বতের দাবী থেকে একথা অনুমান করে নিয়েছিলেন যে, সে যদি এসে হাযির হয় তবেই তার মধ্যে ইসলাহ বা শুদ্ধি এসে যাবে এজন্যই তিনি খাজা সাহেবকে উপরোক্ত কথা বলেছিলেন।

এরপর খাজা সাহেব হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)–এর দরবার থেকে যখন প্রত্যাবর্তন করলেন, ঘটনাক্রমে তখন পুনরায় হযরত জিগার মুরাদাবাদীর সাথে তার সাক্ষাত হলো। হযরত খাজা সাহেব সকল ঘটনা তাঁকে খুলে বললেন। মুরাদাবাদী সাহেবেরও হিদায়াত ও ইসলাহের সময়ও এসে গিয়েছিলো। তিনি হযরত থানবী (রহঃ)–এর একথা শুনেই অঝোরে কাঁদতে শুরু করলেন। এবং শেষ পর্যায়ে তিনি কঠোরভাবে এ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হলেন যে, যদি আমি মারাও যাই তবুও ঐ নোংরা বস্তুর কাছেও যাবো না। ঘটলোও তাই, শরাব পান করা ছেড়ে দেয়ার কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে দাঁড়ালো। লোকেরা তখন বললো, আপনার এ করুণ অবস্থায় প্রয়োজন পরিমাণ মদ পান করার অনুমতি তো শরীয়তও দিয়ে থাকে। আপনি নিজে গিয়ে হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)–এর কাছ থেকে মাসআলাহ জিজ্ঞাসা করে নিন।

কিন্তু জিগার মুরাদাবাদী (রহঃ) একটি প্রশস্ত জিগার বা কলিজার

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। নিজের প্রতিজ্ঞার উপর তিনি ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ় ও মযবূত। এ সকল কিছুর উত্তরে তিনি বললেন, আমি তো এখন ওটা ছেড়ে দিয়েছি যদি আমার হায়াত থেকে থাকে তবে ইনশাআল্লাহ ওটা ছাড়াই আমি বেঁচে থাকবো। আর যদি আমরা হায়াত আল্লাহর দরবারে শেষ হয়ে গিয়ে থাকে আর আমার শেষ সময় উপস্থিত হয়ে গিয়ে থাকে তবে এই শেষ সময়ে ঐ নাপাক এবং নিকৃষ্টতম নোংরা বস্তুর দ্বারা আমার মুখ ও জিহ্বাকে কেন অপবিত্র করবো?

মহান আল্লাহ দৃঢ় মনোবল ও হিম্মতের অধিকারী ব্যক্তিকে সাহায্য করে থাকেন। এখানেও মহান আল্লাহ পাকের সাহায্য ও পরিপূর্ণ শক্তির দ্বারা কিছুদিন পরেই মুরাদাবাদী সাহেব পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে গেলেন। এভাবে যাহেরী এবং বাতেনী রোগ থেকে মুক্তিলাভ করার পর তিনি এবার থানাভবন যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। যেদিন তিনি থানাভবন তাশরীফ আনলেন, ঘটনাক্রমে অধম (মুফতী শফী সাহেব) সেদিন সেখানেই উপস্থিত ছিলাম। হযরত থানবী (রহঃ) তার সাথে অত্যন্ত সম্মান ও মহব্বতের আচরণ করলেন। দীর্ঘ সময় ধরে তার সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করলেন। আমার যতটুকু স্মরণ আছে হযরত থানবী (রহঃ) তাকে বলছিলেন, আমার কাছে আপনার একটা শের (কবিতা) খুবই ভাল লেগেছে। শেরটি আমি নিজেও বারবার পড়ে থাকি। আমি যদি কোন শায়েরকে (কবিকে) তার শেরের জন্য পুরস্কার দিতাম, তবে এই শেরটির জন্য আপনাকে বহুত বড় একটি পুরস্কার দিতাম। শেরটি হলো—

میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے
قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں

অর্থাত, (হে প্রভু!) আপনাকে পাওয়ার জন্য আমার যে চেষ্টা সেটাও আপনারই দান, আপনাকে পাওয়ার পথে আমার পা ওঠে না, আপনি তা উঠানোর তাওফীক দিয়ে থাকেন।

এরপরের বিষয়টি আমার স্মরণ নেই যে, জিগার সাহেব নিজেই নিজের কোন একটা গজল শুনাতে চাইলেন নাকি উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে কেউ হযরত জিগার মুরাদাবাদী সাহেবের একটি গজল শুনার আবেদন জানালো। যাই হোক হযরত থানবী (রহঃ)–এর কাছে অনুমতি

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

চাওয়া হলে অনুমতি দিলেন, তখন হযরত জিগার সাহেব মরহুম নিজের কয়েকটা গজল সে মজলিসে শুনালেন। তার মধ্যকার একটি গজলের নিম্নোক্ত তিনটি লাইন আমার স্মরণ আছে—

بے کیف مے ناب سے معلوم نہیں کیوں!
پھیکی شب مہتاب ہے معلوم نہیں کیوں
ساقی نے دیا تھا جو بصد عرض تمنا
وہ جرعہ بھی زہر آب ہے معلوم نہیں کیوں
دل آج بھی سینے میں دھڑکتا تو ہے لیکن
کشتی سے تہ آب ہے معلوم نہیں کیوں

অর্থাত, শরাবের পিয়ালা প্রস্তুত থাকার পরে আমার এ দুরবস্থা কেন বুঝে আসে না। আলোকজ্জ্বল চাঁদনী রাতও কেন নিরস হয়ে গেল জানি না। সাকী তো হাজারো বিনয়ভাবে অনেক আকাংখার বাণী শুনালো কিন্তু তার সে পেয়ালাও আমার কাছে বিষের পেয়াল্যর মত লাগছে কেন বুঝি না। সীনার মাঝে দিল তো এখনো কম্পমান এবং বিদ্যমান রয়েছে কিন্তু তাও যেন পানিবিহীন কিস্তির ন্যায় কেন হলো বুঝতে পারছি না।

এটা ছিলো হযরত মুরাদাবাদীর হযরত থানবী (রহঃ)–এর সাথে প্রথম সাক্ষাত এবং সে সাক্ষাতের কথপোকথন। এরপর থেকেই আসা–যাওয়া, চিঠিপত্রের আদান–প্রদান চলতে থাকলো। তার মধ্য হতে কয়েকটি চিঠি হয়তো প্রকাশিতও হয়েছে।

একজন কলেজ ছাত্রের কাহিনী

সম্ভবতঃ শিমলা নামক অঞ্চলের কোন কলেজে একবার হযরত থানবী (রহঃ)–এর বয়ান হলো। যার শ্রোতা ছিলো কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকগণ। সে বয়ানে হযরত থানবী (রহঃ) আধুনিক শিক্ষা দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন সংশয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন যা ইসলামের মৌলিক ও শাখা বিষয়সমূহ সম্পর্কে অধিকাংশ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের মনে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, ঐসব সংশয়–সন্দেহ ও প্রশ্নসমূহ সৃষ্টি

হওয়ার জন্য শুধু শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যসূচীই দায়ী নয় বরং এর একটি অন্যতম বড় কারণ হচ্ছে, ওসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বদদ্বীনী পরিবেশ। যে পরিবেশের মধ্যে থেকেই আমাদের নব প্রজন্ম লালিত-পালিত হয়। যার ফলে তাদের অন্তর থেকে মহান আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐ মাহাত্ম্য ও মহব্বত শেষ হয়ে যায় যা একজন মানুষের ঈমানদার হওয়ার জন্য আবশ্যক। আর সে মাহাত্ম্য ও মহব্বত বুযুর্গানে দ্বীনের সংস্পর্শ ও সান্নিধ্যের মাধ্যমে লাভ হতে পারে।

এরপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আলহামদুলিল্লাহ বর্তমানে প্রায় সকল জায়গায় কম-বেশী বুযুর্গানে দ্বীনের মজলিস হয়ে থাকে। কিছুদিন সে ধরনের মজলিসে কাটানোর অভ্যাস করুন। তাও সম্ভব না হলে অন্ততঃ বন্ধের সময় হতে কিছু সময় সে কাজের জন্য ব্যয় করুন। যদি আধুনিক শিক্ষিতরা এ কাজটি করেন তবে আমি আশা করি তাদের অন্তর থেকে ইসলামের উপর সৃষ্ট বিভিন্ন সন্দেহ ও প্রশ্ন সমূলে বিদূরিত হয়ে যাবে। এবং নিজের মনেই সে প্রশ্নের সঠিক জবাব এসে যাবে এবং সবকিছু এমনিতেই বুঝে এসে যাবে।

সম্ভবতঃ সে মজলিসে উপস্থিতদের মাঝে একজন ছাত্র প্রশ্ন করলো, আমরা শুনেছি আপনার নাকি ইংরেজী শিক্ষিতদের প্রতি চরম ঘৃণা রয়েছে? হযরত থানবী (রহঃ) তখন জবাব দিলেন, কস্মিনকালেও না, ঐ লোকদের প্রতি আমার কোন ঘৃণা নেই তবে তাদের কিছু আচরণ ও কাজ-কর্মের প্রতি আমার ঘৃণা রয়েছে, যেগুলো শরীয়ত পরিপন্থী। লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করলো, সে কাজ-কর্মগুলো কি? হযরত থানবী (রহঃ) জবাব দিলেন, বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন কাজ রয়েছে সকলের কাজ এক রকম নয়। লোকটি ছিলো খুবই আযাদ প্রকৃতির। সে আবারো প্রশ্ন করলো, যেমন আমার মধ্যে কি কি কাজ রয়েছে, যা আপনার দৃষ্টিতে অপসন্দ বা ঘৃণার কারণ। বর্তমানকালের ছাত্রদের অবস্থামতে সে লোকটিরও দাড়ি একেবারে পরিস্কারভাবে মুণ্ডানো ছিলো। হযরত থানবী (রহঃ) বললেন, কিছু কিছু বিষয় তো আপনার মাঝে আছে যা পরিস্কারভাবে প্রকাশিত রয়েছে কিন্তু এত লোকের মজলিসে তা প্রকাশ করতে আমার শরম হচ্ছে। আর কিছু আছে যা দেখা যায় না, সুতরাং আপনার সামগ্রিক অবস্থা ও আচার-আচরণ সম্পর্কে না জেনে তার উপর কোন মন্তব্য করা তো সম্ভব নয়।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

এরপর সে মজলিস শেষ হয়ে গেল। হযরত থানবী (রহঃ) থানাভবন ফিরে এলেন। অতঃপর একবার যখন কলেজ বন্ধ হলো তখন একজন ছাত্রের একটা চিঠি এলো। (একথা আমার (সংকলক) স্মরণ নেই যে, হযরত (রহঃ)কে যে ছাত্র প্রশ্ন করেছিলো এ চিঠি কি সেই পাঠিয়েছিলো, না অন্য কেউ) চিঠিতে লেখা ছিলো—বর্তমানে আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ, তাই আমি আপনার বলে দেয়া পদ্ধতি অনুযায়ী কিছুদিন আপনার খেদমতে থাকতে চাই। কিন্তু আমার বাহ্যিক আকার-আকৃতি যেমন শরীয়ত মুতাবিক নেই তেমনি আমার কাজ-কর্ম ও আমলের মাঝেও অনেক গড়বড় রয়েছে। এ অবস্থায় যদি আমাকে আসার জন্য অনুমতি দেয়া হয় তবে অবশ্যই আমি উপস্থিত হয়ে যাবো।

হযরত থানবী (রহঃ) এ চিঠির জবাবে লিখলেন, যে অবস্থায় আছেন সে অবস্থায়ই চলে আসুন। অন্য কোন চিন্তা করবেন না। জবাব পেয়ে সে ছাত্র হযরত থানবী (রহঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে গেলো। এবং বললো, আমার অনেক সংশয় ও প্রশ্ন আছে, বিষয়গুলো সম্পর্কে আমি আপনার কাছ থেকে জেনে নিতে চাই। হযরত থানবী (রহঃ) তার এ কথার জবাবে বললেন, হাঁ, বিষয়গুলো ঠিকই জেনে নেয়া দরকার, তবে সেজন্য পদ্ধতি হবে এই যে, আপনার যতগুলো সংশয় ও প্রশ্ন রয়েছে সেগুলো সব একত্রে লিখে নিতে হবে। এরপর আপনি আমার মজলিসে বসে নিশ্চুপভাবে আমার কথা শুনতে থাকবেন। কোন প্রশ্ন করবেন না। এরপর আপনার এখান থেকে বিদায় নেয়ার যখন তিনদিন বাকী থাকবে তখন আপনি আপনার প্রশ্নের বিষয়টি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবেন, আমি আপনাকে প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নেয়ার জন্য স্বতন্ত্রভাবে সময় দিবো। হযরত থানবী (রহঃ) তাকে একথাও বলে দিলেন যে, এখন আপনি যে প্রশ্নগুলো লিখে আপনার কাছে রাখবেন, আমার এখানে অবস্থানকালীন সময়ের মধ্যে এমনিতেই যদি কোন প্রশ্নের উত্তর আপনি পেয়ে যান বা বিষয়টি যদি আপনার বুঝে এসে যায় তবে সে প্রশ্নটি ঐ তালিকা থেকে কেটে দিবেন।

হযরত থানবী (রহঃ)-এর কথামত ছাত্রটি সেভাবেই সবকিছু করলো। এরপর বিদায়ের তিনদিন পূর্বে হযরত থানবী (রহঃ) যখন তাকে প্রশ্ন করার সময় দিলেন তখন ঐ ছাত্রটি হযরত থানবী (রহঃ)কে জানালো যে, আমার প্রশ্নসমূহের তালিকা অনেক দীর্ঘ ছিলো কিন্তু হযরতের

সূচীপত্র

দরবারে অবস্থানকালীন সময়ে বিভিন্ন মজলিসে হযরতের বয়ান ও বক্তব্য শুনে শুনে তার মধ্যকার অনেক প্রশ্নের জবাব আমি এমনিতেই পেয়ে গেছি। যখন যে প্রশ্নের জবাব বুঝতে পেরেছি তখন সেটা কেটে দিয়েছি। এভাবে কাটতে কাটতে এখন মাত্র অল্প কয়েকটা প্রশ্ন বাকী আছে। সে হযরত থানবী (রহঃ)-এর খেদমতে সে প্রশ্নগুলো পেশ করলো এবং খুব সহজভাবেই হযরত থানবী (রহঃ) তাকে তার উত্তর বুঝিয়ে দিলেন। এবং লোকটি তার প্রশ্নসমূহের সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে পরিপূর্ণ আত্মতৃপ্তি নিয়ে সেখান থেকে বিদায় নিলো।

অপর এক ছাত্রের ঘটনা

সম্ভবতঃ আলীগড়ের একজন ছাত্র হযরত থানবী (রহঃ)-এর বরাবরে পত্র লিখলো যে, আমি আপনার খেদমতে হাযির হতে চাই, কিন্তু আমার সুরত এবং লেবাস পোশাক ইত্যাদি সবই শরীয়ত পরিপন্থী। এছাড়া আমার আমলতো শরীয়তের খেলাফ আছেই। আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন তাহলে আমি আপনার দরবারে আসতে চাই।

ছাত্রটির এ পত্রের জবাবে হযরত থানবী (রহঃ) তাকে জানালেন, আপনার চিঠি পেয়ে জানলাম যে, আমলের বিবেচনায় আপনার যাহির বা বাহ্যিক অবস্থা খারাপ। আর আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে একথা জানি যে, আমার বাতেন বা ভিতরগত হালত খারাপ, সুতরাং আমাদের দু'জনের রোগই ভিন্ন। যদি আমাদের উভয়ের রোগ একই রকম হতো তবে আমরা মিলতে পারতাম, সুতরাং এমতাবস্থায় আপনাকে কষ্ট দেয়া আমি উচিত মনে করি না।

এ দু'টি ঘটনাই হযরত থানবী (রহঃ) নিজেই আমাদেরকে শোনালেন এবং বললেন যে, প্রথম ছাত্রের চিঠি পাওয়ার পর আল্লাহ্ পাক আমার মনে এমন একটি খেয়াল ও ভাব সৃষ্টি করে দিলেন যা থেকে আমার মনে হলো, এ লোকটি আমার কাছে এলে সে উপকৃত হবে এবং আশা করা যায় যে, তার মধ্যে সংশোধনী আসবে তাই তাকে আসার অনুমতি দিয়েছি। আর দ্বিতীয় ছাত্রের চিঠি পাওয়ার পর মনে খেয়াল হলো যে, এখানে আসলে লোকটির কোন ফায়দা বা উপকার হবে এমনটি আশা করা যায় না, এজন্য তাকে নিষেধ করে দিয়েছি।

তবে এখানে এ কথাটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা ও স্মরণ রাখার মত

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

যে, লোকটিকে হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)-এর দরবারে আসতে নিষেধ করার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি এবং ধারা তিনি অবলম্বন করেছেন সেখানে ঐ লোকটির সম্মানের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। যাতে তার মন না ভাঙ্গে এবং তার প্রতি যাতে কোন দোষও আরোপ করা না হয়। সাথে সাথে নিজের নফসেরও কিছুটা ইসলাহের দিক এতে নিহিত রয়েছে। কারণ এখানে নিজের খুব পবিত্রতা বা নিজে খুব নেককার হওয়ার দাবীও করা হয়নি। হযরত থানবী (রহঃ)-এর প্রায় কথাতেই এ ধরনের সূক্ষ্ম দিকগুলোকে লক্ষ্য রাখার বিষয়টি পরিলক্ষিত হতো। যা সকলের পক্ষে সহজ নয়।

ভাল কাজের যে কোন পদক্ষেপেই লাভ

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, পবিত্র কুরআনে ঐসব লোকের প্রশংসা করা হয়েছে যারা শেষ রাতে আল্লাহ্ পাকের ইবাদত করার জন্য নিজেদের বিছানা পরিত্যাগ করে। পবিত্র কুরআনের বাণী—

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

অর্থাত, তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে (ইবাদতের জন্য) পৃথক হয়ে যায়।

এই আয়াত দ্বারা মূলতঃ এ বিষয়টিকেই বুঝানো হয়েছে, এর প্রকৃত লক্ষ্যস্থল ঐ সকল লোকেরাই যারা বিছানা ছেড়ে উঠে উযূ করে নামায ও বিভিন্ন ইবাদতে লিপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি দ্বীনী ব্যাপারে দুর্বল কিংবা শারীরিক দুর্বলতা বা অলসতার কারণে এতটা করতে নাও পারে বরং যদি শুধু বিছানার উপর উঠে বসে যায় এবং কয়েক মিনিট আল্লাহ পাকের যিকির-তাসবীহ পাঠ করে তবে আশা করা যায় এ সূরত অবলম্বন করার কারণে ঐ পূর্ণ আমলের সওয়াবের কিছুটা হলেও সে লাভ করবে ইনশাআল্লাহ।

হযরত ইয়াকূব সাহেব (রহঃ)-এর বিশেষ দু'আ

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আমার দারুল উলূম দেওবন্দে থাকাকালীন সময়ে একবার ইংরেজী শিক্ষার ভক্ত একজন লোক বললো, এসব মাদরাসার দ্বারা কি হবে? দু' চারটা 'কুল আউযু' শিখে এরপর বের

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হয়ে যায়। (এরা কি শিখবে আর কি করে খাবে?)

হযরত ইয়াকূব সাহেব (রহঃ) তার একথা শুনলেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন সময়ে দারুল উলূমের শাইখুল হাদীস এবং সদরুল মুদাররিস। 'কাশফ' ও কারামতের অধিকারী বুযুর্গ ছিলেন তিনি। লোকটির উপরোক্ত মন্তব্য শুনে তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে দু'আ করলেন, আয় আল্লাহ! যারা এ মাদরাসায় পড়াশুনা করবে তাদের যেন জীবিকার ব্যাপারে কোন অস্থিরতার শিকার হতে না হয়। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আমার সাথে এই ওয়াদা সম্পাদিত হয়েছে যে, এই দারুল উলূমের সাথে কোনভাবে সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তির মাসিক উপার্জন অন্তত দশ টাকার থেকে কম হবে না।

এটি ছিলো আজ থেকে প্রায় একশত বৎসর পূর্বের ঘটনা। তখনকার দশ টাকা এ সময়ের প্রায় দেড় দুইশত টাকার সমান। (আর বর্তমান অবস্থায় তো আরো বেশী।)

কাউকে পিছন থেকে ডাকা প্রসঙ্গে

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, ইমাম আযম হযরত আবু হানীফা (রহঃ) হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)কে যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি উপদেশ ছিলো এই যে, যে ব্যক্তি তোমাকে পিছন দিক থেকে ডাকবে, তুমি তার ডাকে সাড়া দিবে না। কারণ এ পদ্ধতি হলো জানোয়ার তাড়ানোর পদ্ধতি। পিছন দিক থেকে ডেকে লোকটি তোমার সাথে ঐরূপ আচরণই করলো যেরূপ আচরণ করা হয় জানোয়ারের সাথে। সুতরাং সে উত্তর পাওয়ার যোগ্য নয়।

আর্থিক অস্থিরতা দূর করার উপায়

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, মিরাটের সরদার এলাহী বখশ সাহেব অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একটি মূল্যবান ও কাজের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, লোকেরা আর্থিক ক্ষেত্রে অস্থিরতামুক্ত থাকার জন্য উপার্জন বাড়ানোর ব্যাপারে খুব চেষ্টা-ফিকির করে থাকে। আর উপার্জন বৃদ্ধি করাটা মূলতঃ তাদের ইচ্ছার অধীন নয়। কিন্তু তারা এই চিন্তা করে না যে, খরচ কিভাবে কমানো যায়। বিশেষতঃ যেসব বিষয় তুলনামূলক কম প্রয়োজনীয় সেসব ক্ষেত্রে খুবই কমিয়ে দেয়া

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

যায়। আর খরচ কমানোর বিষয়টি তো প্রত্যেকের ইচ্ছাধীন, ইচ্ছা করলেই খরচ কমিয়ে দেয়া যায়।

নিয়ম-কানূন মেনে চলার গুরুত্ব

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, ভূপাল রাজ্যের একজন উযীর ছিলেন। তিনি নিয়ম-কানূন খুব কঠোরভাবে মেনে চলতেন। তিনি নিজের পারিবারিক জীবনেও উঠাবসা, নিদ্রা-জাগরণ, খানাপিনা মোটকথা সকল ব্যাপারেই একটা নিয়ম নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন এবং তিনি তার পরিপূর্ণ অনুসরণ করতেন।

একবার কোন এক লোক তাকে গালমন্দ করে তার কাছে একটি চিঠি পাঠালো। ঐ উযীর সাহেব চিঠিটি পেয়ে পড়লেন এবং সে চিঠিটির জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে একটি ফাইল তৈরী করে তার মধ্যে সে চিঠিটি রেখে দিলেন। আর চিঠিটির গায়ে তিনি লিখলেন যে, এ চিঠিতে যা লিখা হয়েছে তা লেখকের ব্যক্তিগত মত। এখানে মন্দের কিছু নেই, কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের মত প্রকাশের স্বাধীনতা রাখে।

কুরআন তিলাওয়াত কিভাবে সুন্দর হয়

হযরত থানবী (রহঃ) বর্ণনা করেন, হযরত কারী আবদুর রহমান পানিপতী সাহেব (রহঃ) বলতেন, কেউ যদি শুধু কাওয়ায়েদ, তাজভীদ ও বিভিন্ন হরফের সিফাতসমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে কোন বিশেষ সুর বা ধরন অবলম্বন না করে তবে সে তিলাওয়াত কোনদিন সুন্দর তিলাওয়াত বলে বিবেচিত হবে না।

অতঃপর তিনি বলেন যে, উলামাগণ কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করার আদব বর্ণনা করতে গিয়ে এটিও বলেছেন যে, যেখানে কোন কাফেরের কথা উদ্ধৃত করা হয় সেখানে আওয়ায কিছুটা নীচু করে দেয়া উচিত। (পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের এটিও একটি আদব।)

পরিভাষাসমূহকে সহজ করা

হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ) বলেন, আমার মনে চায় সকল ইলম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষ পরিভাষাগুলোকে অত্যন্ত সহজ করে মাতৃভাষায় লিখে দিতে। যাতে একজন সাধারণ মানুষও প্রয়োজনীয় পরিভাষাগুলো অত্যন্ত সহজভাবে বুঝতে পারে।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

নবী (আঃ)গণের বিচ্যুতিও রহমতস্বরূপ

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, মহান আল্লাহ নবী (আঃ)গণকে যে উচ্চ মর্যাদার নৈকট্য দান করেছেন এবং তাদেরকে সকল গুনাহ্ থেকে নিষ্পাপ করে বানিয়েছেন এটি যেমন আল্লাহ পাকের একটি বিশেষ রহমত ও নেয়ামত। অনুরূপ কোন কোন সময়ে নবী (আঃ)গণ থেকে কোন ব্যাপারে কিছূটা বিচ্যুতি প্রকাশ পাওয়ার যেসব ঘটনা পবিত্র কুরআনে আলোচিত হয়েছে সেগুলোও রহমতস্বরূপ এবং তার মধ্যেও রয়েছে বিশেষ হিকমত ও রহস্য। এমনটি ঘটার একটি বিশেষ ফায়েদা হলো, মানুষ যাতে নবী (আঃ)গণকে খোদা বলে ভাববার সুযোগ না পায়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছোট–খাঁটো বিচ্যুতি প্রকাশ পাওয়া এবং তার প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সতর্ক করার বিষয়টি আমাদেরকে একথা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেয় যে, নবী (আঃ)গণও আল্লাহ পাকের বান্দা ছাড়া অন্য কিছু নন।

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহঃ) বলতেন, নবী (আঃ)গণের সর্বদা উচ্চ সম্মান ও নৈকট্য বর্ধিতই হতে থাকে। যেসব বিষয়কে তাদের বিচ্যুতি বলে প্রকাশ করা হয় শেষ ফলাফলে সেগুলোও তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়ে যায়। কেননা তাঁরা সে ব্যাপারে অবগত হওয়ার পর খুব রোনাজারী (কান্নাকাটি) এবং ইস্তিগফার করে থাকেন।

হজ্জ সফরের শর্ত ও আদবসমূহ

হযরত হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত (রহঃ) বলেন, একবার এক লোক হজ্জ করার ইচ্ছা করলো। সে হজ্জ সফরে যাওয়ার অনুমতি নেয়ার জন্য হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান গাঞ্জে মুরাদাবাদী (রহঃ)–এর দরবারে হাযির হলো। হযরত মুরাদাবাদী (রহঃ) জানতেন যে, লোকটির হজ্জে যাওয়ার মত পর্যাপ্ত সামানপত্র নেই। তিনি তাকে বললেন, যেখানে যেতে চাও সেখানে যেতে হলে কি শর্ত তা কি তোমার জানা আছে? লোকটি মাওলানার এ কথা শুনে স্বাভাবিকভাবেই নিম্নোক্ত কাব্যাংশ মুখে উচ্চারণ করে শুনিয়ে দিলো—

اے دل آں بہ کہ خراب از مئ گلگوں باشی   بے زر و گنج بصد حشمت قارون باشی

در رہ منزل لیلے کہ خطرہاست بجان   شرط اول قدم آں ست کہ مجنون باشی

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

অর্থাত, হে মন! ফুল সুবাসিত শরাব পান করে যদি তুমি নষ্ট হয়ে যাও তবে তাও ভাল, এর দ্বারা তুমি ধনভাণ্ডার ও স্বর্ণচান্দী ছাড়াই হাজারো শানশওকতে কারুনের মত সমৃদ্ধ হয়ে যাবে। মাশুক লায়লার মঞ্জিলের পথে জীবন বিপন্ন হওয়ার আকাংখা আছে। লায়লার মনজিলে পৌছতে হলে সেজন্য প্রথম শর্ত হলো তোমাকে মজনূন হতে হবে।

লোকটির এ জবাব ছিলো সুফিয়ায়ে কিরাম–এর জবাবের মত। যার কারণে হযরত মুরাদাবাদী (রহঃ)–এর মনের মাঝে এমন মানসিক প্রভাব সৃষ্টি হলো, যার ফলে অনিচ্ছায় তার মুখ থেকে একটি চিৎকার বেরিয়ে এলো। কিন্তু তিনি যেহেতু একজন কামেল দরজার শাইখ ছিলেন তাই সাথে সাথে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে তিনি বললেন, শরীয়তসম্মত শর্তসমূহের কাছে এ সবই মূল্যহীন।

প্রকৃত কথা হলো, তরীকত ও তাসাওউফকে ঐ সকল বুযুর্গগণ পুরোপুরিভাবে বুঝেছিলেন। বিভিন্ন হাল ও অবস্থা তো নিজ নিজ স্থানে আছে কিন্তু সবকিছুর উপরেই শরীয়তের নির্ধারিত সীমারেখা ও বিধি–বিধানের পাহারাদারী বসানো রয়েছে।

হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)–এর একটি কথা

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, একবার এক লোক হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব মুহাজিরে মক্কী (রহঃ)–এর খিদমতে কিছু হাদিয়া পেশ করলো। হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) সে হাদিয়া গ্রহণ করলেন। হাদিয়া গ্রহণ করার সময় তিনি বললেন, এই হাদিয়া হলো মহব্বতের প্রমাণস্বরূপ। (এ কথাটি তো তাদের জন্য আনন্দের কারণ ছিলো, যারা হাদিয়া দিয়ে থাকেন। কিন্তু যারা হাদিয়া দিতে অক্ষম তাদের মনে এ কথাটির দ্বারা আফসূস ও অনুশোচনা সৃষ্টি হতে পারে ভেবে সাথে সাথে তিনি এও বললেন,) যারা হাদিয়া দেয় না তারা যে মহব্বত করে না এমন নয় বরং যাদের ব্যাপারে মহব্বতের বিষয়টা পরিষ্কার তাদের সেটা সাবেত করার জন্য কোন হাদিয়া বা প্রমাণ পেশ করার প্রয়োজন পড়ে না।

রামপুরে হযরত নানুতবী (রহঃ)

হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ) বলেন, একবার হযরত কাসেম নানুতবী (রহঃ) কোন এক দ্বীনী প্রয়োজনে রামপুর অঞ্চলে গিয়েছিলেন।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

রামপুরের নবাব সংবাদ পেয়ে হযরত নানুতবী (রহঃ)-এর সাথে এসে সাক্ষাৎ করার জন্য অনুমতি চাইলে হযরত তাকে আসতে নিষেধ করে দিয়ে বললেন, আমি হলাম একজন গ্রাম্য মানুষ। আমীর-উমারাদের আদব-কায়দা সম্পর্কে আমার জানা নেই। সুতরাং নবাব এখানে এলে তা উভয়ের জন্যই বিরস ও বিষাদ হবে।

জীন অনুগত করার আমল

হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ) ইরশাদ করেন, একবার আমি হযরতের খিদমতে জীনদের অনুগত করার আমল জিজ্ঞাসা করলাম (আমার নোটের মধ্যে এখানে কোন বুযুর্গের নাম লিখা হয়নি। হযরত থানবী (রহঃ) হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)কে উদ্দেশ্য করেছিলেন নাকি হযরত ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) উদ্দেশ্য ছিলো তা এ মুহূর্তে আমার স্মরণ নেই।) হযরত জবাবে বললেন, আমার কাছে জীন বশীভূত করার আমল আছে এবং সে আমলগুলো খুবই সহজ। আপনি যদি সে আমল করেন তবে জীন আপনার বশীভূত হয়েও যাবে। কিন্তু একটি কথা শুনে রাখুন, মহান আল্লাহ আপনাদেরকে গোলাম হওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন, প্রভু হওয়ার জন্য নয় যে, আপনি অন্য সৃষ্টিজীবকে আপনার বশীভূত ও অধীনস্ত করতে থাকবেন। হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, ঠিক সে সময় থেকেই আমার মনে ঐ আমলের ব্যাপারে একটা অনীহা সৃষ্টি হয়ে গেছে।

একটি মাসআলার সঠিক বিশ্লেষণ

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল শহীদ দেহলভী (রহঃ) হানাফী মাযহাবের কিছু অনুসারীদের অতিরঞ্জন দেখে তিনি নিজেই নামাযের মধ্যে উচ্চস্বরে আমীন বলা এবং রফয়ে ইয়াদাইন (রুকূতে যাওয়ার পূর্বে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠানো) শুরু করলেন। এ অবস্থা লক্ষ্য করে হযরত শাহ আবদুল কাদের (রহঃ) তাঁকে বললেন, উচ্চস্বরে আমীন বলা এবং রফয়ে ইয়াদাইন করা নিঃসন্দেহে সুন্নাতে রাসূল দ্বারা প্রমাণিত এবং অনেক মুজতাহিদ ইমামগণ এর প্রতি আমলও করেছেন। সুতরাং এর উপর যদি কেউ আমল করে তাতে তেমন কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু যেখানে সবলোক হানাফী মাযহাবের অনুসারী সেখানে এর উপর আমল করা হলে (বিষয়টি

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হানাফী মাযহাব পরিপন্থী হওয়ার দরুন) অযথা লোকদের মনে একটা দ্বিধা সংশয় সৃষ্টি করা হয়, যা থেকে বেঁচে থাকাই ভাল। এ কথা শুনে হযরত ইসমাইল শহীদ (রহঃ) আরয করলেন, হযরত! হাদীস শরীফে এসেছে যে ব্যক্তি কোন মুর্দা সুন্নাতকে জীবিত করবে, সে একশত শহীদের সওয়াব লাভ করবে। এখানে এ সুন্নাতটি মুর্দা হয়ে যাচ্ছে, এজন্য আমি তাকে জিন্দা করছি।

হযরত শাহ আবদুল কাদের (রহঃ) বললেন, মিয়া ইসমাইল আমরা তো জানতাম যে, তুমি বহুত বড় আলেম হয়ে গেছো, কিন্তু তুমি কি এতটুকু কথাও বুঝ না যে, সুন্নাত মুর্দা হওয়ার কথাটা সেখানেই বলা চলে যেখানে সুন্নাতের পরিবর্তে কোন বিদ'আত সে স্থান দখল করে বসে। আর যেখানে একটি সুন্নাতের পরিবর্তে অপর একটি সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে মতভেদ থাকে কেউ একটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে তার উপর আমল করে আবার কেউ সে স্থানে অপরটিকে প্রাধান্য দিয়ে তার প্রতি আমল করে থাকে, এক্ষেত্রে তো উভয় দিকেই সুন্নাত বিদ্যমান কোনদিকেই তো বিদ'আত নেই সুতরাং এখানে তো কোন সুন্নাত মুর্দা হয়নি। সুন্নাত যখন মুর্দাই হলো না তখন সুন্নাত জিন্দা করার কথা বলা এখানে কিভাবে শুদ্ধ হতে পারে।

কারণ সুন্নাতে রাসূলের মাধ্যমে উচ্চস্বরে আমীন বলা এবং রফয়ে ইয়াদাইন করা যেমন প্রমাণিত আছে অনুরূপ অনুচ্চস্বরে আমীন বলা এবং রফয়ে ইয়াদাইন পরিত্যাগ করাও সুন্নাতে নববী দ্বারা প্রমাণিত। এ দু'টি দিকের মধ্যে কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়া মুজতাহিদ ইমামগণের কাজ। সেমতে কোন কোন ইমাম উচ্চস্বরে আমীন এবং রফয়ে ইয়াদাইনকে প্রাধান্য দিয়েছেন আবার কোন কোন ইমাম অনুচ্চস্বরে আমীন বলা এবং রফয়ে ইয়াদাইন পরিত্যাগ করাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এখানে উভয় দিকেই রয়েছে সুন্নাত কোন দিকেই বিদ'আত নেই। যার কারণে এখানে কোন সুন্নাত মুর্দা হয়েছে কথাটা বলা যায় না।

অধম সংকলক বলছে যে, চার ইমামের সর্বসম্মত মূলনীতি মতে একথা প্রমাণিত যে, যে বিষয়ে ইজতিহাদ করার অবকাশ রয়েছে এবং মুজতাহিদ ইমামগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ গবেষণার আলোকে উত্তম এবং মঙ্গল বিবেচনা করে সে বিষয়ে কোন বিশেষ পদ্ধতি নির্ধারণ করে যদি তার প্রতি আমল করেন তবে সেখানে মুনকার বা নিন্দনীয় কোন কিছুই

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

থাকে না বরং প্রত্যেক ইমামের নির্ধারিত পদ্ধতিই মারুফ বা ভাল এবং পসন্দনীয়, বিধায় এখানে

نهى عن المنكر এবং امر بالمعروف

অর্থাত, ভাল কাজে আদেশ দান এবং মন্দ ও নিন্দনীয় কাজ থেকে বারণ করার বিষয়টিও এখানে প্রয়োগ করা চলে না। এক্ষেত্রে নিজের 'মাসলাক' বা অনুসৃত নীতির ব্যতিক্রম আমলকারীদের প্রতি সুন্নাত তরক করার অভিযোগ আরোপ করা কিংবা তাদেরকে ফাসিক বলা কোন ইমামের মতেই জায়েয নয়।

ইলমে হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম হাফেয ইবনে আবদুল বার মালেকী (রহঃ) তাঁর প্রণীত গ্রন্থ 'জামিউল ইলম'–এর মধ্যে এ ব্যাপারে যে বিষয়টি উদ্ধৃত করেছেন তা প্রত্যেক আহলে ইলমের জন্য অবশ্য জ্ঞাতব্য ও সর্বদা মনে রাখার মতো। যাতে তারা ঐ সকল জটিলতা ও ভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকতে পারেন যেসব জটিলতা ও ভ্রান্তিতে বর্তমানে অনেক আলিম–ওলামাও লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। আর তা হলো, কোন মাসআলার ক্ষেত্রে ইজতিহাদী মতপার্থক্যের কারণে একে অপরকে ফাসিক এমনকি কাফির পর্যন্ত বলতে দ্বিধা করে না এবং পূর্বসূরী উলামায়ে কিরামের ব্যাপারে বেয়াদবীমূলক মন্তব্য করার ধৃষ্টতাও প্রদর্শন করে বসে। যার ফলে দ্বীনদার মুসলমানগণ পরস্পরের সাথে ঝগড়া কলহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এবং এর কারণে তারা কত সগীরা কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে তা মহান আল্লাহই ভাল জানেন।

নিকটাত্মীয়দের বাই'আত করা প্রসঙ্গে

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আমি আমার বিশেষ আত্মীয়দেরকে সাধারণতঃ বাই'আত করি না। হযরত মাওলানা শাইখ মুহাম্মদ সাহেব থানবীর একটি ঘটনার দ্বারাই আমি এ বিষয়টির ব্যাপারে সতর্ক হয়েছি। ঘটনাটি হলো, মুন্সী আমীর আহমদ (যিনি ছিলেন মাওলানা শাইখ মুহাম্মদ সাহেবের অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি) তিনি এসে হযরত মাওলানার কাছে বাই'আত হওয়ার আবেদন করলেন। হযরত মাওলানা জবাব দিলেন, আমার কাছে বাই'আত হওয়া তোমার জন্য উচিত হবে না। তোমার সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে তোমার মাঝে (আমাকে সঠিক অর্থে শাইখ বলে মান্য করার ক্ষেত্রে) কখনো

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সংকীর্ণতার সৃষ্টি হতে পারে। আর আমার কাছে বাই'আত হওয়ার পর কোন ব্যাপারে তুমি আমার বিরোধিতা করলে দ্বীনী দিক থেকে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যদি আমার সম্পূর্ণ অনুকরণ করো তবে পার্থিব দিক থেকে তুমি অস্থিরতার শিকার হবে।

তাওয়াক্কুলের সঠিক মর্ম

হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ) ইরশাদ করেন, খুব লিপ্ততার সাথে দু'আ করা এবং বারবার দু'আ করতে থাকা তাফবীয বা কোন বিষয় আল্লাহ পাকের উপর ছেড়ে দেয়ার পরিপন্থী নয়। তবে দু'আ করার পর তা কবুল হওয়ার কোন নিদর্শন চোখে দেখতে না পেলে অস্থির হয়ে যাওয়া 'তাফবীয' এর পরিপন্থী। কারণ এই অস্থিরতা নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সৃষ্ট। আর নিজের সিদ্ধান্ত সেটাকে 'তাজবীয' বলা হয় সেটা আর আল্লাহ পাকের উপর ছেড়ে দেয়া যেটাকে 'তাফবীজ' একটি অপরটির বিপরীত।

ইলমী এবং আমলী পূর্ণতা তথা দ্বীনী ব্যাপারে পূর্ণতার ক্ষেত্রেও তাফবীযের একটি স্তর রয়েছে, আর তাহলো পূর্ণতা অর্জন করার জন্য ইচ্ছা করতে হবে এবং চেষ্টাও করতে হবে। তবে নিজের কাংখিত পূর্ণতা অর্জিত না হওয়ার উপরও রাযী খুশী থাকতে হবে অস্থির হওয়া যাবে না।

অধম সংকলক বলছে, হাদীস শরীফে একটি বিশেষ দু'আর কথা বর্ণিত হয়েছে। যে দু'আটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো। এ দু'আর মধ্যেও উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি ইশারা করা হয়েছে বলে বুঝে আসে। দু'আটি নিম্নরূপ—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْاَ مَانَةَ وَ حُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضٰى بِالْقَدْرِ

অর্থাত, ইয়া আল্লাহ! আপনার দরবারে আমি সুস্থতা প্রার্থনা করি। আরো প্রার্থনা করি কলঙ্কমুক্ততা, আমানতদারী এবং উত্তম চরিত্র এবং আপনার দরবারে চাই আপনার নির্ধারিত ভাগ্যলিপির উপর সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক।

উপরোক্ত দু'আর মধ্যে প্রথমে কিছু দ্বীনী পূর্ণতা অর্জিত হওয়ার প্রার্থনা করা হয়েছে। আর শেষে যে দু'আটি করা হয়েছে তাহলো যেন

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সর্ব অবস্থায় মহান আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং তাকদীর তথা ভাগ্যলিপির উপর সন্তুষ্ট থাকতে পারি যদিও সেটা আমার আকাংখা ও চেষ্টার বিপরীত হয়।

এ কারণেই হযরত থানবী (রহঃ) শেষ কথার মধ্যে এ কথাও বলেছেন যে, এই পথে (তাসাওউফের পথে) কোন সহজতা নেই যদিও কোনটা দেখতে খুবই সহজ মনে হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা খুবই কঠিন। কারণ এইপথে পরস্পরবিরোধী বস্তুকে একই সাথে একত্রিত করতে হয়।

ইবাদতে একাগ্রতা

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গংগুহী (রহঃ) বলতেন যে, ইবাদতের ক্ষেত্রে মানুষের মনে যেসব ওয়াসওয়াসা ও প্রবঞ্চনা এসে থাকে তা দূর করার জন্য খুব বেশী তাড়াহুড়া করা উচিত নয়, এমনটি ক্ষতিকর হয়ে থাকে। হযরত গংগুহী (রহঃ) আরো বলেন, চিন্তা করা উচিত যে, উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলাকে রাযী ও খুশী করা আর তা অর্জিত হয় নিজের সম্ভব পরিমাণ সময় অন্তরকে অন্যসব চিন্তা ফিকির থেকে মুক্ত রেখে ইবাদতের মধ্যে লিপ্ত থাকার মাধ্যমে। এর পরেও যেসব ওয়াসওয়াসা ও প্রবঞ্চনা অনিচ্ছাকৃতভাবে মনের মধ্যে সৃষ্টি হয় সেটা ক্ষতিকর নয়। তাই এ কারণে বেশী অস্থির হয়ে পড়বে না। এর পরেও মনে ওয়াসওয়াসা ও প্রবঞ্চনা সৃষ্টি হওয়ার কারণে যে মানসিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়ে থাকে সেটা মুজাহাদার অন্তর্ভুক্ত। এর জন্য সে মুজাহাদার সওয়াব লাভ করবে। এজন্য আমার খেয়ালে ঐ ইবাদত যার সাথে ওয়াসওয়াসা ও প্রবঞ্চনা থাকে তাতে সওয়াব ও পুরস্কার অধিক লাভ হয়ে থাকে। একটি হলো ইবাদতের সওয়াব আর অপরটি হলো মুজাহাদার সওয়াব। (তবে সেজন্য শর্ত হচ্ছে, নিজের ইচ্ছায় ওয়াসওয়াসা ও প্রবঞ্চনাকে লালন করা যাবে না। এবং তা অনুসন্ধান করা যাবে না।)

সর্বদা যথার্থ একাগ্রতা তো পরিপূর্ণভাবে বড় বড় ব্যক্তিদেরও লাভ হয় না। সেক্ষেত্রে যদি কোন সালেক বা সাধক একাগ্রতায় স্বল্পতা অনুভব করে, তবে মানসিকভাবে খুব অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। এটিও রহস্য থেকে খালি নয় কারণ এর দ্বারা সবর ও ধৈর্যের সওয়াব লাভ হয়ে থাকে। হাফেয সিরাজী (রহঃ) খুব সুন্দর বলেছেন—

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

باغبان گر چندروزه صحبت گل بایدش　　بر جفائی خار ہجران صبر بلبل بایدش
ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال　　مرغ زیرک چوں بدام افتد تحمل بایدش

অর্থাত, মালি যদি কিছুদিন ফুলের সংস্পর্শে থাকতে চায় তবে ফুলের কাঁটার আঘাতের কষ্টে তাকে বুলবুল পাখির মত ধৈর্য ধারণ করতে হবে। হে মন ! তুমি মুসীবতের জালে আবদ্ধ হয়ে ধৈর্যহারা হয়ে যেও না। (তুমি কি দেখ না?) যেসব পাখি চালাক তারা শিকারীর জালে আবদ্ধ হয়েও ধৈর্যধারণ করে (কারণ সে জানে যদি এখানে অধৈর্য হয়ে হা–হুতাশ শুরু করি তবে আরো বেশী আটকে যাবো।)

সারকথা হলো, নামায এবং ইবাদতের মধ্যে ওয়াসওয়াসা ও প্রবঞ্চনা থেকে বেঁচে থাকা এবং মনকে একাগ্রচিত্ত রাখা ঐ পরিমাণ আবশ্যক যতটুকু নিজের সাধ্যে আছে। কিন্তু এর পরেও যদি তার মধ্যে কিছুটা স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়, তবে তা আল্লাহ পাকের উপর ছেড়ে দেয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। কবির ভাষায়—

گر گریزی بامید راحتے　　ہم ازاں جا پیشت آید آفتے
ہیچ کنجے بے دوا و بے دام نیست　　جز بخلوت گاہ حق آرام نیست

অর্থাত, তুমি যদি শান্তির আশায় বাদশার দরবার থেকে ভেগে যাও তবে তোমার কপালে ভোগান্তি থাকলে দেখবে সেখানেও তোমার সামনে একটা মুসীবত এসে দাঁড়াবে। দুনিয়ার কোন স্থান শান্তির নয়, সেখানে কোন একটা কষ্ট বা ব্যথা অবশ্যই ভোগ করতে হবে। (তবে শান্তির স্থান হলো নির্জনতা) আল্লাহ পাকের সাথে যথার্থ নির্জনতা ব্যতীত আর কোথাও আরাম নেই।

সম্পদের ক্ষেত্রে হক সংরক্ষণ

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, আমি তো মসজিদের সম্পদকে পৃথক রাখার ব্যাপারে সর্বদাই সচেতন দৃষ্টি রাখি যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়ও বটে। এজন্য আমি মসজিদের হাতপাখাগুলোর গায়ে চিহ্ন লাগিয়ে দেই, যাতে সেই পাখা নিয়ে কেউ আমার বৈঠকখানায় কিংবা থাকার ঘরে ব্যবহার করতে না পারে। এছাড়া আমি আমার নিজস্ব মালিকানার জিনিস এবং আমার বিবিগণের মালিকানার জিনিসও পৃথক করে রাখি।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

যখন কোন ঘরে কোন আসবাব দেই তখন একথাও বলে দেই যে, এর মালিক তুমি বা এর মালিক আমি। অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, সারকথা হলো কোনরূপ চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনা ছাড়া এলোমেলো জীবন যাপন করা উচিত নয়। কারণ, এ কথা তো জানা নেই যে, কখন মউত এসে যাবে, তখন কোন্ জিনিসের হকদারকে তা পূর্ব থেকে নির্ধারিত না থাকলে তো সব এলোমেলোই থেকে যাবে।

অধম সংকলক বলছে, হযরত থানবী (রহঃ)–এর এই সচেতনতার ফল এই হয়েছে যে, হযরত (রহঃ)–এর ইন্তিকালের পর কোন একটি জিনিসের ব্যাপারেও এই সংশয় দেখা দেয়নি যে, এটা কি হযরত থানবী (রহঃ)–এর মালিকানাধীন নাকি ঘরের অন্য কেউ এর মালিক। কোন্ বস্তুটি কার মালিকানাধীন তা পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধও করা ছিলো।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, মিরাস বন্টনের ক্ষেত্রে অনেক আলেম এবং বুযুর্গ ব্যক্তিগণও ভুলের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়েন। মিরাস বন্টন করার পূর্বেই শরীকী মাল থেকে ইসালে সওয়াবের নামে সব ওয়ারিসদের অনুমতি না নিয়েই কিছু মাল খরচ করে ফেলা হয়, এবং তাবাররুক হিসাবেও কিছু জিনিস বিতরণ করে দেয়া হয়। যার কারণে অন্যান্য ওয়ারিসদের হক নষ্ট হয় বিধায় সবকিছুই হারাম হয়ে যায়।

হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন, বিশেষ করে নাবালেগ বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ওয়ারিসদের প্রাপ্ত হক সংরক্ষণের ব্যাপারে চূড়ান্ত পর্যায়ের সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী। এক্ষেত্রে অধিকাংশ লোক অলসতা করে থাকে। এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, নাবালেগের কোন মাল সে অনুমতি দিলেও অপরের জন্য তা হালাল হয় না।

নাবালেগের হক

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, যদি কোন ব্যক্তির যিম্মায় নাবালেগের কোন হক ওয়াজিব থেকে থাকে তবে তা আদায় করার সহজ পদ্ধতি হলো, ঐ নাবালেগকে এমন কোন কিছু তৈরী করে (বা ক্রয় করে) দিয়ে দিবে যা বিশেষভাবে সেই ব্যবহার করবে, যেমন জামা–কাপড়, জুতা ইত্যাদি।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য যে জুতা ক্রয় করা হয় বা জামা–কাপড় তৈরী করা হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

এমনটি করা উচিত যে, সেগুলোর মালিক ঐ ছেলে বা মেয়েকে না বানিয়ে নিজের মালিকানায় রেখে দিবে যাতে কোন জুতা বা কাপড় এক বাচ্চার পরনে ছোট হলে তা অন্য বাচ্চাকে ব্যবহার করতে দেয়া যায়। কিন্তু যদি কোন জুতা বা কাপড়ের ক্ষেত্রে কোন একজন ছেলে বা মেয়েকে মালিক বানিয়ে দেয়া হয়, তবে পিতার জন্যও জায়েয নয় সে জামা বা জুতা অন্য কোন ছেলে বা মেয়েকে পরিধান করতে দেয়া।

পবিত্র কুরআনের তরজমা প্রসঙ্গে

পবিত্র কুরআনের একজন অনুবাদক হলেন, ডেপুটি নযীর আহমদ দেহলুভী। হযরত থানবী (রহঃ)–এর সামনে একবার তাঁর কৃত তরজমার প্রসঙ্গটি আলোচনায় এলে হযরত থানবী (রহঃ) নযীর আহমদ সাহেবের তরজমার ব্যাপারে বললেন যে, সে তরজমায় যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা কোন উর্দূ সাহিত্যিকের কাছে খুব পসন্দ হতে পারে (যেহেতু তার মধ্যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ উর্দূ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে) কিন্তু মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহু–এর কথার ভাবমূর্তি ও মর্যাদা থেকে তা অনেক দূরে।

এক ব্যক্তির প্রশ্নের জবাব

একবার এক ব্যক্তি হযরত থানবী (রহঃ)–এর কাছে প্রশ্ন করলো, নামায পাঁচ ওয়াক্ত কেন ফরয করা হলো?

হযরত থানবী (রহঃ) জবাবে বললেন, আপনার নাকটি চেহারার মধ্যে কেন লাগানো হলো কোমরের উপর কেন লাগানো হলো না?

লোকটি বললো, যদি নাক কোমরের উপর লাগানো হতো তবে তা দেখতে খুবই বিশ্রী দেখাতো।

এরপর হযরত থানবী (রহঃ) তাকে পুনরায় বললেন, যদি সব মানুষের নাক কোমরেই লাগানো থাকতো তবে কি হতো (তখন কি আর বিশ্রী দেখা যেতো?)

এবার লোকটি একেবারে চুপ হয়ে গেলো।

অধম সংকলক বলছে, হযরত থানবী (রহঃ) একথা অনেকবার বলেছেন যে, শরীয়তের আহকামের বিভিন্ন হিকমতের মধ্যে অনেকটা তো জানাই আছে। এছাড়া আরো চেষ্টা করতে থাকলে এ ব্যাপারে আরো

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

অতিরিক্ত জ্ঞানলাভ হতে পারে। যেমন এ বিষয়ে লিখা হযরত থানবী (রহঃ)–এর একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রয়েছে যার নাম—

المصالح العقلية فى الاحكام النقلية

(ইসলামী বিধানের যৌক্তিকতা) কিন্তু হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, বান্দার জন্য এমনটি মোটেও কাম্য নয় যে, সে মহান বিধান দাতা আল্লাহ পাকের আরোপিত নির্দেশের ব্যাপারে কারণ ও রহস্যের অন্বেষণে লিপ্ত থাকবে। কেননা এই কারণ ও রহস্য অন্বেষণের ফলাফল তো এই হয়ে থাকে যে, যদি আরোপিত বিধান ও নির্দেশের কারণ খুঁজে বের করতে না পারে এবং তা বুঝতে ব্যর্থ হয় তবে সে বিধানের উপর আমল করাটা কিছুটা কষ্টকর ও বোঝা মনে হতে থাকে। বান্দার কাজ হচ্ছে বন্দেগী করা এবং হুকুম তামিল করা। আর এ কথাও ঠিক যে, কোন ব্যক্তি যত অধিক পরিমাণে মহান বিধাতার হুকুম তামিলে সচেষ্ট হবে শরীয়তের বিধানসমূহের রহস্য ও হিকমত তার সামনে তত অধিক পরিস্কার হতে থাকবে।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, হয়তো কোন এক সময় তোমরা এ ধরনের একটি প্রশ্ন করলে যার হিকমত ও রহস্য আমার জানা আছে কিন্তু তা তোমাদের সামনে বর্ণনা করা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। কারণ একটি বিধানের হিকমত ও রহস্য জানতে পেরে তা তোমাদের খুব পসন্দ হবে। ফলে তোমরা শরীয়তের প্রত্যেক বিধানের রহস্য ও হিকমত খুঁজতে লেগে যাবে। যার দরুন শরীয়তের বিধানকে (বিনা বাক্য ব্যয়ে) অনুসরণ করার যে নির্দেশ রয়েছে তা পূর্ণরূপে আদায় হবে না। এরপর হযরত একটি ফার্সি কবিতার দু'টি চরণ পাঠ করেন—

مصلحت نیست کہ از پردہ بروں افتد راز

ورنہ در مجلس رندان خبرے نیست کہ نیست

অর্থাত, রহস্যকে গোপনীয়তার পর্দা ভেদ করে প্রকাশ করে দেয়া ঠিক নয়। অন্যথায় বুযুর্গানে দ্বীনের মজলিসে এমন কোন খবর নেই যার রহস্য তার জানা নেই।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

খাজা আযীযুল হাসান মাজযূব (রহঃ) প্রসঙ্গে

হযরত থানবী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, খাজা আযীযুল হাসান মাজযূব সাহেব বড় বড় সরকারী পদে থেকে কাজ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নিজের লেবাস–পোশাক এবং সুরত–শেকেল সর্বদা খুব সাদাসিধা এবং শরীয়ত অনুযায়ী ঠিক রেখেছেন। একজন জার্মানী খৃষ্টান তাঁকে দূর থেকে দেখেই মন্তব্য করলো, এ ব্যক্তিকে তো অত্যন্ত ভদ্রলোক বলে মনে হয়।

খৃষ্টান লোকটির কথা থেকে বুঝা যায় যে, যে সব লোক খৃষ্টানদের কৃষ্টি–কালচার অনুকরণ করে চলে খোদ খৃষ্টানদের নজরেও তারা ভদ্রতা পরিপন্থী কাজ করছে। আর এটা বাস্তবেও ঠিক। কারণ যারা নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্য আত্মসম্ভ্রমবোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ রক্ষা করে না তারা নিঃসন্দেহে ভদ্রতা বিবর্জিত কাজই করছে।

বিভিন্ন প্রকারের যিকির

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আমি যখন পবিত্র মক্কা শরীফে হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব মুহাজেরে মক্কী (রহঃ)–এর খিদমতে অবস্থান করছিলাম তখন আমার মনে খেয়াল হলো যে, 'গেযায়ে রূহ' (রূহের খোরাক) নামক কিতাবে হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) যেসব যিকিরের কথা উদ্ধৃত করেছেন তার প্রত্যেক পদ্ধতিতে দুই দুই দিন করে আমল করে দেখবো। কিন্তু তার উপর আমল শুরু করার পূর্বে হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) থেকে যখন অনুমতি চাইলাম তখন হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) বললেন, এটা কি কোন কিতাবের সবক যে, সবটাই পড়ে নিতে হবে। এটা তো ডাক্তারের দোকান যেখানে হাজারো রকমের ঔষধ আছে। সব ঔষধই সব রুগীর জন্য উপকারী হয় না। সুতরাং যে ঔষধ যার মনে চাইলো সে তাই দাওয়াখানা থেকে নিয়ে খেতে শুরু করবে এমনটি তো হতে পারে না। এতে হিতে বিপরীত হওয়ারই সম্ভাবনাই বেশী।

অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, সুফিয়ায়ে কিরাম যেসব যিকিরের কথা লিখেছেন তার লক্ষ্য শুধু এতটুকু যে, তার দ্বারা মনে একাগ্রতা সৃষ্টি হবে। বিভিন্ন ওয়াসওয়াসা ও প্রবঞ্চনা থেকে অন্তর মুক্ত হয়ে যাবে। ঐসব যিকিরের শাখা–প্রশাখা সবই তো আর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় বরং তার আসল ও প্রকৃত বিষয় হাদীস শরীফ দ্বারা

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

প্রমাণিত। নামাযের ক্ষেত্রে নামাযীর সামনে যে একটা লাঠি গেড়ে দিয়ে 'সুতরা' কায়েম করা হয় তা দ্বারাও উদ্দেশ্য হলো নামাযের মধ্যে একাগ্রতা সৃষ্টি হওয়া।

ঐ সকল উদ্ধৃত যিকিরসমূহকে যদি কেউ ইবাদতে মাকসূদাহ বা প্রকৃত উদ্দেশ্যমূলক ইবাদত মনে করে বসে, তবে তা বিদ'আতে পরিণত হয়ে যাবে।

যেমন সর্দি ও জ্বরের সময় 'গুলে বানাফশাহ' (এক ধরনের ঔষধি উপাদান) পান করতে হয়। এটাকেও যদি কেউ মৌলিক ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত মনে করে তবে তাও বিদ'আত বলে গণ্য হবে।) পক্ষান্তরে কেউ যদি তাকে একটি সুস্থতার জন্য ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবহার করে তবে তা জায়েয হবে। কেননা সুস্থতা অর্জন করা তো জায়েয বরং এজন্য মানুষকে নির্দেশও দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে ঐ সকল উদ্ধৃত পদ্ধতির যিকির-শোগলকে যদি কেউ ইবাদতে একাগ্রতা লাভের উদ্দেশ্যে আমল করে তবে তা জায়েয হবে কিন্তু ঐ সকল পদ্ধতিকে মৌলিক ইবাদত (ইবাদতে মাকসুদাহ) মনে করে যদি আমল করা হয় তবে তা বিদ'আত বলে গণ্য হবে। একই বিধান যিকরে জলীর (উচ্চস্বরে যিকির) ব্যাপারেও, অর্থাত কেউ যদি অন্তর থেকে ওয়াসওয়াসা দূর করা এবং মনে একাগ্রতা সৃষ্টির একটি ব্যবস্থা মনে করে উচ্চ আওয়াযে যিকির করে তবে তা জায়েয। কিন্তু এই উচ্চস্বরে যিকিরকেই যদি মৌলিক ইবাদত বা ইবাদতে মাকসূদাহ বানিয়ে করা হয় তবে তা বিদ'আতে পরিণত হয়ে যাবে।

হাদিয়া গ্রহণ করা প্রসঙ্গে

হযরত থানবী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেন; কেউ যদি এই মনে করে কাউকে হাদিয়া দেয় যে, এ ব্যক্তি অত্যন্ত নেককার ও বুযুর্গ লোক, আর প্রকৃতপক্ষে সে যদি এরূপ না হয় তবে তার জন্য হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েয হবে না।

উপরোক্ত কথা শুনে হযরত থানবী (রহঃ)-এর সাগরেদ মাওলানা রশীদ আহমদ কানপুরী প্রশ্ন করলেন, এর ফলাফল তো এই দাঁড়ায় যে, হাদিয়া দেয়া এবং হাদিয়া গ্রহণ করা কোনটাই জায়েয হবে না। কারণ যে ব্যক্তিকে নেককার এবং বুযুর্গ মনে করে হাদিয়া দেয়া হচ্ছে সে নিজেও যদি নিজেকে নেককার বুযুর্গ ধারণা করতে থাকে তবে এটা নিজেকেই

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

নিজে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বলে দাবী করার শামিল। পবিত্র কুরআনে এমনটি করতে বারণ করে ইরশাদ করা হয়েছে—

وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ

অর্থাত, তোমরা তোমাদের নিজেদের প্রবৃত্তিকে ত্রুটিমুক্ত বলে জাহির করো না।

সুতরাং যে ব্যক্তি নিজেকে নিজে ত্রুটিমুক্ত বুযুর্গ ও নেককার ধারণা করবে তার সে কাজ পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতের লংঘন হওয়ার কারণে তা গুনাহের কারণ। আর ঐ হাদিয়া গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি নিজেকে কোন নেককার বুযুর্গ বলে ধারণা না করে তবে হযরত ইমাম গাযযালী (রহঃ)–এর গবেষণা মতে তার জন্য হাদিয়া গ্রহণ করা বৈধ নয়।

এ প্রসঙ্গে হযরত থানবী (রহঃ) জবাব দিলেন যে, হযরত ইমাম গাযযালী (রহঃ)–এর উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে লোকদের মাঝে নিজের নেককারী ও বুযুর্গীর ধারণা সৃষ্টি করে এই আশায় যাতে লোকেরা তাকে হাদিয়া দেয় তবে এমনটি হারাম। কারণ এটিও এক ধরনের ধোঁকা। কিন্তু যদি কোনরূপ ইচ্ছা বা চেষ্টা ছাড়াই লোকেরা কারো সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করতে থাকে এবং তাকে নেককার ও বুযুর্গ মনে করে তার বরাবরে হাদিয়া পেশ করে অথচ যাকে হাদিয়া দেয়া হচ্ছে তার মনে ধারণা হলো, আমি আসলে ঐ রকম কেউ নই তবে এ অবস্থায় হাদিয়া কবুল করা নিষিদ্ধ নয়। (জুমাদাস সানিয়াহ ১৩৫৮ হিজরী)

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব ছাহেব (রহঃ)

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, শৈশবকাল থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত মুত্তাকী এবং পরহেযগার। প্রসিদ্ধি এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্য লাভ করার প্রতি তার ছিলো কঠিন ঘৃণা। তিনি বলতেন, দু' চার হরফ ইলম যা শিখেছিলাম সে কারণেই প্রসিদ্ধির মুসীবতে লিপ্ত হয়ে পড়েছি। আর তা না হলে আমি অন্য এক ধারায় একেবারে গোপনীয় জীবন যাপন করতাম।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

আল্লামা শিবলী নো'মানী (রহঃ)-এর কথা

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, হযরত উবাইদুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ) যখন দিল্লীতে 'নিযারাতুল মা'আরিফ' নামক প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন তিনি একবার থানাভবন এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমি আল্লামা শিবলী নো'মানীর সাথে সাক্ষাত করেছি এবং তার সাথে ব্যাপকভাবে মুসলমানদের পথভ্রষ্টতা, তাদের অস্থিরতা এবং বিভিন্ন বিপদাপদে লিপ্ত হয়ে পড়ার বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। আমি (মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছি, আপনার দৃষ্টিতে জাতির ইসলাহ বা সংশোধনের উপায় কি?

আল্লামা শিবলী নো'মানী জবাবে বললেন, জাতির সংশোধন শুধু তাঁরাই করতে পারেন জাতির উপর যাঁদের পরিপূর্ণ প্রভাব রয়েছে এবং যাদের প্রতি জাতির প্রতিটি নাগরিকের শ্রদ্ধা বিদ্যমান আছে। আর এই প্রভাব এবং শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠা করা নিজের মধ্যে সার্বিক পরিচ্ছন্নতা ছাড়া সম্ভব নয়। আর এ সার্বিক পরিচ্ছন্নতা তাকওয়া, অধিক পরিমাণে ইবাদত এবং আল্লাহর যিকির ছাড়া সৃষ্টি হতে পারে না।

মেহমানের সম্মান

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, আমার কাছে মিষ্টার গান্ধীও যদি মেহমান হয়ে আসেন তবে তাকেও আমি সম্মান দেখাবো, মেহমানদারী করবো। তবে সেখানে একটা শর্ত অবশ্যই আমি লাগিয়ে দেবো আর তা হলো সে এখানে এসে তার চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণার প্রতি কাউকে দাওয়াত দিতে পারবে না। সে সুযোগ তাকে মোটেও দেয়া হবে না।

শরীয়ত বিরোধী রাজনৈতিক কর্মসূচী মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর নয়

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, ঐ সকল রাজনৈতিক কর্মসূচী ও ব্যবস্থা যার কিছুটা থাকে ইসলাম সম্মত আর কিছু থাকে শরীয়ত পরিপন্থী কুফরী। ইসলাম ও কুফরের সংমিশ্রণে তৈরী সে কর্মসূচী যখন কোন কাফির গোষ্ঠী অবলম্বন করে তখন তারা খানিকটা ইসলামের কাছাকাছি এসে যায়। আর সেজন্য তারা সে কর্মসূচীতে সফলকাম হয়। আর ঐ একই কর্মসূচী যখন কোন মুসলমান দলের

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

লোকেরা গ্রহণ করে তখন তারা ইসলাম থেকে সরে এসে কুফরীর কাছাকাছি হয়ে যায়। আর এ কারণেই তারা সে কর্মসূচীতে সফলকাম হতে ব্যর্থ হয়। মুসলমান জাতির একটি স্বতন্ত্র মেযায ও প্রকৃতি রয়েছে তাকে বিভিন্ন কাফির সম্প্রদায়ের স্বভাব প্রকৃতির সাথে তুলনা করা হলে তা হবে নিতান্তই ভুল। যেমন এক নির্বোধ লোকের একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। ঘটনাটি নিম্নরূপ—

একবার কোন এক গ্রামের একজন লোক খেজুর গাছে উঠলো। এরপর সে যখন গাছ থেকে নামার ইচ্ছা করলো তখন সে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করতে লাগলো এবং সে চিৎকার করে লোকদের ডেকে বলতে লাগলো 'আমাকে গাছ থেকে নামানোর ব্যবস্থা করে আমার প্রাণ রক্ষা করো'। তার চিৎকার শুনে লোকেরা এসে জড়ো হলো এবং তাকে কিভাবে নামানো যায় সে ব্যাপারে সে গ্রামের অপরিণামদর্শী মতিভ্রম মোড়লের কাছে পরামর্শ চাইলো। যার কাছে পরামর্শ চাইলো সে লোকটি আসলে ছিলো নির্বোধ। সে পরামর্শ দিলো, তোমরা একটি মজবুত রশি নাও এবং সে রশিটির একমাথা নিচের থেকে নিক্ষেপ করে ঐ গাছের লোকটির হাতে ধরিয়ে দাও, অতঃপর তোমরা তাকে বলো সে যেন রশিটি শক্তভাবে তার কোমরের সাথে বেঁধে নেয়। এরপর তোমরা সকলে মিলে সজোরে এক টান মারো। দেখবে লোকটি নিচে নেমে আসবে। বুঝতে আর কারো বাকি নেই যে, সেখানে কোন ধরনের জ্ঞানী (?) লোকেরা একত্রিত হয়েছিলো। ঐ মোড়লের পরামর্শ মতই কাজ করা হলো সেমতে খেজুর গাছে আরোহণকারী লোকটিও এক মিনিটে নিচে নেমে এলো ঠিক কিন্তু তার হাত–পা, হাড্ডি–গুড্ডি সবই ভেঙ্গে গুড়ো হয়ে গেলো, লোকটিও সাথে সাথে মারা গেলো। অবস্থা দেখে লোকেরা তাদের সে মহান পরামর্শক সাহেবের (?) কাছে দৌড়ে গিয়ে জানালো যে, লোকটি তো মারা গেছে। লোকটি অত্যন্ত অভিজ্ঞ লোকের মত জবাব দিলো, মরে গেলে আর কি করা যাবে, তার মউত এসে গিয়েছিলো তাই সে মারা গেছে, মউতের হাত থেকে কি কেউ কাউকে বাঁচাতে পারে? তাই যদি না হবে তবে আমি যে পদ্ধতি তোমাদের বলে দিয়েছিলাম তা তো বিলকুল ঠিক ছিলো। এটি বহুবার পরীক্ষিত হয়েছে। যেমন আমি কুয়ার মধ্যে পড়ে যাওয়া অনেক লোককে এ পদ্ধতিতেই কুয়া থেকে উদ্ধার করে তাদের প্রাণ রক্ষা করেছি।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

মতিভ্রম পরামর্শদাতা লোকটি কুয়ার গভীরতার সাথে খেজুর গাছের উচ্চতাকে তুলনা করেছে। সুতরাং সাথে সাথেই তার ভ্রান্ত তুলনা করার ফলাফল সামনে এসে গেছে।

ঠিক অনুরূপভাবে মুসলমানগণ আল্লাহ তা'আলার নিকট উচ্চতায় রয়েছে। আর কাফির গোষ্ঠী নীচে বা গভীরতায় নিমজ্জিত আছে। সুতরাং এ উভয় গ্রুপের মুক্তির জন্য একই পন্থা ফলপ্রসূ হওয়া মোটেও আবশ্যকীয় নয়।

প্রত্যেক কাজে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আমার এক মামা খুব দরবেশ মানুষ ছিলেন। তবে তিনি ছিলেন বেশ মুক্তচিন্তার লোক। এ কারণে অনেক ব্যাপারেই তার সাথে আমার মতের মিল হতো না। সে বিভিন্ন আয়াত এবং হাদীস দ্বারা নিজে যা বুঝতেন সেভাবেই দলীল প্রমাণ পেশ করতেন, যা শরীয়তের নীতিমালার বিচারে আমার কাছে সঠিক মনে হতো না। কিন্তু তার একটি দলীল আমার কাছে খুব পসন্দ হয়েছে। তিনি বলেছেন, মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে হযরত দাউদ (আঃ)কে লৌহবর্ম (যুদ্ধে ব্যবহৃত লোহার পোশাক) প্রস্তুত করতে শিখানোর কথা বিবৃত হয়েছে সেখানে মহান আল্লাহ এ কথাও ইরশাদ করেছেন—

قَدِّرْ فِى السَّرْدِ

অর্থাত, লৌহবর্মের লোহার কড়াগুলো সব সমান হতে হবে।

কারণ হলো, লোহার কড়াগুলো যদি ছোটবড় হয় তবে সে কারণে যুদ্ধের ময়দানে তা দ্বারা কাজ নেয়ার ক্ষেত্রে যদিও কোন ব্যাঘাত হবে না কিন্তু তা সুষ্ঠু ও সুন্দর ব্যবস্থাপনা ও সামঞ্জস্যতার পরিপন্থী এবং এর কারণে লৌহবর্মের সৌন্দর্য বিঘ্নিত হয়ে যায়। (এ থেকে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক কাজে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, সামঞ্জস্যতা ও সৌন্দর্য রক্ষা করা শরীয়তেরই দাবী।)

বুযুর্গানে দ্বীনের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাসের মাপকাঠি

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, আমি আমার যেসব বুযুর্গানে দ্বীনের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস ও আস্থা রাখি তার ভিত্তি এই নয় যে, আমি

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

তাদেরকে অন্য সকলের চাইতে বড় আলেম মনে করি। কারণ আমি এ সম্ভাবনায় বিশ্বাসী যে, দুনিয়ায় তাদের চাইতেও বড় আলেম মওজূদ আছেন।

আমার বরং তাদের প্রতি ভক্তি–বিশ্বাসের সবচাইতে বড় কারণ হলো, এসব লোকেরা আল্লাহওয়ালা ছিলেন। তারা দুনিয়াদার ছিলেন না, তারা দুনিয়ায় বসবাস করেছেন ঠিক কিন্তু দুনিয়ার হাওয়া তাদের গায়ে লাগতে পারেনি। দুনিয়ার ধনসম্পদ ও সম্মানের লোভ করা থেকে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে বিরত থেকেছেন। তাদের শুধু কাজ ছিলো দ্বীনের দাওয়াত ও দ্বীনের চাহিদা পূরণ করা। এতে যদি তাদের নিজেদের সমস্ত সুযোগ–সুবিধা নষ্টও হয়ে যেতো তবুও তারা দ্বীনের চাহিদা ও দ্বীনী স্বার্থকেই অগ্রগণ্য বিবেচনা করতেন।

একটি আয়াতের তাফসীর থেকে সংশয় নিরসন

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, পবিত্র কুরআনের আয়াত—

لِمَا تَقُوْلُوْنَ مَالَا تَفْعَلُوْنَ

অর্থাত, ‘তোমরা কেন বলো এমন কথা যা তোমরা নিজেরা করো না।’

এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে কেউ কেউ এমনটি বুঝে থাকে যে, কোন ব্যক্তি নিজে যে নেক আমল করে না, সে নেক আমলের প্রতি অন্যকে দাওয়াত দেয়া তার জন্য জায়েয নয়। অথচ এ আয়াতের এমন মর্ম জ্ঞান করা নিতান্তই ভুল। আর এ ভ্রান্তির প্রকৃত কারণ হলো তারা এ আয়াতকে দাওয়াতের আয়াত বলে বুঝে থাকে অথচ এটি দাওয়াত সংক্রান্ত আয়াত নয় বরং এটি হলো দাবী সংক্রান্ত আয়াত এবং এর মর্ম হলো, যে গুণ তোমাদের মাঝে বিদ্যমান নেই, সে গুণের দাবী তোমরা কেন করো। অর্থাত, যে কাজ তোমরা করোনি এবং যে গুণ তোমাদের মাঝে নেই, সে কাজ করেছো বলে এবং সে গুণ তোমাদের মাঝে বিদ্যমান আছে বলে তোমরা দাবী করো না।

কাজের মাধ্যমে কিছু দাবী করাও নিষিদ্ধ

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, মুখের কথা দ্বারা যেমন কোন

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

ব্যক্তির এমন কোন কাজ বা এমন কোন গুণের দাবী করা জায়েয নয় যা ঐ ব্যক্তির মাঝে নেই। ঠিক তেমনি নিজের কাজ–কর্ম, সূরত–সীরত এবং চালচলন দ্বারাও এ প্রকারের দাবী নিষিদ্ধ। একটি হাদীসের মর্ম অনুধাবন করার ক্ষেত্রে অনেক সময় একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। উপরের আলোচনা দ্বারা সে প্রশ্নেরও অবসান ঘটে।

হাদীস শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে, আসহাবে সুফফার মধ্য হতে একবার এক সাহাবীর (রাযিঃ) ইন্তিকাল হলো। ইন্তিকালের পর তাঁর জামার পকেটে একটি দিনার (সাড়ে চার মাশা স্বর্ণের একটি মুদ্রা) পাওয়া গেলো। বিষয়টি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবগত করানো হলে তিনি বললেন—

كية من النار

অর্থাত, 'এটি জাহান্নামের আগুনের একটি দাগ স্বরূপ।'

অতঃপর অপর একজন সাহাবীর ইন্তিকালের পর তার জামার পকেটে দুটি দিনার পাওয়া গেলো। এবারও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পেরে বললেন—

كيتان من النار

অর্থাত, এ দু'টি দিনার জাহান্নামের আগুনের দু'টি দাগস্বরূপ।

এ হাদীসের উপর প্রশ্ন হয় একটি বা দু'টি দিনারের উপর তো যাকাতও ওয়াজিব হয় না। যদি যাকাত ওয়াজিব হতো তবে বুঝা যেতো যে, সে যাকাত আদায় না করার কারণে হয়তো জাহান্নামের ভয় ও ধমকীর কথা আসতে পারে। এছাড়া কেউ একটি বা দুটি দিনারের মালিক হওয়াও শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন অপরাধ নয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)–এর কাছে চল্লিশ হাজার দিনার ছিলো, যা তিনি ইসলামের বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যয় করেছেন। যখন তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সাথে হিজরত করেন তখনো তাঁর কাছে সাত হাজার দিনার অবশিষ্ট ছিলো। সেগুলো তিনি হিজরতের সফরে সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর আদেশ মতে বিভিন্ন প্রয়োজনে তা খরচ করেছেন।

এছাড়া হযরত উসমান গনী (রাযিঃ) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযিঃ) হযরত যুবাইর (রাযিঃ) প্রমূখ সাহাবী (রাযিঃ)গণ যথেষ্ট

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। হাজার হাজার দিনারের মালিক ছিলেন তাঁরা। কিন্তু তাঁদের ব্যাপারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ধমকীমূলক বক্তব্য পেশ করেননি। অথচ ঐ দু'জন সাহাবী (রাযিঃ)–এর এক–দুই দিনারের উপর এত বড় কঠিন সতর্ক বাণী প্রকাশ করলেন এর কারণ কি?

উপরোক্ত বিষয়টির ব্যাপারে হযরত কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ) যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা হলো, আসহাবে সুফফার সদস্য হযরত সাহাবায়ে কিরাম তাদের বাহ্যিক অবস্থা ও আকার আকৃতিতে যেন এ কথারই দাবীদার ছিলেন যে, 'আমরা দুঃস্থ আমাদের কাছে কোন অর্থ সম্পদ নেই' তারা মুখে একথা না বললেও তাদের কাজে এ দাবীই প্রকাশ পেতো। তাদের পকেটে দিনার থাকা যেহেতু তাদের বাহ্যিক অবস্থা ও বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এ কারণে তাদের ব্যাপারে ধমক বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

সাধারণ লোকের আস্থা অর্জন লক্ষ্যণীয় নয়

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আমি চিন্তা করি যে, যদি কোন ব্যক্তি আমার প্রতি আস্থাশীল হয়ে আমার ভক্ত হয়ে যায় তাতে দ্বীনের কি ফায়দা হলো। অনুরূপ কেউ যদি আমার উপর আস্থাশীল বা আমার ভক্ত না হয় তাতেই বা দ্বীনের কি ক্ষতি। বরং যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখা হয় তবে দেখা যাবে যে, দুনিয়ারও কোন ক্ষতি নেই।

লেবাস–পোশাকে লৌকিকতা

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, আমি যখন কোন লোককে লেবাস পোশাকে খুব লৌকিকতা করতে দেখি, তখন সেটাকে দুটি বিষয়ের প্রমাণ বলে মনে করি। প্রথমতঃ লোকটি অকর্মা কারণ, যেসব লোক কাজে ব্যস্ত থাকে তারা কখনো লেবাস–পোশাকে লৌকিকতা করার ব্যাপারে যত্নবান হয় না। দ্বিতীয়তঃ লোকটি নিতান্তই সংকীর্ণ চিন্তা–চেতনার লোক, তার সামনে কোন মহৎ উদ্দেশ্য নেই। যদি তাই থাকতো তবে লেবাস–পোশাকের পিছনে পড়ে নিজের সময় নষ্ট করতে পারতো না।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

আল্লাহ্ পাকের রহমতের একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা

হযরত থানবী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এক মূর্খ মহিলা ইন্তিকালের সময় মুখে কিছু শব্দ উচ্চারণ করছিলো। ঐ মহিলার পরিবারের মূর্খ লোকেরা তার সে শব্দগুলোর কোন অর্থই বুঝতে পারলো না। তাই তারা একজন আলেমকে ডেকে আনলো এবং বললো, এর কথা আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। সুতরাং আপনি একটু শুনে দেখুন তো কিছু বুঝতে পারেন কিনা। আলেম ব্যক্তি তখন ঐ মহিলার কাছাকাছি গিয়ে কান লাগিয়ে শুনলেন যে, সে মহিলা আরবী ভাষায় বলছে—

ان هذين الرجلين يقولان ادخل الجنة

অর্থাত, এই দুই ব্যক্তি আমাকে বলছেন যে, তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর।

এ কথা শুনে ঐ আলেম সাহেব খুব হয়রান হয়ে গেলেন। তিনি পরিবারের মূর্খ লোকদের লক্ষ্য করে বললেন, তাকে তো বেহেশতের সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে। সে এমন কি আমল করতো যার কারণে সে এই সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারলো? লোকেরা জবাব দিলো, এ মহিলার তো কোন নেক আমল ছিলোই না। বরং সে ছিলো একজন বদ আমল মহিলা। মাওলানা সাহেব সকলকে লক্ষ্য করে আবার বললেন, আপনারা একটু গভীরভাবে ভেবে দেখুন নিশ্চয়ই তার কোন নেক আমল ছিলো যা আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়ে গেছে, সে নেক আমলটি কি?

অনেক চিন্তা-ভাবনার পর লোকেরা জানালো যে, এ মহিলার একটি বিশেষ অভ্যাস ছিলো এই যে, যখনই আযান হতো তখন সে অন্য সব কাজ বন্ধ করে দিতো এবং খুব গুরুত্ব সহকারে আযান শুনতো। অন্য কাউকেও তখন সে কোন কথা বলতে দিতো না। মাওলানা সাহেব তখন বললেন, মহান আল্লাহ পাকের নামের প্রতি এ সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টিই হয়তো আজ তার কাজে লেগে গেছে, যে ভাল কাজটি অন্য সকল মন্দ কাজকে ধুয়ে সাফ করে দিয়েছে।

মহান আল্লাহ পাকের ব্যাপক দয়া-অনুগ্রহ ও রহমতের এ ঘটনাটি বর্ণনা করার পর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, মহান আল্লাহ পাকের রহমতের ব্যাপারে ইনশার নিম্নোক্ত শেরটি আমার কাছে খুবই পসন্দনীয়। শেরটি হলো—

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

تصدق اپنے خدا کے جاؤں کہ مجھ کو آتا ہے پیار انشاء

ادھر سے ایسے گناہ پیہم ادھر سے یہ دمبدم عنایت

অর্থাত, আমি নিজের জন্য আমার প্রভুর তরে উৎসর্গ ও কুরবান হয়ে যাওয়াই পসন্দ করি। আমার মনে শুধু তারই প্রেম উথলে উঠে। একদিকে আমার তো রয়েছে হাজারো গুনাহ আর অপরাধ আর অপরদিকে মহান আল্লাহর সীমাহীন অনুগ্রহ।

অধম সংকলক বলছে যে, উপরোক্ত ঘটনা থেকে এ কথাও বুঝে আসে যে, ইন্তিকালের পর আলমে বরযখে এমনিতেই সকলের ভাষা আরবী হয়ে যাবে। কেননা আরবীই হলো মানুষের আসল দেশ অর্থাত জান্নাতের ভাষা। এ ভাষাতেই মহান আল্লাহ তার সকল কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। অতঃপর নবী (আঃ)গণ তাকে নিজ নিজ ভাষায় অনুবাদ করে উম্মতকে শুনিয়েছেন। (আল-ইতকান, আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ))

এক বুযুর্গের একটি কারামত

'জামে' কারামাতিল আউলিয়া' নামক গ্রন্থের মিসরী সংস্করণে হযরত কারশী মাজযূম (রহঃ)-এর একটি আশ্চর্য ঘটনার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। ঘটনাটি হলো হযরত কারশী (রহঃ) উচ্চস্তরের বুযুর্গ ও আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত। এ কারণে অপরের কষ্ট হবে ভেবে তিনি বিবাহ থেকে বিরত ছিলেন। তবে তিনি যেহেতু নওজোয়ান ছিলেন, তাই তাঁর মাঝে বিবাহের মানসিক চাহিদা বিদ্যমান ছিলো। সে চাহিদা অনুভব করে একবার তিনি আপন মুরীদদের সামনে বললেন, এবার আমি বিবাহ করার ইচ্ছা করেছি। সুতরাং তোমরা আমার পক্ষ থেকে বিবাহের পয়গাম পাঠাতে পারো। তবে যেখানেই বিবাহের পয়গাম পাঠাবে সেখানে আমার পূর্ণ অবস্থা বর্ণনা করবে। আমার সার্বিক অবস্থা জেনে যদি কোন মহিলা আমার সাথে বিবাহে সম্মত হয়ে যায় তবে তো ভাল, আর তা না হলে আমি সবর করবো।

এ কথা শুনে একজন মুরীদ তৎক্ষণাত উঠে নিজের বাড়ী গেলো। তার এক মেয়ে ছিলো প্রাপ্তবয়স্কা। সে তার মেয়েকে ঐ বুযুর্গ পীর সাহেবের সকল অবস্থা বর্ণনা করে জিজ্ঞাসা করলো, সে তার কাছে বিবাহ

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

বসতে রাযী আছে কিনা? জবাবে ঐ মেয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে জবাব দিলো, আমি রাযী আছি। এ উত্তর শুনে ঐ মুরীদ খুশী হয়ে পুনরায় ঐ বুযুর্গ পীর সাহেবের দরবারে ফিরে এসে জানালো, আমার কন্যা আপনার সাথে বিবাহে সম্মতি প্রকাশ করেছে। বুযুর্গ পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি তার কাছে আমার পূর্ণ অবস্থার কথা বর্ণনা করেছো? মুরীদ উত্তর দিলো, আমি আপনার সকল অবস্থা তার কাছে পরিষ্কার ভাষায় খুলে বলেছি। সব শুনে আমার মেয়ে উত্তর দিয়েছে, আমি ঐ বুযুর্গের খেদমত করতে পারাকে আমার দ্বীনী সৌভাগ্যের বিষয় মনে করি। বিধায় আমি তাঁকে গ্রহণ করতে রাযী আছি। সেমতে ঐ বুযুর্গের সাথে ঐ মেয়ের বিবাহ সম্পাদিত হয়ে গেলো।

হযরত কারশী (রহঃ) ছিলেন কারামতের অধিকারী অলৌকিকত্ব সম্পন্ন বুযুর্গ। ঐ মেয়ের উন্নত ধ্যান–ধারণা ও প্রশস্ত চিন্তা–চেতনার কথা শুনতে পেয়ে তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করলেন—'ইয়া আল্লাহ! আমি যখন আমার স্ত্রীর কাছে যাই তখন যেন আমার সুরত সুন্দর ও সুদর্শন হয়ে যায়।' আল্লাহ পাক তাঁর ফরিয়াদ কবুল করলেন। তিনি যখন নিজের ঘরে স্ত্রীর কাছে গেলেন তখন তার শরীরে কুষ্ঠ রোগের কোন চিহ্নই থাকলো না। তিনি একজন সুস্থ, সুঠাম, সুদর্শন যুবকে পরিণত হলেন। ঐ মেয়ে (বর্তমানে যে তাঁর স্ত্রী) তাকে দেখেই পর্দায় লুকিয়ে গেলো এবং বললো, আপনি কে? এখানে কেন এসেছেন?

বুযুর্গ উত্তর দিলেন, আমি কারশী, তোমার স্বামী। মেয়েটি উত্তর দিলো, আপনি আমার স্বামী নন। কারণ আমার স্বামী কুষ্ঠ রোগী। একথা শুনে হযরত কারশী মাজযূম (রহঃ) নিজের কারামতের কথা বিস্তারিতভাবে তাকে শুনিয়ে বললেন, এখন থেকে আমি যখনই তোমার কাছে আসবো তখনই আমার এ সুন্দর সুদর্শন আকৃতি তৈরী হয়ে যাবে, প্রতিবার এ আকৃতিতেই আমি তোমার কাছে আসবো।

সম্মানিত পাঠক! মেয়েটির উন্নত ধ্যান–ধারণা ও উচ্চাঙ্গের হিম্মতের বিষয়টি লক্ষ্য করুন। মেয়েটি জবাব দিলো, আফসূস ও পরিতাপের বিষয় এই যে, আপনি আমার খালেস নিয়্যত এবং তার সওয়াব নষ্ট করে দিলেন। আমি শুধু আপনার সাথে বিবাহে এজন্য সম্মত হয়েছি যে, আপনাকে মা'যূর (অপারগ) মনে করে আপনার খেদমত করে সওয়াব হাসিল করবো। দুনিয়ার ভোগ–বিলাস কিংবা

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করার জন্য নয়। সুতরাং আপনি যদি আপনার আসল সূরত এবং প্রকৃত অবস্থায় আমার সাথে মিলতে চান তবে আমি আপনার খেদমত করার জন্য প্রস্তুত আছি। আর তা না হলে আপনি আমাকে তালাক দিয়ে দিন। হযরত কারশী (রহঃ) এ কথা শুনে নিজের আসল সূরতে চলে এলেন, কুষ্ঠ রোগ তার শরীরে এসে গেলো এবং মেয়েটি এ অবস্থাতেই ঐ বুযুর্গের সাথে ঘর-সংসার করতে থাকলো।

হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ) প্রসঙ্গে হযরত নানূতবী (রহঃ)-এর সাক্ষ্য

হযরত থানবী (রহঃ) হযরত নানূতবী (রহঃ)-এর একটি কথার বর্ণনা দিয়ে বলেন, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানূতবী (রহঃ) বলতেন, বর্তমানে যদি কেউ এই কসম করে যে, আজকে অবশ্যই আমি একজন 'ফকীহ' (ইসলামী আইনে পারদর্শী কোন ব্যক্তি)-এর দর্শন লাভ করবো তবে সে ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের কসম থেকে দায়মুক্ত হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ)-এর দর্শন লাভ করবে।

উপরোক্ত কথাটির মর্ম এই ছিলো যে, আমাদের এতদঞ্চলে হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ) এমন একমাত্র ব্যক্তি যাকে 'ফকীহ' বলা যায়। তার বর্তমানে অন্য কেউ ফকীহ উপাধি পাওয়ার উপযুক্ত নয়।

এ কথাটি বর্ণনা করার পর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আমাদের পূর্বসূরী বুযুর্গানে দ্বীনের কথার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, সে কথার মধ্যে কোনরূপ অতিরঞ্জন, বাড়াবাড়ি কিংবা লৌকিকতা ছিলো না।

অসুস্থাবস্থায় হযরত নানূতবী (রহঃ)

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, একবার হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানূতবী (রহঃ) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুস্থতা হেতু পানি ব্যবহার করা তার জন্য ক্ষতিকর ছিলো। তা সত্ত্বেও হযরত নানূতবী (রহঃ) কষ্ট স্বীকার করে উযূই করতেন। লোকেরা তখন আবেদন করলো, হযরত! আপনার জন্য এ অবস্থায় তায়াম্মুম করা জায়েয, তার পরেও আপনি কেন এত কষ্ট স্বীকার করে উযূ করেন? আপনি বরং তায়াম্মুম করুন। কিন্তু এর পরেও হযরত নানূতবী (রহঃ) আযীমত তথা উন্নত দিকটি নিজের আমলে রাখার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করে উযূ করতেন।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

একবার হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) হযরত নানূতবী (রহঃ)-এর সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য এসে যখন এ অবস্থা দেখতে পেলেন তখন তিনি হযরত নানূতবী (রহঃ) কে বললেন, এ অবস্থায় রুখসাত তথা সহজ দিকটির উপর আমল না করে সতর্কতা পরিহার করা আমার দৃষ্টিতে পসন্দনীয় নয়। এমনটি আল্লাহ্ পাকের সামনে নিজের বাহাদুরী প্রকাশ করার মতই দেখায়। সুতরাং এ অবস্থায় আপনি তায়াম্মুম করে নামায পড়লেই বরং অধিক সওয়াব লাভ করবেন। এ কথা শুনার পর হযরত নানূতবী (রহঃ) তা গ্রহণ করলেন এবং তায়াম্মুম করতে শুরু করলেন।

ইলমের খাদেমগণের জন্য প্রশাসনিক কাজ থেকে দূরে থাকাই শোভনীয়

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আমি তো আমার বন্ধু-বান্ধবদের এ পরামর্শ দিয়ে থাকি যে, যদি আল্লাহ্ পাক তাদেরকে কোন দ্বীনী মাদরাসায় দরস দানের (পড়ানোর) সুযোগ করে দেন তবে তাই ভালো। এক্ষেত্রে কোন এন্তেজামী দায়িত্ব বা মুহতামিমের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করবে না। কারণ, এসব দায়িত্ব এবং দরসী খিদমত পরস্পরের বিপরীতমুখী। মুদাররিস এবং দ্বীনী ইলমের খাদেমগণের জন্য এটাই শোভনীয় যে, তারা ইলমে দ্বীনের খেদমতে লেগে থাকবে। স্থানীয় কিংবা দেশীয় ব্যবস্থাপনা (প্রশাসনিক) ও রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে।

উচ্চস্বরে যিকির এবং বিদ'আত

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, হাদীস শরীফের সাধারণ বিবরণ থেকে উচ্চস্বরে যিকির করার প্রতি নিষেধাজ্ঞার কথাই বুঝে আসে। এবং ইমাম আযম হযরত আবু হানীফা (রহঃ)-এর মাযহাবও তাই। আমাদের বুযুর্গগণের মধ্যে সবচাইতে বড় ফকীহ এবং সচেতন বুযুর্গ ছিলেন হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ)। এক্ষেত্রে তার গবেষণালব্ধ মতামত হচ্ছে, যদি উচ্চস্বরে যিকির করাকে কেউ উত্তম কিংবা অধিক সওয়াব লাভের কারণ হিসেবে গ্রহণ করে তবে তা বিদ'আত হবে। তবে যিকিরে একাগ্রতা সৃষ্টি এবং শয়তানের প্রবঞ্চনা থেকে বাঁচার একটা

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

ব্যবস্থা হিসেবে যদি কেউ উচ্চস্বরে যিকির করে, তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই। এর উদাহরণ অবিকল এমন যেমন কারো সর্দি হলে 'গুলে বানফসা' (একপ্রকার গুল্ম)–এর তৈরী ঔষধ সেবনকে যদি কেউ বিশেষ ইবাদত এবং সওয়াব হিসেবে গণ্য করে তবে তাও বিদ'আত হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি শুধু একটা ঔষধ বা সর্দি থেকে মুক্তির ব্যবস্থাপত্র হিসেবে গ্রহণ করে তবে বিদ'আতের সাথে তার কোনই সম্পর্ক নেই।

এ ব্যাপারে আমীর শাহ খান সাহেব হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানূতবী (রহঃ)–এর কাছ থেকে একটি হাদীসের যে মর্ম ও ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন তাও এ বিষয়টির পক্ষেই প্রমাণ বহন করে।

এক হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

من احدث فى امرنا هذا فهو رد

অর্থাত, যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মাঝে নতুন কোন বিষয়কে সংযোজন করে, সে সংযোজিত বিষয়টি অবশ্যই উপেক্ষাযোগ্য ও পরিত্যাজ্য।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানূতবী (রহঃ) বলেন, উপরোক্ত হাদীসে যে বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে তা হলো দ্বীনের মধ্যে নতুন কোন বিষয় সংযোজন করা। তবে দ্বীনের বিধি–বিধানকে যথার্থভাবে কার্যকর করার জন্য যে সকল অসীলা এবং মাধ্যমের প্রয়োজন দেখা দেয় সে সবের কথা কুরআন ও হাদীসে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ বা আলোচনা থাকা আবশ্যকীয় নয়। সে সব বিষয় সময় ও স্থান–কাল–পাত্র ভেদে উপযুক্ত বিবেচনা করে অবলম্বন করে নেয়া যেতে পারে। যেমন বর্তমান সময়ে হজ্জের জন্য উড়োজাহাজে এবং জিহাদের জন্য ট্যাংক ও এটম বোম ইত্যাদি ব্যবহার করা। এগুলোকে দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছুর সংযোজন বলা হবে না বরং দ্বীনের জন্য নতুন সংযোজন বলা যেতে পারে। আর এমনটি হলে তা জায়েয।

অনুরূপভাবে যিকিরের মধ্যে একাগ্রতা ও শয়তানী প্রবঞ্চনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য উচ্চস্বরে যিকির করা কিংবা সুফিয়ায়ে কিরামের অনুসৃত কোন পথ বা পন্থা অবলম্বন করা হলে তাও দ্বীনের মাঝে সংযোজন নয় বরং দ্বীনের জন্য সংযোজন বলে বিবেচিত হবে।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

মুফতী এলাহী বখ্শ (রহঃ)-এর কথা

হযরত মাওলানা রুমী (রহঃ)-এর মাসনবী-এর পরিশিষ্টের লিখক হযরত মুফতী এলাহী বখ্শ কান্ধলুবী (রহঃ) একজন প্রথিতযশা আলেমে দ্বীন এবং মুফতী হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তার তাকওয়া পরহেযগারীও ছিলো বেনযীর। তিনি হযরত সাইয়্যেদ আহমদ সাহেব শহীদ বেরেলোবী (রহঃ)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি বললেন, আমরা তো এর আগেও পবিত্র কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতাম কিন্তু হযরত সাইয়্যেদ সাহেব (রহঃ)-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পর তার মাঝে একটি নতুন রং নযরে আসতে লাগলো।

একজন বুযুর্গ শিক্ষকের কথা

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, গাঙ্গূহ এলাকায় হাফেয হুসাইন আলী নামের একজন বুযুর্গ মুত্তাকী লোক ছিলেন। তিনি গাঙ্গূহ-এর লাল মসজিদে ইমামতি করতেন এবং ছোট বাচ্চাদের পড়াতেন। তার বুযুর্গীর জন্য তো হযরত গাঙ্গূহী (রহঃ)-এর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। যেমন একবার কোন এক গ্রামের লোকেরা ঐ বুযুর্গকে তাদের অঞ্চলে নিয়ে যেতে চাইলো। তখন তিনি জবাব দিলেন যে, আমি হযরত গাঙ্গূহী (রহঃ)-এর খাদেম। আমার কোন কাজের ব্যাপারেই আমি আমার ইচ্ছা নির্ভর নই বরং আপনারা হযরত গাঙ্গূহী (রহঃ)-এর কাছে অনুমতি নিন। যদি তিনি অনুমতি দেন, তবে আমি চলে আসবো। অতঃপর লোকেরা হযরত গাঙ্গূহী (রহঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে অনুমতি চাইলো, তখন হযরত গাঙ্গূহী (রহঃ) বললেন—

'আরে মিয়া! গাঙ্গুহ এলাকায় একজন মুসলমানই তো আছে তাকে আমি তোমাদের হাতে দিয়ে দিবো এটা কি করে হয়।'

তার মাঝে তাকওয়া এবং আল্লাহ পাকের ভয় এতটাই প্রবল ছিলো যে, কখনো যদি ত্রুটির কারণে বাচ্চাদের মারার প্রয়োজন দেখা দিতো, তখন মারবার পরে তিনি ভাবতেন, আমার দ্বারা কোন বাড়াবাড়ি হয়ে গেলো কিনা? তাই তিনি পুনরায় সে বাচ্চাকে ডেকে বলতেন, আমি তোমাকে মেরেছি সুতরাং তুমিও আমাকে মেরে তার প্রতিশোধ নিয়ে নাও। এক্ষেত্রে অনেক দুষ্ট ছেলেরা তাকে মারার জন্য রাযীও হয়ে যেতো।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হযরত (রহঃ) বলেন, ঐ হাফেয সাহেবের এ ব্যাপারটি যখন আমি জানতে পারলাম তখন আমি বললাম, তার এ আচরণের মূল উৎস তো হলো, আল্লাহ পাকের ভয়, যা মানুষের জন্য একটি উত্তম পুঁজি। কিন্তু এ পদ্ধতিটি অবলম্বন করতে থাকা হলে এর দ্বারা বাচ্চাদের উত্তম শিক্ষা নষ্ট হবে, তারা বেয়াদব হয়ে উঠবে। এক্ষেত্রে ভাল পদ্ধতি হলো, প্রথমতঃ মারার সময় এ বিষয়টি খুব লক্ষ্য রাখবে যাতে সীমা ও প্রয়োজনের অধিক না হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ পরবর্তীতে তার সাথে এমন স্নেহ ও মহব্বতের আচরণ করবে যাতে সে খুশী হয়ে যায়।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ)-এর ঘটনা

একবার হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) দেখতে পেলেন যে, এক ব্যক্তিকে শূলীর উপর চড়ানো হয়েছে। তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি অপরাধ করেছে? লোকেরা জবাব দিলো, এ ব্যক্তি ডাকাত। প্রথমবার চুরি করার অপরাধে তার ডান হাত কাটা হয়েছে। কিন্তু তার পরেও সে চুরি করা থেকে বিরত হয়নি। ফলে পুনরায় চুরি করে ধরা পড়ায় তার বাম পা কেটে দেয়া হয়েছে। এর পরও যখন সে চুরি করা থেকে বিরত হয়নি বরং পুনরায় চুরি করে ধরা পড়েছে সুতরাং এবার নিয়ম মতে তার শূলীতে চড়ার পালা, তাই তাকে শূলীতে চড়ানো হয়েছে।

এ কথা শুনে হযরত জুনাইদ (রহঃ) সামনে বাড়লেন এবং তার পা নিজের চোখের সাথে লাগিয়ে চুমু খেলেন। এ দৃশ্য দেখে লোকেরা অস্থির হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, হযরত আপনি একি করছেন? হযরত জুনাইদ (রহঃ) তখন জবাব দিলেন যে, আমি তার পা চুম্বন করিনি, বরং তার অবিচলতা ও দৃঢ়তাকেই চুম্বন করেছি, যা তার অভ্যন্তরে রয়েছে। যদিও এ অজ্ঞ লোকটি তার সে দৃঢ়তাকে অপরাধ ও গুনাহের কাজে ব্যয় করেছে এবং সেমতে সে শাস্তিও পেয়ে গেছে। কিন্তু আমি চিন্তা করছি যে, কতই না সুন্দর হতো যদি ভাল ও সওয়াবের কাছে আমারও এ ধরনের দৃঢ়তা ও অবিচলতা নসীব হতো।

সুবহানাল্লাহ! ঐ সকল বুযুর্গানে দ্বীনের দৃষ্টি কত গভীর ছিলো। যার ফলে তারা প্রত্যেক বিষয়ের সীমা সর্বাবস্থায় জানতে পারতেন। যার সারকথা এই দাঁড়ায় যে, মানুষের অভ্যন্তরে যেসব যোগ্যতা ও চাহিদা

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার প্রত্যেকটাই যোগ্যতা হিসেবে প্রশংসনীয় হলেও তাকে অন্যায় পথে কিংবা অপরাধ বা গুনাহের কাজে ব্যবহার করা হলে তা গুনাহের কারণ হয়ে যায়। ঠিক সে যোগ্যতাকেই যদি ভাল কাজে এবং ভাল পথে ব্যবহার করা হয়, তবে তা মানুষের উন্নতি ও অগ্রগতির মাধ্যম হতে পারে। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারূক (রাযিঃ)–এর একটি কথার দ্বারাও এ কথার পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়।

সম্পদের দ্বারা আত্মশুদ্ধি

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, আমার বিশেষ দোস্তগণের একজন তার মধ্যকার কিছু খারাপ অভ্যাস দমন করার জন্য বার বার চেষ্টা করেও যখন ব্যর্থ হলেন তখন তিনি বিরক্ত হয়ে নিজ প্রবৃত্তির প্রতি শাস্তি হিসেবে প্রতি মাসে একটা বড় অংকে সাদকা দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এ কথাটি যখন আমি জানতে পারলাম তখন আমি তাকে এমনটি করতে নিষেধ করলাম। বললাম, আপনার একটি পয়সাও খরচ করার অনুমতি নেই। কারণ আমি জানতাম সে যদি এভাবে সাদকা করতে থাকে তবে সে বড় সমস্যায় পড়ে যাবে এবং স্ত্রী–পুত্রের যেসব হক তার দায়িত্বে রয়েছে তাদের সেসব দায়িত্ব আদায়ের ব্যাপারে শিথিলতা এসে যাবে। (২৬শে রবিঃ সানী ১৩৫৯ হিঃ)

একটি সংশয়ের নিরসন

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, কয়েকজন নবীন শিক্ষার্থী একবার আমাকে প্রশ্ন করলো, হুযূর! هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ আয়াতের মর্ম আমরা বুঝতে পারছি না, কারণ এর অর্থ তো হলো 'এই কুরআন মুত্তাকী ব্যক্তিদের জন্য পথপ্রদর্শক' অথচ মুত্তাকী ব্যক্তিরা তো এমনিতেই হিদায়াতের উপর রয়েছেন তাদের জন্য তো আর পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন নেই। আর যারা মুত্তাকী নয় তাদের জন্যই তো পথ প্রদর্শকের দরকার। অথচ এ কুরআন শরীফ তো তাদের জন্য হেদায়াত বা পথ প্রদর্শক নয়।

এর জবাবে হযরত থানবী (রহঃ) বললেন, আমি একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি। তা থেকে এ কথার উত্তর বুঝে এসে যাবে। যেমন ধরুন, এক

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

জায়গায় বি.এ কোর্সের ইংরেজী বইপত্র রাখা আছে। এখন যদি সে ইংরেজী বইগুলোর প্রতি ইশারা করে কেউ একথা বলে যে, এগুলো হলো বি.এ-র কোর্স, তবে তার একথা বলা ঠিক হবে নাকি বেঠিক হবে? উপস্থিত সকলে উত্তর দিলো, বিলকুল ঠিক হবে।

এরপর হযরত থানবী (রহঃ) বললেন, যে লোক বি.এ পাশ করেছে তার তো এ কোর্সের প্রয়োজন নেই। আর যে এ কোর্স সম্পন্ন করেনি তাকে তো বি.এ বলা হবে না, কারণ সে বি.এ নয়। এ কথার যে উত্তর আপনারা দিবেন هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ এর ব্যাপারে উত্থাপিত প্রশ্নেরও সেই একই জবাব।

একথা শুনে সকলেই শান্ত ও চুপ হয়ে গেলো। প্রশ্নটির উত্তরও তাদের বুঝে এসে গেলো যে, এই কিতাব হলো মানুষকে মুত্তাকি হিসেবে গড়ে তোলার কিতাব।

একটি উপদেশমূলক ঘটনা

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আমাদের এক মামু যিনি স্বাধীন চিন্তার অধিকারী একজন দরবেশ ছিলেন। তিনি ১৮৫৭ সালের আযাদী আন্দোলনের সময়ের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। ঘটনাটি হলো নিম্নরূপ—

এক জায়গায় অনেকগুলো লাশ পড়েছিলো। লোভী প্রকৃতির এক হিন্দুলোক (বানিয়া) দূরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিলো। ঐ লাশগুলোর মধ্যে একজন লোক আহত হয়ে মরার মত পড়েছিলো। সে ঐ হিন্দু লোকটিকে দেখে বললো, ওহে ভাই একটু এখানে এসো! লোকটি একথা শুনে ভয় পেয়ে গেলো। সে ভাবলো মরা লাশ আমাকে ডাকছে। সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে ভেগে পালাতে উদ্যত হলো। ইতিমধ্যে সে আহত লোকটি আবার বলে উঠলো, ওহে ভাই তুমি ভয় পেয়ো না আমি মরা লাশ নই, আহত হয়েছি মাত্র। আমার তো আর বাঁচার কোন আশা নেই, আমার কোমরে বাধা থলের মধ্যে অনেকগুলো টাকা আছে। আমার ইচ্ছা হলো, এ টাকা তো আমার কোন কাজে আসবে না কারণ আমি তো কিছুক্ষণের মধ্যেই মরে যাবো সুতরাং টাকাগুলো তোমাকে দিয়ে দিবো তুমি এগুলো কাজে লাগাতে পারবে।

টাকার কথা শুনে লোকটি গলে গেলো এবং ভয়ে ভয়ে সে ঐ আহত

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

লোকটির কাছে গেলো। সে যখন আহত লোকটির একেবারে কাছে এসে গেলো তখন আহত লোকটি দ্রুত তরবারী হাতে নিয়ে এক আঘাতে ঐ লোকটির একটা ঠ্যাং কেটে ফেললো। সাথে সাথে লোকটি মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। কিন্তু মাটিতে পড়েও লোকটি ঐ আহত লোকটির কোমর হাতাতে লাগলো। তার ইচ্ছা হলো, টাকাগুলো তো আগে হাতে নিয়ে নেই। এবার আহত লোকটি বললো, আরে মশাই তুমি তো দেখছি একটি বদ্ধ পাগল, যুদ্ধের ময়দানে কি কেউ কোমরে টাকা বেঁধে নিয়ে আসে!

আসল কথা হলো, আমার আশে পাশে যারা পড়ে আছে তারা সবাই মরা লাশ, আমিই শুধু একা জীবিত আছি, রাত হয়ে যাচ্ছে, আমি ভাবলাম যদি আলাপ আলোচনা করার জন্য একজন লোক আমার সাথে থাকতো তবে রাতটা কাটানো অনেক সহজ হয়ে যেতো। আমি যদি তোমাকে এমনিতেই বলতাম যে, ভাই আমার সাথে তুমি রাতে এখানে থাক তাহলে তুমি তো ধেয়ে কুল পেতে না। আমি একটু মানসিক প্রশান্তির জন্য তোমাকে আমার সাথী বানিয়ে নিলাম। হিন্দু লোকটি রাগে কটমটিয়ে বললো—বেটা বজ্জাত কোথাকার! নিজেও চলতে পারবে না, অন্যকেও চলতে দিবে না।

মামুজান এ ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, বর্তমানে আল্লাহ পাকের রাস্তার ব্যাপারে মানুষের অবস্থা এরূপই হয়ে গেছে যে, সে নিজে তো আল্লাহর পথে চলবেই না, অন্য কেউ চলতে চাইলে তার পথেও বাধার সৃষ্টি করে দিবে।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

১৩৪৮ হিজরীর রমাযান মাসের মালফূযাত

জালিমের প্রতি মিথ্যা অপবাদ প্রসঙ্গে

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ এ উম্মতের মাঝে সবচাইতে বড় জালিম হিসেবে প্রসিদ্ধ। কিন্তু কোন এক বুযুর্গের মজলিসে একজন লোক তার প্রতি কিছু মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলো এবং তার গীবত করলো। তখন সে বুযুর্গ বললেন, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ যদিও একজন অত্যাচারী জালিম এবং ফাসিক কিন্তু তার সাথে আল্লাহ পাকের কোন দুশমনী নেই। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ-এর জুলুমের শিকার হয়ে যেসব লোক মযলূম হয়েছে সেসব মজলূমদের পক্ষ থেকে আল্লাহ পাক যেমন হাজ্জাজ থেকে তার প্রতিশোধ নিবেন, অনুরূপ যদি হাজ্জাজের উপরও কেউ জুলুম বা অবিচার করে তবে আল্লাহ পাক হাজ্জাজের পক্ষ থেকে ঐ ব্যক্তির কাছ থেকেও তার প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।

মতপার্থক্যের সময় পারস্পরিক সম্পর্ক

(১) হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, যেসব লোকের সাথে আদর্শিক দিক থেকে মতপার্থক্য রয়েছে, তাদের সাথে নিজ ইচ্ছায় যেমন সাক্ষাত কিংবা উঠাবসা করার চেষ্টা করবে না অনুরূপ ইচ্ছা করে সাক্ষাত করা থেকে বিরতও থাকবে না। স্বাভাবিকভাবে যে অবস্থা সৃষ্টি হয় সেটাকেই মঙ্গলজনক মনে করবে। মানসিকভাবে যে অনীহা অন্তরে সৃষ্টি হয়ে থাকে তা মানুষের ইচ্ছাধীন নয়, সুতরাং সে বিষয় নিয়ে অস্থিরতা পোহানোর কারণ নেই। কেননা মনে এ ধরনের অনিহা ভাব সৃষ্টি হওয়া আত্মসম্মান বোধেরও চাহিদা। তবে যার সাথে মতপার্থক্য রয়েছে তার ব্যাপারে বদগুমানী বা মনের মধ্যে কুধারণা সৃষ্টি করা কিংবা বদযবানী বা মুখে খারাপ শব্দ উচ্চারণ করা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে।

(২) যেসব লোক তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলে বা তাদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তোমার কাছে এসে বর্ণনা দেয়, যেসব কথা প্রথমে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

কুধারণা সৃষ্টি করে এবং পরে তা মুখে তাদের ব্যাপারে খারাপ শব্দ উচ্চারণের কারণ হয়, এ জাতীয় কথা বা বর্ণনা দেয়ার সুযোগ তাদেরকে দিবে না।

(৩) তোমার মাসলাক ও নীতির সাথে একমত—এমন কোন লোক যদি তোমার নীতি বিরুদ্ধ লোকদের সাথে উঠাবসা, দেখা–সাক্ষাত করে তবে সে ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়বে না। বরং তার সাথে উঠাবসার বিষয়টিকে তার একটি অপারগতা বলে ধরে নিবে অথবা মনে করবে যে, এ উঠাবসার পিছনে হয়তো তার কোন ভাল উদ্দেশ্য রয়েছে। এরপর যতদিন সে স্বেচ্ছায় তোমার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে ততদিন তুমিও তার সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলবে। মানুষ পার্থিব কারণেও তো সম্পর্ক রক্ষা করে থাকে। সে ক্ষেত্রে দ্বীনী কারণে যদি কেউ এমনটি করে তাতে ক্ষতি কি? (১৮ জুমাদাল উলা ১৩৬১ হিজরী)

বুযুর্গদের সংস্পর্শের আসল উদ্দেশ্য

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, বুযুর্গানে দ্বীনের সংস্পর্শে থাকার আসল উদ্দেশ্য হলো, ঐ বুযুর্গের মত মন–মানসিকতা বিশিষ্ট হয়ে যাওয়া। আর এটা প্রকৃতপক্ষে আমল ও চেষ্টার দ্বারা অর্জিত হয় না বরং এটা শুধু আল্লাহ পাক দান করলেই লাভ হতে পারে। তিনি যখন ইচ্ছা করেন, যাকে ইচ্ছা করেন দান করেন। আর আমল এবং বিভিন্ন কাজ মানুষের ইচ্ছাধীন বিষয় এক মুহূর্তের মধ্যে সেটা পরিবর্তন করে ফেলা যায় কিন্তু সুস্থ মানসিকতা অনেক সময় পঞ্চাশ বৎসরেও অর্জিত হয় না।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, হিজরতের পূর্বে যে সকল সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সাথে ছিলেন তারা কোন দিক থেকেই ঐ সকল মুসলিম সৈনিকদের থেকে নীচে ছিলেন না, যাদেরকে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাযিঃ) জবলা ইবনে আইহাম–এর বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য ঐতিহাসিক ইয়ারমুকের যুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন। কেননা জবলার বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা ছিলো ষাট হাজার। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাযিঃ) তাদের মুকাবিলা করার জন্য মাত্র ত্রিশজন সাহাবীকে (রাযিঃ) নির্বাচন করেছিলেন যার

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

কারণে হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ) হযরত খালিদ (রাযিঃ)কে বলেছিলেন, আপনি কি মুসলমানদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে চান? হযরত খালিদ (রাযিঃ) উত্তর দিয়েছিলেন, কস্মিনকালেও না বরং আমি যুদ্ধের জন্য এমন লোকদেরকেই নির্বাচন করেছি যারা ষাটহাজার থেকে কম নয়।

হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ) পুনরায় বললেন যে, আমি চিন্তামুক্ত হতে পারছি না। এভাবে বারবার বলার কারণে হযরত খালিদ (রাযিঃ) আরো ত্রিশজন সাহাবী (রাযিঃ) বাড়িয়ে নিলেন। এবার হযরত খালিদ (রাযিঃ)–এর বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা হলো মাত্র ষাট জন। এই ষাটজনকেই তিনি ষাট হাজার সৈন্যের মোকাবিলা করার জন্য সঙ্গে নিলেন। সারাদিন যুদ্ধ চললো। সর্বশেষ দেখা গেলো ঐ ষাটহাজার সৈন্য মাত্র ষাটজনের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে ময়দান ছেড়ে পালাচ্ছে।

এখন এখানে একটি প্রশ্ন হয় তাহলো, হিজরতের পূর্বে হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)–এর মাঝে দুর্বলতা ছিলো। তারা সংখ্যায়ও কম ছিলেন এটা ঠিক কিন্তু সংখ্যায় ষাটের থেকে তো বেশী ছিলেন এবং পূর্বে আলোচিত ষাটের থেকে তো তারা শক্তিতেও কম ছিলেন না। তা সত্ত্বেও তখন তাদেরকে যুদ্ধ থেকে কেন বারণ করা হয়েছিলো?

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, সে সময় সামগ্রিক অবস্থার বিচারে যুদ্ধ করার পরিবেশ ছিলো না। যদিও মোটামুটিভাবে শক্তি থাকার বিষয়টা অস্বীকার করা যায় না।

অধম সংকলকের এখানে খেয়াল হলো, এ ক্ষেত্রে আরো একটি বিশেষ দিক রয়েছে, তখন যুদ্ধ থেকে বারণ করার ক্ষেত্রে হয়তো এটিও একটি বিশেষ কারণ। তাহলো, সে সময়টি ছিলো ব্যক্তি সংশোধনের সময়। শত্রুদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কঠোরতা ও অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হয়ে এবং তার উপর ধৈর্য ধারণ করে আত্মিক দিক থেকে তাদের শুদ্ধিসাধন করাই উদ্দেশ্য ছিলো। যাতে তাদের সমস্ত নেক আমল এবং যুদ্ধ–জিহাদ সব একমাত্র আল্লাহ্ পাককে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে হয়। প্রবৃত্তির কোন চাহিদা পূরণের জন্য যাতে না হয়। এজন্য সে সময় প্রবৃত্তির চাহিদাকে সমূলে উৎখাত করে মার্জনা–ক্ষমা ও ধৈর্যের প্রতি আমল করার বিধানই বেশী বেশী অবতীর্ণ করা হয়েছে। এরপর যখন আত্মিক দিক থেকে তারা পরিপূর্ণভাবে শুদ্ধি অর্জন করেছেন তখন

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

তাদের প্রতি যুদ্ধ করার বিধান নাযিল করা হয়েছে।

(জুমাদাল উলা ১৩৬১ হিজরী)

পূর্ববর্তী মাশাইখগণের প্রতি আদব

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, ইলমী তাহকীক এবং গবেষণার চাইতে বেশী প্রয়োজন হলো আদব। বরং বুযুর্গানে দ্বীনের প্রতি আদব রক্ষা করে চলার দ্বারা মহান আল্লাহ তা'আলা ইলমী ব্যাপারে তাহকীক ও গবেষণা করার যোগ্যতা দিয়ে দেন। পূর্বসূরী বুযুর্গানে দ্বীনের প্রতি আদব ও শিষ্টাচার পরিহার করে যে গবেষণা করা হয়, সেখানে ভ্রষ্টতা ও পদস্খলনের সমূহ আশংকা বিরাজমান থাকে।

জবাব বুঝা মুশকিল কেন?

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, অধিকাংশ সময় দেখা যায় 'শুবাহাত' বা সংশয়পূর্ণ বিষয়গুলো সাধারণ লোকেরাও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বুঝে ফেলে কিন্তু তার পিছনে যে প্রশ্ন হয় তার জবাব অনুধাবন করা তাদের জন্য খুব মুশকিল হয়ে যায়। তার কারণ হলো, সংশয়ের উৎসস্থল হচ্ছে মূর্খতা। সুতরাং মূর্খতা থেকে উৎসারিত কথা সাধারণ লোকেরা তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে। আর জবাবের উৎসস্থল হলো 'ইলম' বা জ্ঞান, আর তা প্রত্যেক ব্যক্তি বুঝে উঠতে পারে না।

হযরত থানবী (রহঃ)-এর উন্নত পোশাক প্রসঙ্গে

হযরত থানবী (রহঃ) অধিকাংশ সময় উন্নত এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক ব্যবহার করতেন। কখনো বুটিদার জামাও হযরতের (রহঃ) গায়ে শোভা পেতো। এ কারণে কিছু অজ্ঞাত লোকের সংশয় সৃষ্টি হতো, তাদের ধারণা—এসব চাকচিক্যপূর্ণ পোশাক বুযুর্গী পরিপন্থী।

এ প্রসঙ্গে একদিন হযরত থানবী (রহঃ) বললেন, এ জাতীয় সন্দেহ যারা করে তাদেরকে কোন জবাব দেয়া আমি প্রয়োজন মনে করি না এবং জবাবও দেই না। তবে প্রকৃত কথা হলো, এ জাতীয় আড়ম্বরপূর্ণ দামী পোশাক ব্যক্তিগতভাবে আমি পসন্দ করি না। তাই আমি নিজে যখন কোন জামা-কাপড় বানাই তখন খুব সাদাসিধাভাবেই বানাই এবং যে আমার কাছে অনুমতি নিয়ে আমার জন্য পোশাক তৈরী করে তাকেও

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

বলে দেই যেন অবশ্যই আড়ম্বরহীন পোশাক তৈরী করে। কিন্তু মাঝে মধ্যে অনেক দ্বীনী ভাই মহব্বত করে আমার সাথে আলোচনা ছাড়াই বিভিন্ন আড়ম্বরপূর্ণ দামী পোশাক তৈরী করে নিয়ে আসেন। এভাবে যারা নিয়ে আসেন তাদেরকে আমি বলি যে, এ জাতীয় আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক আমি পসন্দ করি না কিন্তু যেহেতু তা বানানো হয়েছে আমার গায়ের মাপে, তাই সে পোশাক ফেরত দেয়ার অর্থ হলো, তা অকেজো করে দেয়া। এবং সেগুলো ব্যবহার না করাও এক ধরনের লৌকিকতা। এজন্য বাধ্য হয়ে তার শুকরিয়া আদায় করে তা গ্রহণ করি এবং ব্যবহার করি।

একটি পসন্দনীয় শে'র

হযরত থানবী (রহঃ)-এর মামা একটি ফার্সী শে'র খুব পসন্দ করতেন। শে'রটি হলো নিম্নরূপ—

اے فخر رسل عز و بسالت بتو نازد

معراج کند فخر رسالت بتو نازد

অর্থাত, আয় রাসূলগণের গর্ব আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, উচ্চ মর্যাদা আর সম্মান আপনার কাছে আসতে পেরে সে নিজেই এতে গর্বিত। এবং মি'রাজের ন্যায় সম্মানিত উপহার আপনার জন্য হওয়ায় সে মি'রাজ নিজেই গর্ববোধ করে।

মহিলাদের মহরের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, মহিলাদের মহরের ব্যাপারে একদিকে যেমন অতিরঞ্জন পরিলক্ষিত হয়, অপরদিকে লক্ষ্য করা যায় শিথিলতা ও গুরুত্বহীনতা। অনেকে মহরকে খ্যাতি ও সুনাম বৃদ্ধির উপকরণ মনে করে খুব বেশী করে মহর নির্ধারণ করে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে তা এত বেশী হয় যা আদায় বা পরিশোধ করার কল্পনাও করা যায় না। শরীয়তের দৃষ্টিতে এমনটি নিতান্তই নিন্দনীয়। হাদীস শরীফে এমনটি করতে নিষেধ করা হয়েছে। মহর নিজের সাধ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করাই হলো পসন্দনীয়।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অধিক সম্মানিত

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

দুনিয়াতে আর কে হতে পারে। তিনি নিজের আদরের কন্যার বিবাহে মহর ধার্য করেছেন মাত্র পাঁচশত দিরহাম। এতো গেলো মহরের ব্যাপারে অতিরঞ্জনের কথা, এর বিপরীত দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অনেকে মহরের ব্যাপারে খুবই শৈথিল্য প্রদর্শন করে থাকে। মহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে ঐ মেয়ের বংশের অন্যান্য মহিলাদের মহরের সাথে একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হয় এ বিষয়টি অনেক অজ্ঞ লোক মোটেও বিবেচনা করে না বরং কোন কোন আলিমকেও এ ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করতে দেখা যায়।

একটি মেয়ের বিবাহের সময় তার বংশের অন্যান্য মেয়েদের সমপরিমাণ মহর ধর্তব্য। কাজেই মেয়েটিও তার বংশীয় অন্যান্য মেয়ের সমপরিমাণ মহর পাওয়ার অধিকার রাখে। অবশ্য যদি বংশের সকলে মিলে পরামর্শ করে মহর কমিয়ে দেয় তবে সেটা খুবই ভাল। এমনটি করলে হাদীসের নির্দেশের প্রতিও আমল করা হয়। কিন্তু বংশের অন্য সব মেয়েদের মহর বেশী হলে সে ক্ষেত্রে কোন বাপ যদি তার মেয়ের মহর সে তুলনায় অনেক কম নির্ধারণ করে, তবে ঐ বাপ এই মেয়ের হক নষ্ট করলো যা তার জন্য জায়েয নয়।

এছাড়া মেয়ের পিতা কিংবা দাদা ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি যদি মহরে মিস্‌ল অর্থাত এ মেয়ের বংশীয় অন্যান্য মেয়েদের মহর থেকে কম মহর নির্ধারণ করে কোন বিবাহ সম্পাদন করে তবে 'মুতাআখখিরীন' বা পরবর্তী সময়ের ইমামগণের মতানুসারে এ বিবাহই শুদ্ধ হবে না। আর 'মুতাকাদ্দিমীন' বা পূর্ববর্তী ইমামগণও এখানে বলেছেন যে, ঐ মেয়ের যারা ওলী তাদের ইসলামী আদালতের সহায়তায় এ বিবাহ ভেঙ্গে দেয়ার অধিকার রয়েছে। বর্তমানে অনেক কাযী সাহেবই বিবাহ পড়ানোর সময় মহরে ফাতেমী নির্ধারণ করার জন্য খুব জোরাজুরি করে থাকেন এবং মেয়ে ও মেয়ের ওলীগণের সম্মতি ছাড়াই মহরে ফাতেমী নির্ধারণ করে দেন। এসব ক্ষেত্রে খুব সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

ফিৎনা থেকে বেঁচে থাকার দু'আ

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, ফিৎনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য হাদীস শরীফের একটি বর্ণনায় নিম্নোক্ত দু'আটি পড়তে শিক্ষা দেয়া হয়েছে—

وَاِذَا اَرَدْتَّ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِىْ اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

অর্থাত, আয় আল্লাহ! যখন আপনি কোন সম্প্রদায়কে ফিৎনার মধ্যে নিপতিত করতে ইচ্ছা করেন তখন আমাকে ফিৎনামুক্ত থাকা অবস্থায় মউত দিয়ে দিন।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, এ দু'আর মর্ম থেকে এ কথাই বুঝে আসে যে, সম্পূর্ণ ফিৎনাকে সমূলে বিদূরিত করে দেয়ার জন্য চেষ্টা চালানো এবং সেজন্য দু'আ করতে যাওয়া ঠিক নয়। বরং এ জাতীয় পরিস্থিতিতে নিজেকে ফিৎনামুক্ত রাখার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করবে।

শরীয়তসম্মত হীলা

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, ইসলামী আইন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ফকীহগণ অনেক ক্ষেত্রে কোন কোন নাজায়েয বিষয়াবলীর অবস্থা পরিবর্তন করে জায়েযের পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য কিছু হীলা (কৌশল) বর্ণনা করেছেন। যা অবলম্বন করা হলে সে নাজায়েয বিষয়টি জায়েযের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও কোন কোন ক্ষেত্রে এ জাতীয় হীলা বা কৌশল অবলম্বন করার অনুমতি দিয়েছেন বলেও বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু অনেকে বিষয়টি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে না পারার কারণে ভুলের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ জাতীয় হীলা শুধু মোআমালাহ বা পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে করার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু অনেকে এটাকে মোআমালাহ এবং দিয়ানত বা বিশ্বস্ততা ও ঈমানদারী এ উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করে থাকে। অথচ দিয়ানতের ক্ষেত্রে কোনরূপ হীলা অবলম্বন করা মোটেও শরীয়তসম্মত নয়।

যেমন অনেকে যাকাত আদায় করা থেকে বাঁচার জন্য হীলা অবলম্বন করে। বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই নিজের সমুদয় অর্থসম্পদ নিজের স্ত্রীকে অথবা কোন সন্তানকে দান করে দেয় এবং বাহানাস্বরূপ তার হাতে তা দিয়ে তাকে মালিক বানিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাকে দান করা উদ্দেশ্য থাকে না। বরং উদ্দেশ্য হয় যখন আবার আগামী বৎসর পূর্ণ হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসবে তখন সে আবার আমাকে দান করে দিবে। যার দরূন দু'জনের কারো কাছেই মাল এক বৎসরকাল থাকবে না। ফলে কারো উপরই যাকাত ফরয হবে না। এ জাতীয় হীলা

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

অবলম্বন করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। এবং এমনটি করা যাকাত আদায় না করার চাইতেও কঠিন গুনাহ। কারণ, এখানে হীলা বা বাহানা করা হয়েছে মহান আল্লাহ পাকের ফরয থেকে বাঁচার জন্য। যা মূলতঃ দিয়ানত বা ঈমানদারীর সাথে সম্পৃক্ত। ঐ বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় যাদের প্রতি শনিবার দিনে মাছ শিকার করা হারাম করে দেয়া হয়েছিলো তারা বিভিন্ন হীলা–বাহানা করে শিকার করার সুরত বের করেছিলো। ফলে তাদের উপর মহান আল্লাহ পাকের গযব এবং আযাব নেমে এসেছিলো।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, কখনো হীলা করা হয় শরীয়তের উদ্দেশ্য বাতিল করার জন্য, এমনটি করা হারাম। আবার কখনো হীলা করা হয় শরীয়তের উদ্দেশ্যকে আমল ও কার্যকর করার জন্য, এ জাতীয় হীলা করা জায়েয। আর যে হীলা এ পর্যায়ের হয় যে, তা দ্বারা সাধারণ লোকদের ফিৎনায় নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তবে তাও হারাম।

তাবীয–কবয প্রসঙ্গে

রসমী আমল এবং তাবীয–কবযকে যারা খুব গুরুত্ব দেয় হযরত থানবী (রহঃ) তাদেরকে পসন্দ করতেন না। হযরত থানবী (রহঃ)কে তাঁর মুর্শিদ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব মুহাজেরে মক্কী (রহঃ) বলে দিয়েছিলেন যে, কেউ যদি কোন প্রয়োজনে তাবীয নিতে আসে তবে তাকে নিষেধ করবে না। বরং তাৎক্ষণিকভাবে ঐ সমস্যার জন্য পবিত্র কুরআনের যে আয়াত কিংবা আল্লাহ পাকের যে নাম সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করবে তাই লিখে দিয়ে দিবে। হযরত থানবী (রহঃ) সমগ্র জীবন এর উপর আমল করেছেন।

একবার হযরত থানবী (রহঃ) বললেন যে, একদিন একজন কৃষক আমার কাছে এসে আমাকে বললো যে, আমার ফসলের ক্ষেতে অনেক ইঁদুর। এগুলো আমার খুবই ক্ষতি করে। এ সমস্যা থেকে ফসল রক্ষার জন্য আমাকে একটি তাবীয দিন। হযরত থানবী (রহঃ) তখন পাঁচটি কাগজের উপর পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত বাক্য লিখে দিলেন।

বাক্যটি হলো—

لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ

অর্থ ঃ আমি জালিমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করে দিবো।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

এবং ঐ কৃষক লোকটিকে বলে দিলেন, এই পাঁচটি কাগজ পাঁচটি মাটির পাত্রের মধ্যে ভরে ক্ষেতের মাঝখানে একটি এবং চার কোণে চারটি পুঁতে রাখবে।

অনুরূপভাবে এক লোক এসে জানালো যে, সন্তান প্রসবের পর সন্তানের মায়ের স্তনে দুধ খুব বেশী আসছে। যার কারণে সন্তানের মায়ের খুব কষ্ট হচ্ছে। হযরত থানবী (রহঃ) তাকে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত লিখে দিলেন। আয়াতটি হলো—

قِيْلَ يَاأَرْضُ ابْلَعِىْ مَاءَكِ وَ يَاسَمَاءُ أَقْلِعِىْ وَ غِيْضَ الْمَاءُ

অর্থ ঃ নির্দেশ দেয়া হলো, হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেলো, আর হে আকাশ! ক্ষ্যান্ত হও। এবং পানি হ্রাস করা হলো। (সূরা হুদ, ৪৪)

উপরোক্ত আয়াত কাগজের উপর লিখে দিয়ে দিলেন এবং বলে দিলেন, এটাকে ঐ বাচ্চার মায়ের বুকে বেঁধে দিবে। লোকটি তাই করলো। আল্লাহ পাক এতেই ঐ মহিলার কষ্ট দূর করে দিলেন।

জোশালো বয়ান

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ পাকের মা'রিফাত লাভের মাকাম বা স্তরে পৌছে যায় তার কাছে نظريات যুক্তিনির্ভর বিষয়সমূহ بدهيات তথা সুস্পষ্ট দৃশ্য বিষয়াবলীর পর্যায়ে চলে আসে। আর যে বস্তু বা বিষয় প্রকাশ্যে দৃশ্যমান তা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে কোন মানুষ বিশেষ গুরুত্বের আশ্রয় গ্রহণ করে না। যেমন ঠিক দুপুরের সময় সূর্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য কোন জোশালো বা জ্বালাময়ী বক্তব্য দেয়ার প্রয়োজন হয় না। (এ কারণেই বুযুর্গানে দ্বীন কোন জ্বালাময়ী বা জোশালো বয়ানে সাধারণতঃ অভ্যস্ত থাকেন না।) এ অবস্থা সম্পর্কেই সুফিয়ায়ে কেরাম বলেছেন—

مَنْ عَرَفَ اللّٰهَ كَلَّ لِسَانُهٗ

অর্থাত, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের মা'রিফাত অর্জন করতে পেরেছে তার যবান কথা বলাতে ক্লান্ত হয়ে যায়।

যেমনটি একটি হাদীসেও উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসটি হলো—

الحياء والعى من الايمان

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

অর্থাত, লজ্জা এবং কথা বলতে অপারগতা ঈমানের অংশ।

এ কথার মর্মও কথা বলা এবং ওয়ায ও বয়ানের ক্ষেত্রে ঐ পর্যায়ের অপারগতা যা আল্লাহ পাকের মারিফাত অর্জিত হওয়ার কারণে সৃষ্টি হয়। অযোগ্যতা এবং মূর্খতার কারণে যে অপারগতা সৃষ্টি হয় এখানে সেটা উদ্দেশ্য নয়। কারণ, এ পর্যায়ের অপারগতা ঈমানের অংশ হতে পারে না। এমনটি শরীয়তের দৃষ্টিতেও নিন্দনীয়। এ পর্যায়ে হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, হাফেয সিরাজীর একটি প্রসিদ্ধ শে'র রয়েছে, শে'রটির একটি পংক্তি হলো—

"کجا دانند حال ما سبکساران ساحلها"

অর্থাত, নিজেদেরকে বুদ্ধিমান বলে জ্ঞানকারী নদীর প্রথম পাড়ে দণ্ডায়মান লোকেরা—আমরা যারা নদী অতিক্রম করে এপারে এসেছি তাদের অবস্থা কিভাবে বুঝবে।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ লোক যে দরিয়ার প্রথম পাড়েই দাঁড়িয়ে আছে, দরিয়া পার হয়ে অপর পাড়ে যেতে পারেনি। আর যে লোক দরিয়া পার হয়ে তার জটিলতাসমূহ কাটিয়ে দরিয়ার অপর পাড়ে পৌছে গেছে আপাত দৃষ্টিতে যদিও সে ব্যক্তি দরিয়ার পাড়েই দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু এ দুই ব্যক্তির মাঝে রয়েছে বিরাট পার্থক্য। এই দ্বিতীয় ব্যক্তি সম্পর্কে 'কিভাবে জানবে' কথাটি বলা শুদ্ধ হবে না, কারণ সে দরিয়া অতিক্রম করে ওপার চলে গেছে বিধায় সে সবকিছুই জানে। কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে দুই কিনারে দাঁড়ানো দু'জনকে দেখতে একই রকম মনে হয়।

অনুরূপভাবে একজন তো এরূপ মূর্খ যে, কোন বস্তুর হাকীকত সম্পর্কে কিছুই জানে না। তার কাছে যদি কোন প্রশ্ন করা হয় তবে সে তার জবাব দিতে এবং কোন কথা বলতে প্রকৃতপক্ষেই অপারগ হয়ে পড়ে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো ঐ আরেফে কামেল বা মহান সাধক যার কাছে প্রত্যেক বস্তুর হাকীকত এতটাই পরিস্কার যে, অদৃশ্য বস্তুসমূহও তার কাছে দৃশ্যমান বস্তুসমূহের মত মনে হয়। এমন ব্যক্তিও খুব বেশী কথাবার্তা এবং দীর্ঘ বক্তব্য দিতে অপারগ হয়ে থাকেন। আর এমনটিই হলো ঐ অপারগতা যাকে হাদীস শরীফে ঈমানের অংগ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

দ্বীনী ব্যাপারে অনধিকার চর্চা

হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, দুনিয়ার বিভিন্ন বৈষয়িক জ্ঞান এবং বিভাগসমূহের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি যদি কোন বিশেষ বিভাগ বা বিষয় সম্পর্কে অবগত না থাকে, তবে সে তা নিঃসংকোচে স্বীকার করে যে, এ বিষয়ে আমার জানা নেই। যেমন একজন বড় ও প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে গিয়ে যদি আপনি চোখের সমস্যার কথা জানিয়ে তার ঔষধ কি তা জানতে চান, তবে সে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বলে দিবে যে, আমি ডাক্তার নই। অনুরূপ যদি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোন বিষয় সম্পর্কে কোন ডাক্তারের কাছে জানতে চান, তবে সে নিঃসঙ্কোচে বলে দিবে যে, আমি ইঞ্জিনিয়ার নই। কিন্তু দ্বীনকে এতটাই লাওয়ারিশ ও অসহায় বানিয়ে নেয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই দ্বীনী ব্যাপারে নিজস্ব রায় ঠুকে দেয়ার ধান্ধায় থাকে। সেখানে একথা বলা হয় না যে, আমি আলিম নই।

সাহারানপুরের একজন সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট একবার থানাভোনে এলো। তার মাথায় এই ভ্রান্ত ধারণার ভূত চেপে বসেছিলো যে, দুনিয়ায় উন্নতি করতে হলে সূদ খেতে হবে, সূদ খাওয়া ছাড়া দুনিয়ার জীবনে উন্নতি সাধন করা আদৌ সম্ভব নয়। সুতরাং সে হযরত থানবী (রহঃ)–এর দরবারে এসে তাঁকে বললো, হযরত! সূদ খাওয়াকে যে কোন ভাবে জায়েয করে দিন।

তার কথা শুনে হযরত থানবী (রহঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বনী উমাইয়ার শাসনামলে মুসলমানদের উন্নতি হয়েছিলো কিনা? এর জবাবে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব স্বীকার করলেন, হ্যাঁ, তখন যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিলো। হযরত থানবী (রহঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কি সূদের কারবার করেছিলো কিংবা সূদ হালাল করে দিয়েছিলো? এবার সে কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলো। কারণ, এর কোন জবাব তার কাছে ছিলো না। এরপর হযরত থানবী (রহঃ) বললেন, এর দ্বারা তো অন্তত এতটুকু বুঝা গেলো যে, উন্নতি সাধন করা সূদের উপর নির্ভরশীল নয়।

এরপর ঐ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব একটি আয়াত সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করলো। সাথে একথাও বললো যে, অমুক সাহেব এ আয়াতের তাফসীর এভাবে করেছেন। সে যার কথা বলেছে সে লোকটি একজন উর্দূ

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সাহিত্যিক মাত্র, কোন আলিম নয়। হযরত থানবী (রহঃ) বললেন, আপনি যে আইন–কানূন দ্বারা আদালতে ফয়সালা করে থাকেন ওগুলো আমাকে দিন। আমি সে কানুনসমূহের একটা ব্যাখ্যা লিখবো এবং আপনি আমার সে ব্যাখ্যা মুতাবিক আদালতে বিচার–ফয়সালা করবেন। এর পর আপনাকে যদি প্রশাসনের পক্ষ থেকে পাকড়াও করা হয় তবে বলবেন যে, আশরাফ আলী এই কানূনের এই ব্যাখ্যাই করেছে। এরপর দেখবেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে আপনার জন্য কি কি খেতাব আসতে থাকে।

বুযুর্গানে দ্বীনের বরকত

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, একজন মুত্তাকী পরহেযগার বুযুর্গ ব্যক্তি আমাকে একটি আচকান দিয়েছিলেন। যেটি ছিলো মোমীছিটের তৈরী। আমি সেটিকে বরকতপূর্ণ মনে করে ব্যবহার করতাম। তার সুফল এই ছিলো, সেটা যতক্ষণ আমার গায়ে থাকতো ততক্ষণ গুনাহের কোন আশঙ্কাও আমার মনে আসতো না। মানুষ বলে থাকে যে, বুযুর্গানে দ্বীনের কাপড়ের মধ্যে আর কিইবা আছে, কিন্তু বুযুর্গানে দ্বীনের কাপড়ের মাঝেও যে বরকত থাকতে পারে তা তো আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করলাম।

মুসলমানদের আর্থিক সচ্ছলতাও একটি নি'আমত

মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আমি যখন কোন মুসলমানকে অপরের মুখাপেক্ষীহীন এবং সচ্ছল অবস্থায় দেখি তখন আমার কাছে খুব খুশী লাগে। দারুল উলূম দেওবন্দের সাবেক সদর মুহতামিম (মহাপরিচালক) হযরত মাওলানা হাফেয মুহাম্মদ আহমদ সাহেব যিনি ছিলেন হযরত নানুতবী (রহঃ)–এর সাহেবজাদা। তিনি যখন হায়দারাবাদে রাজকীয় মুফতী হিসেবে প্রতিমাসে একহাজার টাকা ওযীফায় নিয়োগপ্রাপ্ত হলেন তখন এ অবস্থায় তার দায়িত্ব গ্রহণ আমার নিকট মানসিকভাবে পসন্দের বিষয় ছিলো না। তা সত্ত্বেও শুধু এই কারণে আমি আনন্দিত হলাম যে; দুনিয়াদারদের নযরেও একজন আলেমে দ্বীনের মর্যাদা বৃদ্ধি পেলো। সে সময় আমি প্রথম বারের মত হায়দারাবাদে মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য গিয়েছিলাম। অবশ্য সে সফরের আসল উদ্দেশ্য ছিলো মৌলভী শাব্বীর আলী সাহেবের শুভ বিবাহে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

অংশগ্রহণের জন্য আওরঙ্গাবাদ যাওয়া। সফরসঙ্গীদের ইচ্ছা ছিলো, হায়দরাবাদ হয়ে তার সাথে সাক্ষাত করে যাওয়া। আমি শুধু এই নিয়্যতে তাদের সাথে যেতে সম্মত হলাম যে, আমাদের এখানে ইংরেজ এবং হিন্দুদের মোকাবেলায় মুসলমানদেরকে সম্পদ ও সম্মানের বিচারে কিছুটা নিম্নশ্রেণীর বলে মনে করা হয়। পক্ষান্তরে হায়দারাবাদে মুসলমানদের হাতেই নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্ব। সেখানে গিয়ে মুসলমানদের সচ্ছলতা, তাদের সম্মান ও প্রতিপত্তি দেখে আনন্দ উপভোগ করবো। (এটাই ছিলো মনের ঐকান্তিক বাসনা।)

বিনয় থেকে ঐক্যের সৃষ্টি হয়

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) বলতেন, ঐক্যের মূল ভিত্তিই হলো বিনয় ও নম্রতা। দু'জন অহংকারী মুতাকাব্বির ব্যক্তির মাঝে কখনো ঐক্য স্থাপিত হতে পারে না। কারণ, কোন ব্যক্তির মাঝে যখন নম্রতা সৃষ্টি হয় তখন তার জন্য নিজেকে অন্যের তাবে বা অধীনস্ত বানানো কোন কঠিন বা মুশকিল মনে হয় না। অনুরূপ অন্য কারো মতের কাছে নিজের মতকে পরিহার করাও তার জন্য কোন কষ্টকর ব্যাপার হয় না। পক্ষান্তরে কোন মুতাকাব্বির বা অহংকারীর জন্য এমনটি কস্মিনকালেও সম্ভব নয়।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

হাদীস শরীফে আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা আমাকে নবী হযরত ইউনূস ইবনে মাত্তা (আঃ) থেকে অধিক ফযীলতের মনে করবে না।'

হযরত মাওলানা ফখরুল হাসান গাঙ্গুহী (রহঃ) নিজ উস্তাদ হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ)–এর নিকট এ হাদীসের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলেন যে, সকল মুসলমানের সর্বসম্মত আকীদা ও বিশ্বাস হচ্ছে, আমাদের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত নবী (আঃ)গণ অপেক্ষা উত্তম ও অধিক সম্মানিত, সকলের সরদার এবং সব নবী (আঃ)গণের ইমাম। কিন্তু উপরোক্ত হাদীসে হযরত ইউনূস (আঃ) থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অধিক ফযীলতের মনে করতে নিষেধ করার কারণ কি? এ প্রশ্নটির কথা হাদীসের সকল

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

ব্যাখ্যাতাই নিজ নিজ ব্যাখ্যাগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধারায় বিভিন্ন পন্থায় এর উত্তরও দিয়েছেন।

কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তরে হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গূহী (রহঃ) একটি সুন্দর জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই হাদীসটিই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল নবী (আঃ)গণের তুলনায় আফযল ও উত্তম হওয়ার প্রমাণ। কারণ, এ হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে উত্তম বলতে নিষেধ করেছেন আর যারা প্রকৃতপক্ষে উত্তম হয়ে থাকেন তাদের তরীকা ও পদ্ধতি এটাই যে, তারা নিজেদেরকে অন্যের উপর প্রাধান্য দিতে বারণ করেন।

এ জবাব দ্বারা মাওলানা ফখরুল হাসান সাহেব সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তখন হযরত গাঙ্গূহী (রহঃ) তাঁকে বললেন, আচ্ছা আপনি বলুন যে, আপনি আপনার তুলনায় আমাকে কেমন মনে করেন? আমাকে আপনি নিজের থেকে উত্তম মনে করেন কিনা? সকলে একবাক্যে বলে উঠলেন, এতে তো সামান্য পরিমাণ সন্দেহের অবকাশ পর্যন্ত নেই। একথা শুনে হযরত গাঙ্গূহী (রহঃ) বললেন, আমি যদি আপনাদের সামনে কসম করে কোন কথা বলি তবে আপনারা সে কথা সত্য বলে বিশ্বাস করবেন কিনা? সকলে উত্তর দিলো, কোনরূপ সন্দেহ বা সংশয় ছাড়াই আমরা তা সত্য বলে মেনে নিবো। এরপর হযরত গাঙ্গূহী (রহঃ) বললেন, আল্লাহ পাকের কসম করে বলছি, আমি আপনাদের প্রত্যেককেই আমার থেকে উত্তম মনে করি। হযরত গাঙ্গূহী (রহঃ)–এর এরূপ কসম করার কারণে মজমায় উপস্থিত সকলেই বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লো এবং হযরত গাঙ্গূহী (রহঃ) তখন মজলিস থেকে উঠে নিজের খাস কামরায় চলে গেলেন।

বিরুদ্ধবাদীদের সাথে হযরত গাঙ্গূহী (রহঃ)–এর আচরণ

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, কোন এক ব্যাপারে হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গূহী (রহঃ) একটি ফতওয়া লিখলেন। সে ফতওয়ার উপর হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী (রহঃ)–এর প্রসিদ্ধ মুরীদ আমীর শাহ খাঁন সাহেব কিছু প্রশ্ন তুললেন এবং তা লিখিত আকারে ডাকযোগে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর তার খেয়াল হলো যে, আমি তো বেয়াদবী করে ফেললাম। তখন সাথে সাথে তিনি পূর্বের চিঠির

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

ব্যাপারে ক্ষমা চেয়ে এবং ভুল স্বীকার করে আরো একটি পত্র পাঠিয়ে দিলেন।

দুটি পত্রই যখন হযরত গাঙ্গূহী (রহঃ)–এর হাতে পৌছুলো তখন তিনি তার জবাবে লিখলেন, আমার কাছে আপনার প্রেরিত প্রশ্ন ও আপত্তি সম্বলিত প্রথম পত্রটি খুব ভাল লেগেছে কিন্তু পরের পত্রটি ভাল লাগেনি। কারণ, প্রথম পত্রে আপনি যা কিছু লিখেছিলেন তা একমাত্র দ্বীনের জন্যই লিখেছিলেন এবং এ ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আপনার সে লেখার দ্বারা বেআদবী করা উদ্দেশ্য ছিলো না। এজন্য আমার মনে সামান্যতমও অনীহা বা অপসন্দের ভাব সৃষ্টি হয়নি। যেমন হযরত মাওলানা রুমী (রহঃ) বলেছেন—

گفتگوی عاشقان درکار رب   جوشش عشق است نے ترک ادب

অর্থাত, মহান আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের প্রয়োজনে আশেক লোকদের কথা কোন বেয়াদবী বা আদব পরিপন্থী কিছু নয় বরং এ সবই তার ইশকের জোশমাত্র।

উপরোক্ত ঘটনার ঠিক বিপরীত একটি ঘটনা—একবার এই ঘটলো যে, এক ব্যক্তি হযরত গাঙ্গূহী (রহঃ)–এর কাছ থেকে একটি ফতওয়া লিখিয়ে নেয়ার পর সে ঐ ফতওয়ার উপর বিতর্কের ভঙ্গিতে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করে তা লিখে পাঠিয়ে দিলো। তার সেসব প্রশ্নের জবাবে হযরত গাঙ্গূহী (রহঃ) উত্তরপত্র লিখে পাঠালেন যে, আমরা আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা মতে উত্তর দিয়েছি। যদি তা আপনার পসন্দ না হয়, তবে যে আলেমের উপর আপনার আস্থা হয় তার কাছে গিয়ে বিষয়টি জেনে নিন।

فَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيْمٌ

অর্থাত, প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির উপর অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি রয়েছেন।

মসনবী কিতাবের সারমর্ম

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব (রহঃ) বলেন, আমি মাওলানা রুমী (রহঃ)–এর মসনবী যতই অধ্যয়ন করেছি আমার কাছে এ বিষয়টিই পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হয়েছে যে, সমস্ত মসনবী শরীফের সারমর্ম হচ্ছে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

এক নাম্বারে তাওহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদকে বর্ণনা করা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, ইসলাহে নফস বা আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহপাক পর্যন্ত পৌঁছার জন্য একজন শাইখে কামিল তথা হক্কানী শাইখের প্রয়োজনীয়তা।

হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)-এর কিতাব অধ্যয়ন

হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, আমার খুব বেশী কিতাব মুতালায়া বা অধ্যয়ন করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়নি। কারণ, আমি শুধু ইলমকেই মূল উদ্দেশ্য বলে বুঝিনি। আমলের জন্য যতটুকু ইলমের প্রয়োজন ততটুকু ইলমের ক্ষেত্রে আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের উপর পরিপূর্ণ নির্ভরতা ও বিশ্বাস ছিলো। সুতরাং পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যায় তাঁরা যা কিছু বলেছেন, তার উপরই অন্তর নিস্কন্টক ছিলো।

হযরত থানবী (রহঃ)-এর প্রায় একহাজার কিতাবের উল্লেখ করে একজন আগন্তুক আরয করলো, আপনি যখন এতগুলো কিতাব লিখেছেন, সুতরাং আপনার তো এর চাইতে কয়েকগুণ অধিক কিতাব অধ্যয়ন করতে হয়েছে। এর জবাবে হযরত থানবী (রহঃ) বললেন যে, হাঁ, আমি কিছু কিতাব ঠিকই অধ্যয়ন করেছি, যে কিতাবগুলোর নাম হচ্ছে, হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহঃ), হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) এবং হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ)।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, উল্লিখিত কিতাবসমূহই আমাকে অন্য সব কিতাব থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছে। হয়ত এ ধরনের বুযুর্গ হযরতগণের প্রতি লক্ষ্য করেই কোন আরবী কবি বলেছেন—

وانت الكتاب المبين الذى × باحرفه يظهر المضمر

অর্থাত, তুমিই হলে সেই সুস্পষ্ট কিতাব যার প্রতিটি হরফের দ্বারা সব গোপন বিষয়াদি প্রকাশ পেয়ে যায়।

সাহাবায়ে কিরামের (রাযিঃ) বিশেষ মর্যাদা

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, কোন এক ব্যক্তির কয়েকজন সাহাবী (রাযিঃ) সম্পর্কে কিছুটা সংশয় ছিলো। সে একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, সমুদ্রের মধ্যে যদি হাজারো ময়লা আবর্জনা এবং নাপাক বস্তু নিক্ষেপ করা হয় সেগুলো সমুদ্রের পানিকে পরাজিত বা অপবিত্র করতে পারে না। সেসব ময়লা আবর্জনার কোন নিদর্শন সমুদ্রের পানিতে প্রকাশ পায় না বরং সমুদ্রের পানিই ঐসব কিছুর উপর প্রবল ও বিজয়ী হয়ে থাকে।

নিয়্যতের গুরুত্ব

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, মহান আল্লাহ মানুষের অন্তর এবং তার নিয়্যত ও ইচ্ছাকে দেখে থাকেন। যদি তা একমাত্র আল্লাহ পাকের জন্য হয়। এরপর আমলের ক্ষেত্রে যদি কিছুটা অলসতা বা স্বল্পতা প্রকাশ পায় তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা ক্ষমা করে দেয়া হয়।

দ্বীনী মাদরাসার বিশেষ গুরুত্ব

হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ) বলেন, বর্তমানে ধর্মীয় অনুশাসন উপেক্ষা করে স্বাধীনভাবে চলার প্রবণতা, বদদ্বীনী, নাস্তিকতা ও খোদাদ্রোহীতা যে হারে যত বেশী ছড়িয়ে পড়ছে আমার খেয়ালে দ্বীনী মাদরাসাসমূহের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে একটা বিশেষ অনুগ্রহ যে, আমার অন্তরে দেওবন্দ মাদরাসার প্রতি আগ্রহ এবং মহব্বত এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এর আগে কখনোই এতটা ছিলো না। অনুরূপভাবে অন্যান্য দ্বীনী মাদরাসাসমূহের গুরুত্বও অন্তরে বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি বিভিন্ন দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, মানতিক ও গণিত বিদ্যা ইত্যাদি যা এসব মাদরাসায় পড়ানো হয় সেগুলোকেও আমি উপকারী এবং প্রয়োজনীয় বলে মনে করছি। কারণ, বর্তমান সময়ে নাস্তিক্যবাদ এবং বিজ্ঞান পূজারীদের চিকিৎসার পথ এটাই যে, উলামায়ে কিরাম নিজেরাই ঐসব জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে অবগতি লাভ করবেন। যাতে প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর তাদের মিজায ও মানসিকতা মুতাবেক দিতে পারেন। এবং যাতে আলিম সমাজকে তারা অবস্থানগত দিক থেকে তাদের তুলনায় নিচু মনে করতে না পারে। যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের এসব বিষয় যদিও মূলতঃ কোন দ্বীন নয় কিন্তু এগুলোর দ্বারাও দ্বীনের খেদমত নেয়া যেতে পারে।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, ইদানিং এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

পবিত্র কুরআন শরীফের দু'টি আয়াতের বাহ্যিক বৈপরিত্ব দেখে সে ব্যাপারে প্রশ্ন করলো। আমি গণিত শাস্ত্রের সাহায্যে উত্তর দিয়ে তাকে বিষয়টি বুঝালাম, সেও বিষয়টি বুঝে গেলো।

তার প্রশ্ন ছিলো, কিয়ামতের দিন দীর্ঘ হওয়ার ব্যাপারে এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এক হাজার বছর পরিমাণ। আবার অপর এক আয়াতে خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ অর্থাত, পঞ্চাশ হাজার বছর পরিমাণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ দুই আয়াতে বর্ণিত পরিমাণের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। লোকটির একথা শুনে হযরত থানবী (রহঃ) গণিত শাস্ত্রের নীতি অনুযায়ী বললেন, একটি দিগন্তের হিসাবে যা এক হাজার বৎসরের বরাবর হয়, অপর দিগন্তের হিসাবে তা পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান। এর পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ তাফসীরে বয়ানুল কুরআনে লিখে দেয়া হয়েছে। (মালফূয, ১৯শে শা'বান, ১৩৪৮ হিজরী)

প্রকাশ্য এবং গোপন ইবাদত

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, মানুষ নিজের নফল ইবাদত এবং দ্বীনী কামালসমূহকে সাধারণতঃ প্রবৃত্তির তাড়নাতেই প্রকাশ করে থাকে। সাথে সাথে তারা এটা প্রকাশ করা যে পসন্দনীয় নয় তাও জানে। তবে এক্ষেত্রে খুব বেশী চেপে ঢেকে গোপন রাখার প্রতি যত্নবান হওয়াও ঠিক নয়। কারণ, এর দ্বারা কিছুটা হলেও গাইরুল্লাহর প্রতি লক্ষ্য নেয়া হয়। যদিও সে লক্ষ্যটা নেক আমল প্রকাশের জন্য নয় বরং নেক আমল গোপন করার জন্য। মুহাক্কিক বুযুর্গগণের কর্মধারা হলো, তারা তাদের আমল ও কাজকে নিজ গতিতে চালিয়ে যেতে থাকেন। এক্ষেত্রে তারা সে কাজ বা আমল প্রকাশ করার ইচ্ছা যেমন করেন না, তেমনি তা গোপন করার জন্য হাহুতাশও তাদের থাকে না। সুফিয়ায়ে কিরামের মধ্যে একটি গ্রুপ ছিলো, যারা 'মালামাতিয়াহ' নামে প্রসিদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে তাদের উদ্দেশ্য ছিলো আমল গোপন রাখার ব্যাপারে খুব যত্নবান হওয়া, গুনাহে লিপ্ত হওয়ার বিষয়টি গোপন রাখা নয়। 'আওয়ারিফ' নামক গ্রন্থে 'মালামাতিয়া' সম্প্রদায়ের পরিচয় এভাবেই দেয়া হয়েছে।

স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

চিঠির মাধ্যমে আমাকে একটি খাবের (স্বপ্নের) কথা লিখেছিলো। আমি তার জবাবে লিখলাম, 'জাগ্রত অবস্থার কথা লিখ, খাবের পিছনে পড়ো না।'

এরপর হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করলেন, কেউ যদি এই সন্দেহ করে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো গুরুত্ব সহকারে খাব শুনতেন এবং তার ব্যাখ্যা বর্ণনা করতেন। (তাহলে খাবের পিছনে পড়ো না কথাটি কিভাবে ঠিক হয়?) তবে তার জবাব হলো, এখন সেই ধরনের খাব দর্শনকারীও নেই আর সে ধরনের ব্যাখ্যাকারীও নেই।

কাউকে কেবলা বা কা'বা বলা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ)-এর কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিলো যে, লোকেরা কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যকার বড় বা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামের সাথে 'কেবলা' 'কাবা' ইত্যাদি লিখে থাকে (ইসলাম ও শরীয়তের দৃষ্টিতে) এটি কেমন?

হযরত থানবী (রহঃ) এর উত্তরে বললেন, রূপক অর্থে এমনটি বলা হয় বিধায় এতে কোন অসুবিধা নেই। তবে এমনটি পরিহার করাই ভাল।

সুন্নাতে নববী (সাঃ)-এর বরকত

হযরত থানবী (রহঃ)-এর খেদমতে একবার প্রশ্ন করা হলো যে, কোন এক ব্যক্তি যে কোন একটি কাজ সুন্নাত মুতাবেক করে কিন্তু সেটি যে সুন্নাত তাও সে জানে না। আর সে কাজটি সে সুন্নাতের অনুসরণের নিয়্যতেও করল না। এর পরেও কি সে ব্যক্তি এ কাজের জন্য সওয়াব লাভ করবে?

হযরত থানবী (রহঃ) বললেন, নিয়্যত না করার কারণে সে সওয়াব তো পাবে না কিন্তু যেহেতু কাজটি সুন্নাত মুতাবিক করা হয়েছে তাই তার বরকত থেকে সে একেবারে বঞ্চিতও হবে না।

আত্মার সাথে সম্পৃক্ত কিছু শে'র

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহঃ)-এর একটি ফারসী শে'র আছে, যা নিম্নরূপ—

دلے دارم جواہر خانہ عشق است تحویلش

کہ دارد زیر گردون میر سامانے کہ من دارم!

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

অর্থাত, আমার একটা অন্তর আছে যার যাবতীয় কর্মকাণ্ডই প্রেম আর ইশকের ফল, আমার ইশক ও প্রেমের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিষয়াদি দ্বারাই আমার অন্তর পূর্ণ রয়েছে।

হযরত খাজা আযীযুল হাসান সাহেব (রহঃ) হযরত থানবী (রহঃ)–এর দরবারে এই শে'র পাঠ করলে হযরত থানবী (রহঃ) তা খুব পসন্দ করলেন এবং বললেন, আত্মার ব্যাপারে হযরত বুযুর্গানে দ্বীনের বিভিন্ন মত আছে। কুদসীর নিম্নোক্ত শে'রগুলোও সে ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য—

دارم دلے اما چہ دل صد گونہ حرماں در بغل

چشمے وخوں در آستیں اشکے وطوفاں در بغل

روز قیامت ہر کسے آید بدستش نامۂ

من نیز حاضر میشوم تصویر جاناں در بغل

অর্থাত, আমার একটি প্রেমিক অন্তর আছে কিন্তু আমার আমলনামায় রয়েছে হাজারো গুনাহ আর বঞ্চনা। চোখে আমার রক্তের অশ্রু প্রবাহিত আর বোগলে আমার প্রেমিকসুলভ উৎসাহ ও জযবা। কিয়ামতের ময়দানে যখন প্রত্যেক ব্যক্তি তার আমলনামা হাতে নিয়ে উপস্থিত হবে, আমিও তখন আমার প্রেমাস্পদের ছবি বগলে ধারণ করে সেখানে হাযির হবো।

উপরের পংক্তিসমূহের শেষ পংক্তিটি হযরত শাহ আবদুল আযীয সাহেব (রহঃ) কিছুটা পরিবর্তন করে এভাবে পাঠ করতেন—

من نیز حاضر میشوم تفسیر قرآں در بغل

অর্থাত, আমিও সেখানে পবিত্র কুরআনের তাফসীর বগলে নিয়ে উপস্থিত হবো।

একটি বাণী

হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ) বলেন, আমি বেয়াদবীকে গুনাহ থেকে অধিক ক্ষতিকর মনে করি। এ প্রসঙ্গে হযরত (রহঃ) একবার বলেন, মাশায়েখ এবং উলামায়ে কিরামের সাথে বেয়াদবী করতে আমার খুবই

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

ভয় লাগে। কেননা, এর পরিণাম এবং ফলাফল খুবই ভয়াবহ হয়ে থাকে।

ঘুষের সংজ্ঞা

ঘুষের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ) বলেন, ঘুষের এমন একটা ব্যাপক সংজ্ঞা আছে, যা ঘুষের সকল প্রকারকেই শামিল করে নেয় সে সংজ্ঞাটি হলো, মূল্যহীন বস্তু যার কোন দাম বা মূল্য নির্ধারণ করা যায় না তার বিনিময় বা মূল্য গ্রহণ করা।

সুফিয়ায়ে কিরামের তরীকা

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, সুফিয়ায়ে কিরামের তরীকার আসল ও প্রকৃত বস্তু হলো 'সোহবতে শাইখ' এবং 'মহব্বতে শাইখ' এ দুটি বস্তু বাদ দিয়ে শুধু তা'লীম আর তালকীন কোন কাজে আসে না। পক্ষান্তরে তা'লীম ও তালকীন ছাড়া শুধু সোহবত বা সংস্পর্শও যথেষ্ট কার্যকর ও উপকারী হয়ে থাকে। পূর্ব যুগের বুযুর্গানে দ্বীনের খুব বেশী তা'লীম ও তালকীন দেয়ার ব্যাপক অভ্যাস ছিলো না। বরং তাদের সোহবত ও সংস্পর্শের বরকতেই নফসের ইসলাহ হয়ে যেতো।

খুব সম্ভব হযরত মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) 'মানসাবে ইমামত' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, বুযুর্গানে দ্বীনের ফয়েয সূর্যের সোহবত বা সংস্পর্শের মত। সূর্যের আলোতে যেই আসে সেই তার সুফল লাভ করে, যদিও সুফল ভোগকারী নিজেরও সে ব্যাপারে জানা না থাকে। এবং সে সুফল লাভের ইচ্ছা করুক কিংবা না করুক সূর্যের আলোর সুফল সকলের সমানভাবেই লাভ হতে থাকে। অনুরূপ বিশেষ বিশেষ বুযুর্গানে দ্বীনের সোহবতের ফয়েযও এমনি ব্যাপক হয়ে থাকে। আর এ ধরনের বুযুর্গানে দ্বীনের আলামত বা নিদর্শন হলো তাদের ইন্তিকালের সময় ব্যাপকভাবে মানুষের অন্তরে একটা অন্ধকারাচ্ছন্নতা এবং ব্যথা অনুভূত হতে থাকে। হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর ইন্তিকালের পর সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)–এর ব্যক্ত করা একটি বাক্য উপরোক্ত কথার পক্ষে প্রমাণ বহন করে।

প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর ইন্তিকালের পর হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) বলেছিলেন—

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

والله ما انفضنا ايدينا من التراب حتى انكونا قلوبنا

অর্থাত, আল্লাহ পাকের কসম! আমরা প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর দাফনকার্য সম্পন্ন করে আমাদের হাতের মাটি ধুয়ে ফেলার আগেই আমাদের অন্তরের মাঝে পরিবর্তন অনুভূত হয়েছে।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, মাশায়েখে কিরামের সংস্পর্শে যারা থাকে তারা সর্বদাই ঐ বুযুর্গ থেকে লাভবান ও উপকৃত হতে থাকে। এক্ষেত্রে উপকৃত ব্যক্তি তার উপকারের বিষয়টি অনুভব এবং উপলব্ধি করুক আর নাই করুক।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

রমযানুল মুবারক, ১৩৫০ হিজরী

সেমা' জায়েয হওয়ার শর্তসমূহ

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, হযরত সুলতান নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহঃ) 'ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ' নামক গ্রন্থে সেমা' জায়েয হওয়ার শর্তসমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন। যার সারমর্ম হলো চারটি বস্তু, যে চারটি বস্তু সেমা' এর 'আরকানে আরবা' তথা চার রোকনের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাত, ১. শ্রোতা ২. যে ব্যক্তি শুনায় ৩. যা শোনা হয় ৪. যেসব যন্ত্রের মাধ্যমে সেমা' করা হয়। প্রত্যেকটির ব্যাপারে হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহঃ)-এর নিকট জায়েয হওয়ার শর্তসমূহ নিম্নরূপ—

১. শ্রোতা ঃ শ্রোতাকে পবিত্র মনের মানুষ হতে হবে। সে যেন প্রবৃত্তি পূজারী না হয়। অর্থাত, সেমা' যে শুনবে সে অবশ্যই সাচ্চা দিল বিশিষ্ট মানুষ হতে হবে। সে প্রবৃত্তির এমন অনুসারী হবে না যে খাহেশাতে নফসানী তথা প্রবৃত্তির চাহিদার পিছনে চলে।

২. যে শুনায় ঃ যে ব্যক্তি সেমা শোনাবে সে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে। মহিলা কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক হতে পারবে না। অর্থাত, সেমা পাঠকারী প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ হওয়া বাঞ্ছনীয় কোন মহিলা কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক দাড়িবিহীন বালকের সেমা' জায়েয হবে না।

৩. যা শোনা হয় ঃ যে পদ্য, কবিতা বা শের পাঠ করা হবে তা বেহুদা বা অশ্লীল না হতে হবে। অর্থাত ঐ কথা যা সেমা' হিসেবে শোনানো হবে তা কোন প্রহসনমূলক কৌতুক কিংবা কোন অশ্লীল কথা না হওয়া।

৪. শোনানোর যন্ত্র বা মাধ্যম ঃ সেমা' এর সাথে দোতারা, সেতারা বা অন্য কোন বাদ্যযন্ত্র থাকতে পারবে না। অর্থাত, দোতারা, সেতারা, হারমোনিয়াম ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে তার তালে তালে যেন সেমা' না হয়।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) একথাগুলো বিবৃত করার পর বলেন, পূর্বযুগের কোন কোন সূফী সাধক থেকে যে সেমা-এর কথা প্রমাণিত আছে তা উপরোক্ত শর্ত সহকারেই প্রমাণিত। কিন্তু বর্তমান সময়ে বিভিন্ন কামনা-বাসনায় মত্ত এক শ্রেণীর লোক গান-বাজনা তো করছেই সাথে সাথে ঐ সমস্ত সেমা তথা গান-বাজনাকারীদের গুরুদের

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

কোন কামাল বা বুযুর্গী তো মোটেও নেই কিন্তু পূর্বকালের যে সকল বুযুর্গ সেমা' করেছেন তারা শুধু 'আহলে সেমা' ছিলেন না, বরং 'আহলে সামা–অর্থাৎ আসমানওয়ালা তথা সম্মানিত আল্লাহওয়ালা ছিলেন। বর্তমানের গান–বাজনাওয়ালারা হলো 'আহলে আরদ' যাদের দেখলে মনে হয় اخلد الى الارض তথা অধঃপতিত সম্প্রদায় স্থায়ীভাবে জমিনেই থাকবে।

কামেল লোক চেনার মাপকাঠি

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, যদি কোন আলিমের ইলমের অবস্থান এবং দক্ষতা জানতে হয় তবে তার ছাত্রের কাছে জিজ্ঞাসা করুন। আর যদি কোন সুফী বুযুর্গ ব্যক্তির মর্যাদা বা অবস্থান জানতে হয় তবে তার সাথে তার সময়ের অন্যান্য মাশায়েখ এবং তরীকতের লাইনের মুরব্বীদের আচরণ লক্ষ্য করুন। দেখুন তারা এ বুযুর্গের সাথে কেমন এবং কোন্ ধরনের আচরণ করেন। তারা এ বুযুর্গ ব্যক্তিকে প্রকৃতপক্ষেই একজন সাচ্চা বুযুর্গ হিসেবে স্বীকার করে সে ধরনের আচরণ করেন কিনা।

এরপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, এ প্রসঙ্গে আমার একজন শাহী নাপিতের কিচ্ছা স্মরণ হলো। কিচ্ছাটি হলো, একবার বাদশাহ ঐ নাপিতকে চুল কাটার জন্য তলব করলো। সে নাপিত তখন কোন কারণে উপস্থিত হতে পারলো না। সে অত্যন্ত অস্থির হয়ে ভাবতে লাগলো যে, এই ক্ষতি সে কিভাবে পূরণ করবে। চিন্তা–ভাবনা করে সে বাদশাহর দরবারের খাদেমদের কাছে এই বলে অনুরোধ করলো যে, যখন বাদশাহ ঘুমিয়ে পড়বেন তখন তোমরা আমাকে একটু সুযোগ দিবে আমি ঘুমের মধ্যেই বাদশাহর চুল কেটে দিবো।

কথামত বাদশাহর খাদেমরা তার প্রতি সহমর্মী হয়ে তাকে সুযোগ দিলো। ঐ নাপিত ঘুমের মধ্যেই এমনভাবে বাদশাহর চুল কেটে দিলো যে, বাদশাহ সামান্য টেরও পেলো না। ঘুম থেকে উঠে বাদশাহ দেখলো তার চুল কাটা। সে দরবারের লোকদের জিজ্ঞাসা করলে তারা পূর্ণ ঘটনা বাদশাহকে শোনালো। বাদশাহ নাপিতের এ দক্ষতা দেখে খুব খুশি হলো এবং তাকে 'উস্তাদ'–এর রাজ উপাধিতে ভূষিত করলো। বিষয়টি অল্প সময়ে শহরে ছড়িয়ে পড়লো। ফলে তার আত্মীয়–স্বজন ও পরিচিত

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

লোকজনের বিবিরা ঐ নাপিতের বিবির কাছে তাকে মুবারকবাদ দেয়ার জন্য উপস্থিত হলো। নাপিতের বিবি যখন বিষয়টি জানতে পারলো তখন সে একজন বিচক্ষণ মানুষের মত একটি কথা বললো। নাপিতের বিবি বললো, এই উপাধি যদি নাপিত জাতির পক্ষ থেকে কিংবা কোন বিশিষ্ট নাপিতের পক্ষ থেকে দেয়া হতো তবে আমি আনন্দিত হতাম। কারণ, সেটা আমার স্বামীর দক্ষতার পক্ষে প্রমাণ হতো। বাদশাহ নাপিতগীরির কি বুঝেন। সুতরাং বাদশাহর পক্ষ থেকে দেয়া এই উপাধির কারণে আমার কাছে তার কোন সম্মান বা মর্যাদা বৃদ্ধি পায়নি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাবে দেখা

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, এ ব্যাপারে হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহঃ) এবং শাহ আবদুল কাদের দেহলবী (রহঃ)–এর মাঝে এ ব্যাপারে মতপার্থক্য ছিলো যে, যদি কোন ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর দৈহিক বিবরণ সম্বলিত প্রসিদ্ধ হুলিয়া মুবারকের ব্যতিক্রম কোন আকৃতিতে খাবে দেখে। বিশেষতঃ সে আকৃতি যদি শরীয়ত নির্ধারিত আকার–আকৃতি পরিপন্থী হয় তাহলে এ খাব 'রূ'য়ায়ে সাদিকাহ' বা সত্য ও বাস্তব খাব হবে কিনা। (একজনের মত হলো এটাও বাস্তব ও সাচ্চা খাব হিসেবে পরিগণিত হবে আর অপরজনের মতে হবে না।)

বাহাদুরী ও দয়া একে অপরের পরিপূরক

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, বর্তমানে লোকেরা জুলুম, অত্যাচার, চুরি, ডাকাতি এবং নির্দয় আচার–আচরণের নাম রেখেছে বাহাদুরী। এক্ষেত্রে বাস্তব কথা হলো, যার মধ্যে প্রকৃত বাহাদুরীর প্রাবল্য থাকে তার মাঝে দুর্বলদের জন্য দয়াও বেশী থাকে। নির্দয় এবং পাষণ্ডের মত আচরণ শুধু তাদের দ্বারাই প্রকাশ পেয়ে থাকে যাদের মাঝে প্রকৃত বাহাদুরী বা বীরত্ব নেই। আর এ কারণেই হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের মাঝে কোন দয়ার্দ্রচিত্ততা ও সহমর্মিতা নেই। যখন কারো সাথে মোকাবেলা করার জন্য আসে তখন প্রতিপক্ষের সাথে এমন নির্দয় আচরণ করে যা দেখলে স্বাভাবিক মানবতাবোধ পর্যন্ত কেঁপে উঠে। মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহ প্রকৃত বীরত্ব ও বাহাদুরী দান করেছেন।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

ইতিহাস তার সাক্ষী, কোন দুর্বল দুশমন যদি ধরা পড়তো বা মুসলমানদের আয়ত্বে এসে যেতো তবে তার সাথে কস্মিনকালেও নির্দয় আচরণ করা হতো না।

যার স্ত্রী বেপর্দায় চলে

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব নানুতুবী (রহঃ)–এর কাছে একবার একটি প্রশ্ন এলো। প্রশ্নটি ছিলো—যে ব্যক্তির স্ত্রী পর্দায় থাকে না তার ইমামতি করা জায়েয আছে কিনা? হযরত ইয়াকুব সাহেব নানুতুবী (রহঃ) এ প্রশ্নের উত্তরে লিখলেন—

যেখানে মুক্তাদিরা সব এ ধরনেরই হয় সেখানে ঐ ব্যক্তির ইমামতি করা জায়েয হবে। যেমন সবাই যদি কাপড় ছাড়া উলঙ্গ হয়, তবে সেখানে একজন উলঙ্গ ব্যক্তির ইমামতি করা জায়েয। অতঃপর হযরত (রহঃ) বলেন, পরিপূর্ণ পর্দা বর্তমানে কোথায়ই বা আছে। কারো বিবি বেপর্দা, বাইরে ঘুরে বেড়ায়, আবার কারো স্ত্রী হয়তো বাইরে ঘুরে বেড়ায় না, কিন্তু তার ঘরের মধ্যে বেগানা নামাহরাম পুরুষ প্রবেশ করে, ঘরের মহিলাদের সাথে দেখা করে এই দুই অবস্থার যে কোন একটিতে লিপ্ত নয় এমন লোক ক'জনইবা আছে। 'ইল্লা মাশাআল্লাহ'।

স্যার সৈয়দ এবং মাওলানা ইয়াকুব (রহঃ)

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বর্ণনা করেন, যে সময়ে স্যার সৈয়দ আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেছিলো, সে সময়েই পূর্বসূরী বিশিষ্ট উলামায়ে কিরাম দারুল উলূম দেওবন্দের ভিত্তি স্থাপন করেন। যখন স্যার সৈয়দ এ সংবাদ জানতে পারলো তখন সে বললো, এর দ্বারা আর কি হবে বরং মসজিদে কপাল ঠোকার আরো দু'চারজন লোক বাড়বে এই তো। হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) যিনি দারুল উলূমের প্রথম সময়ের সদরুল মুদাররিস ছিলেন, তিনি যখন স্যার সৈয়দের এ উক্তি শুনলেন তখন তিনি দু'আ করলেন—আয় আল্লাহ! এ কথার আমলী (বাস্তব) জবাব তো একমাত্র আপনিই দিতে পারেন। অতঃপর বললেন, আমার সাথে আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন যে, এই মাদরাসায় পাঠ গ্রহণকারী কোন মানুষ দশ টাকার কম

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

বেতনের কর্মচারী হবে না। এ কথাটা ছিলো আজ থেকে প্রায় এক/দেড়শ' বছর পূর্বের। সুতরাং সে সময়ের দশ টাকা বর্তমান সময়ের পাঁচ শত টাকার সমপর্যায়ের ছিলো। হযরতের এ কথার উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এটাই ছিলো যে, এই মাদরাসায় শিক্ষা গ্রহণকারী কাউকে জীবিকার জন্য অস্থিরতার শিকার হতে হবে না।

যে অঞ্চলে ইশার নামাযের ওয়াক্ত হয় না

এই মাসআলার ব্যাপারে এই মজলিসে হযরত থানবী (রহঃ) যা ইরশাদ করেছিলেন তা বর্ণনা করার পূর্বে এ বিষয়ে আসল মাসআলা বুঝে নেয়া দরকার। তা হলো, উত্তর মেরুর কিছু এলাকায় আমাদের দেশের মত রাত-দিনের এ নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা নেই। বুলগার ইত্যাদি রাষ্ট্রে বৎসরে এমন কিছুদিন আসে, যখন সূর্য ডুবে যাওয়ার পর আসমানের সাদা আভা বিলুপ্ত হওয়ার আগেই পুনরায় সূর্য উঠে আসে। যেন ঐ দিনগুলোতে সে এলাকায় ইশা এবং বিতরের নামাযের ওয়াক্তই হয় না। এ বিষয়টি পূর্ব যুগের ফকীহগণের মাঝে আলোচিত হওয়ার পর তাদের থেকে বিভিন্ন মত প্রকাশ পেয়েছে।

উলামায়ে কিরামের এক জমাআতের মত হলো, তাদের উপরও ইশার নামায পড়া ফরয। যদিও তাদের নামায আদায় করতে হবে সূর্য উদিত হয়ে যাওয়ার পর। কারণ প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার কথা পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্র বা কোন অঞ্চলের জন্য ভিন্ন বিধান দেয়া হয়নি। এ মত ব্যক্তকারী ফকীহগণ তাদের এ ফতওয়ার পক্ষে দাজ্জালের সময়ের একটি হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করে থাকেন। যে হাদীসে বলা হয়েছে, দাজ্জালের সময়ে একটি দিন হবে এক বৎসরের সমান। সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) আরয করলেন, যে সময় একটি দিন এক বৎসরের সমান হবে সে দিনেও কি শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই পড়া হবে? উত্তরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, না বরং আনুমানিক হিসাব করে প্রতি একদিন পরিমাণ সময়ের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত করে নামায পড়তে হবে।

ফুকাহায়ে কিরামের অপর এক জামাআতের মতামত হলো, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পাঁচটি ওয়াক্তের সাথে শর্তযুক্ত। যে স্থানে যে নামাযের

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

ওয়াক্ত মোটেও আসে না সেখানে সে নামায সাকেত বা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যেমন উযূর মধ্যে চারটি ফরয। কিন্তু যদি কারো পা কাটা থাকে তবে তার উপর পা ধৌত করার ফরযটি আর বিধিবদ্ধ থাকে না। তার দায়িত্বে তখন শুধু তিনটি ফরযই বাকী থাকে। এ মতাবলম্বী আলিমগণ দাজ্জালের সময়কার উক্ত হাদীস–এর সাথে তুলনা করা সঠিক মনে করেন না।

উত্তরমেরুর রাষ্ট্রসমূহে রাত্র–দিনের এই ব্যতিক্রমী ধারা ছাড়াও সূর্য উদিত হওয়া ও অস্ত যাওয়ার আরো বিভিন্ন সূরত ও পরিস্থিতি সামনে আসে। সেসব ক্ষেত্রে নামায পড়ার ব্যাপারেও ফকীহগণের উল্লিখিত দুটি মত বিদ্যমান রয়েছে। কোন কোন ফকীহ্ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকেই তখনো ফরয বলে স্থির করে থাকেন। আর কোন কোন ফকীহ্–এর মতে যেখানে যে নামাযের ওয়াক্ত হয় না বা পাওয়া যায় না সে নামায তথাকার মুসলমানদের দায়িত্ব থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সে ওয়াক্ত নামায আদায় করা আর ফরয থাকবে না।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রহঃ) 'রদ্দুল মুহতার' নামক গ্রন্থে এ মাসআলার ব্যাপারে বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানধর্মী আলোচনা করেছেন এবং ফকীহগণের উভয় জামাআতের তাহকীকী এবং গবেষণাধর্মী আলোচনা উদ্ধৃত করেছেন।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ)–এর সামনেও এ প্রশ্ন কয়েকবার উত্থাপিত হয়েছে। যার বিবরণ ইমদাদুল ফাতাওয়ার প্রথম খণ্ডের ১১১ পৃষ্ঠা থেকে ১১৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিবৃত হয়েছে। হযরত থানবী (রহঃ) ফতওয়া দিয়েছেন ঐসব ফকীহগণের মতানুসারে যাদের মতে এমন পরিস্থিতিতে ঐ নামায ফরযই থাকে না যার ওয়াক্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। উপরোক্ত বিশ্লেষণের পর এবার হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)–এর ঐ মালফূয বা বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে যা হযরত থানবী (রহঃ) এই মজলিসে ইরশাদ করেছেন।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, বিশিষ্ট শাইখ, শাইখে আকবার মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহঃ) 'ফুতুহাত'–এর মধ্যে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, দাজ্জালের যমানায় যখন একটি দিন হবে এক বৎসরের সমান। প্রকৃতপক্ষে সে দিন এক বৎসর হবে না বরং সূর্যের নিয়ম তার নিজের অবস্থায় স্বাভাবিক থাকবে। সূর্যের উদয় এবং অস্ত নির্ধারিত সময়েই হতে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

থাকবে, কিন্তু তৎকালীন লোকদের দাজ্জালের দাজ্জালীর কারণে সূর্যের এই উদয় ও অস্ত যাওয়া দৃষ্টিগোচর হবে না। তারা এভাবে একটি বৎসরকে একদিনের মতই অনুভব করবে।

এ যুগের আবু হানীফা হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ সাহেব গাঙ্গুহী (রহঃ) 'ফুতুহাত'-এর উক্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলেন, এর দ্বারা একথা পরিস্কার হয়ে যায় যে, বুলগার এর অধিবাসী এবং উত্তরমেরুতে অবস্থিত দেশসমূহের বাসিন্দাদের ব্যাপারকে দাজ্জালের যমানার মাসআলার উপর তুলনা করা শুদ্ধ নয়। কেননা সেখানে প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তই ঠিক ঠিক নির্ধারিত সময় মত আসতে থাকবে কিন্তু মানুষের নজরে তা দৃষ্টিগোচর হবে না। এ কারণে সেখানে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, সময় অনুমান করে একদিন পরিমাণ সময়ে পাঁচওয়াক্ত করে নামায পড়তে থাকবে। কিন্তু বুলগার ইত্যাদি এলাকার অধিবাসীদের মাসআলা ইহার ব্যতিক্রম। কারণ, তাদের অঞ্চলে ইশার নামাযের ওয়াক্তই আসে না। এজন্য সেদিনগুলোতে তাদের প্রতি ইশার নামায আদায় করা ফরয থাকে না।

অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, এ মাসআলার আসল ভিত্তি তো পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীরের উপর। আয়াতটি হলো—

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا

আয়াতে পাকের তরজমা হলো, নিঃসন্দেহে নামায মুমিনগণের উপর ওয়াক্তের সাথে বিধিবদ্ধ একটি ফরয।

এ আয়াতের তাফসীর যদি এভাবে করা হয় যে, প্রত্যেক চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচওয়াক্ত নামায ফরয। তাহলে তো বুলগার-এর অধিবাসীদের উপরও প্রতিদিনের পাঁচওয়াক্ত নামায ফরয হবে। এক্ষেত্রে কোন বিশেষ নামাযের ওয়াক্ত তারা পাক বা নাই পাক। কিন্তু যদি আয়াতের তাফসীর এভাবে করা হয় যা পবিত্র কুরআনের শব্দ থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক দিনের নির্ধারিত সময়মত পাঁচওয়াক্ত নামায পড়া ফরয। তাহলে যেসব শহরে কোন বিশেষ নামাযের ওয়াক্তই হয় না সে নামায তাদের জন্য ফরযই থাকবে না।

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহঃ) যে বিশ্লেষণ করেছেন

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

তা হযরত শাইখে আকবার (রহঃ)–এর তাহকীক ও গবেষণা থেকেও বুঝে আসে। হযরত কাযী ইয়ায (রহঃ)ও দাজ্জালের হাদীসের ব্যাপারে প্রায় এ ধরনের মতই অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেছেন, দাজ্জালের হাদীস একটি 'খেলাফে কিয়াস' বা যুক্তিবিরুদ্ধ বিষয়কে বর্ণনা করেছে। এ জন্য সেটা শুধু দাজ্জালের সময়ের সাথেই বিশেষিত থাকবে। যা প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ বিশেষ সময়ের জন্য বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন। তিনি যদি এ বিশেষ বিধানকে ঐ নির্ধারিত সময়ের জন্য বিধিবদ্ধ না করতেন তবে ইসলামী আইন শাস্ত্র ফিকাহ–এর ইজতিহাদের ভিত্তিতে সে নির্ধারিত সময়েও একথাই বলা হতো যে, ঐ এক বৎসরের সমান একদিনেও নিজ নিজ ওয়াক্ত মত শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই আদায় করা হবে। কিন্তু পরিষ্কার বক্তব্য সম্বলিত হাদীস থাকার কারণে সেখানে কোন কিয়াস বা যুক্তির আশ্রয় গ্রহণকে পরিত্যাগ করা হয়েছে। আর কিয়াসের খেলাফ বা যুক্তির পরিপন্থী যে বিধানকে কোন বিশেষ মাসআলাহ বা বিশেষ ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ করা হয় সেখানে সাধারণ মূলনীতি এটাই যে, অন্যান্য মাসআলাহ বা বিষয়কে এ বিশেষ মাসআলার উপর কেয়াস বা তুলনা করা চলে না। (রদ্দুল মুহতার শামী ১ম খণ্ড, ৩৩৭ পৃঃ)

কাযী ইয়ায (রহঃ)–এর উক্ত বিশ্লেষণের সারকথা হচ্ছে, যদি দাজ্জালের সময়কার এক বৎসরের সমান একটি দিনকে বাস্তবেও একটি দিন হিসেবে ধরা হয় এবং শাইখ আকবরের বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি করা না হয়, তবুও ফিকহী বিধান এটাই যে, ঐ সমস্ত রাষ্ট্রে যে নামাযের ওয়াক্ত পাওয়া যায় না সে নামায পড়া ঐ দেশের অধিবাসীদের জন্য ফরয নয়। বরং ঐ নামায আদায়ের দায়িত্ব থেকে তারা মুক্ত। সর্ব ব্যাপারে মহান আল্লাহ পাকই সর্বাধিক জ্ঞাত।

এটা যেহেতু ফিকহী মাসআলাহ বিস্তারিত ও পরিপূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করার জায়গা নয় বিধায় বিষয়টি আরো বিষদভাবে জানতে হলে 'রদ্দুল মুখহার' শামী ইত্যাদি ফিকহী কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করা যেতে পারে। সেখানে দীর্ঘব্যাপী রাত ও দীর্ঘব্যাপী দিনের দেশসমূহে নামায পড়ার মাসআলার সাথে সে অঞ্চলে রোযা রাখার বিধানও বর্ণনা করা হয়েছে।

দৃষ্টি আকর্ষণ

উপরোক্ত মাসআলার ব্যাপারে হযরত থানবী (রহঃ) ঐ সকল

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

ফকীহগণের মতের পক্ষে মত পেশ করেন যারা ওয়াক্ত না পাওয়া গেলে নামায পড়তে হবে না বলে মত পেশ করেন এ কথাটি তো হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)–এর পক্ষ থেকে ইমদাদুল ফাতাওয়াতেও বর্ণিত রয়েছে।

তবে এ মালফূযের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণ রাখার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, যুগের শ্রেষ্ঠ ফকীহ্ হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহঃ)–এর নিকটও হযরত থানবী (রহঃ)–এর মতের অনুরূপ মত প্রনিধানযোগ্য।

নির্ভেজাল কাশফও শরীয়তের দলীল নয়

ইতিপূর্বে যে বিষয়টি আলোচিত হলো, সেখানে হযরত শাইখে আকবর (রহঃ) যা কিছু বর্ণনা করেছেন সেখানে এ কথাটি পরিস্কার যে, তার মধ্যে একটি কাশফও রয়েছে। এ ক্ষেত্রে এ সন্দেহ হতে পারতো যে, কাশফ দ্বারা শরীয়তের আহকামের ব্যাপারে দলীল পেশ করা কিভাবে ঠিক হলো? এ ব্যাপারে হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ)–এর প্রকৃত প্রমাণ পেশ করা ঐ কাশফের উপর ভিত্তি করে নয়। বরং তার প্রকৃত প্রমাণ হলো পবিত্র কুরআনের আয়াত—

كِتَابًا مَّوْقُوتًا

এর পরিস্কার তাফসীরের উপরে ভিত্তি করে। সাথে তাঁর কাশফকে শুধু প্রমাণের পক্ষে একটা অতিরিক্ত সমর্থক হিসেবেই বর্ণনা করা হয়েছে। মূল প্রমাণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়নি।

অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, হযরত শাইখে আকবর (রহঃ)–এর কোন কোন কাশফ শয়তানী প্রবঞ্চনামুক্ত হওয়ার বিষয়টিও বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু কোন কাশফ শয়তানী প্রবঞ্চনামুক্ত হলেই তাকে শরীয়তের হুজ্জত বা প্রমাণ বানিয়ে নিতে হবে এমন নয়। যেমন কোন ব্যক্তি যদি একা ঈদের চাঁদ দেখে এবং সে এমন নিশ্চিতভাবে দেখেছে যে, তার সে দেখার মধ্যে কোনরূপ সন্দেহ বা দ্বিধা–দ্বন্দ্ব নেই, তা সত্ত্বেও তার একার দেখাটা শরীয়তের হুজ্জত বা প্রমাণ নয়। তাই তার সে দেখার উপর ভিত্তি করে কাযী বা রাষ্ট্রপ্রধান জনসাধারণকে ঈদ করার হুকুম দিতে পারেন না।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

মাসনুবীর একটি শে'রের ব্যাখ্যা

হযরত থানবী (রহঃ) মসনবীয়ে রুমী (রহঃ)–এর একটি শে'র প্রসঙ্গে বলেন, হযরত মাওলানা রুমী (রহঃ) বলেছেন—

پس زبون وسوسہ باشی دلا ☆ گر طرب را باز دانے از بلا!

گر مرادت را مذاق شکر است ☆ نامرادی نے مراد دلبر است

অর্থাত, নিজের চাহিদা এবং পসন্দের বস্তুকে উত্তম আর তাকদীর ও ভাগ্যের ভিত্তিতে যা সামনে আসে তাকে খারাপ মনে করলে বুঝবে এটা শয়তানের প্রবঞ্চনা। যদিও তোমার কাছে নিজের উদ্দেশ্য ও কাংখিত বিষয়টি লাভ করতে পারাই মর্যাদাকর মনে হয়। কিন্তু তোমার প্রকৃত মাহবূবের পসন্দ হয় তোমার ব্যর্থতা এবং তোমার কাংখিত বস্তু তোমাকে না দেয়া। সুতরাং তুমি নিজের পসন্দকে নিজ মাহবূবের পসন্দের উপর কুরবান করে দিয়ে আন্তরিকভাবে খুশি হয়ে যাও।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, মুমিনের স্বভাব তো এরূপ হওয়া উচিত, যেমনিভাবে সে নিজের চাহিদা মুতাবেক কাজ হলে রাযী এবং খুশি হয়, নিজের চাহিদার পরিপন্থী এবং নিজের আকাংখার বিপরীত কাজ হলেও ঠিক তেমনিভাবে রাযী–খুশী থাকা। যেমন হাদীস শরীফে 'রেযা বিল কদর' বা নিজের ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট থাকার দু'আ করতে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অর্থাত মহান আল্লাহ তার বান্দার ভাগ্যে যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা যদিও তার চাহিদা বা আকাংখার পরিপন্থী হয় তবুও এই ভেবে খুশি থাকতে হবে যে, আমাদের রব আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত অনুগ্রহশীল এবং দয়ালু এবং তিনি সবচাইতে বড় প্রজ্ঞাবান। তিনি আমার জন্য যা কিছু করেছেন তার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন হিকমত বা মঙ্গল নিহিত রয়েছে এবং তার পরিণাম ফল আমার জন্য মঙ্গল ও রহমত ছাড়া অন্য কিছু নয়।

এ বিষয়টিকেই প্রথম শে'রের মধ্যে এভাবে বলা হয়েছে যে, নিজের চাহিদা এবং পসন্দের বস্তুকে উত্তম তার নিজের ভাগ্যের লিখন হিসেবে যা সামনে আসে তাকে মন্দ মনে করা শয়তানের প্রবঞ্চনা মাত্র।

আর দ্বিতীয় শে'রের মধ্যে ঐ রেযা বিল কাযা বা ভাগ্যের লিখনের উপর সন্তুষ্ট থাকার গুণ অর্জন করার জন্য একটি আশেক বা প্রেমিকসুলভ ভাবনার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। আর তা হচ্ছে, তুমি

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ যে, তোমার কাছে একটি বস্তু ভাল মনে হচ্ছিলো তুমি তার অন্বেষণে ছিলে। কিন্তু তোমার প্রকৃত মাহবূবের কাছে সে বস্তুটি পসন্দনীয় ছিলো না। তিনি তোমার জন্য অন্য কিছু ব্যবস্থা করে দিলেন। এমতাবস্থায় আশেকের উপর ফরয বা অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, নিজের মাহবূব বা প্রেমাস্পদের পসন্দের উপর নিজের পসন্দকে কুরবান করে দেয়া। এবং তিনি বলেন যে, যদি তোমার কাছে নিজের উদ্দেশ্য ও কাংখিত বিষয়টি অর্জন করতে পারাই মর্যাদাকর বলে মনে হয় কিন্তু যদি তোমার প্রকৃত মাহবূবের পসন্দ হয় উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত না হওয়া এবং তোমার ব্যর্থতা, তবে সে ক্ষেত্রে তুমি তোমার নিজের পসন্দকে নিজ মাহবূবে হাকীকীর পসন্দের উপর কুরবান করে দিয়ে আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট হয়ে যাও।

অপর এক বুযুর্গও এ বিষয়টিকেই নিম্নোক্ত শে'রের মধ্যে বর্ণনা করেছেন—

فراق ووصل چہ باشد رضائے دوست طلب
کہ حیف باشد از وغیر او تمنائے

অর্থাত, বিচ্ছেদ আর মিলনে কি আর হবে, আমি চাই আমার বন্ধুর সন্তুষ্টি। আর এমনটি বড়ই নিন্দনীয় ও আফসুসের কথা যে, আমি তার দরবারে তাকে ছাড়া অন্য কিছুর প্রার্থনা বা আকাংখা করবো।

কম কথা বলা সম্পর্কে একটি হাদীস

হযরত থানবী (রহঃ) বর্ণনা করেন, মিশকাত শরীফের 'হিফযুল লিসান' নামক অধ্যায়ে একটি হাদীস আছে, হাদীসটি হচ্ছে—

العى من الايمان

অর্থ—কথা বলার ক্ষেত্রে স্বল্পতা এবং বাধাগ্রস্ত হওয়াটাও ঈমানের অংশবিশেষ।

এর ব্যাখ্যায় হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, মুমিনের প্রকৃত স্বভাব এমন হওয়া উচিত যে, তার অন্তর পরকালের চিন্তায় সর্বদা ব্যস্ত থাকবে। আর যখন এই অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাবে তখন কথা বলার ক্ষেত্রে জড়তা অবশ্যই সৃষ্টি হবে সন্দেহ নেই। নির্ঝঞ্ঝাটভাবে যবান চলতে থাকা এবং নির্দ্বিধায় তুখোড়ভাবে বয়ান করতে থাকা আখিরাতের চিন্তায় লিপ্ত থাকা

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

অবস্থায় সম্ভব নয়। তবে কখনো কোন পারিপার্শ্বিক প্রয়োজনে অন্য কোন হালতের প্রাবল্য এসে যেতে পারে। আর সে সময় কথার মাঝে অনর্গলতা, বয়ানের ক্ষেত্রে তুখোড় ভাব এবং বক্তৃতায় জোরালো অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়, যেমন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর বয়ানের সময় তাঁর অবস্থার কথা সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন।

সালেকদের প্রতি একটি বিশেষ উপদেশ

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, এই দুনিয়ায় বিভিন্ন উপকরণ দ্বারা যেমন একটা 'আছর' বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গরম কোন কিছু ব্যবহার করলে গরমী বা গরম সৃষ্টি হয়। আবার ঠাণ্ডা কোন বস্তুর ব্যবহারে ঠাণ্ডা সৃষ্টি হয়। অনুরূপ কোন কোন সময়ে ঐ আছর বা প্রতিক্রিয়া থেকেও আসবাব বা উপকরণের সৃষ্টি হয়। যেমন খানা খাওয়ার কারণ হলো ক্ষুধা এবং খানার প্রতি আগ্রহ থাকা, আর সাধারণতঃ এটাই হয়ে থাকে যে, প্রথমে ক্ষুধা লাগে এবং খানার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। সে চাহিদার ভিত্তিতে খানা খাওয়া হয়। কিন্তু ছোট্ট দুধের বাচ্চার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখবে, বাপ–মা যখন বাচ্চাকে বুকের দুধ ছাড়ানোর জন্য অন্য খাবার চামিচ দিয়ে খাওয়াতে যায় তখন সে তার প্রতি কোন আগ্রহ দেখায় না বরং চরম অনাগ্রহই প্রকাশ করে। তার আগ্রহ থাকে শুধু মায়ের দুধের প্রতি। এর পর বাপ–মা তাকে অল্প অল্প করে কিছু খাওয়ায়, একটু খাবার মুখে দিয়ে চাটায়, এভাবে আস্তে আস্তে বাচ্চার মাঝে খাবারের আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে যায়।

যেসব লোক জর্দা খায় কিংবা বিড়ি–সিগারেট পান করে অভ্যস্ত হয় তাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, জর্দা বা বিড়ি–সিগারেটের প্রতি পূর্ব থেকেই তার মধ্যে কোন আগ্রহ এবং আকর্ষণ ছিলো যার কারণে বাধ্য হয়ে সে তা খেয়েছে বা পান করেছে, নাকি বিষয়টি তার সম্পূর্ণ উল্টা যে, প্রথমে সে একটু আধটু করে খাওয়া শুরু করেছে। এরপর সে তা খেতে বা পান করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। (এক্ষেত্রে একথা তো পরিস্কার যে, শেষের বিষয়টিই ঠিক। তাহলো আগে সে খেতে বা পান করতে শুরু করেছে পরে তার মধ্যে আস্তে আস্তে অভ্যাস ও আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে।)

অনুরূপভাবে মানুষের অভন্তরে ঈমানী পূর্ণতা তার নেক আমলের

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

জন্য কারণ হয়ে থাকে। ঠিক তেমনিভাবে কোন কোন সময় দিলের মধ্যে আবেদন বা আগ্রহ থাকে না, তা সত্ত্বেও আমল শুরু করে দিলে ধীরে ধীরে মনের মাঝে আগ্রহ ও চাহিদা সৃষ্টি হয়ে যায়। এজন্য সালেক বা আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের অন্বেষণকারীদের উচিত হলো, নিজের শাইখ যেসব আমল বাতলে দেন সেগুলো পূর্ণ করার ক্ষেত্রে এই আশায় থাকবে না যে, মনের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হলে তখন তা পালন করবো। বরং তার জন্য উচিত হলো, সে শাইখের বাতলে দেয়া আমলগুলো পুরোপুরিভাবে পালন করতে থাকবে। এভাবে ধীরে ধীরে সে ব্যাপারে তার মনে আগ্রহ সৃষ্টি হবে এবং আমলের সাধ পেতে থাকবে।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

১৬ সফর, ১৩৫৫ হিজরীর মালফূযাত

একবার এক ব্যক্তি হযরত থানবী (রহঃ)কে চিঠি লিখলো, আমি দাড়ি মুণ্ডাতে অভ্যস্ত। সাথে আরো কিছু গুনাহের কথা উল্লেখ করে লিখলো, আমি অমুক অমুক গুনাহের মধ্যে লিপ্ত রয়েছি। কিন্তু আমার মন চাইছে আপনার দরবারে উপস্থিত হতে। আমার এই অবস্থায় আপনি যদি অনুমতি দেন তবে আমি আপনার দরবারে উপস্থিত হবো।

লোকটির পত্রের জবাবে হযরত থানবী (রহঃ) লিখলেন, আপনার বাহ্যিক অবস্থা খারাপ কিন্তু ভিতরগত অবস্থা ভাল। আর আমার ভিতরগত অবস্থা খারাপ তবে বাহ্যিক অবস্থা ভাল। এর দ্বারা বুঝা গেলো যে, আমাদের দু'জনের মাঝে কোন সামঞ্জস্যতাই নেই। যদি আমাদের উভয়ের দোষ একই রকম হতো তবে আমাদের মাঝে সামঞ্জস্যতা থাকতো। আর পরস্পর অসামঞ্জস্য থাকা অবস্থায় কোন কাজ হয় না। বিধায়, আপনার সফরের কষ্টটাই বরবাদ হবে, এমনটি উচিত বলে মনে করি না।

এরপর হযরত থানবী (রহঃ) নিজেই আবার বললেন, অনুরূপ অপর এক ব্যক্তিও এ ধরনের বিষয় উল্লেখ করে একটি চিঠি লিখে আমার কাছে আসার অনুমতি চেয়েছিলো। জবাবে আমি তাকে লিখে দিয়েছিলাম, তুমি যে অবস্থাতেই থাকো না কেন এসে পড়। এর কারণ হলো, এই ব্যক্তির চিঠি পড়ার পর তার ইসলাহ হবে বলে আমার দিলে একটা সাড়া পাওয়া গেছে, তাই তাকে আসতে বলেছি। পক্ষান্তরে ঐ পূর্বে উল্লেখিত ব্যক্তির চিঠি পড়ে এমনটি মনে হয়নি বিধায় তাকে আসতে নিষেধ করে দিয়েছি।

নফস এবং শয়তানের প্রবঞ্চনার পার্থক্য

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, যদি কারো মনে একই গুনাহ বারবার করার চাহিদা সৃষ্টি হয় তবে এটা নফস বা প্রবৃত্তির প্রবঞ্চনা বলে বুঝে নিতে হবে। পক্ষান্তরে যদি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের গুনাহ করার চাহিদা অন্তরে সৃষ্টি হয়, তাহলে বুঝতে হবে

এটা শয়তানী প্রবঞ্চনা। কারণ নফস বা প্রবৃত্তির পক্ষ থেকে প্রবঞ্চনা হয়ে থাকে নিজের চাহিদা এবং কুপ্রবৃত্তির স্পৃহা ও খাহেশ পূর্ণ করার জন্য। এজন্য সে তার চাহিদাকেই বারবার পেশ করতে থাকে। আর শয়তানের উদ্দেশ্য থাকে মানুষকে যে কোন একটি গুনাহের কাজে লিপ্ত করে রাখা। একটি গুনাহের প্রবঞ্চনাকে যদি সে অন্তর থেকে দূর করে দেয় তবে সাথে সাথে শয়তান অন্য একটি গুনাহের খেয়াল অন্তরে জাগিয়ে তোলে। আর আকীদা ও বিশ্বাসগত দিক থেকে যেসব খতরা ও প্রবঞ্চনা সৃষ্টি হয় তার সবটাই হয় শয়তানের পক্ষ থেকে।

৯ই সফর ১৩৫৫ হিজরী তারিখে আমার (সংকলক) মুহতারাম পিতা ইন্তিকাল করেন। এরপর ১৬ই সফর ১৩৫৫ হিজরী আমি থানাভোনে হযরত থানবী (রহঃ)–এর দরবারে উপস্থিত হলে হযরত থানবী (রহঃ) আমাকে বললেন, আপনি এখানে আসার ব্যাপারে এবারও তাড়াহুড়া করে ফেললেন। কেননা আপনার মাতা মুহতারামা হয়তো এখনো খুবই অস্থির অবস্থায় আছেন। আমার তো মনে চাইতেছিলো, আমার যদি সফর করার মত শক্তি থাকতো তবে দু'একদিনের জন্য আমি নিজেই সেখানে চলে যেতাম। এবং তাঁকে সান্ত্বনা দিতাম। কিন্তু আমি তো এখন আর কোন কাজই করতে পারি না। অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আমার দিলে এ সাক্ষীই দিচ্ছে যে, ইনশাআল্লাহ তাআলা আপনার মুহতারাম পিতার প্রতি হয়তো মহান আল্লাহ পাক অনুগ্রহ ও দয়ার আচরণই করেছেন।

শে'র–এর ব্যাপারে বুযুর্গানে দ্বীনের ভারসাম্যতা

একবার হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ)–এর সামনে ফার্সী কবিতার একটা অংশ পাঠ করা হলো। যে কবিতাটি ছিলো এমন লোকদের সাথে সম্পৃক্ত যারা কোন শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়াই কোন মুসলমানকে কাফের বলে দেয়। কবিতাংশ ছিলো নিম্নরূপ—

مرا کافر اگر گفتی غمے نیست   چراغ کذب را نبود فروغے
مسلمانت بخوانم در جوابش   دروغے را جزا شد دروغے

অর্থাত, তুমি যদি আমাকে কাফের বলে অভিহিত করো তাতে আমার কোন ভাবনা নেই। কারণ মিথ্যার চেরাগ কখনো আলোকিত হয়

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

না। আর তোমার সে কথার জবাবে আমি তোমাকে মুসলমান বলবো কেননা মিথ্যার প্রতিদান মিথ্যা দিয়েই হয়।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতবী (রহঃ) যখন এই কবিতাংশ শুনলেন, তখন তিনি বললেন, এই কবিতাতে তো সম্বোধিত ব্যক্তিকে কাফেরই বলে দেয়া হলো। কারণ, তার মুসলমান হওয়াকে মিথ্যা বলা তো প্রকারান্তরে তাকে কাফেরই বলা।

অতঃপর তিনি ঐ কবিতাংশের সাথে নিজের পক্ষ থেকে একটি শে'র এভাবে বর্ধিত করলেন—

مرا کافر اگر گفتی غمے نیست　　چراغ کذب رانبود فروغے

مسلمانت بخوانم در جوابش　　دہم شکر بجائے تلخ دوغے

اگر خود مؤمنے فبہا والا　　دروغے را جزا باشد دروغے

অর্থাত, আমাকে যদি তুমি কাফের বলো তবে তা নিয়ে আমার কোন ভাবনা নেই। কারণ, মিথ্যার চেরাগ কখনো উজ্জ্বলতা লাভ করে না। আমি তোমার সে কথার জবাবে তোমাকে মুসলমান বলে যাবো। এবং তোমার মিথ্যার তিক্ততার পরিবর্তে আমি তোমাকে মিষ্টতাই দিবো। এরপর তুমি যদি মুসলমান হয়ে থাকো তবে তো ভাল আর যদি তা না হও তবে মিথ্যার প্রতিদান তো মিথ্যা দিয়েই হয়ে থাকে।

তাবীয-কবয

একবার কথা প্রসঙ্গে হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, বর্তমানে লোকেরা নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এবং বিপদ-আপদ ও রোগ-শোক থেকে মুক্তিলাভের জন্য তাবীয-কবয ইত্যাদিকে খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং সেজন্য অনেক চেষ্টা-ফিকিরও করে থাকে। কিন্তু আসল যে ব্যবস্থা আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা, সে ব্যাপারে অলসতা করে। হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, এ ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, কোন নকশা বা তাবীয, দু'আর সমান কাজ করে না, তবে সে দু'আ হতে হবে দু'আর মত এবং যেসব কারণে দু'আ কবুল হয় না সেগুলো থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

এ ব্যাপারে হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন,

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

যখন আমি কানপুরের জামিউল উলূম মাদরাসায় শিক্ষক ছিলাম, সে সময় হঠাৎ সেখানে ব্যাপক আকারে মহামারী দেখা দিলো। তখন আমি খাবে দেখলাম, এক বুযুর্গ বলছেন, খানাপিনার বস্তুর উপর তিনবার পূর্ণ সূরায়ে কদর অর্থাত, 'ইন্না আনযালনা' সূরা পাঠ করে খেলে বা পান করলে অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে যাবে এবং সুস্থ ব্যক্তি রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে। অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, তার উপর আমল করার পর বাস্তবে তার সুফল প্রমাণিত হয়েছে।

ইংরেজদের সাথে বন্ধুত্ব ও দুশমনী উভয়টাই ফিতনা

আলোচনা প্রসঙ্গে একবার হযরত থানবী (রহঃ) বললেন, ইংরেজদের সাথে বন্ধুত্বও একটা বাতেনী ফিতনা। এবং বর্তমান সময় ও পরিস্থিতিতে তাদের সাথে দুশমনী করা হলো জাহেরী ফিতনা। কারণ, বর্তমান সময়ে মুসলমানদের হাতে ইংরেজদের সাথে মোকাবেলা করার মত শক্তি নেই। তাই আমরা উভয়টা থেকে আল্লাহর দরবারে পানাহ চাই। যেমন প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি দু'আর মধ্যে উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন—

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ

অর্থাত, আয় আল্লাহ! আমরা সর্বরকম ফিতনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যা যাহেরী এবং প্রকাশ্য ফিতনা এবং যা বাতেনী বা গোপন ফিতনা (সব থেকেই আমরা আপনার আশ্রয় চাই)।

বৃদ্ধ বয়সে সতর্কতা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, অনেক বয়সোত্তীর্ণ বৃদ্ধ লোকেরা বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যাওয়ার কারণে মনে করে এখন বেগানা মহিলারা আমার সামনে পর্দা করা ছাড়া আসলে কিংবা অল্প বয়সের দাড়িবিহীন বালকদের দ্বারা খেদমত নিলে কোন ফিতনার সম্ভাবনা নেই।

হযরত থানবী (রহঃ) একবার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, এ ক্ষেত্রে বেশীর ভাগই ধোঁকা ও ভ্রান্তির শিকার হতে হয়। বার্ধক্য যত অধিকই হোক না কেন কিন্তু তার প্রবৃত্তির চাহিদা এবং তার ভিতরকার আকর্ষণ ঠিকই

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

বাকী থাকে। আর বৃদ্ধদের জন্য এই আকর্ষণ অধিক ক্ষতির কারণ হয়। কেননা তার মধ্যকার আকর্ষণ দূর করার জন্য যে পরিমাণ প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রয়োজন সে পরিমাণ শক্তি তার থাকে না, এ কারণে সে কলবের গুনাহ এবং নযরের গুনাহে তো অবশ্যই লিপ্ত হয়। এজন্য বৃদ্ধ বয়সেও এসব থেকে বেঁচে থাকা এবং খুব সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

কারো ব্যক্তিসত্ত্বার উপর আঘাত না করা

আকাবীরে দেওবন্দের মাসআলাহসমূহের ব্যাপারে হক কথা বলা এবং পরিস্কার ভাষায় বলার বিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত এবং প্রসিদ্ধ। যা কারো অজানা নয়। অনুরূপভাবে তাদের তাকওয়া এবং বিনয় প্রকাশেরও একটি দিকও রয়েছে। যে ব্যাপারে অনেক কম লোকই অবগতি রাখে। আর তা হলো, মাসআলার ক্ষেত্রে তো কারো ব্যাপারে সামান্যতম পক্ষপাতিত্ব বা শিথিলতা নেই। নিজের কাছে যা হক বলে মনে হবে সেটাই পরিস্কারভাবে বলে দিতে হবে। কিন্তু যারা আকাবীরে দেওবন্দের বিরোধিতা করে, আকাবীরগণের সামনে যখন ঐ সকল লোকদের ব্যক্তিসত্ত্বা বা তাদের ব্যক্তিগত দিক নিয়ে আলোচনা করা হয় তখন তারা সে ব্যাপারে সতর্কতার সাথে কথা বলেন। তাদের সম্পর্কে কোন খারাপ শব্দ উচ্চারণ করা থেকে তাঁরা নিজেরাও বেঁচে থাকেন এবং অন্যদেরকেও সতর্কতার সাথে বেঁচে থাকার শিক্ষা দেন। তাদের বাস্তব জীবনের হাজারো ঘটনা যার অকাট্য প্রমাণ। এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা নিম্নরূপ—

একবার হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম সাহেব নানুতুবী (রহঃ)–এর কাছে কোন এক লোক বললো, মিরাটের মাওলানা আবদুস সামী' সাহেব বায়দল খুব বেশী বেশী মীলাদ পড়ে এবং লোকদেরকে দিয়েও পড়ায়। আপনি কেন এমনটি করেন না? জবাবে হযরত নানুতবী (রহঃ) বললেন, ভাই সে তো নবীপ্রেমের উচ্চাসনে রয়েছে। দু'আ করো আমারও যাতে সেই উচ্চাসন লাভ হয়।

(মালফূযে হাকীমুল উম্মত ১২ই রমযান ১৩৪৫ হিজরী)

উপরোক্ত প্রশ্নটি অপর এক আলেমের ব্যক্তিত্ব এবং নিজের কিছুটা হীনতার বিষয়ে ছিলো। এখানে যদি মাসআলাহ গত দিক বিচার করতে যাওয়া হত তবে তাতে নিজের উপর আরোপিত অভিযোগ দূর করে অপর একজন আলেমের ব্যক্তিত্বকে আঘাত করা হতো। এজন্য হযরত

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী (রহঃ) সেদিকটি পরিহার করলেন এবং তাওয়াযু' ও বিনয়ের দিকটিই অবলম্বন করলেন।

তবে যদি শুধু মাসআলাহ জিজ্ঞাসা করা হতো যে, প্রচলিত পন্থার মীলাদ মাহফিল করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন। তবে তিনি তাই বলতেন, যা তাঁর বিভিন্ন লিখা এবং ফতওয়ার মধ্যে আলোচিত রয়েছে।

একজন প্রসিদ্ধ পীর ছিলেন যিনি বাজারের বেপর্দা মহিলাদেরকেও মুরীদ করতেন। একবার হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রহঃ)-এর মজলিসে কিছু লোক তার দূর্নাম এবং তাকে মন্দ বলতে শুরু করলে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী (রহঃ) খুব গোশ্বা হলেন এবং বললেন, তোমরা তো তার দোষই দেখেছো কিন্তু তার এ গুণ কি দেখেছো যে, সে রাতের বেলা আল্লাহ পাকের সামনে ইবাদতে রত থাকে এবং রোনাজারী করে। এ কথা বলে তিনি লোকদের চুপ করিয়ে দিলেন। এবং এ কথার প্রতিই ইশারা করলেন যে, কারো ভাল আমলকে ভাল বলা এবং মন্দ আমলকে মন্দ বলে দেয়া তো দ্বীনী দায়িত্ব। কিন্তু কোন ব্যক্তিকে সামগ্রিক বিচারে ভাল কিংবা মন্দ বলতে হলে তার গোপন প্রকাশ্য সকল আমল সম্পর্কে অবগতি থাকা প্রয়োজন কিন্তু সাধারণতঃ এ ধরনের অবগতি মানুষের থাকে না। এজন্য কোন ব্যক্তিকে মন্দ বলার ক্ষেত্রে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী (রহঃ)-এর লৌকিকতামুক্ত বিশেষ মুরীদ আমীর শাহ খান ঐ সময়ের একজন প্রসিদ্ধ বিদ'আতী ফযলে রাসূল সাহেবের নামটা কিছুটা বিকৃত করে ফছলে রাসূল উচ্চারণ করলো (উল্লেখ্য ফযলে রাসূল অর্থ হলো, রাসূলের অনুগ্রহ। আর ফছলে রাসূল অর্থ হচ্ছে, রাসূল থেকে বিচ্ছিন্ন) একথা শুনে হযরত নানুতবী (রহঃ) অসন্তুষ্ট হয়ে কঠোরভাবে এমনটি বলতে নিষেধ করে দিলেন। এবং বললেন, সে যেমন লোকই হোক না কেন তোমরা তো পবিত্র কুরআনের আয়াতের পরিপন্থী কাজ করে গুনাহগার হচ্ছো। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

অর্থাত, তোমরা একে অন্যকে কলঙ্কযুক্ত উপাধিতে সম্বোধন করো না।

একজন নামজাদা প্রসিদ্ধ বিদ'আতপন্থী আলেম যে আকাবিরে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

দেওবন্দকে কাফের বলার ধৃষ্টতা দেখাতো এবং অনেক বইপত্রে তাদের সম্পর্কে অনেক কঠোর ও খারাপ শব্দ ব্যবহার করতো, তার আলোচনা উঠলে তিনি ইরশাদ করলেন, আমি সত্যি করে বলছি যে, সে পরকালে শাস্তিপ্রাপ্তই হবে এমন ধারণা আমার নেই। কারণ তার ও সব কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর তা'যীম ও সম্মান করাও তো উদ্দেশ্য হতে পারে।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

রমযানুল মুবারক ১৩৪৮ হিজরীর মজলিস

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, বর্তমানে দুটি মন্দ কাজ খুব ব্যাপক হয়েছে। একটি হলো ফটো আর অপরটি হলো স্প্রীট ও এ্যালকোহলের ব্যবহার। অধম (সংকলক) হযরতের খিদমতে আরয করলো যে, এভাবে এ মন্দ কাজ দুটির ব্যাপকতার প্রতি লক্ষ্য করে এর শরয়ী বিধানের ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা করা যায় কিনা? এর জবাবে হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করলেন, হালাল–হারামের ক্ষেত্রে কোন মন্দ কাজের ব্যাপক প্রচলন কোন শিথিলতা আনতে পারে না। এমনটি শুধু পাক ও নাপাক হওয়ার ব্যাপারেই গ্রহণযোগ্য। তাও শুধু ঐ ক্ষেত্রে যখন কোন বস্তুর পাক কিংবা নাপাক হওয়ার ব্যাপারে পূর্ববর্তী মুজতাহিদ ইমামগণের মাঝে মত পার্থক্য থাকে।

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, আমি যখন দারুল উলূম দেওবন্দের শিক্ষা শেষ করে ফারেগ হলাম। তখন আমার ইচ্ছা ছিলো, এখন থেকে আমার খরচের বোঝা আমি আর আমার মুহতারাম পিতার উপর দিবো না। কোথাও ছোটখাঁট একটা কাজ করে আমার প্রয়োজন পূর্ণ করার ব্যবস্থা করবো। কিন্তু মাসে দশ টাকার অধিক উপার্জনের প্রতি কখনো খেয়ালও হতো না। (অথচ হযরত থানবী (রহঃ) ছিলেন একটি ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান তা সত্বেও তিনি নিজের জীবনকে অত্যন্ত সাদাসিধাভাবে পরিচালনা করতে অভ্যস্ত ছিলেন।)

অতঃপর হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বললেন, দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ফারেগ হওয়ার পরপরই নিজের বুযুর্গ–মুরুব্বীগণের পরামর্শমতে কানপুরের জামিউল উলূম মাদরাসায় শিক্ষকতার দায়িত্বে নিয়োজিত হয়ে গেলাম। এবং সেখানে আমার মাসিক ওযীফা নির্ধারিত ছিলো পঁচিশ টাকা। তখন আমি মনে মনে বলতাম, এত টাকা দিয়ে আমি কি করবো।

হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন যে, মানুষের মনে যেসব প্রশ্ন উদয় হতে থাকে তার জবাব কখনো কোন আলিমের মজলিসে উপস্থিত হলে কিংবা কোন বয়ান শুনলে এমনিতেই বুঝে এসে যায়। তবে এ

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

ব্যাপারে স্বীকৃত কথা হলো, নিজে প্রশ্ন করে তার উত্তর লাভ করা একদিকে যেমন বেশী লাভজনক হয়, অপরদিকে তার প্রভাব প্রতিক্রিয়াও দীর্ঘস্থায়ী হয়।

'কিয়াফাহ্' বা বাহ্যিক আকৃতি ও হালত দেখে ভিতরের অবস্থা বলে দেয়া যায় এমন জ্ঞান সংক্রান্ত ঘটনা আলোচনা প্রসঙ্গে হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, একবার নওশেরওয়া বাদশাহর কাছে একজন বেটে লোক এসে নালিশ করলো যে, আমার উপর অমুক ব্যক্তি অবিচার করেছে। একথা শুনে নওশেরওয়া বললেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছো। বেটে লোকেরা নিজেরাই ফিতনা হয়ে থাকে। সুতরাং তাদের প্রতি আর কে অবিচার করতে পারে। বেটে লোকটি বললো, জাহাপনা আপনি ঠিকই বলেছেন, তবে আমার প্রতি যে লোকটি অবিচার করেছে সে আমার চাইতেও বেশী বেটে। এ ব্যাপারে যখন খোঁজ-খবর নেয়া হলো, তখন দেখা গেলো যে, ঘটনা ঠিক।

হযরত থানবী (রহঃ) যেসব লোকের নাম শরীয়ত পরিপন্থী দেখতেন তাদের নাম সুন্নাত মুতাবেক পরিবর্তন করে দেয়ার বিষয়টি খুব গুরুত্ব দিতেন। তবে এ ব্যাপারে হযরত থানবী (রহঃ)-এর বিশেষ কামাল এই ছিলো যে, তিনি নাম এমনভাবে পরিবর্তন করতেন যেন খুব একটা পার্থক্য সৃষ্টি না হয়। এবং নাম পরিবর্তনের কারণে খুব বেশী জটিলতার স্বীকার হতে না হয়।

একবার একজন ইংরেজ মহিলাকে মাওলানা হাবীব আহমদ কিরানুভী (রহঃ) মুসলমান বানালেন। তার বংশগত নাম ছিলো 'বুরাদাহ'। হযরত থানবী (রহঃ) তার নাম পরিবর্তন করে ইসলামী নাম রাখলেন 'বুরাইদাহ'। অনুরূপ অপর এক ব্যক্তির নাম ছিলো 'পীর বখ্স' হযরত থানবী (রহঃ) তার নাম রাখলেন 'কবীর বখ্স'।

এক মহিলা হযরত থানবী (রহঃ)-এর কাছে চিঠি লিখে প্রশ্ন করলো, রাতে শোয়ার সময় কুরআন শরীফের কিছু সূরা এবং আয়াত পাঠ করার যে মা'মূল আছে—হায়েযকালীন সময়ে তো তা জারী রাখা যায় না। তাই সেসময় আমি কি পড়বো? হযরত থানবী (রহঃ) তার জবাবে লিখলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং ইস্তিগফার পাঠ করবে। কিন্তু যে সময় নাপাকী (খুন) আসতে থাকে তখন এও পড়বে না। কারণ তখন পড়া আদবের খেলাফ। যেমন পেশাব করার সময় পাঠ করা আদবের খেলাফ।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আমার কানপুরের শিক্ষকতার সময়ে একবার এক দরবেশ কানপুরে এলো। সে আমাকে খুব মহব্বত করতো। সে আমাকে গায়েবী হাত থেকে প্রতিদিন চার টাকা করে লাভ করার একটি আমল লিখে দিয়ে গেলো। আমি বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়ার চেষ্টা করলাম যে, এই চার টাকা কোথা থেকে আসবে। পরে জানলাম যে, ঐ আমলের কারণে চার টাকা তার অধীনস্ত ও তার জন্য নির্ধারিত হয়ে যায়। সে চার টাকা যেখানেই খরচ করা হবে আবার তা অবিকল তার কাছেই ফিরে আসবে। স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, এখানে জিনদের হাত রয়েছে।

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করলেন, এটা তো চুরি ছাড়া কিছুই নয়। আমি চার টাকা দিয়ে ঘরের কোন প্রয়োজনীয় বস্তু কারো থেকে খরিদ করলাম। অতঃপর সেই লোকের কাছ থেকে পুনরায় ঐ চার টাকা আমার কাছেই ফিরে চলে আসলো, যে চার টাকা ঐ লোকটির হক ছিলো। সুতরাং এ কারণে এ জাতীয় আমল করা হারাম।

বড় আফসূসের কথা যে, অনেক মূর্খ ও অজ্ঞ দরবেশ এটাকে কারামত মনে করে খুব খুশি হয়, যা অকাট্য হারাম এবং গুনাহের কাজ।

হযরত আম্বিয়া (আঃ)গণের মু'জিযাসমূহ প্রত্যেক যুগের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই প্রকাশ পেয়েছে। যেমন হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর জীন-ইনসান, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ এবং বাতাসের উপর যে বাদশাহী ছিলো এটাও একটা মু'জিযা হিসেবেই ছিলো। এ কারণেই হযরত সুলাইমান (আঃ) এই দু'আ করেছিলেন—

هَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي

অর্থাত, আয় আল্লাহ! আপনি আমাকে এমন রাজত্ব দান করুন যা আমার পরে অন্য আর কেউ লাভ করতে পারবে না।

এর কারণও এটাই ছিলো যে, এ বাদশাহী এবং রাজত্ব মু'জিযাহ হিসেবেই ছিলো। আর প্রত্যেক নবীর মু'জিযাহ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

যারা কাজের লোক তাদের সংশয় কম হয় কিছু হলেও তা দ্রুত দূর হয়ে যায়

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, আমার বাস্তব

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

অভিজ্ঞতা হচ্ছে, যে ব্যক্তির সামনে কোন উদ্দেশ্য থাকে এবং সে ঐ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কাজ করতে চায় তার সামনে সংশয়ও খুব কম আসে। দু' একটি সংশয় যা সামনে আসে সামান্য ইশারাতেই তা দূরীভূত হয়ে যায়। বিভিন্ন প্রশ্ন ও সংশয়ের অবতারণা শুধু তারাই করে, যাদের কাজ করা হয় না।

এখান থেকে যদি কেউ দিল্লী যেতে চায় এবং সে উদ্দেশ্যে যদি সে রওয়ানা হয়ে যায়, তবে পথিমধ্যে রাস্তার ব্যাপারে যদি খানিকটা সংশয় দেখা দেয় তখন সে যদি কাউকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তখন তার যতটুকু জানা প্রয়োজন ততটুকু জানতে পারলেই সে পুনরায় চলতে শুরু করে। এ ব্যক্তি যেমন খুব গভীর খোঁজ-খবর বা অনুসন্ধানের পিছনে পড়ে না তেমনি সে অতিরিক্ত কিছু জিজ্ঞাসাবাদও করে না।

অনুরূপ কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে যদি খাবার দেয়া হয় তবে সে খুব জিজ্ঞাসাবাদ ও অনুসন্ধানের পিছনে পড়ে না যে, আটা কোন জায়গার? চাউল কোথা থেকে এসেছে? আটা কোথায় চূর্ণ করা হয়েছে? ইত্যাদি সে শুধু নিজের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। তার লক্ষ্য হয় আমার ক্ষুধা নিবারণের জন্য মহান আল্লাহ আমাকে খাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এর দ্বারা আমি উপকৃত হবো।

দ্বীনের ব্যাপারে হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)-এর দৃষ্টিভঙ্গী এই ছিলো। তাদের মাঝে কাজের সার্বক্ষণিক প্রেরণা বিরাজমান থাকতো এবং তারা তাদের কান পেতে রাখতো নির্দেশ শোনার অপেক্ষায়। যাতে যখনই কোন কাজের আদেশ হয়, সাথে সাথে যেন তা করতে শুরু করে দেয়া যায়। প্রথমতঃ দ্বীনের ব্যাপারে তো তাদের মাঝে কোন প্রশ্ন, সংশয় বা সন্দেহই সৃষ্টি হতো না। ছোট খাটো যাই হতো তা সামান্য ইশারা দ্বারা এবং সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দ্বারা একেবারে অদৃশ্য হয়ে যেতো। আর এমনটি কেনই বা হবে না কারণ, সত্য এবং সঠিক কথার এটাই হলো মানসিক প্রভাব বা আছর। হাদীস শরীফে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

الصدق طمانينة والكذب ريبه

অর্থাত, সত্য কথা আত্মিক প্রশান্তি ও স্থিরতা লাভের কারণ হয়। আর মিথ্যা সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টির কারণ হয়।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

একদিকে সত্য ও সরল কথা অপরদিকে তা গ্রহণ করা এবং মেনে চলার অধীর আগ্রহ আর এ কারণেই এক্ষেত্রে কোন প্রকার সংশয় সন্দেহই স্থায়িত্ব লাভ করতে পারতো না।

একবার হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযিঃ) ও হযরত ফারুকে আযম (রাযিঃ)–এর মাঝে কোন একটি বিষয়ে মতের পার্থক্য দেখা দিলো, তখন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযিঃ) দু' একবার শুধু বলে দিলেন—

والله هو خير والله هو خير

অর্থাত, আল্লাহ পাকের শপথ করে বলছি, মঙ্গল এর মাঝেই নিহিত, মঙ্গল এর মাঝেই নিহিত।

এ কথার পর হযরত ফারুকে–আযম (রাযিঃ) বললেন, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযিঃ)–এর একথা শোনার পর আমারও বিষয়টি সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে বুঝ এসে গেলো, যে বিষয়টি সর্বপ্রথম হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযিঃ)–এর বুঝে এসেছিলো ফলে মতপার্থক্যও শেষ হয়ে গেলো।

এ কথা পরিষ্কার যে, والله هو خير (আল্লাহর শপথ মঙ্গল এর মাঝেই নিহিত) কথাটা কোন বিষয়ের বা মাসআলার পক্ষে দলীল বা প্রমাণ নয়, এবং বিতর্কের পক্ষে জবাবও নয়। বরং এটি সত্য সন্ধানী ব্যক্তির জন্য চিন্তা ফিকির করার দাওয়াত। আর তাই এ কথাটি এখানে মতপার্থক্য দূর করার জন্য যথেষ্ট হলো।

সাধারণতঃ পিতা ছেলেকে উপদেশ দেয়ার সময় কোন দলীল–প্রমাণ পেশ করেন না। এবং খুব দীর্ঘ ওয়ায–নসীহতও করেন না। ছেলের যে পথে মঙ্গল রয়েছে সংক্ষিপ্ত শব্দে শুধু সেটাই বলে দেন। আর তাই যথেষ্ট হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনের বক্তব্যসমূহ সাধারণতঃ এ ধারারই হয়ে থাকে।

কাউকে কাফির বা ফাসিক বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, যে ব্যক্তির সামনে নিজের পরিণাম এবং পরকালের চিন্তা বিরাজমান থাকে তার মুখ অন্যের ব্যাপারে কখনই লাগামহীনভাবে খুলতে পারে না, সে ব্যক্তি কোন কাফেরকেও হীন দৃষ্টিতে দেখে না।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

কারণ সে কাফেরের পরিণাম কি হবে তা যেমন তার জানা নেই তেমনি নিজের পরিণাম কি হবে তাও তো সে জানে না। যেমন ফার্সী কবির ভাষায়—

ہیچ کافررا بخواری منگرید کہ مسلمان بودنش باشد امید

অর্থাত, কোন কাফের ব্যক্তিকেও হীনতার নযরে দেখবে না। কেননা এমনও তো হতে পারে যে, লোকটা ইন্তেকালের পূর্বে মুসলমান হয়ে যাবে।

অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আহলে ফতওয়া আলেম তথা মুফতীগণকে বাধ্য হয়ে এমন ফয়সালা করতে হয় যে, কোন্ লোকটি মুসলমান আর কোন্ লোকটি কাফের। কোন্ ব্যক্তি নেককার আর কোন্ ব্যক্তি ফাসেক। অন্যথায় কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে এ জাতীয় বিশেষণ আরোপ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। এক্ষেত্রে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। আর শুকরিয়ার কথা, আলহামদুলিল্লাহ! হক্কানী উলামায়ে কিরাম সর্বদাই বিষয়টি গুরুত্বসহকারে লক্ষ্য রাখেন। তা সত্ত্বেও কিছু এমন লোক যারা চিন্তাশীল নয় তারা সম্মানিত আলেমগণের প্রতি তিরস্কারমূলক ভাষা ব্যবহার করে থাকে। তারা বলে, এই আলেমরাই লোকদেরকে ফতওয়া দিয়ে কাফের মুর্তাদ বানিয়ে দেয়, তাদের জবাবে আমি বলে থাকি যে, কাফের বানায় না বরং কাফের বাতায় অর্থাত যে ব্যক্তি নিজের ভ্রান্ত আকীদা–বিশ্বাসের কারণে কাফের হয়ে আছে কিন্তু তার কাফের হওয়াটা গোপন রয়ে গেছে। তার সম্পর্কে মুসলমানদেরকে সতর্ক করার জন্য বাতলে দেয় যে, এই লোকটি নিজের আমলের কারণে কাফের হয়ে গেছে।

তাকাব্বুরীর হাকীকত ও একটি প্রশ্নের জবাব

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, উন্নত ও পরিপূর্ণ গুণাবলীর বিচারে মহান আল্লাহ তাআলা মানুষদের মাঝে বিভিন্ন স্তর রেখেছেন। এক্ষেত্রে কেউ নাকেস বা অসম্পূর্ণ আবার কেউ কামেল বা পূর্ণ। আবার কেউ বা আকমাল বা পরিপূর্ণ। যেমন কোন এক ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি খুব প্রখর। সে সূক্ষ্ম ও দূরের বস্তুও দেখতে পায়। পক্ষান্তরে অপরজনের দৃষ্টি দুর্বল, সে দূরের ও সূক্ষ্ম বস্তু পরিষ্কার দেখতে পায় না। আবার এক

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

ব্যক্তির নির্দোষ দু'টি চোখ রয়েছে। অপর ব্যক্তির দুটি চোখ কিংবা যে কোন একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। এখন কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি যদি নিজেকে অন্ধ ব্যক্তি তুলনায় আকমাল বা পরিপূর্ণ মনে করে অথবা কোন দুর্বল দৃষ্টির ব্যক্তির তুলনায় প্রখর দৃষ্টিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে পূর্ণাঙ্গ বলে মনে করে, তবে এটা কোন তাকাব্বুরী বা অহংকার নয়। এটুকুও মনে করা যাবে না বলে কাউকে যদি বাধ্য করা হয় তবে সেটা হবে কাউকে এমন কাজের প্রতি নির্দেশ করা যে কাজ করার সাধ্য তার নেই শরীয়তের পরিভাষায় যাকে 'তাকলীফে মা–লা–য়ুতাক' (সম্ভব জিনিস করতে বাধ্য করা) বলা হয়।

এমন এক ব্যক্তি যে কোন কিতাবের একটি হরফও পড়তে পারে না এবং কিছুই লিখতে পারে না। অপর এক ব্যক্তি আলিম, ফাযিল, হাফিয, কারী এবং মুফাসসির ও মুহাদ্দিস। সে এমনটি কিভাবে বুঝবে যে ঐ পড়ালেখা না জানা মূর্খ লোকটি তার থেকে কামেল। এজন্য যদি কোন আলিম এমনটি মনে করেন যে, আমি যেহেতু লিখতে এবং পড়তে পারি এদিক থেকে আমি ঐ ব্যক্তির তুলনায় কামেল যে লিখতে পড়তে পারে না। এই কামাল বা পূর্ণতাও আমার কোন জন্মগত গুণ নয়। বরং এটাও মহান আল্লাহপাকের বখশিশ এবং দান, তবে এটা তাকাব্বুর বা অহংকারের অন্তর্ভুক্ত নয়।

সারকথা হলো, নিজেকে কোন বিশেষ গুণের ক্ষেত্রে অপরের তুলনায় পরিপূর্ণ মনে করা অহংকার নয়। তবে অন্যের তুলনায় নিজেকে ভাল ও উত্তম মনে করা তাকাব্বুরী এবং অহংকার। কেননা কারো ভাল বা উত্তম হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ পাকের দরবারে মকবুল হওয়া এবং শেষ পরিণাম ভাল হওয়ার উপর নির্ভরশীল। আর সে সম্পর্কে কারোই জানা নেই। এজন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে নিজেকে একজন নীচু এবং সাধারণ লোক থেকেও ভাল এবং উত্তম মনে করা জায়েয নয়।

জীন-ভুত হাযির করা এক ধরনের ভেল্কীবাজী

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, অনেক লোক এমন আছেন যারা তাবিয কবয দিয়ে থাকেন তারা জীন–ভূত হাযির করে বিষয়টি সম্পর্কে অবগতি লাভ করেন বলে দাবী করে থাকেন। এক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতা হলো, জীন–ভূত হাযির করা নিজের একটা খেয়ালের

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

প্রয়োগ মাত্র। যদি জীন হাযির করার সেই আসরে কেউ দৃঢ়ভাবে এই খেয়াল নিয়ে বসে থাকে যে, এটা কিছুই নয়, সম্পূর্ণ ভুয়া এবং ভ্রান্ত, তবে সেই আসরে জীন হাযির করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। আমি নিজেই বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখেছি। যতক্ষণ মনের মাঝে দৃঢ়ভাবে এই খেয়াল বদ্ধমূল করে বসে থেকেছি ততক্ষণ ঐ জীন হাযিরকারী ব্যক্তি অপারগ ছিলো কিছুই দেখতে পাওয়া যায়নি। আবার যখন মন থেকে এই খেয়াল দূর করে দিয়েছি তখন দেখা গেছে যে, সবই হচ্ছে।

ইলমে কালাম (কালাম শাস্ত্র)-এর সঠিক অবস্থান

হযরত থানবী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, বিশ্বাসগত বিদ'আত সৃষ্টি হওয়ার কারণেই ইলমে কালামের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। লোকেরা যখন ইসলামী আকীদার মাঝে বিভিন্ন প্রকারের সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করতে শুরু করেছে। তখন উলামায়ে কিরামের সে সংশয় সন্দেহ দূর করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। আর এ থেকেই ইলমে কালামের সৃষ্টি হয়েছে। আর এটা ঠিক তদ্রূপ যেমন আমাদের এ যুগে ইলমে ফিক্‌হের মাঝে ফিকাহগত মাসআলার বিভিন্ন শাখা প্রশাখা রয়েছে। যেমন এ বিষয়টি বিশ্লেষণ করা যে, নামাযের মধ্যে ফরয কতটি? ওয়াজিব কতটি? সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ কি কি? এবং মুস্তাহাবসমূহ ও মাকরূহ বিষয় কি কি? যখন লোকেরা নামায আদায়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অলসতা এবং অসম্পূর্ণতা সৃষ্টি করতে লাগলো, তখন উম্মতের আলেমগণের জন্য এ বিষয়টি যরুরী হয়ে পড়লো যে, তারা নামাযের বিভিন্ন আমলকে দলীল-প্রমাণের আলোকে যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ করে একথা স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে দিবেন যে, নামাযের মধ্যে কোন্ কোন্ কাজ ফরয এবং ওয়াযিব যা ছাড়া নামায শুদ্ধই হয় না। আর কোন্ কাজ সুন্নাত বা মুস্তাহাব যা ছুটে গেলে নামায তো হয়ে যাবে, তবে খানিকটা অসম্পূর্ণ হবে।

হযরত সাহাবায়ে কিরামের (রাযিঃ) সময়ে এ ধরনের বিশ্বাসগত বিদ'আতের সূচনা হয়নি এবং নামাযের ক্ষেত্রেও এ জাতীয় অলসতা ও অসম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হয়নি। এ কারণে তখন ইলমে কালামের যেমন প্রয়োজন হয়নি, তেমনি প্রয়োজন হয়নি বর্তমান সময়ের মত সুবিন্যস্ত ইলমে ফিক্‌হ। এরপর যখন প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শুধু তখনই

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

এগুলোকে যরুরী মনে করা হয়েছে।

তবে এখানে একটি কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, ইলমে কালামের যাবতীয় গবেষণাকে শুধুমাত্র পারিভাষিক 'বাধা' বা প্রতিবন্ধকের মর্যাদা দেয়া যেতে পারে। যার সারকথা হলো, শুধু একটি সম্ভাবনার সৃষ্টি করা যে, এমনটিও হতে পারে, এটিকে আকীদা বা মৌলিক বিশ্বাসের পর্যায়ে গণ্য করা সীমালংঘনের শামিল। যে সকল উলামায়ে কেরাম ইলমে কালাম চর্চায় লিপ্ত হতে বারণ করেছেন তারা এই সীমালংঘনের দিকটি লক্ষ্য করেই তা করেছেন।

এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, হযরত মুতাকাল্লেমীন দর্শন শাস্ত্রের এই ধারণার বিরুদ্ধাচারণ করেছেন যে, 'জিস্‌ম' বা শরীর 'হাইউলা' বা উপাদান এবং 'সূরত' বা আকৃতির সমন্বয়ে গঠিত। তাদের একথার মোকাবেলায় মুতাকাল্লিমীন বা ইলমে কালামের বাহকগণ বলেছেন اجزاء لايتجزى বা পরমাণু যার কোন ভাগ সম্ভব নয় তার অনেকগুলোর সমন্বয়ে জিসিম বা শরীর গঠিত হয়েছে। এক্ষেত্রে যারা جزء لايتجزى এর ব্যাপারে সেটিকে একটি মানে' বা সম্ভাবনা সৃষ্টিকারীর পর্যায়ে রাখে তারা শরীয়ত পরিপন্থী কোন কাজ করছে না। কিন্তু কেউ যদি তার আকীদা বিশ্বাসকে এমন বানিয়ে নেয় যে, জিস্‌ম اجزاء لايتجزى বা পরমাণুসমূহ দ্বারাই সংগঠিত হয়েছে, তাহলে এর পক্ষে শরীয়তের কোন প্রমাণ না থাকার কারণে এ জাতীয় আকীদা পোষণ করা ভ্রান্ত এবং নাজায়েয হবে।

কাজের ক্ষেত্রে সতর্কতা ও অন্যের প্রতি কু-ধারণার পার্থক্য

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, শেখ সা'দীর (রহঃ) লেখা গুলিস্তাঁ এবং বোস্তাঁ কিতাবের দুটি শে'র রয়েছে যা একটি অপরটির বিষয়বস্তুর বিপরীত। শেখ সা'দী (রহঃ) গুলিস্তাঁর মধ্যে লিখেছেন—

هر كرا جامه پارسا بينى ! پارسادان ونيك مرد انگار

এই শে'রের সারমর্ম তো এই যে, কারো অভ্যন্তরীণ বিষয়ে খুব বেশী অনুসন্ধান করার কোন প্রয়োজন নেই। বাহ্যিকভাবে যাকে নেককার দেখা যায় তাকে নেককারই মনে করবে।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

আবার বোস্তাঁর মধ্যে তিনি বলেছেন—

نگہ دار د آں شوخ در کیسہ در   کہ داند ہمہ خلق را کیسہ بر

এই শে'রের সারমর্ম হচ্ছে, সকল মানুষকেই চোর মনে করবে।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে উল্লেখিত দুটি শে'রের মাঝে কোন বৈপরিত্ব নেই। প্রথম শে'রটি হচ্ছে আস্থা পোষণ করা সম্পর্কিত। অর্থাত যে ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা নেককার লোকদের মত তাকে নেককার বলেই ধারণা পোষণ করবে। কোন কারণ ছাড়া অহেতুক তার প্রতি কুধারণা পোষণ করো না। আর দ্বিতীয় শে'রটি হলো, কার্যক্ষেত্রে সতর্কতা এবং পরস্পর মু'আমালার ক্ষেত্রে সজাগ ও সচেতন দৃষ্টি রাখার জন্য। অর্থাত কার্যক্ষেত্রে প্রত্যেক নেককার এবং বদকার লোক থেকে নিজের জিনিসপত্রকে এমনভাবে সংরক্ষণ করো যেমন চোরদের থেকে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন সারকথা হলো যে, কারো প্রতি ধারণা পোষণ করার ব্যাপারে গুলিস্তাঁর শে'রের উপর আমল করবে। আর মু'আমালা করার ক্ষেত্রে বোস্তাঁর শে'রের উপর আমল করবে।

আহকার (সংকলক) বলতে চায় যে, হাদীস শরীফেও এ রকম বাহ্যিক বিপরীতধর্মী বিভিন্ন রকম বর্ণনা এসেছে। যেমন এক হাদীসে বলা হয়েছে اهل الجنة بله। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, জান্নাতবাসী নেককার লোকেরা সব সরল–সোজা হয়ে থাকেন। অথচ অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মুমিনগণ অত্যন্ত তীক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন ও বিচক্ষণ হয়ে থাকেন, তাঁরা কারো দ্বারা ধোঁকা খান না বা প্রতারিত হন না। এই দুই হাদীসেরও ঐ রকম দুটি ক্ষেত্র। প্রথম হাদীসে মুমিনের এই অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, সে অন্যের ত্রুটির প্রতি নযর করে না বরং নিজের কাজ নিজে করে যেতে থাকে। আর দ্বিতীয় হাদীসে মু'আমালা ও লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। যাতে সে প্রতারিত না হয়। (সর্ব ব্যাপারে মহান আল্লাহ পাকই সর্বাধিক অবগতি রাখেন।)

মা'রিফাতের লাইনের প্রথম পদক্ষেপ

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, আমার মতে তাসাওউফ বা আধ্যাত্মিকতার পথে প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে এই যে, মানুষ

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সকল প্রকার সম্পৃক্ততা থেকে মুক্ত হয়ে ইসলাহে বাতিন তথা আত্মশুদ্ধির ফিকিরে লিপ্ত হয়ে যাবে এবং নিজের সকল ইচ্ছা ও সংকল্পকে নিজের শাইখের উপর ন্যস্ত করে দিয়ে নিজে সম্পূর্ণ দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। বিভিন্ন সম্পৃক্ততা এ পথে খুবই ক্ষতিকর বস্তু। এমনকি সম্পৃক্ততার সংকল্পও ক্ষতিকর।

পঙ্কিলতামুক্ত রমণী

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো, যে সকল মহিলা এন্তেজামী কাজে অপরিপক্ক ও অদক্ষ হয় তাদের মাঝে পবিত্রতা ও সতীত্ব পরিপূর্ণভাবে বিরাজমান থাকে। সুতরাং কোন পুরুষ যদি তার স্ত্রীর ব্যাপারে এন্তেজামী অদক্ষতার সমস্যায় লিপ্ত থেকে থাকে, তবে তার উচিত হবে তার স্ত্রীর সতীত্ব উন্নত চরিত্রের দিকটি মনের মাঝে জাগরুক রাখা। তা হলে তার মনের অপ্রফুল্লতা এবং অস্বচ্ছতা দূরীভূত হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষাও এরূপ। ইরশাদ হচ্ছে— عَسٰى اَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِنَّ خَيْرًا كَثِيْرًا

অর্থাত, এটি কোন অসম্ভব বিষয় নয় যে, মহান আল্লাহ তাদের মাঝেই অগণিত মঙ্গল এবং বৃহত্তর কল্যাণ দান করবেন।

বিবিকে অতিরিক্ত হাত খরচ প্রদান

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, আমি আমার দোস্ত আহবাবগণকে পরামর্শ দিয়েছি যে, নিজের বিবিকে আপনারা তার খোরপোষ হিসেবে যা দিয়ে থাকেন, শরীয়ত সম্মতভাবে সে তার মালিক হয় না। কারণ, তা থেকে যদি কিছু বেঁচে যায় তবে তার মালিক থাকে স্বামীই। অবশ্য যদি কেউ দেয়ায় সময় একথা বলে দেয় যে, যা তোমাকে দিলাম এর মালিক তুমিই, তবে সে ক্ষেত্রেই শুধু স্ত্রী মালিক হয়।

এ কারণে যে টাকা ঘরের খরচের জন্য স্ত্রীকে প্রদান করা হয়, তা সাধারণ প্রয়োজনের বাইরে স্ত্রীর নিজস্ব প্রয়োজনে খরচ করার কোন সুযোগ থাকে না। যেমন স্ত্রীর তার কোন গরীব প্রিয়জনকে কিংবা কোন দুঃস্থ অসহায় ব্যক্তিকে সাহায্য করতে চাইলে সেক্ষেত্রে তাকে ঘরের প্রয়োজনে খরচ করতে দেয়া টাকা থেকে সাহায্য দেয়ার করার অধিকার

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

নেই। এজন্য উত্তম হচ্ছে, স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় খোরপোষের টাকা ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু টাকা তার হাত খরচ হিসেবে তাকে মালিক বানিয়ে দিয়ে দেয়া। যাতে করে সে স্বাধীনভাবে সে টাকা নিজের ইচ্ছামত খরচ করতে পারে এবং অন্যের কাছে মুখাপেক্ষী হয়ে না থাকে।

হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন, একজন স্ত্রীর সবচাইতে বড় গুণ হচ্ছে, সে তার স্বামীর জন্য নিজের সকল সম্পৃক্ততাকে পরিহার করে দিয়ে স্বামীর কাছে চলে এসেছে। আমি তো তাসাওউফের লাইনের লোকদের বলে থাকি যে, একজন অল্প বয়স্কা যুবতী মেয়ে যে কাজ মাত্র একদিনে করে দেখিয়ে দেয় তাকি বছরের পর বছর কেটে যাওয়ার পরও তোমরা আল্লাহ পাকের জন্য করতে পেরেছো? অর্থাত যাবতীয় সংযোগ ও সম্পর্ককে কি আল্লাহ পাকের জন্য কুরবানী করে দিতে পেরেছো?

আমীর উমরাদের সাথে আচরণ

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহঃ)–এর কাছে যদি আমীর–উমারা বা নেতৃস্থানীয় লোকজন আসতো তবে তিনি তাদের সাথে কখনো খারাপ আচরণ করতেন না বরং নিজের স্বাভাবিক অভ্যাস মতে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) আরো বলতেন যে, কিছু মূর্খ কিংবা আত্মনিয়ন্ত্রণশূন্য কিছু সুফী দুনিয়াদার লোকদের সাথে অনীহামূলক খারাপ আচরণ করে তাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। এমনটি করা সুন্নাত পরিপন্থী। কেননা যখন এই লোকটি কোন আলিম বা দরবেশের কাছে উপস্থিত হয়, তখন একথা তো পরিস্কার যে, সে দুনিয়ার কোন ফায়দা অর্জনের উদ্দেশ্যে হাযির হয়নি বরং এখানে সে নিশ্চয়ই দ্বীনী কোন উপকার লাভের জন্যই এসেছে। আর আমীর হয়েও সে দরবেশের দরবারে যাওয়ার কারণে এ সময় তাকে نعم الامير। (ভাল আমীর) বলে অভিহিত করার যোগ্য হয়েছে। কারণ বুযুর্গানে দ্বীন ইরশাদ করেছেন—

نعم الامير على باب الفقير و بئس الفقير على باب الامير

অর্থাত, ঐ আমীর ব্যক্তি খুবই ভাল, যে কোন দরবেশের দরবারে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

উপস্থিত হয়। আর ঐ দরবেশ খুবই খারাপ, যে (দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্যে) কোন আমীর ব্যক্তির দরজায় গিয়ে হাযির হয়।

তবে এমনটি যাতে কস্মিনকালেও না হয় যে, আগত আমীরের কাছে নিজের কোন প্রয়োজনের কথা পেশ করে দিলো, বরং নিজের কোনরূপ প্রয়োজনের কথা তার কাছে উপস্থাপন না করে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষীভাব বজায় রাখবে। তবেই ঐ আমীর ব্যক্তির কিছুটা দ্বীনী ফায়দা অর্জন হতে পারবে।

আমানত ও দিয়ানত

শাহ লুতফে রাসূল সাহেব (রহঃ) নামক একজন বুযুর্গ হযরত থানবী (রহঃ)–এর খলীফা ছিলেন। তিনি থানাভবনেই থাকতেন। তিনি কাশফ ও কারামতের অধিকারী বুযুর্গ ছিলেন। হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ) তার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে একদিন বলেন—

একবার শাহ লুতফে রাসূল (রহঃ)–এর নিকট একটি বেয়ারিং কার্ড এলো (পূর্বের যুগে বর্তমানের বেয়ারিং চিঠির মত বেয়ারিং কার্ডও চলতো) তিনি এটাকে নিষ্প্রয়োজনীয় মনে করে সেটি না পড়েই ফেরত দিয়ে দিলেন। উপস্থিত লোকদের একজন বললো, হযরত আপনি কার্ডের বিষয়বস্তুটা একবার অন্তত পড়েই না হয় ফেরত দিতেন। তখন হযরত শাহ লুতফে রাসূল সাহেব (রহঃ) বললেন, বিষয়বস্তু পাঠ করার পর ফেরত পাঠালে সেটা খিয়ানত হতো। কারণ ঐ কার্ড দ্বারা একটা ফায়দা অর্জন করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আমি সে ফায়দা অর্জন করলাম ঠিক কিন্তু ডাক বিভাগের খেদমতের যে বিনিময় তার প্রাপ্য ছিলো সেটা সে পেলো না।

এ ধরনের ছোট খাটো বিষয়ের প্রতি ঐ সকল লোকেরাই লক্ষ্য রাখেন, যাদের অন্তরে পরকালের চিন্তা জাগরুক থাকে এবং মনের মাঝে আল্লাহ পাকের ভয় বিরাজমান থাকে।

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, একবার উলামায়ে কিরামের এক মজলিসে একজন সরকারী অফিসার উপস্থিত ছিলেন। মজলিসের কথা যেন ঐ অফিসার বুঝতে না পারেন সেজন্য একজন আলিম আরবী ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন। ঐ অফিসার মাঝে মধ্যেই বুযুর্গানে দ্বীনের মজলিসে বসতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি আরবী ভাষাও বুঝতেন।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

তৎক্ষণাৎ তিনি বলে উঠলেন---আমার মনে হচ্ছে, আপনি আরবী ভাষায় যে কথা বলছেন তা হয়তো আপনার কোন গোপন কথা হবে। এজন্য আমি আপনাকে বিষয়টি জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন মনে করছি যে, আমি আরবী ভাষাও বুঝি। একথা যদি আমি প্রকাশ না করি তবে এটা খিয়ানতের শামিল হবে। এ কারণে আমি এখান থেকে উঠে যাচ্ছি। এ কথা শুনে ঐ আলিম সাহেব অস্থির হয়ে গেলেন এবং বললেন, এতক্ষণ আমার আলোচ্য বিষয়টি আসলেই গোপনীয় ছিলো এবং আপনার কাছ থেকে বিষয়টি গোপন রাখার জন্যই আমি আরবীতে কথা বলছিলাম কিন্তু এখন আপনার দিয়ানতদারী এবং বিশ্বস্ততা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর আপনিও আমাদের একজন হয়ে গেছেন। সুতরাং এখন আমি পরিষ্কার উর্দূ ভাষাতেই বিষয়টি আলোচনা করছি। আপনার উঠে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, আপনি বসুন।

এ সবই ছিলো বুযুর্গানে দ্বীনের সংস্পর্শের ফল। আর তা না হলে বর্তমানে তো অন্য একজনের গোপনীয় বিষয়কে জেনে ফেলতে পারাকে বিরাট বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিষয় মনে করা হয়। এরপর তা এমনভাবে মানুষের কাছে বলে বেড়াতে থাকে যে, আমি তাকে বোকা বানিয়ে দিলাম। তার সব কথাই আমি জেনে ফেললাম। এরই নাম হচ্ছে, 'আদাবে মুআশারাত' যার দ্বারা মুসলমানগণ প্রকৃত মুসলমান রূপে গড়ে উঠেন।

তাকদীরের প্রতি ঈমান

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, একসময় তাকদীর সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার এতটাই খটকা সৃষ্টি হলো, যার কারণে আমি খুবই অস্থির ও পেরেশান হয়ে পড়লাম। তখন জীবনের চাইতে আমার কাছে মউতই অগ্রগণ্য বিবেচিত হতে থাকলো। কিন্তু এরপর বিষয়টির ব্যাপারে আমার মনে স্থিরতা সৃষ্টি হলো। এবং তা এভাবে হলো যে, ঐ বিষয়টির হাকীকত ও প্রকৃতি জানার পিছনে পড়াকেই আমি বোকামী এবং নির্বুদ্ধিতা মনে করলাম। কারণ তাকদীর মূলতঃ মহান আল্লাহ পাকের একটি বিশেষ গুণ। আর মহান আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্তার হাকীকত ও প্রকৃতি সম্পর্কে যেমন মানুষের পূর্ণ অবগতি লাভ করা সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি তাঁর কোন গুণের প্রকৃত হাকীকত সম্পর্কেও

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

পূর্ণ অবগতি লাভ করা অসম্ভব। যেমনিভাবে আমরা কোনরূপ প্রকৃতি ও হাকীকত সম্পর্কে অবগতি ছাড়াই মহান আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্তা ও গুণাবলীর উপর ঈমান এনেছি, ঠিক তেমনি তাকদীরের উপর ঈমান আনাও ওয়াজিব।

নিষ্প্রয়োজনীয় কথাই ক্ষতিকর

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, মানুষের সকল আমল চাই তা দ্বীন বিষয়ক হোক বা দুনিয়া বিষয়ক যদি সাধারণ দৃষ্টিতে বিবেচনা করা হয় তবে তা তিন প্রকার বলে বুঝে আসে। অবশ্য কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি আমলকে তিন প্রকার বলেই উল্লেখ করেছেন। এক. ঐ আমল যা তার জন্য উপকারী। দুই. ঐ আমল যা তার জন্য ক্ষতিকর। তিন. ঐ আমল যা তার জন্য উপকারীও নয়, ক্ষতিকরও নয়। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করার পর বুঝে আসে যে, প্রকৃতপক্ষে এই তৃতীয় প্রকারও দ্বিতীয় প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাত, ক্ষতিকর আমলের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, যে পরিমাণ সময় ও মেধা এই নিরর্থক কাজে ব্যয় করা হয়েছে, যদি তা কোন অর্থবহ উপকারী কাজে ব্যয় করা হতো তবে তার দ্বারা উপকার হতো। সে উপকার থেকে বঞ্চিত হওয়াটাই তো একটা ক্ষতি এবং লোকসান। যেমন ধরুন কোন ব্যবসায়ী তার পুঁজিকে এমন কোন কাজে লাগালো যেখানে কোন লাভ হলো না এবং কোন লোকসানও হলো না। তার পরেও ঐ ব্যবসায়ী সেটাকে ক্ষতি ও লোকসান বলেই মনে করে, কারণ এখানে সে যেই লাভের আশা করেছিলো তা তার অর্জিত হলো না।

দ্বীনের ক্ষেত্রে সংশয় সৃষ্টির আসল কারণ

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, দ্বীনী বিধি-বিধান এবং আচার-আচরণের ক্ষেত্রে সংশয় সৃষ্টির আসল কারণ হচ্ছে এই, যে ব্যক্তির অন্তরে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাহাত্ম্য ও মহব্বত পরিপূর্ণভাবে বিরাজমান থাকে না, সেই বিভিন্ন প্রকারের সংশয় সন্দেহের শিকার হয়ে পড়ে। আর এ কারণে সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) ও তাবেঈনে কিরাম (রহঃ)গণ কোনরূপ সংশয়-সন্দেহে নিপতিত হতেন না। (কারণ তাদের অন্তরে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর মাহাত্ম্য ও মহব্বত ছিলো পরিপূর্ণ)। এ থেকে বুঝা যায় যে, সংশয় থেকে বেঁচে থাকার প্রকৃত ঔষধ হলো দু'টি—'মাহাত্ম্য' ও 'মহব্বত'। আর এ দু'টি বিষয় অর্জন করার উপায় হচ্ছে মাহাত্ম্য ও মহব্বতের অধিকারী ব্যক্তিবর্গের সাথে উঠাবসা করা, তাদের সংস্পর্শে থাকা। যার মনে চায় বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখতে পারে। যে কোন মুহাক্কিক বুযুর্গের দরবারে অত্যন্ত ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে কিছুদিন আসা–যাওয়া করার দ্বারা এমনিতেই অনেক সংশয়–সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায়। যা বছরের পর বছর তর্ক–বিতর্ক করার দ্বারাও দূর করা সম্ভব হয় না।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন, যদি কোন ব্যক্তির মানসিকভাবে এমনটিই পসন্দনীয় হয় যে, সে দ্বীনের রহস্যসমূহ এবং বিভিন্ন হিকমত সম্পর্কে অবগতি লাভ করবে তবে তার পদ্ধতিও এটাই যে, সে ঐ সকল রহস্য সম্পর্কে খুব বেশী খোঁজাখুজি করা এবং তর্ক–বিতর্ক করা ছেড়ে দিবে। নিজে কোন একজন বুযুর্গের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ মন নিয়ে তাঁর আনুগত্য করবে। তবেই দেখা যাবে যে, এ সকল রহস্য তার কাছে এমনিতেই উন্মোচিত হয়ে যাবে। অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ পাকের শপথ করে বলছি! আল্লাহ পাকের কসম করে বলছি!! এর জন্য এটাই পথ।

আমি যখন থেকে শিক্ষকতার দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে শুরু করি, তখন থেকেই এ বিষয়টির উপর স্থায়ীভাবে আমল করে আসছি যে, যে বিষয় সম্পর্কে আমি অবগত ছিলাম না, সে ব্যাপারে পরিস্কার ভাষায় বলে দিতাম যে, আমি এ বিষয়ে অবগত নই বা বিষয়টি আমার জানা নেই। সে ব্যাপারে আমার কোন ছাত্র আমাকে প্রশ্ন করুক কিংবা অন্য কেউ প্রশ্ন করুক। আর এ বিষয়টি আমি আমার উস্তাদ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকূব সাহেব নানুতুবী (রহঃ) থেকে শিখেছি।

বাস্তব অভিজ্ঞতা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, ইসলাম কোন তর্ক–বিতর্ক বা কোন গবেষণা বিশ্লেষণের মজলিস থেকে প্রসার লাভ করেনি। বরং ইসলাম প্রসার লাভ করেছে আমল ও আনুগত্যের মধ্য দিয়ে। একজন ইংরেজ লিখেছেন—হিন্দুস্থানে দুই শ্রেণীর লোকের মাধ্যমে ইসলাম প্রসার লাভ করেছে। এক শ্রেণীর লোক হচ্ছে ব্যবসায়ী আর অপর শ্রেণী হচ্ছে সুফিয়ায়ে কিরাম (বুযুর্গ ও ওলীগণ)।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, প্রকৃতপক্ষে দ্বীনের সবচাইতে বড় তাবলীগ ও দাওয়াত হলো, দাওয়াত দাতা নিজের অবস্থা, মু'আমালা এবং আখলাককে ঠিক করে নিবে। আর তা দেখে দেখে লোকেরা নিজ ইচ্ছাতেই মুসলমান এবং ভাল হয়ে যাবে।

মাদরাসাসমূহের ব্যাপারে একটি উপকারী পরামর্শ

দ্বীনী মাদরাসাসমূহের বিভিন্ন সমস্যার কারণে এসব মাদরাসার দায়িত্বশীলগণ অনেক সময় ওয়াকফ ফাণ্ড থেকে করয গ্রহণ করে থাকেন এবং এটি ব্যাপকভাবেই প্রচলিত হয়ে আছে বলা চলে। অথচ ওয়াকফ ফাণ্ড থেকে করয দেয়া দুরস্ত নয়।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) দারুল উলূম দেওবন্দের দায়িত্বশীলগণকে পরামর্শ দিয়েছেন যে, এভাবে করয দেয়ার জন্য একটা আলাদা 'করয ফাণ্ড' গড়ে তোলা হোক। যখন প্রয়োজন হয় তখন সেখান থেকেই করয দেয়া হবে। এবং এ প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য নিজেই অগ্রগামী হয়ে নিজের পক্ষ থেকে পাঁচশত টাকা 'করয ফাণ্ড'–এ জমা দিলেন (আলহামদুলিল্লাহ দারুল উলূম করাচীতেও আল্লাহ পাকের এক বান্দা করয দেয়ার জন্য কিছু পরিমাণ টাকা দিয়ে রেখেছেন। সেখান থেকেই করয ও ঋণ দেয়া হয়।)

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলতেন, আমি তো সকল মাদরাসাওয়ালাদের বলে থাকি যে, মুদাররিস, কর্মচারী এবং ছাত্রদের ব্যাপারে যেসব বিষয় এবং অবস্থা সামনে আসে, সেসব বিষয়ে অভিজ্ঞ মুফতীগণের কাছ থেকে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করে সেসব ব্যাপারে শরীয়তের বিধান একত্রিত করে সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। আর তাই হবে দ্বীনী মাদরাসাসমূহের দস্তুর বা সংবিধান। আর এর সবচাইতে বড় মঙ্গলজনক দিক হলো, শরীয়তের অনুসরণ। আর এমনটি হলে মাদরাসার দায়িত্বশীলগণের জন্যও সুবিধা। কারণ যদি মাদরাসা কর্তৃপক্ষের কোন ব্যক্তির ইচ্ছার বিপরীত কিছু করতে হয়, তবে তারা সে ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান পেশ করে তার কাছে অপারগতা প্রকাশ করতে পারবেন। এবং এটা প্রতিপক্ষের জন্যও একটা প্রমাণ হয়ে যাবে।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

তাসাওউফের বিধান মূলতঃ শরীয়তেরই বিধান

সাধারণভাবে লোকেরা তাসাওউফের প্রকৃত হাকীকতকে বুঝতে পারে না। বরং অনেকেই শুধু যিকির-ওযীফা, কাশফ-এলহাম অথবা ইবাদত-বন্দেগীর আর বিশেষ অবস্থাকে তাসাওউফ বলে মনে করে বসে আছে আর এ কারণেই তাসাওউফের আহকামকে শরীয়তের আহকাম থেকে ভিন্নতর বলে মনে করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে শরীয়তের উপর পরিপূর্ণরূপে আমল করে চলার নামই হচ্ছে তরীকত বা তাসাওউফ। যেখানে নামায, রোযা ইত্যাদি বাহ্যিক ও যাহেরী আমলসমূহের পাশাপাশি বাতেনী আমলসমূহের ইসলাহ করাও একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক। বাতেনী আমলসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম হলো, নিজের আকীদাসমূহকে দুরস্ত করা অতঃপর আখলাক সংশোধন করা। এক্ষেত্রে অহংকার, হিংসা, শত্রুতা, লোভ, সম্মানের লোভ, সম্পদের লোভ ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকা, বিনয়, অল্পে তুষ্টি, সবর, শোকর আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি পরিপূর্ণ মহব্বত ইত্যাদি ভাল গুণসমূহ অর্জন করার প্রতি যত্নবান হওয়া।

হযরত ইমাম আবদুল ওয়াহহাব শা'রানী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থ 'আল-ইয়াওয়াকীত ওয়াল জাওয়াহির'-এর প্রথম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে লিখেছেন, বাতেনী আমলসমূহ এবং তার বিধানসমূহকে সলফে সালেহীন, সাহাবা ও তাবেঈন এবং আইম্মায়ে মুজতাহিদীন-এর যুগে এ কারণে সংকলন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়নি যেহেতু সে সময়ে তা আমলীভাবে এতটাই গুরুত্ববহ ছিলো যে, প্রতিটি মুসলিম পরিবারের প্রত্যেক সদস্যই সে ব্যাপারে অবগত ও বাস্তবক্ষেত্রে তার প্রতি আমলে অভ্যস্ত ছিলো। পরবর্তীতে যখন লোকদের মাঝে মূর্খতা, অলসতা এবং দুর্বলতা প্রকাশ পেতে থাকলো সে সময় সলফে সালেহীনগণের যুগের শেষ পর্বে এসে তার সংকলনের কাজও শুরু হয়ে গেলো। এ বিষয়টি ঠিক তেমনি যেমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক যুগে হাদীস ও ফিকাহ-এর সংকলন হয়নি, পরবর্তীতে উম্মতের বরণীয় ব্যক্তিবর্গ যখন হাদীস সংকলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন পর্যায়ক্রমে তখন ধারাবাহিকভাবে তা সংকলিত হয়েছে। যেমন প্রথমে হাদীস পরে ফিকাহ ও পরে উসূলে ফিকাহ-এর সংকলন করা হয়েছে।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সারকথা হচ্ছে, বাতেনী আমলসমূহের বিধি–বিধান ফিকাহ–এর কিতাবসমূহে সংকলিত না থাকার কারণে কেউ যেন এ ধরনের বিভ্রান্তির শিকার না হয় যে, বাতেনী আমলের আহকাম মূলতঃ কোন শরঈ আহকাম নয় কিংবা শরঈ আহকাম হলেও নামায রোযা ইত্যাদির আহকামের তুলনায় বাতেনী আমলের আহকামের গুরুত্ব কিছুটা কম।

শাইখের মজলিসে বসে করণীয়

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, যে মুরীদ নিজের শাইখের দরবারে বসবে তার জন্য আদব হলো, শাইখ যখন কোন কথা বলবেন, তা গুরুত্ব ও পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শুনবে। আর শাইখ যখন চুপ থাকেন তখন সে আল্লাহ পাকের যিকিরে লিপ্ত থাকবে। সে সময় শুধু কলবী যিকির করাই যদিও যথেষ্ট তা সত্ত্বেও আমি 'লিসানী যিকির' বা মৌখিক যিকিরকে এজন্য অগ্রগণ্য বলে মনে করে থাকি, যেহেতু কলবী যিকিরের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ে গাফলতী এসে যায়। অথচ এ লোকটি মনে করতে থাকে যে, আমি যিকিরে লিপ্ত রয়েছি।

হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন যে, কলবী যিকিরের দুটি অবস্থা রয়েছে। একটি হলো, আল্লাহ পাকের কোন বিশেষ নামের শব্দকে ধ্যান করতে থাকা। আর অপরটি হলো শুধু ফিকির করা। অর্থাত, আল্লাহ পাকের পরিপূর্ণ কুদরত তার দয়া অনুগ্রহ এবং তার নি'আমতসমূহের বিষয়ে চিন্তা–ফিকির করতে থাকা।

নামাযে একাগ্রচিত্ত হওয়ার সহজ পথ

হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, খুশু'বা একাগ্রচিত্ততা হলো, নামাযের রূহ বা আত্মা। তা অর্জন করার জন্য মাশাইখগণ বিভিন্ন পদ্ধতি এবং আমলের কথা লিখেছেন। বাস্তব অভিজ্ঞতা এ কথার প্রমাণ যে, একাগ্রচিত্ত হওয়ার প্রচেষ্টায় খুব বেশী লিপ্ত হয়ে পড়লে প্রথমে ক্লান্তি–শ্রান্তি ও পরে বিরক্তি সৃষ্টি হয়ে যায়। এজন্য এক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। আর তার সীমা হলো, নামাযের মধ্যে যে শব্দ মুখে উচ্চারণ করা হয় তা শুধু নিজের মুখস্থ থেকে পড়ে যেতে থাকবে না বরং প্রত্যেকটি শব্দের প্রতি এমনভাবে ধ্যান করবে যেমন অপরিপক্ক হাফেয কুরআন শরীফের

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

শব্দগুলো চিন্তা করে করে মুখে উচ্চারণ করে। এর মধ্যেও যদি কখনো গাফলতী এসে যায়, তবে সেজন্য অস্থির না হয়ে এবং সামনের চিন্তা পরিত্যাগ করে তৎক্ষণাৎ ঐ বর্ণিত পদ্ধতির উপর পুনরায় আমল শুরু করবে অর্থাত যে শব্দ মুখে উচ্চারণ করা হচ্ছে তার প্রতি ধ্যান করতে থাকবে।

নামাযের মধ্যে 'ইস্তিগরাক' বা একেবারে ডুবে যাওয়ার মত অবস্থাও কাম্য নয় যে, তার আর অন্য কিছুর কোন খবরই থাকবে না। 'ইস্তিগরাক' বা একেবারে ডুবে যাওয়া এক জিনিস আর খুশু বা একাগ্রচিত্ততা হলো ভিন্ন জিনিস। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামাযের মধ্যে কখনো 'ইস্তিগরাক' এর অবস্থা হতো না। ঐ হাদীস এ কথার পক্ষে প্রমাণ যে হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথার বর্ণনা দিয়ে ইরশাদ হয়েছে যে, নামাযের জামাআত চলাকালীন সময়ে যদি কোন ছোট বাচ্চার কান্নার আওয়ায কানে আসতো তবে প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সংক্ষেপ করে দিতেন। কারণ, ঐ বাচ্চার মা তার কান্নার কারণে নামাযের মধ্যে অস্থিরতা অনুভব করবে। যদি ইস্তিগরাকের অবস্থাই হতো তবে বাচ্চার কান্নার আওয়ায কিভাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কানে পৌছুতো।

আর প্রকৃত কথাও এটাই যে, 'ইস্তিগরাক' হলো মানুষের ইচ্ছা বহির্ভূত একটি অবস্থা। আর ইচ্ছা বহির্ভূত কোন কিছুর দ্বারা তারাক্কী বা উন্নতি হয় না। বরং তারাক্কী এবং উন্নতি ঐ সকল আমলের দ্বারাই হয়ে থাকে, যা মানুষ নিজের ইচ্ছায় সম্পাদন করে থাকে। খুশু বা একাগ্রতাও একটি ইচ্ছাধীন কাজ আর সেটাই মূলতঃ নামাযের মধ্যে কাম্য।

সুফীগণের তুলনায় আলিমগণের প্রাধান্য

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আমি সর্বদা উলামায়ে কিরামকে সুফিয়ায়ে কিরামের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকি। কারণ, দ্বীন ও তার সীমা আলেমগণই সংরক্ষণ করে থাকেন। এজন্য উলামাদের নির্জনে বসে কাটানোর তুলনায় এটাকেই অগ্রগণ্য বলে মনে করি যে, তারা দরস-তাদরীস, ওয়ায-তাবলীগ বা রচনা-সংকলন, ফতওয়া-ফারায়েয ইত্যাদি কাজেই তার অধিক সময় ব্যয় করবেন। এটা হলো আমার

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

আকলী বা জ্ঞানগত রায়, আর তা না হলে তবঈ বা মানসিক দিক থেকে আমি সুফিয়ায়ে কিরামের প্রতি অত্যন্ত ইশক ও মহব্বত পোষণ করি।

তরীকতপন্থীদের জন্য উপদেশ

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, আল্লাহর যিকির এবং বিভিন্ন নফল ইবাদতের মাঝে এক বিশেষ ধরনের স্বাদ আছে। যা দুনিয়ার অন্য সকল স্বাদের থেকেও উপরে। কিন্তু যারা প্রাথমিকভাবে তরীকত চর্চা শুরু করে তাদের সেই স্বাদ ও মযা লাভের ফিকিরে থাকা উচিত নয়। কারণ, প্রাথমিক স্তরের লোকদের জন্য দ্বীনের আমলসমূহ ঔষধের মত। আর ঔষধ সেবনের ক্ষেত্রে স্বাদ আর মযা লাভের আশা করে বসে থাকার সুযোগ কোথায়? কিন্তু তরীকতের লাইনের যারা শেষ পর্যায়ের উচ্চস্তরের তাদের জন্য এ আমলটিই অত্যন্ত মযাদার ও সুস্বাদু খাবারে পরিণত হয়ে যায়।

অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, লোকেরা এই পথে এসে মযা তালাশ করে অথচ এই পথে এসে তো লোহার বুট চিবাতে হয়। যে পর্যন্ত সাধক এই স্তর অতিক্রম করে সামনে বাড়তে না পারবে ততক্ষণ তার কোন মযা বা স্বাদ লাভ হবে না।

সহজভাবে কাজের হুকুম দেয়া

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, লোকেরা সাধারণতঃ কাউকে কোন কাজের জন্য হুকুম দিলে এমনভাবে দেয় যে, পুরো কথাটা তাকে বলে না। ফলে যাকে কাজের হুকুম করা হয় সে না বুঝে এলোমেলো করে ফেলে। তখন আবার তার প্রতি রাগান্বিত হয়। বিশেষ করে এমনটি হয় নিজের সাগরেদ বা ঘরের চাকরদের ব্যাপারে। এক্ষেত্রে আদব ও উত্তম পন্থা হলো, কাউকে কোন কাজের আদেশ দেয়ার সময় পুরো কথাটা অত্যন্ত পরিষ্কার করে সহজ পদ্ধতিতে বলে তাকে বুঝিয়ে দেয়া।

একমাত্র নববী ইলমই হলো সান্ত্বনার বস্তু

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, শাইখে আকবর মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (রহঃ) যদিও নিজের তাহকীক ও গবেষণা থেকে বলেছেন যে, কামেল মাশায়েখগণের কাশফ এবং

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

ইলহামের মাঝে কোন ভুল হয় না, তা সত্ত্বেও তিনি বলেছেন, কাশফ ও ইলহাম দ্বারা কোন উম্মতের অর্জন করা ইলম পরিপূর্ণ সান্ত্বনার বিষয় নয়। বরং পরিপূর্ণ সান্ত্বনা ও ইতমিনান ঐ ইলমের দ্বারাই লাভ হতে পারে যা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর মাধ্যমে অর্জিত হয়। তিনি বলেন, কাশফ এবং ইলহাম দ্বারা অনেক সময় কাশফ–ইলহামের অধিকারী ব্যক্তিকে পরীক্ষা করাও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর শিক্ষার মাঝে কোন পরীক্ষা নিরীক্ষার সম্ভাবনা থাকে না। কারণ নবী তো শুধু হাদী বা সত্যের পথপ্রদর্শক হয়ে থাকেন। ভ্রান্ততা ও গোমরাহী সে পথে আসতে পারে না। কাশফের ব্যাপারটি ইহার বিপরীত। কারণ তার সম্পর্ক হলো, (তাকবীনী) সৃষ্টিগত বিষয়ের সাথে। আর নিজেদের তাকবীনী (সৃষ্টিগত) বিষয়ের মাঝে হিদায়াত ও ভ্রান্ততা উভয়টিই হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ পাকের শান এ থেকে ভিন্ন। হিদায়াত ও গোমরাহী উভয়টিই তার কুদরত এবং ইচ্ছার দ্বারা হয়ে থাকে। এ কারণে স্বপ্নের মধ্যে শয়তান কখনো নিজেকে খোদা বলে দাবী করতে পারে। কিন্তু সে স্বপ্নের মাঝেও তাকে এমন ক্ষমতা দেয়া হয়নি যার দ্বারা সে নিজেকে নবী বা রাসূল বলে দাবী করতে পারে। কারণ এমনটি হলে মানুষ তার দ্বারা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু খোদায়ী দাবী করার মাঝে এ পর্যায়ের প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই, একটা সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিও খোদায়ী দাবী করার বিষয়টিকে ভ্রান্ত বলে বুঝে নিতে পারে।

তরীকতের শুরু ও শেষ স্তরের পার্থক্য

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, আল্লাহর পথের পথিকদের প্রথম অবস্থায় অন্তর নযরের অধীনস্ত থাকে। যেদিকে নযর যায়, অন্তরের খেয়াল ও ধ্যান সেদিকেই লেগে যায়। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থা কাটিয়ে উঠে কিছু মযবুতী অর্জন করার পর বিষয়টি সম্পূর্ণ উল্টা হয়ে যায় অর্থাত তখন নযর অন্তরের অধীন হয়ে যায়। এ কারণেই প্রাথমিক পর্যায়ের সাধকদেরকে একাগ্রচিত্ততা অর্জনের জন্য চক্ষু বন্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কামেল সাধকগণের এমনটি করার কোন প্রয়োজন থাকে না।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

মহান আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার পদ্ধতি

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহঃ)–এর খলীফা মাওলানা সিদ্দীক আহমদ সাহেব আম্বটুবী (রহঃ) বলতেন, সুফিয়ায়ে কিরাম–এর পরিভাষায় যে জিনিসকে 'আল্লাহ পর্যন্ত পৌছা' বলা হয়ে থাকে, সেটা লাভের জন্য আল্লাহ পাকের নিয়ম হলো, প্রথমে বান্দা নিজের পক্ষ থেকে সেদিকে ধাবিত হবে। অর্থাত, বান্দা নিজের চেষ্টা ও আমলের দ্বারা আল্লাহ পাকের রাস্তা অতিক্রম করতে থাকবে। এভাবে বান্দা যখন নিজের পক্ষ থেকে ধাবিত হয়ে নিজের ক্ষমতা ও সাধ্যমত যতটুকু করা যায় ততটুকু পর্যন্ত করে নেয় এরপরে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে টেনে বা আকর্ষণ করে তাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আর সেই আকর্ষণের ফলেই বান্দা তার কাংখিত মঞ্জিলে (গন্তব্যে) পৌছে যায়। আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে 'জযব' বা আকর্ষণ লাভ করা ছাড়া শুধুমাত্র 'সুলুক' বা আল্লাহর পথে নিজে ধাবিত হওয়ার দ্বারা মনজিলে মাকসুদে পৌছে যাওয়া সম্ভব হয় না। তবে পূর্বের যুগে সুলুক বা আল্লাহর পথে সাধনার জন্য কঠিন মিহনত এবং কঠোর মুজাহাদা করতে হতো। এরপর তারা 'জযব' বা আল্লাহর পক্ষ থেকে আকর্ষণ লাভ করতে পারতো। বর্তমানে মানুষ শক্তির দিক থেকে খুবই দুর্বল এজন্য কঠিন মুজাহাদাসমূহ ছাড়াই আল্লাহ পাকের 'জযব' বা আকর্ষণ লাভ হয়ে যায়। তবে শর্ত হলো, সুন্নাতের অনুসরণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে। কারণ, কারো প্রতি 'জযব' বা আকর্ষণ হওয়া তার মাহবুব বা প্রেমাস্পদ হওয়ার নিদর্শনস্বরূপ। আর মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন—

قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

এখানে মহান আল্লাহ প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে ইরশাদ করছেন, (হে নবী!) আপনি লোকদের বলে দিন যে, যদি তোমাদের আল্লাহ পাকের প্রতি মহব্বত ও ভালবাসা থেকে থাকে তবে তোমরা আমার অনুসরণ করো। আর আমার সুন্নাতের অনুসরণের ফল এই হবে যে, তোমরা মহান আল্লাহ পাকের কাছে মাহবূব বা প্রিয়পাত্র হয়ে যাবে।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

ইমামগণ সকলেই আল্লাহ পাকের ওলী ছিলেন

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম গাযযালী (রহঃ) তার লিখা কিতাব 'ফাতিহাতুল উলূম'–এর মধ্যে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), ইমাম শাফী (রহঃ), ইমাম মালিক (রহঃ) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) প্রমুখসহ অধিকাংশ মুজতাহিদ ইমামগণ সম্পর্কে একথা প্রমাণ করেছেন যে, এ সকল বুযুর্গ ব্যক্তিগণ হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) ও তাবেঈনে কেরাম (রহঃ)গণের ন্যায় জাহের ও বাতেন সবদিক থেকেই পরিপূর্ণ ও আল্লাহ পাকের কামেল ওলী ছিলেন। যদিও তাদের এ ধরনের রসমী ও প্রচলিত মুজাহাদা করার প্রয়োজন পড়েনি যা সাধারণতঃ সুফিয়ায়ে কিরামের মাঝে প্রসিদ্ধ রয়েছে। এ কথার আলোচনা প্রসঙ্গেই হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, সাধারণ লোকেরা মাওলানা রুমী (রহঃ)–এর একটি শে'রের মর্ম ভুল বুঝে তা দ্বারা এ কথা প্রমাণ করতে চায় যে, শরীয়ত হলো এক জিনিস আর তরীকত বা মারেফাত হলো ভিন্ন জিনিস। মুজতাহিদ ইমামগণ শুধু শরীয়তের অধিকারী ছিলেন, তারা তরীকতের বাহক ছিলেন না। শে'রটি হলো নিম্নরূপ—

زاں طرف کہ عشق می افزود درد بوحنیفہ شافعی درسے نہ کرد

অর্থাত, যে পথে তরীকত তথা আল্লাহ পাকের ইশক লাভ হয়, আবু হানীফা আর শাফী সে সবক পড়েননি।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আমাদের হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব মুহাজিরে মক্কী (রহঃ) উপরোক্ত শে'রের দুই লাইনের মাঝে শুধু দুটি শব্দ লিখে দিয়ে সকল প্রশ্নের অবসান করে দিয়েছেন। তা হলো, 'বুহানীফা–শাফী' শব্দের নিচে তিনি লিখেছেন, 'উলামায়ে যাহের উদ্দেশ্য' অর্থাত উপরের শে'রে ইমাম আবু হানীফা ও শাফী (রহঃ)দ্বয়ের ব্যক্তিসত্তা উদ্দেশ্য নয়। বরং তাদের প্রসিদ্ধ গুণই এখানে উদ্দেশ্য অর্থাত এমন লোক যারা যাহেরী শরীয়তের জ্ঞান রাখেন। যেমন একটি প্রবাদ ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধ রয়েছে, প্রবাদটি হলো—

لکل فرعون موسى

এর শাব্দিক অর্থ যদিও এরূপ যে, প্রত্যেক ফেরাউনের জন্যই

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

একজন মূসা (আঃ) আছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে বিশেষভাবে ফেরাউন এবং মূসা (আঃ)–এর ব্যক্তিসত্তা উদ্দেশ্য নয়। বরং ফেরাউন দ্বারা উদ্দেশ্য হয় সাধারণভাবে কোন ভ্রান্ত লোক। আর মূসা (আঃ) দ্বারা উদ্দেশ্য হয় কোন সঠিক পথের পথিক। এ থেকে বুঝা যায় যে, উপরোক্ত শে'রের মর্ম হচ্ছে, যে ব্যক্তি শুধু ইলমে ফিকাহ্–এর বিভিন্ন শাখা প্রশাখা মুখস্থ করে নিয়েছে এবং সে শুধু যাহেরী শরীয়তের উপরই আমল করে কিন্তু বাতেনী ফরযসমূহ, হারামসমূহ ও মাকরূহসমূহ সম্পর্কে কোন অবগতি রাখে না। কিন্তু সম্মানিত মুজতাহিদ ইমামগণ কস্মিনকালেও এমন ছিলেন না যে, তারা বাতেনী আহকাম সম্পর্কে কিছুই জানতেন না এবং তার প্রতি আমলও করতেন না। (বরং তারা যাহেরী শরীয়তের সাথে সাথে বাতেনী ইলম সম্পর্কেও জ্ঞান রাখতেন এবং তার প্রতি আমলও করতেন) কারণ বাতেনী আহকামও কুরআন সুন্নাহর এমন যরুরী আহকাম যেমন যরুরী নামায,রোযা, হজ্জ ও যাকাতের আহকাম।

কোন বিশেষ ব্যক্তির অনুসরণ

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, নফস বা প্রবৃত্তির আযাদী এবং ভ্রষ্টতার ঔষধ 'তাকলীদে শখসী' বা কোন বিশেষ ব্যক্তির অনুসরণ –এর চাইতে উত্তম আর কিছুই নয়। আমাদের উস্তাদ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) তো তার যুগের সমসাময়িক উলামায়ে কিরামেরও তাকলীদ বা অনুসরণ করতেন। সুফিয়ায়ে কিরামের পরিভাষায় তাকলীদে শখসী বা বিশেষ ব্যক্তির অনুসরণের নামই হলো وحدت مطلب অর্থাত, কোন একজন শাইখকে নিজের মুরব্বী ও মুসলিহ বানিয়ে সকল ক্ষেত্রে তারই অধীনস্ততা মেনে নিয়ে তার নির্দেশমত আমল করা। বিভিন্ন মাশাইখ এবং বুযুর্গগণের আমল দেখে নিজের জন্য কোন আমলের পথ যদি কেউ বেছে নিতে চায় তবে সে নিজের প্রবৃত্তির প্রতারণা থেকে কখনো বেঁচে থাকতে পারে না।

মহিলাদের মাঝে দ্বীনী ইলম

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, কান্ধেলা জিলার অধিকাংশ মহিলাই এমন যারা মিশকাত শরীফ এবং 'দুররে মুখতার' পর্যন্ত পড়েছেন এবং এমন মহিলা সেখানে খুব কমই আছে, যে হাফেয

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

নয় এবং রমযান মাসে সারা রাত শুয়ে ঘুমায়। অর্থাৎ, অধিকাংশ মহিলাই হাফেয এবং রাতে জাগ্রত থেকে কুরআন তিলাওয়াত ও ইবাদাত করে থাকে।

চিঠির গায়েই তার জবাব লিখা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ)–এর অত্যন্ত বিজ্ঞজনোচিত অভ্যাস ছিলো যে, তিনি প্রত্যেক চিঠির জবাব ঐ চিঠির কিনারাতেই লিখতেন যাতে করে প্রশ্ন এবং উত্তর উভয়টাই এক সাথে থাকে এবং জবাবও খুব সংক্ষেপে লিখা হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে হযরত (রহঃ) বলেন—

لوگ میرے اس معمول کو اہانت سمجھتے ہیں اور میں اس کو اعانت سمجھتا ہوں

অর্থাত, লোকেরা আমার এ অভ্যাসকে অবজ্ঞা ও অপমান মনে করে আর আমি তাকে সহায়তা ও সমর্থন মনে করি।

মাদরাসার চাঁদার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, এসব দ্বীনী মাদরাসাসমূহের অস্তিত্ব খুবই যরুরী এবং তার স্থায়িত্বও চাঁদার উপর নির্ভরশীল। (কিন্তু চাঁদা তোলার ক্ষেত্রে বর্তমানে অগণিত খারাবী সৃষ্টি হয়ে গেছে। তার মধ্যে সবচাইতে বড় খারাবী হলো, যে সকল আলিমগণ চাঁদা তুলতে যান তাদের মান–সম্মান ক্ষত–বিক্ষত হয়। যা সাধারণ জনগণের জন্য ক্ষতিকর বিষতুল্য। এছাড়া যে সব লোক চাঁদা তুলতে যান তারাও এক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করেন না। বরং তারা এমন পদ্ধতি অবলম্বন করেন যে, দাতা শরমে পড়ে হলেও কিছু দিয়ে রক্ষা পায়। এর দ্বারা দাতার ইখলাসও শেষ হয়ে যায়। এজন্য এ ধরনের চাঁদা তোলা জায়েয নয়।)

এজন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত তা হলো, কোন বিশেষ ব্যক্তিকে সম্বোধন না করে আমভাবে চাঁদা আহবান করা হবে। আর ব্যক্তিবিশেষকে সম্বোধন করা শুধু ঐ ক্ষেত্রে জায়েয হবে, যেখানে সম্বোধনকারী ব্যক্তি কোন বিশেষ সম্মানিত বা প্রতিপত্তিসম্পন্ন লোক না হয়। যার প্রভাবের বশে লোকেরা ইচ্ছার বিরুদ্ধেও চাঁদা দিতে বাধ্য হতে পারে।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

'ইচ্ছা' মানুষের এখতিয়ারভুক্ত নয়

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, কাজ তো আমাদের এখতিয়ারভুক্ত বা ইচ্ছাধীন কিন্তু 'ইখতিয়ার' বা ইচ্ছাটা আমার ইচ্ছাধীন নয়। আর শুধু এর দ্বারা 'জবর' বা বাধ্যকরণ লাযেম আসে না বা আবশ্যকীয় হয় না। যেমন দেখুন সাধারণভাবে সবকিছুই আল্লাহ পাকের এখতিয়ারভুক্ত কিন্তু আল্লাহ পাকের এখতিয়ার বা ইচ্ছার নিজস্ব কোন শক্তি নেই। বরং এটা লাযেমে যাত আল্লাহ পাক যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখনই সে ইচ্ছা আল্লাহ পাকের যাত বা সত্তার সাথে আসতে পারে ইচ্ছা নিজেই এসে আল্লাহ পাকের সাথে লাগতে পারে না।

আল্লাহ পাকের দিকে ধাবিত হওয়ার বরকত

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, আমাদের হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) বলতেন, চারটি মাসআলার ব্যাপারে মহান আল্লাহ আমাকে পরিপূর্ণ বুঝ দান করেছেন। এগুলোর ব্যাপারে আমার মনে কখনো সামান্যতম কোন সন্দেহও সৃষ্টি হয় না। প্রথমতঃ তাকদীরের মাসআলাহ। দ্বিতীয়তঃ রূহের হাকীকতের মাসআল্লাহ। তৃতীয়তঃ সাহাবায়ে কিরামের (রাযিঃ) 'মুশাজারাত' বা তাদের পরস্পরে বিরোধের বিষয়। আর চতুর্থতঃ হলো ওয়াহদাতুল উজূদ বা আল্লাহ পাকের একক সত্তা। একথা পরিস্কার যে, উপরোক্ত বিষয়গুলো পরিস্কারভাবে বুঝতে পারা কিতাবী ইলমের মাঝে খুব বেশী পরিশ্রম করার ফল ছিলো না। বরং মহান আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া এবং তার প্রতি ধাবিত হয়ে নিজেকে তার ফিকিরে লিপ্ত করে নেয়ার ফলাফল ছিলো।

হাকীমসুলভ জবাব

একবার এক ব্যক্তি হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ)-এর খিদমতে পত্র লিখে জানতে চাইলো যে, আপনার ওখানে কোনদিন চাঁদ দেখা গেছে? এ প্রশ্নের উত্তরে হযরত থানবী (রহঃ) লিখলেন, আমি যদি একটা কিছু লিখে দেই তবে তাকি আপনার জন্য কোন হুজ্জত বা প্রমাণ হবে, যাতে আপনি তার প্রতি আমল করতে পারেন? (এমনটি যখন হচ্ছে না সুতরাং এ ধরনের প্রশ্ন করা এবং তার উত্তর দেয়া সবই নিরর্থক এবং বেহুদা।)

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হাদীস শরীফে বর্ণিত দরূদ ও সালাম

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, আমার কাছে এমনটি খুবই পসন্দনীয় যে, যে সময় মানুষ 'দালায়েলুল খায়রাত' এর এক মঞ্জিল পরিমাণ পাঠ করে সে সময়ে (তার পরিবর্তে) ঐ সকল দরূদ ও সালাম পাঠ করে নিবে যা হাদীসসমূহে বিবৃত ও বর্ণিত রয়েছে।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহঃ)-এর কথা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ) বলেছেন—

نسبت صوفیہ غنیمتے است کبریٰ و رسوم شان ہیچ نہ ارزند

অর্থাত, সুফিয়ায়ে কিরাম–এর আল্লাহ পাকের সাথে যে নিসবত ও সম্পর্ক সৃষ্টি হয় সেটাই আসল সম্পদ ও মূল্যবান বস্তু। কিন্তু তাদের যে বিভিন্ন নিয়ম–নীতি ও রসম–রেওয়াজ রয়েছে সেগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।

বুযুর্গদের ইতিহাস একজন ইংরেজের কলমে

ইংরেজ সম্প্রদায় দুনিয়ার কাজে খুবই সতর্ক। তারা যখন হিন্দুস্থানে আসতে শুরু করলো, তখন তারা ফার্সী ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করলো এবং এখানকার আমীর ও বাদশাহগণকে কিভাবে আদব ও সম্মান দেখাতে হয় তা শিখলো। এরপর হিন্দুস্থানের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে নেয়ার পরেও একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইসলামী সালতানাতের নিয়ম–নীতি অব্যাহত রাখলো।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, একজন ইংরেজ ১৮৫৭ ঈসায়ী সালের যুদ্ধের পূর্বে হিন্দুস্থানের প্রসিদ্ধ বুযুর্গগণের ইতিহাস ফার্সী ভাষায় লিখেছিলো। যার নাম রেখেছিলো 'মিফতাহুত তাওয়ারীখ'।

আল্লাহর ওলীগণের সরল জীবন

হযরত হাফেয যামেন সাহেব শহীদ (রহঃ) যিনি ছিলেন থানাভোনের তিন কুতুবের একজন। তার বাহ্যিক অবস্থা ছিলো বড়ই আশ্চর্যজনক।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

তার প্রকাশ্য অবস্থা দেখে কেউই চিনতে পারতো না যে, উনি একজন সাহেবে নিসবত বুযুর্গ এবং একজন উচ্চস্তরের আল্লাহর ওলী। তাঁর সাহেবজাদা জনাব মৌলবী মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের অবস্থা একই রকম ছিলো। তিনিও সাহেবে নিসবত বুযুর্গ এবং ওলীআল্লাহ হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ লোকদের কাতারে তাদের মতই চলাফেরা করতেন। ভূপালে তহশীলদার হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে একজন কর্মচারীর বেশে তিনি দিন গুযরান করেছেন।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) তার ঘটনা বর্ণনা করে বলেন যে, একজন দক্ষ ফকীর যে ম্যাসমেরিযম (এক ধরনের ভেল্কীবাজি) চর্চা করে তার উপর পারদর্শিতা অর্জন করেছিলো, সে নিজের খেয়ালী শক্তি এবং মনোনিবেশ দ্বারা লোকদেরকে প্রভাবিত করতে পারতো। এ লোক একবার মৌলভী মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের মজলিসে গিয়ে উপস্থিত হলো এবং সেখানে সে নিজের অদৃশ্য ক্ষমতা প্রয়োগ করার ইচ্ছা করলো। মৌলভী ইউসুফ সাহেব তৎক্ষণাৎ বিষয়টি জানতে পেরে সাথে সাথে নিম্নোক্ত শে'রটি পড়লেন—

سنبھل کے رکھنا قدم دشت خار میں مجنوں

کہ اس نواح میں سودا برہنہ پا بھی ہے

অর্থাত, ওহে পাগল! যেখানে অপমানের সম্ভাবনা আছে, সেখানে (সে কন্টকময় জায়গায়) পা রাখলে বুঝে শুনে রাখা উচিত। কারণ নগ্ন পায়ের পাগল এই মজলিসেও আছে।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

১১ই রমাযান ১৩৪৮ হিজরীর মালফূযাত

বুযুর্গীকে প্রকাশ বা গোপন করা

কোন কোন পূর্বসূরী আল্লাহর ওলীগণ এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে লক্ষ্য রাখতেন যে, তারা যে কোন ইবাদত করতেন তা গোপনে করতেন। যে কোন নেক আমল করতেন সে ব্যাপারে অন্য কেউ জানতে পারতো না। অনেকে তো আবার লোকদের সামনে এমন কিছু করতেন যা মানুষের নযরে দোষ এবং গুনাহের কাজ বলে গণ্য হয়। অথচ প্রকৃতপক্ষে তা কোন গুনাহের কাজ নয়। এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হতো, যাতে লোকেরা তার ব্যাপারে কোন উন্নত ধারণা পোষণ না করে বরং তার প্রতি যাতে তাদের ধারণা খারাপ হয়ে যায়।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলতেন, সুন্নাতের মধ্যম তরীকা হলো, নিজে স্বাভাবিক গতিতে নিজের কাজ চালিয়ে যাবে। এক্ষেত্রে নিজের কাজকে মানুষের মাঝে প্রকাশ করার প্রতি যেমন কোন চেষ্টা চালাবে না ঠিক তেমনি তা গোপন রাখার ব্যাপারেও খুব যত্নবান হওয়ার প্রয়োজন নেই।

হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন, আমার তো মনে চায় যে, যাতে আমার কোন কাজ বা কথার দ্বারা কেউ ধোঁকা না খায়। যেমন কোন কামাল বা বুযুর্গী যা আমার মধ্যে নেই কোন ব্যক্তি আমাকে তার অধিকারী মনে করে যাতে প্রতারিত না হয়। কিন্তু যদি এমন হয় যে, এমন কোন ত্রুটি যা আমার মাঝে বাস্তবে নেই কোন ব্যক্তি যদি আমাকে সে ত্রুটিতে ত্রুটিযুক্ত ধারণা করে তাতে আমার কোন ক্ষতি নেই।

মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে উদারতা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, আমাদের উস্তাদ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)–এর মন–মানসিকতায় নিজের ইখতিলাফী মাসআলাহসমূহের ব্যাপারে বড়ই উদারতা ও প্রশস্ততা ছিলো। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আমি তাঁর কাছে একবার এমন একটি মাসআলাহ জিজ্ঞাসা

করলাম, যে মাসআলার ব্যাপারে হযরত মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)–এর ফতওয়া হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ)–এর ফতওয়ার সাথে বিরোধপূর্ণ ছিলো। তিনি আমার প্রশ্নের উত্তরে নিজের তাহকীক মতে মাসআলাহ বলে দিলেন এবং সাথে তিনি একথাও বলে দিলেন যে, এক্ষেত্রে মাওলানা গাঙ্গুহী সাহেবের ফতওয়া এরূপ। এখন আপনার ইচ্ছা আপনি যে কোন একটির উপর আমল করতে পারেন।

মুত্তাকী লোকের দ্বারাই জাতি উপকৃত হয়

মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্দী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লামা শিবলী নো'মানী (রহঃ) তার সামনে বলেছেন, বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে একথা প্রমাণিত যে, জাতির ইসলাহী ফায়দা বা উপকার ঐ ব্যক্তিই সাধন করতে পারে যার মাঝে পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা এবং তাকওয়া রয়েছে, এছাড়া সে যত বড় আলেম এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি হোন না কেন, উম্মতের ইসলাহ বা সংশোধন তার দ্বারা সাধিত হওয়া সম্ভব নয়।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

১৯৯০ হিজরীর মালফূযাত
বিগত জীবনের প্রতি অনুশোচনা

বর্তমান সময় যখন আমি 'মাজালিসে হাকীমুল উম্মত'-এর এ পৃষ্ঠাগুলো সংকলন করছি তখন ২১শে শা'বান ১৩৯০ হিজরী। আমার বর্তমান বয়স পঁচাত্তর বৎসর পূর্ণ হয়ে ছিয়াত্তরতম বৎসর শুরু হয়েছে। মহান আল্লাহ অশেষ অনুগ্রহ ও দয়া করেই অধমকে পৌনে শতাব্দীর এ দীর্ঘ হায়াত দান করেছেন এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তিনি অধমকে তার অগণিত বখশিশ ও ইহসান লাভে সৌভাগ্যশালী করেছেন। আল্লাহ তাআলার অগণিত নিআমত রাশির ছায়ায় লালিত-পালিত হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন নাফরমানী, গোনাহ ও অলসতায় এই পৌনে এক শতাব্দীর দীর্ঘ জীবন বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে সৃষ্ট বর্তমান অনুভূতি থেকে কিছু শে'র অন্তরের গভীর থেকে বেরিয়ে এসেছে। এ শে'ররগুলোর মধ্যে প্রথম দু'টি শে'র শুধু আমার নিজের রচিত। আর বাকী শে'রগুলো বিভিন্ন বুযুর্গানে দ্বীনের দু'আ হিসেবে রচিত ও পঠিত শে'রসমূহ থেকে চয়ন করে নেয়া। যা আমার বর্তমান অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মনে করে বিভিন্ন স্থান থেকে বাছাই করে এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেহেতু এগুলো বুযুর্গানে দ্বীনের অন্তর থেকে বেরিয়ে আসা শব্দসমূহ তাই এগুলো বারবার পাঠ করার দ্বারাই হয়তো আমলের ক্ষেত্রে কিছুটা ইসলাহ ও সংশোধনী এবং অন্তরে আখিরাতের ফিকির ও চিন্তা সৃষ্টি হতে পারে। এই উপকারী দিকটি সামনে রেখেই এই শে'রগুলো 'মাজালিসে হাকীমুল উম্মত' নামে সংকলিত গ্রন্থের সাথে সংকলন করে দেয়া হলো।

پنج وہفتاد آمد از عمر عزیز   بے عمل بے علم بے رشد وتمیز
وائی بر من فرصت عمر دراز   دادہ ام در غفلت ودر حرص وآز
بے گنہ نگذشت بر من ساعتے   با حضور دل نہ کردم طاعتے
صد ہزاراں دام ودانہ است ای خدا   ما چو مرغان حریص بے نوا
می رہانی ہر دمے ما را و باز   سوئ دامے می رویم ای بے نیاز
از چو ما بیچارگان این بند سخت   کہ کشاید جز تو اے سلطاں بخت
خویش را دیدیم ورسوائی خویش   امتحان ما مکن اے شاہ بیش
اے خداوند کریم برد بار!   دہ امانم زین دو شاخہ اختیار
جذب یک راہہ صراط مستقیم   بہ ز دو راہہ تردد اے کریم!
ہیں کہ از تقطیع ما یک تار ماند   مصر بودیم و یکے دیوار ماند
البقیہ البقیہ اے خدیو   تا نہ گردد شاد کلی جان دیو

ای ہمیشہ حاجت ما را پناہ   بار دیگر ما غلط کردیم راہ!
گر ہزاران دام باشد ہر قدم   چون تو با مائی نباشد ہیچ غم
تلخ تر از فرقت تو ہیچ نیست   بے پناہت غیر پیچا پیچ نیست
کار تو تبدیل اعیان وعطا   کار ما سہوست ونسیان وخطا
سہو ونسیان را مبدل کن بعلم   من ہمہ جہلم مرا دہ صبر وحلم
کیمیا داری کہ تبدیلش کنی   گرچہ جوئی خون بود نیلش کنی
بادشاہا جرم ما را درگذار!   ما گنہگاریم وتو آمرزگار
بر در آمد بندۂ بگریختہ   آبروئے خود بعصیان ریختہ
مغفرت دارد امید از لطف تو   زانکہ خود فرمودۂ لا تقنطوا
چشم دارم کز گنہ پاکم کنی   پیش ازین کاندر لحد خاکم کنی
اندر آندم کز بدن جانم بری   اے خدا با نور ایمانم بری

কারো তরজমা জানার ইচ্ছা হলে যেগুলো বুঝে না আসে সেগুলো কোন আলেমের কাছ থেকে জেনে নিবেন -অনুবাদক।

www.banglakitab.weebly.com   www.islamfind.wordpress.com

আল্লাহর ওলীগণের দ্বারা মুসলমানগণ উপকৃত হন

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, মহান আল্লাহর সাথে যার সম্পর্ক গভীর এবং শক্তিশালী হয়ে যায় তার দ্বারা মুসলমানদের ইচ্ছা করা ছাড়াই উপকার লাভ হয়। তার দৃষ্টান্ত হয় সূর্যের মত। সূর্যের নিজেরও খবর থাকে না যে, তার দ্বারা কোন্ কোন্ ব্যক্তির কি কি উপকার লাভ হচ্ছে। আবার যেসব ব্যক্তি সূর্যের দ্বারা উপকৃত হয় তারা যদি উপকৃত হওয়ার ইচ্ছা নাও করে তবুও যথানিয়মে তাদের প্রতি উপকার পৌছতে থাকে। অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আল-হামদুলিল্লাহ আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের অবস্থা এমনই ছিলো।

শাইখের সংস্পর্শের একটি বিশেষ আদব

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, বুযুর্গানে দ্বীন লিখেছেন, মুরীদের জন্য নিজ শাইখের সাথে খুব বেশী লেপ্টে থাকা এবং সব সময় সর্বাবস্থায়ই শাইখের সাথে লেগে থাকা উচিত নয়। এর কারণ হলো, কোন মানুষই মানবিক দুর্বলতার ঊর্ধ্বে নয়। সুতরাং শাইখের সেসব মানবিক দুর্বলতার প্রতি যদি মুরীদের নযর পড়তে থাকে, তবে মুরীদের অন্তরে শাইখের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি হবে। এমনটি মুরীদের জন্য খুবই ক্ষতিকর। কারণ এমনটি শাইখ এবং মুরীদের মাঝে একটি প্রাচীর হয়ে অন্তরায় সৃষ্টি করে। ফলে শাইখ থেকে ফায়দা হাসিল করার দরওয়াযা বন্ধ হয়ে যায়।

এ প্রসঙ্গে আমার (সংকলক) একটি কথা স্মরণ হলো, আমি শাইখ আবদুল ওয়াহহাব শা'রানী (রহঃ)-এর কোন একটি কিতাবে দেখেছিলাম যে, শাইখুল ইসলাম মুহিউদ্দীন নববী যিনি মুসলিম শরীফের শরাহ লিখেছেন। তিনি যখন নিজের উস্তাদের খেদমতে হাযির হতেন, তখন পথে পথে তিনি এই দু'আ করতে থাকতেন যে, আয় আল্লাহ! শাইখের কোন দোষ বা দুর্বলতার প্রতি যাতে আমার নযর না পড়ে। কারণ এমনটি হলে সে কারণে তাঁর থেকে আমার ফায়দা হাসিল করার ক্ষেত্রে অন্তরায় এবং ক্ষতি সাধিত হবে। সচেতন ও আল্লাহ পাকের অনুসন্ধানে লিপ্ত মুরীদের জন্য এ উপদেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাই বলে তার উদ্দেশ্য কস্মিনকালেও এই নয় যে, উস্তাদ এবং পীরের কাছ থেকে প্রকাশ্যে গুনাহে কবীরা এবং হারাম কাজসমূহ প্রকাশ পেতে দেখবে অথচ

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

তার পরেও তার প্রতি ভক্তি–শ্রদ্ধার কোনরূপ কমতি হবে না। বরং এহেন অবস্থায় তার প্রতি বুযুর্গীর ধারণা পোষণ করা হারাম এবং তার সাথে কৃত বাইআত ভেঙ্গে দেয়া ওয়াজিব। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) অন্য এক ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেছিলেন যে, এরূপ অবস্থায় ঐ শাইখের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি বিদূরিত করে দেয়া ওয়াজিব। তবে এক্ষেত্রেও গোস্তাখী এবং বেয়াদবী থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

(মুহাম্মদ শফী)

দুটি পরস্পর বিরোধী বস্তুর সমন্বয় সাধন

একবার হযরত থানবী (রহঃ)–এর কাছে প্রশ্ন করা হলো যে, বিভিন্ন অপরাধ এবং গুনাহ, বিদ্বেষ এবং যারা গুনাহে লিপ্ত তাদের থেকে দূরে থাকা এবং ক্ষমতা থাকলে তাকে শাস্তি দেয়াও ওয়াজিব। এবং বিনয় ও নম্রতা প্রকাশও ওয়াজিব। যার সারমর্ম হচ্ছে, উপরোক্ত দুটি গুণের মাঝে প্রকাশ্য বৈপরিত্য রয়েছে। এই বিপরীত দুটি বিষয়কে কিভাবে একত্র করা যায়?

এ প্রসঙ্গে হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তিকে কোন গুনাহের কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে কিংবা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হচ্ছে, তার দৃষ্টান্ত এভাবে বুঝবে যেমন, কোন শাহজাদার থেকে কোন অপরাধ প্রকাশ পেলো এবং সরকারী বিধানমতে তার প্রতি শাস্তির হুকুম হলো। আর শাস্তির বিধান সাধারণত জল্লাদের হাতেই কার্যকর হয়ে থাকে। আর জল্লাদ তেমন কোন সম্মানী ব্যক্তি নয়। বিশেষ করে ঐ শাহজাদার তুলনায় জল্লাদের কোন মর্যাদাই নেই। আর জল্লাদের মনেও কখনো এ জাতীয় কল্পনার উদয় হয় না যে, সে শাহজাদাকে শাস্তি দিচ্ছে বিধায় সে শাহজাদা থেকে উত্তম এবং উচ্চমর্যাদাশীল। ঠিক তদ্রূপই প্রত্যেক মুসলেহ বা সংশোধনকারী এবং শরীয়তের বিধান বাস্তবায়নকারী তার নিজের অবস্থা বুঝে নিবে। যে গুনাহগার ব্যক্তির থেকে সে দূরে থাকছে সে ক্ষেত্রে সে মনে করবে যে, এ ব্যাপারে আমি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আদিষ্ট যে, তার সাথে আমি কোন বিশেষ সম্পর্ক রাখতে পারবো না। কিন্তু এমনও হতে পারে যে, সে আল্লাহ পাকের নিকট আমার তুলনায় উত্তম এবং উচ্চ মর্যাদাশীল এবং তার কোন আমল আল্লাহ পাকের দরবারে এতটা পসন্দনীয় ও মকবুল যা তাকে আমার

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

থেকেও আগে বাড়িয়ে দিয়েছে এবং আমারও কোন কাজ (আল্লাহ পাক না করুন) এমন খারাপ হতে পারে, য়া আমাকে তার তুলনায় নিম্নগামী করে দিয়েছে। এ পদ্ধতিতে বিনয়–নম্রতাও পুরোপুরি কায়েম থাকে এবং অপরাধী ও গুনাহগারদের সাথে শরীয়তসম্মত যে আচরণ করা হয় তাও নিজস্থানে বহাল থাকে। কথাটি অন্য শব্দে এভাবেও বলা যেতে পারে যে, বিদ্বেষ ও ঘৃণা এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা প্রকৃতপক্ষে ফাসেক ও গুনাহগারদের কাজ (অর্থাত তাদের কাজের কারণেই মূলতঃ এমনটি করতে হয়) এগুলো প্রকৃতপক্ষে ঐ মুমিন ব্যক্তির নিজ থেকে প্রকাশিত কোন কাজ নয়।

প্রসঙ্গক্রমে আমার (সংকলক) স্মরণ হলো। হযরত থানবী (রহঃ) অন্যত্র কোন এক কলেজে হযরত থানবী (রহঃ)–এর মাহফিল হওয়ার কথা আলোচনা করেন এবং বলেন যে, সেখানে আমার বয়ানের পর এক আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি দাঁড়ালো এবং সে বলতে লাগলো, আমি শুনেছি আপনার নাকি ইংরেজী শিক্ষিত লোকদের প্রতি খুব ঘৃণা রয়েছে। হযরত থানবী (রহঃ) লোকটির একথার উত্তরে বললেন, ইংরেজী শিক্ষিত লোকদের প্রতি আমার কোন ঘৃণা নেই তবে তাদের কিছু কাজ–কর্মের প্রতি অবশ্যই ঘৃণা রয়েছে। তখন সে লোকটি বললো, তাদের সে কাজগুলো কি? হযরত থানবী (রহঃ) জবাব দিলেন, সকলের কাজ একই রকম নয় বরং প্রত্যেকের কাজ–কর্ম ও অবস্থা বিভিন্ন রকম। আর তাই তাদের আহকাম বা বিধানও ভিন্ন। সারকথা হলো, এ থেকে এ কথাই বুঝা যাচ্ছে যে, কোন ব্যক্তি যতই পাপী বা ফাসেক–গুনাহগার হোক না কেন তার ব্যক্তিসত্তাকে ঘৃণা করা শরীয়তের উদ্দেশ্য নয়, বরং তার নাজায়েয আমলের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করাই শরীয়তের উদ্দেশ্য। (মুহাম্মদ শফী)

কারো স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করো না

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, স্বাধীনতা একটি বড় নি'আমত। এ কারণে কারো স্বাধীনতায় কস্মিনকালেও বিঘ্ন সৃষ্টি করা উচিত নয়। লোকদের আরামে, ঘুমে কিংবা কোন ওযীফা–দরূদ পাঠে এবং লেখাপড়ার সময়সমূহে অত্যন্ত প্রয়োজন না হলে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া কিংবা তাকে কোন কাজ করতে বলা তার

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়ারই নামান্তর। এ ব্যাপারে খুব সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। যার কাছে কোন কাজ থাকে কিংবা যার সাথে দেখা করা উদ্দেশ্য হয়, তার কখন সময়-সুযোগ আছে তা জেনে তার কাছে যাওয়া উচিত।

হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন যে, আমি একই মজলিসে বা একই খাবারে বিভিন্ন ধরনের লোকদেরকে একত্রিত করা এ কারণে পসন্দ করি না যেহেতু এমনটি করার কারণে তাদের স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়। যারাই এক মজলিসে একত্রিত হয়েছে, তাদের সকলের মাঝে পরস্পর সামঞ্জস্যতা এবং লৌকিকতামুক্ত অবস্থা থাকে না। বিধায় সকলেই এটাকে একটা বন্দীশালার মত অনুভব করতে থাকে। এ কারণে আমি সফরের ক্ষেত্রে এ শর্তও আরোপ করতাম যে, সকলের সাথে একই মজলিসে বসে খানা খাওয়ার জন্য আমাকে বাধ্য করা যাবে না।

এ কথার প্রেক্ষিতেই হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন যে, যেসব কাজে আল্লাহ পাক এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে আযাদ ও স্বাধীন রেখেছেন সেসব ক্ষেত্রে নিজের পক্ষ থেকে নতুন নতুন শর্ত আরোপ করা স্বয়ং নিজের আযাদী ও স্বাধীনতাকে খর্ব করার শামিল। যেমন আল্লাহ পাক তার যিকির করার জন্য উযূ থাকা না থাকার কোন শর্ত আরোপ করেননি। অনুরূপভাবে দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের যিকির করার অনুমতি রয়েছে। এখন কোন ব্যক্তি যদি নিজের উপর এরূপ বাধ্যবাধকতা তৈরী করে নেয় যে, যখনই সে কোন যিকির করবে, তখন উযূর সাথেই করবে, কিংবা শুধু দাঁড়িয়েই করবে তবে এ ব্যক্তি নিজেই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তাকে দেয়া স্বাধীনতাকে বিনষ্ট করে নিজেই নিজেকে মুসীবতে লিপ্ত করলো। কারণ, শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গীর অধীনে এমনিতেই মানুষের প্রতি অনেক বিধি-নিষেধ ও নিয়ম-নীতি আরোপিত রয়েছে। কিন্তু যেখানে আল্লাহ পাক কোন বিশেষ শর্ত বা নিয়ম-নীতি আরোপ করেননি, সেখানেও যদি বিশেষ বিশেষ নিয়ম-নীতি নিজের উপর আরোপ করে নেয়া হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই বুঝা যায় যে, সে নিয়মানুবর্তিতা স্থায়ীভাবে পালন করে চলাও খুব সহজ কথা নয়। হাদীসে পাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لن تحصوا ولكن سددوا و قاربوا

অর্থাত, তোমরা ঐ সকল বিধি–নিষেধ ও নিয়ম–কানূন পরিপূর্ণরূপে পালন করতে পারবে না, যা তোমাদের প্রতি আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে সঠিক পন্থায় রাখা এবং নিজেদেরকে তার নিকটবর্তী করে রাখার ব্যবস্থা করো এবং তার প্রতি গুরুত্বারোপ করো তবে এতটুকুই যথেষ্ট হবে।

অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, বিদআত নিষিদ্ধ ও নাজায়েয হওয়ার একটা গ্রহণযোগ্য কারণ এটাও যে, বিদ'আত মানুষের আল্লাহ প্রদত্ত স্বাধীনতাকে খর্ব করে। কারণ, আল্লাহ পাক সদকার সওয়াব কাউকে পৌছানোর জন্য কোন শর্ত আরোপ করেননি। এক্ষেত্রে মনে মনে নিয়্যত করে নেয়া বা মুখে শুধু বলে দেয়া যে, এর সওয়াব অমুকে পাক। সওয়াব পৌছানোর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু এখানে কুরআন শরীফের কিছু সূরা পাঠ করতে হবে অথবা পাঠ করাতে হবে এ সবের কোন প্রয়োজন নেই। অহেতুক লোকেরা এসব নিয়ম–নীতি তৈরী করে নিজেদের উপর আরোপ করে নিয়েছে। এগুলো করতে গিয়ে তাদের নিজেদেরকেও যথেষ্ট অস্থিরতা পোহাতে হয়।

কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) ঐ ব্যক্তির প্রতি খুব গোশ্বা হতেন, যে তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যেতো।

(অনুসরণযোগ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নীতি এটাই হওয়া উচিত যে, এ ধরনের কাজের প্রতি তারা অপসন্দনীয়তা এবং অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন, যদিও কোন সম্মানী বুযুর্গ আলেম ব্যক্তি কোন মজলিসে উপস্থিত হলে অন্যদের জন্য তাকে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করার অনুমতি রয়েছে—সংকলক।)

হানাফী, শাফী ও মুহাম্মদী

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, অনেক গায়রে মুকাল্লিদ (যারা ইমাম মানে না আহলে হাদীস বলে পরিচিত) লোকেরা নিজেদেরকে মুহাম্মদী

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

বলে থাকে এবং তারা নিজেদের নামের সাথে মুহাম্মদী লিখে থাকে। তারা হানাফী, শাফী ইত্যাদি বলাকে শিরক বলে বর্ণনা করে থাকে। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) বলেন, যদি হানাফী, শাফী বলা শিরক হয় তবে মুহাম্মদী বলা শিরক হবে না কেন?

ঈসায়ী ১৮৫৭ সালের জিহাদ

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, থানাভোন এবং শামেলীতে এ সময় যে জিহাদ সংঘটিত হয়েছিলো তার আমীরুল মুমিনীন ছিলেন আমাদের মিশনের প্রধান মুরব্বী ও সরদার হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ (রহঃ)। সে জিহাদে তার সাথে যারা সম্পর্ক রাখতো তারা সকলেই অংশগ্রহণ করেছিলো। মহান আল্লাহ পাকের ফায়সালা ও তাকদীরের লিখন মতে সে জিহাদে শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের পরাজিত হতে হলো। ইংরেজদের পক্ষ থেকে মুসলমান মুজাহিদদের গ্রেফতার করার নির্দেশ জারী করা হলো। হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ)কে গ্রেফতার করে জেলখানায় পাঠিয়ে দেয়া হলো। হযরত মাওলানা কাসেম সাহেব (রহঃ) আত্মগোপন করলেন। কিন্তু তিনদিন পর তিনি নিজেই আত্মপ্রকাশ করলেন এবং বললেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনদিন 'সওর' পর্বতের গুহায় আত্মগোপন করেছিলেন। আমি সে সুন্নাত আদায় করেছি মাত্র। এখন আর আত্মগোপন করে থাকবো না। যদি গ্রেফতার হওয়া ভাগ্যে থাকে তবে হবো, কিন্তু আল্লাহ পাক এমন ব্যবস্থা করেছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত তিনি গ্রেফতার হওয়ার হাত থেকেও বেঁচে গেলেন। আমাদের আমীরুল মুমিনীন হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব (রহঃ) আত্মগোপন করে থাকলেন এবং সে অবস্থাতেই একবার তিনি গাঙ্গুহ উপস্থিত হলেন। সে সময় হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ) জেলখানায় ছিলেন। সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ছিলো হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ)–এর পরিবারের লোকদেরকে সান্ত্বনা দেয়া। হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ)–এর কন্যা সুফিয়া তখন ছিলো ছোট বাচ্চা। তাকে তিনি নিজে কোলে বসালেন এবং দুটি টাকা তার হাতে দিলেন। কিন্তু সে সেই টাকা হযরত (রহঃ)–এর পায়ের উপর রেখে দিলো। তখন হাজী সাহেব (রহঃ) বললেন, এই মেয়ে দুনিয়া ত্যাগী হবে।

হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ) অধিকাংশ সময় বলতেন, হযরত হাজী সাহেব

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

(রহঃ)–এর কথামত আল্লাহ তাআলা সে মেয়েকে দুনিয়া ত্যাগী বানিয়ে দিয়েছেন। তার উপর কখনো যাকাত ফরয হওয়ার মত পরিস্থিতি হয়নি। কারণ, যা কিছুই তার কাছে আসে তার সবটাই সে গরীব–দুঃখী এবং প্রিয়জনদের জন্য খরচ করে ফেলে।

নম্রতা ও কঠোরতা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, আমি নম্রতা পরিত্যাগ করা থেকে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষেধ ও বারণ করে থাকি। এ কঠোরতা আপাতদৃষ্টিতে কঠোরতা হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি ছিলো নম্রতা প্রদর্শনে বাধ্য করা এবং তার প্রতি অভ্যস্ত করা।

মীলাদ মাহফিল

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, মীলাদ মাহফিলের ব্যাপারে আমার পূর্বের খেয়াল ছিলো এরূপ যে, ঐ মাহফিলের আসল কাজ হচ্ছে যিকরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর আলোচনা ও তাঁকে স্মরণ করা। আর এ কাজ তো সকলের কাছেই ভাল। সৌভাগ্যজনক এবং মুস্তাহাব ইবাদত। কিন্তু তার মধ্যে যে সমস্ত নিন্দনীয় বিষয়াদি এবং ভ্রান্ত রুসমসমূহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে, সেগুলো দূর করার চেষ্টা করতে হবে। প্রকৃত কাজ মুস্তাহাব মাহফিলকে ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। আর এটি ছিলো মূলতঃ আমাদের হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব মুহাজিরে মক্কী (রহঃ)–এর মসলক বা নীতি। হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)–এর চূড়ান্ত স্নেহ–মমতা, অনুগ্রহ ও মহব্বতের কারণে আমিও এমনটিই পসন্দ করতাম। সাধারণ সুফিয়ায়ে কিরাম (রহঃ)–এর মসলক এবং তাদের নীতিও এরূপ। হযরত মাওলানা রুমী (রহঃ)ও এ কথারই প্রবক্তা। তিনি বলেন—

بہر کیکے کے تو گلیمے را مسوز

অর্থাত, (কম্বলের লোম সাফ করতে গিয়ে) আসল কম্বলটাকেই তুমি জ্বালিয়ে শেষ করে দিও না।

কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের হানাফী মাযহাবের ফকীহগণের মসলক বা নীতি হচ্ছে, যে সমস্ত মোবাহ বা মুস্তাহাব কাজ শরীয়তের মাকসাদ ও

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত সেগুলোর মাঝে যদি কোন নিন্দনীয় ও অপসন্দনীয় বিষয় শামিল হয়ে পড়ে, তবে সে অপসন্দনীয় বিষয়কে দূর করার চেষ্টা করতে হবে। এ কারণে মূল কাজটাকেই ছেড়ে দিবে না। যেমন মসজিদের জামাআতসমূহের মাঝে যদি কোন নিন্দনীয় বিষয় যুক্ত হয়ে পড়ে, তবে সে কারণে জামাআত ছেড়ে দেয়া জায়েয হবে না। বরং পরিপূর্ণ শক্তি ব্যয় করে ঐ নিন্দনীয় বিষয়কে দূরীভূত করার চেষ্টা ফিকির করা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে আযান, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলোও বুঝাতে হবে। কারণ এগুলো শরীয়তের মাকসাদ বা উদ্দেশ্যের মধ্যে শামিল। তাই এ সবের মাঝে যদি কোন নিন্দনীয় বিষয় শামিল হয়ে পড়ে, তবে সে নিন্দনীয় বিষয়কে দূর করার চেষ্টা করতে হবে। মূল কাজটাকেই ছেড়ে দেয়া যাবে না। কিন্তু যেসব মুস্তাহাব কাজ এমন যে, শরীয়তের আসল মাকসাদসমূহ তার উপর মওকূফ বা নির্ভরশীল নয় এ জাতীয় মুস্তাহাব কাজের মাঝে যদি কোন নিন্দনীয় বিষয় যুক্ত হয়ে পড়ে তবে সে মুস্তাহাব কাজকেই ছেড়ে দিতে হবে। যেমন কবর যিয়ারত করা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর স্মরণে কোন মাহফিল অনুষ্ঠিত করা। এ সবের উপর শরীয়তের কোন উদ্দেশ্য নির্ভরশীল নয়। কেননা, এভাবে বিশেষ পদ্ধতি ছাড়াও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্মরণ করা সম্ভব। সুতরাং ঐ বিশেষ পদ্ধতির মাহফিলে যদি কোন নিন্দনীয় বিষয় বা কোন বিদআতের অনুপ্রবেশ ঘটে, তবে সে ক্ষেত্রে এ জাতীয় সভা মাহফিলকেই ছেড়ে দেয়া আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। হাদীস শরীফের বিভিন্ন বর্ণনা, সাহাবায়ে কিরামের (রাযিঃ) বিভিন্ন কাজ এবং ইমামগণের বিভিন্ন কথায় এর পক্ষে অনেক প্রমাণ বিদ্যমান আছে। আল্লামা শাতিবী (রহঃ) সেসব প্রমাণকে 'কিতাবুল ই'তিসাম' নামক গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

যে গাছের নিচে (হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইআত গ্রহণ করেছিলেন, যার উপর মহান আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির কথা পবিত্র কুরআনে আলোচিত হয়েছে। হযরত ফারূকে আযম (রাযিঃ) যখন সে গাছের নিচে লোকদের একত্রিত হওয়া এবং কিছু অপসন্দনীয় বিষয় সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কার কথা অনুভব করলেন, তখন তিনি সে গাছটিকেই কাটিয়ে ফেললেন। অথচ সে গাছের নিচে যেসব সাহাবা (রাযিঃ) একত্রিত হতেন, তারা কোন নাজায়েয কাজ

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

করতেন না। শুধুমাত্র বরকত মনে করে সেখানে তারা একত্রিত হতেন এবং মহান আল্লাহর যিকির এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর যিকির ও স্মরণেই লিপ্ত থাকতেন। কিন্তু যেহেতু এ জাতীয় জমায়েত শরীয়তের কোন মৌলিক উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না এবং ভবিষ্যতে এর মধ্যে শিরক ও বিদ'আত ঢুকে পড়ার আশঙ্কা ছিলো তাই সে গাছ কেটে দিয়ে ঐ জমায়েতকেই শেষ করে দেয়া হয়েছে।

হযরত ফারূকে আযম (রাযিঃ)সহ অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)–এর থেকে এ জাতীয় আরো অনেক ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। 'কিতাবুল ই'তিসাম'–এর মধ্যে সেগুলো নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহের উদ্ধৃতি সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। ঐ সকল হাদীস ও সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)–এর কাজের ভিত্তিতে এ জাতীয় বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের ফকীহগণের নীতি ও মতামত হচ্ছে, যে কাজটি মুস্তাহাব কিন্তু সেটা শরীয়তের মৌলিক কোন উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নয় যদি তার মধ্যে নিন্দনীয় বিষয়াদি বা বিদ'আত শামিল হয়ে পড়ে কিংবা শামিল হয়ে পড়ার দৃঢ় আশঙ্কা হয় তবে এ জাতীয় মুস্তাহাবকেই সমূলে পরিত্যাগ করবে, কিন্তু যেসব মুস্তাহাব কাজের উপর শরীয়তের কোন মাকসাদ বা মৌলিক উদ্দেশ্য নির্ভরশীল সেসব মুস্তাহাবকে নিন্দনীয় বিষয় যুক্ত হওয়ার কারণে ছেড়ে দেয়া যাবে না বরং সে নিন্দনীয় বিষয়কে দূর করার চেষ্টা করতে হবে।

হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ) যেহেতু হানাফী মাসলাক ও মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। এ কারণে তিনি প্রচলিত মীলাদ মাহফিলে শরীক হওয়ার অনুমতি দিতেন না। কারণ, এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের নিন্দনীয় বিষয় ও বিদ'আতের সংমিশ্রন ঘটে গেছে। এই মাসআলার ব্যাপারে একটা সময় পর্যন্ত হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ)–এর সাথেও আমার মতপার্থক্য ছিলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী প্রমাণাদি এবং দ্বীনের হিফাযতের প্রতি লক্ষ্য করে হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ)–এর এ মতই অধিক গ্রহণযোগ্য ও সঠিক বলে বুঝে এসেছে। তাই সেটাকেই গ্রহণ করে নিয়েছি। কিন্তু সুফিয়ায়ে কিরাম (রহঃ) যে নীতি গ্রহণ করেছেন আমি সেটাকেও একেবারে অমূলক মনে করি না। ফকীহ ইমামগণের মাঝে আল্লামা শাফী সাহেব (রহঃ)–এর অনুসারীদের মতামতও অনুরূপ। আল্লামা শামী (রহঃ) 'নামাযের পরে মুসাফাহা' সংক্রান্ত মাসআলার মধ্যে শাফী মতাবলম্বী শাইখ মহিউদ্দীন

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

নববী (রহঃ)–এর এরূপ মতের কথাই বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং যেসব সুফিয়ায়ে কিরাম কোনরূপ নিন্দনীয় কর্মকাণ্ড ও বিদ'আতমুক্তভাবে মীলাদ মাহফিল করে থাকেন, তাদের প্রতিও কোনরূপ প্রশ্ন বা কুধারণা পোষণ করা উচিত নয়।

(এ মালফূযটির মাঝে বিবৃত সব শব্দ হযরত (রহঃ)–এর নয়, এর মাঝে কিছু ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অধমের পক্ষ থেকে সংযুক্ত করা হয়েছে।—মুহাম্মদ শফী (রহঃ))

খারাপ বিষয় সংশোধনের এক বিশেষ পদ্ধতি

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, আমি আমার নফস বা প্রবৃত্তির মাঝে যখন কোন মন্দ বিষয় অনুভব করি তখন কোন কোন ক্ষেত্রে আমি তার এলাজ বা সংশোধনীর জন্য এ পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকি যে, সে ব্যাপারে সাধারণ মজলিসে একটা বয়ান দেই। এর দ্বারা ঐ মন্দ বিষয়ের উপকরণ অন্তর থেকে নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং তা থেকে বেঁচে থাকা সহজ হয়ে যায়।

মহান আল্লাহ ও নিজ নফসের প্রতি ভয়

একবার মক্কা শরীফের প্রশাসন হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)–এর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে গেলো এবং তাকে পবিত্র মক্কা থেকে বের করে দেয়ার ইচ্ছা করলো। হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) যখন বিষয়টি জানতে পারলেন, তখন তিনি বললেন, আমি মহান আল্লাহ ও নিজ নফস বা প্রবৃত্তি ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করি না। মহান আল্লাহকে ভয় করাইতো প্রকৃত ঈমান। একথাতো সকলেই জানে। আর নফস বা প্রবৃত্তিকে এ কারণে ভয় করতে হবে যে, যেহেতু মানুষের সবচাইতে বড় দুশমন হলো নফস বা প্রবৃত্তি, যে মানুষকে ভ্রান্তিতে নিপতিত করে এবং খারাপ কাজে লিপ্ত করে দেয়।

মুতালা'আর ব্যাপারে একটি উপদেশ

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) বলতেন, যখন কোন কিতাব মুতালা'আ করার ইচ্ছা করো, তখন প্রথমে তার নামটা দেখে নাও। যদি নামটাই কিতাবের প্রকৃত বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তবে সেটা বাদ দিয়ে ভূমিকা দেখে নাও। যদি সেটাও কিতাবের বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যশীল

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

না হয়, তবে সে কিতাব মুতালা'আ করার সংকল্প পরিত্যাগ করো, অহেতুক তা পাঠ করে সময় নষ্ট করো না। যদি কিতাবের নাম ও তার ভূমিকা সামঞ্জস্যশীল দেখতে পাও তবেই তা মুতালা'আ করে সামনে বাড়বে।

ফিকহী কাওয়ায়েদ এবং আলিমগণের মতপার্থক্য

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, অনেক সময় কোন বিশেষ ঘটনার ক্ষেত্রে এসে ফিকহী কাওয়ায়েদ বা মূলনীতি পরস্পর বিরোধী হয়ে পড়ে। এক আলিমের নযর এক মূলনীতির প্রতি থাকে আবার অন্য আলিমের নযর অপর এক মূলনীতির উপর থাকে। আর এ কারণে মতের ভিন্নতা সৃষ্টি হওয়া সাধারণ ও আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআনের 'সূরা আবাসা'–এর মধ্যে যে ঘটনা সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর প্রতি ধমকী এসেছে, এই বলে যে,

আপনি একজন গরীব অন্ধ মুসলমান ব্যক্তির প্রতি অধিক লক্ষ্য নেয়ার পরিবর্তে মুশরিক নেতাদের প্রতি অধিক মনোনিবেশ করলেন কেন?

এখানেও এমনটিই ঘটেছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নযরে যে বিষয়টি ছিলো তাহলো—একটি মূলনীতি এরূপ আছে যে, দ্বীনের অমৌলিক বা শাখা বিষয়াদির তুলনায় মৌলিক বিষয়াদির শিক্ষাদান অগ্রগণ্য। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সময় মুশরিক নেতাদের সাথে যে কথা বলছিলেন, তা ছিলো দ্বীনের মৌলিক বিযয়ের শিক্ষা। পক্ষান্তরে ঐ অন্ধ সাহাবী (রাযিঃ) হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর সাথে যে আলোচনা করতেন, তা হতো দ্বীনের শাখা বিষয় সম্পর্কে (মৌলিক বিষয় সম্পর্কে নয়) কারণ সে তো পূর্ব থেকেই ঈমানদার। বিধায় তিনি দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদির অনুসারীও পূর্ব থেকেই ছিলেন। এজন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিক নেতাদের সাথে আলোচনা করাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কিন্তু এখানে এ নীতির বিপরীতে অপর একটি মূলনীতিও রয়েছে তখনকার সময়ে প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর নযর সেদিকে ছিলো না। সে মূলনীতিটি হলো, যে কাজের লাভ ও সুফল আশাব্যঞ্জক এবং যার ক্ষেত্রে সফলকাম হওয়ার অধিক

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

আশা সে কাজকে ঐ কাজের উপর অগ্রগন্য বিবেচনা করতে হবে, যে কাজের লাভ সন্দেহজনক এবং যেক্ষেত্রে সফলতা লাভের আশা কম।

'সূরায়ে আবাসা'-এর ক্ষেত্রে বিষয়টি অনুরূপই ছিলো। তাহলো মুশরিক সরদারদের মৌলিক শিক্ষাদানের সুফল সন্দেহজনক ছিলো, পক্ষান্তরে মুসলমানের জন্য শাখা বিষয়ের শিক্ষাদানের লাভ ও সুফল নিশ্চিত ছিলো। এ কারণে পবিত্র কুরআনে মুসলমানকে শিক্ষা দেয়ার বিষয়টিকেই অগ্রগন্য বিবেচনা করার কথা বলা হয়েছে এবং এ কারণেই ধমকী দেয়া হয়েছে যে, আপনি এই মূলনীতির প্রতি কেন লক্ষ্য করলেন না।

হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) প্রসঙ্গে

একজন লোক হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তার জবাবে হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করলেন, চূড়ান্ত কথা হলো (ধরা যাক) হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) থেকে গুনাহ প্রকাশ পেয়েছে এবং ধরে নাও সে গুনাহ হলো গুনাহে কবীরা। কিন্তু এখন এ বিষয়টি ফায়সালা করে, যে, যদি কোন সাহাবী (রাযিঃ) থেকে গুনাহ প্রকাশ পেয়ে যায়, তবে তার সাথে আমাদের কিরূপ আচরণ করতে হবে। আমাদের জন্য কি তার সম্পর্কে খারাপ ও কটু বাক্য উচ্চারণ এবং গীবত করা জায়েয হয়ে যাবে? দেখো হযরত মায়েয (রাযিঃ) যিনার ন্যায় কবীরা গুনাহ প্রকাশ পাওয়ার পর স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তার প্রতি রজম শাস্তি প্রয়োগ করার কথা বিশেষ হাদীসসমূহের দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু এর পরেও একজন সাহাবী (রাযিঃ) যখন হযরত মায়েয (রাযিঃ) সম্পর্কে গীবত করলেন তখন প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কঠোরভাবে বারণ করলেন।

শব্দ ও নামের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া

ইমাম আযম হযরত আবু হানীফা (রহঃ)-এর একজন শিয়া প্রতিবেশী নিজের দুটি খচ্চরের নাম রেখেছিলো আবু বকর এবং উমর। (শিয়া সম্প্রদায়ের এ জাতীয় নিন্দনীয় ও নোংরা কর্মকাণ্ডের বিষয়টি খুবই প্রসিদ্ধ আছে) একদিন একটি খচ্চর লাথি মেরে ঐ শিয়া লোকটির পেট ছিঁড়ে ফেললো। হযরত ইমাম আযম (রহঃ) যখন বিষয়টি শুনলেন,

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

তখন তিনি সাথে সাথে বললেন, এটি সম্ভবত ঐ খচ্চরটিই হবে যার নাম সে 'উমর' রেখেছিলো। সে নামে 'আছর' ও প্রভাব এমনই হওয়া উচিত ছিলো। বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়ার পর হযরত ইমাম আযম (রহঃ)-এর ধারণা সঠিক প্রমাণিত হলো।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, বিভিন্ন নাম এবং শব্দের মাঝেও আল্লাহ পাক বিশেষ আছর ও প্রতিক্রিয়া রেখেছেন। এক বাচ্চার নাম তার পিতা-মাতা রেখেছে 'কালীমুল্লাহ' সে অধিকাংশ সময়েই শুধু অসুস্থ থাকতো। আমি তার নাম পরিবর্তন করে 'সালীমুল্লাহ' রাখলাম। এরপর থেকে সে সুস্থ হয়ে গেলো এবং সুস্থই থাকলো। কারণ, কালীম শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ হলো, অসুস্থ, ক্ষত ও জখমপ্রাপ্ত। আর সালীম অর্থ সুস্থ।

শাহ আবদুল আযীয (রহঃ)-এর তীক্ষ্ণ ধীশক্তি

দর্শন শাস্ত্র মানতিক ও যুক্তিবিদ্যা ইত্যাদির বিশিষ্ট ইমাম হিসেবে খ্যাত মাওলানা ফযলে হক খায়রাবাদী ও মাওলানা সদরুদ্দীন সাহেব যারা দু'জনই আরবী সাহিত্যেও যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। একবার তারা দু'জন ইচ্ছা করলেন, শাহ আবদুল আযীয দেহলভী (রহঃ)-এর ইলমের পরীক্ষা নিবেন। তারা পরস্পরকে বললেন, শাহ সাহেবের ইলম ও ফযলের কথা বর্তমানে মানুষের মুখে মুখে খুব শোনা যায়। চলো আমরা তাকে একটু পরীক্ষা করে দেখি সে কেমন এবং কত বড় আলেম।

কথামত তারা রওয়ানা করলেন এবং রাস্তায় তারা দু'জনে আরবী ভাষায় দুটি কবিতা রচনা করলেন এবং পরীক্ষা করার জন্য একজনের কবিতা অপরজনের কবিতার সাথে বদল করে নিলেন। এরপর তারা হযরত শাহ সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন, হযরত আমরা দু'জনে কাগজ কলমে কিছু প্রলাপ বকেছি, একটু যদি দয়া করে শুনতেন!

হযরত (রহঃ) বললেন, শোনান। এরপর তারা দু'জনে দুটি কবিতা পড়ে শোনালেন। হযরত শাহ সাহেব চুপ করে বসে শুনতে লাগলেন। অবস্থা দেখে তারা দু'জনে একে অপরকে ইশারায় বলতে লাগলেন যে, বড় মিয়া হয়তো কবিতার কিছুই বুঝতে পারেননি, বলবেন আর কি? অতঃপর তারা হযরত শাহ সাহেব (রহঃ)কে বললেন, হযরত আপনি তো

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

কবিতা দুটি সম্পর্কে কিছুই বললেন না। হযরত শাহ সাহেব (রহঃ) জবাবে বললেন, হাঁ কিছু তো বলবো নিশ্চয়ই, তবে আপনারা আগে আমাকে বলুন, কবিতা দুটি পরস্পরের মধ্যে বদল করেছেন কোথায় বসে এবং কেন? এবার তারা দু'জনে অস্থির হয়ে জানতে চাইলেন, আমরা যে বদল করেছি তা আপনি কি করে জানলেন? হযরত শাহ সাহেব (রহঃ) বললেন, আমি আপনাদের উভয়ের কথা শোনার পর কথার ভঙ্গি থেকে আপনাদের উভয়ের মানসিকতা এবং রুচি সম্পর্কে একটা ধারণা করে নিয়েছিলাম। এ কবিতা দুটিকে তার ব্যতিক্রম দেখতে পাচ্ছি। তাতেই আমার ধারণা হয়েছে যে, আপনারা কবিতা দুটি পরস্পরের মাঝে বদল করেছেন। অতঃপর হযরত শাহ সাহেব কবিতার প্রতিটি পংক্তি ধরে ধরে সংশোধন করতে লাগলেন। অবস্থা এমন হলো যে, কোন একটি পংক্তিও হযরত শাহ সাহেব (রহঃ)-এর সংশোধনী থেকে বাঁচতে পারলো না।

গাইরুল্লার জন্য মানত

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, জানদার প্রাণী ব্যতীত যে খানা বা শিরনী ইত্যাদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে নযর বা মানত করা হয়, সেগুলোকেও ফুকাহায়ে কিরাম হারাম এবং অপবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন আল্লাহ পাক ছাড়া অন্য কারো নামে জবাই করা প্রাণী হারাম, ঠিক তেমনি এসব খানা-শিরনী ইত্যাদিও হারাম। হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আমিও এ রায়কে সঠিক মনে করি, তবে এগুলোকে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত—

مَا اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ

অর্থাত, 'ঐসকল বস্তু যা মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা হয়েছে'-এর অন্তর্ভুক্ত মনে করি না। কারণ উপরোক্ত কথা প্রাণীসমূহের ব্যাপারে হওয়ার বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত। তাই প্রাণী ব্যতীত অন্য কোন বস্তু-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণে প্রাণী ব্যতীত অন্য সব বস্তুর ব্যাপারে এই হারাম হওয়ার বিধানটি কিয়াসী। ফিকহী কিয়াস বা তুলনার ভিত্তিতে উভয় প্রকারের বিধানই এক বলে মনে হয়।

এবং আমি একথাও বলি না যে, উপরোক্ত আয়াত مَا اُهِلَّ -এর মধ্যে যে مَا শব্দটি রয়েছে, যার অর্থ হলো 'যা কিছু'-এর ব্যাপকতার

ভিতরে প্রাণী ছাড়া অন্য সব বস্তুও অন্তর্ভুক্ত। কেননা নিয়ম হলো, কোন ব্যাপক শব্দের ব্যাপকতার মধ্যে অতটুকু শামিল করা যায় যতটুকু পর্যন্ত শামিল করলে সে শব্দের বক্তার উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করা হয় না। এত অধিক ব্যাপকতা সৃষ্টি করা যা দ্বারা বক্তার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় এমনটি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়।

যদি কোন অসুস্থ ব্যক্তি নিজের ডাক্তারের কাছে কি কি জিনিস থেকে বেঁচে থাকতে হবে সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে। আর ডাক্তার যদি বলে দেয়, তৈলাক্ত এবং চর্বিযুক্ত খাবার ছাড়া সব ধরনের খাবার খেতে পারবে। তবে তার অর্থ এমনটি কোনদিনও নয় যে, সে ঐ তৈলাক্ত ও চর্বিযুক্ত খাবার ছাড়া লোহা, পাথর, মাটি ইত্যাদিও খেতে পারবে। অর্থাত তার ঐ ব্যাপকতার মধ্যে যেগুলো খাবার নয় সেগুলোও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এমন নয়। এমনটি ধরা হলে তা বক্তার উদ্দেশ্যকেই অতিক্রম করা হবে।

ঠিক উপরের ব্যাপারটিতে পবিত্র কুরআনের আয়াত প্রাণীসমূহের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আয়াতের মধ্যে রয়েছে ব্যাপকতা। তাই বলে সে ব্যাপকতায় প্রাণী নয় এমন প্রাণহীন বস্তুও শামিল হবে, তা নয়। এমনটি করা হলে তা আমার মতে ঐ ডাক্তারের বক্তব্যের মতই বক্তার উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করা হবে। এজন্য আমার মত হচ্ছে, পবিত্র কুরআনের আয়াত مَا اُهِلَّ بِهٖ –এর দ্বারা তো শুধু ঐ প্রাণীগুলোই হারাম হবে, যেগুলোকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন নামে জবাই করা হয়।

এখন বাকী থাকলো প্রাণহীন অন্যান্য বস্তু। যেমন, বিভিন্ন খানা, শিরনী, মিঠাই ইত্যাদি। এসব যদিও ঐ আয়াতের ব্যাপক অর্থের অন্তর্ভুক্ত নয় কিন্তু এ সবের মাঝেও যেহেতু গাইরুল্লাহর নামে নিবেদন বা উৎসর্গ করার কারণটি বিদ্যমান তাই প্রাণীর সাথে ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে কিয়াস বা তুলনা করে প্রাণহীন বস্তুসমূহকেও হারাম বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। (মূল বক্তব্যের সাথে ব্যাখ্যা সংকলকের পক্ষ থেকে)

সাধনা মুজাহাদা আসল উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হাসিলের মাধ্যম মাত্র

হযরত সুফিয়ায়ে কিরামের মাঝে যেসব মুজাহাদা–সাধনা প্রসিদ্ধ রয়েছে যেমন রাত্রি জাগরণ, অনেক কম খাওয়া, কম কথা বলা ইত্যাদি

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

এগুলো যেমন শরীয়তের কোন বিধাননয়, তেমনি এসব কোন আসল উদ্দেশ্যও নয়। বরং ঐসব সাধনা–মুজাহাদা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, প্রবৃত্তি বা নফসকে এমনভাবে শুদ্ধ করে গড়ে তোলা, যাতে সে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায়, বরং শরীয়তের সীমার ভিতরেই থাকে। এজন্য আত্মার সংশোধনে লিপ্ত মুসলেহ শাইখ ও মুরব্বীর কর্তব্য হচ্ছে, মুরীদ বা সাধকের শক্তি, অবসর ও মানসিকতা বিবেচনা করে সে অনুযায়ী তার জন্য সাধনা ও মুজাহাদা নির্ধারণ করা। পূর্ব যুগের মাশাইখগণ যেসব কঠিন মুজাহাদা নির্ধারণ করেছিলেন, তা সে যুগের জন্য উপযোগী ছিলো। যেহেতু সে সময়ের লোকদের গায়েও শক্তি ছিলো তাদের মানসিকতার মাঝেও কাঠিন্যতা বিদ্যমান ছিলো। তাই সে সময় কঠোর মুজাহাদা করা ছাড়া তাদের প্রবৃত্তিকে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করা মুশকিল ছিলো।

হযরত (রহঃ) বলেন, বর্তমান সময়ের মানুষের মানসিকতার মাঝে এমনিতেই দুর্বলতা রয়েছে। শারীরিক দিক থেকেও তারা কমজোর। পূর্ব যুগে চল্লিশদিনের সাধনা–মুজাহাদার দ্বারা যতটুকু সুফল লাভ হতো বর্তমানে মানসিক দুর্বলতা হেতু এমনিতেই তা লোকদের মাঝে রয়েছে। এজন্য বর্তমান খানা কম খাওয়া এবং কম ঘুমানোর মুজাহাদা করানো উচিত নয়। এতে প্রকারান্তরে তার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাবে ফলে কোন কাজ করাই তার পক্ষে আর সম্ভব হয়ে উঠবে না।

হযরত (রহঃ) বলেন যে, ডাক্তারদের সাথে আলোচনা করে জানতে পেরেছি যে, পূর্বযুগের চিকিৎসাপত্রে একজন মানুষের জন্য ঔষধের যে পরিমাণ লেখা হতো বর্তমানে তা চারজনকেও দেয়া যায় না। পূর্বের পরিমাণের চাইতে বর্তমানে একজন মানুষ চার ভাগের তিনভাগ কমিয়ে শুধু একভাগ লেখা হয়। সুফিয়ায়ে কিরামের মুজাহাদারও এই একই অবস্থা। কারণ মুজাহাদা তো মৌলিক খাবার নয় বরং এটা দাওয়া বা ঔষধের মত। তাই এটাকে মিযাজ ও মানসিকতার বিচারে প্রয়োজন পরিমাণ দেয়া উচিত। সারকথা হচ্ছে, মুজাহাদা কোন মূল উদ্দেশ্য নয় বরং এটা উদ্দেশ্য হাসিলের একটা মাধ্যম বা পদ্ধতি মাত্র। সুতরাং মূল উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির মাধ্যমের মাঝে পার্থক্য করতে হবে।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

১৭ই রমযান ১৩৪৮ হিজরীর মালফূযাত

দুই বুযুর্গের মাঝে আলোচনা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, শরীয়তের পক্ষ থেকে অনুমতি ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থাতেও হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতবী (রহঃ) তায়াম্মুম করতেন না। বরং অনেক কষ্ট স্বীকার করেও তিনি উযূই করতেন। সেসময় হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) হযরত নানুতবী (রহঃ)–এর দরবারে উপস্থিত হলেন। এবং এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, 'আপনি তায়াম্মুম করার অনুমতি থাকা সত্ত্বেও উযূ করাকে হয়ত কামাল বা বুযুর্গী মনে করছেন। কিন্তু আমার খেয়ালে এটা কোন কামাল নয় বরং তার বিপরীত এটি বুযুর্গী পরিপন্থী কাজেরই শামিল। কেননা অসুস্থ ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম করার বিধান আল্লাহ পাকের একটি নেয়ামত হিসেবে তিনি বান্দার জন্য বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন। আল্লাহ পাকের এই পুরস্কারের দ্বারা মনের মাঝে কোন আড়ষ্টতা বা সংকীর্ণতা সৃষ্টি হওয়া কোন কামাল বা বুযুর্গী হতে পারে না। বরং এটাকে একটা দোষই বলতে হবে। হযরত নানুতবী (রহঃ) হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)–এর এই মতকে পসন্দ করলেন এবং সেমতে আমল করতে শুরু করলেন। (উযূর পরিবর্তে তখন থেকে তায়াম্মুম করতে শুরু করলেন।)

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, শরীয়ত আরোপিত 'রুখসত' বা শিথিল ও সহজ বিধানের প্রতি যদি মনে কোন যুক্তিগত অনিহা ভাব এমনিতেই এসে যায় তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই।

অন্য এক ক্ষেত্রে হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাকের গোলামীর দাবী বা চাহিদা তো হচ্ছে, অসুস্থ ব্যক্তি নিজের অসুস্থতা ও দুর্বলতার কথা স্বীকার করবে এবং আল্লাহ পাকের দেয়া সুযোগ ও শিথিলতাকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করবে। কেননা হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে—

ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان توتى عزا ئمه

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

অর্থাত, মহান আল্লাহ্ তাআলা তাঁর দেয়া 'রুখসত' বা শিথিল বিধানের প্রতি আমল করাকে অনুরূপ পসন্দ করেন যেমন তিনি পসন্দ করেন 'আযীমত' বা উন্নত ও যথার্থ বিধানের প্রতি আমল করা।

এ বিষয়টিকেই মাওলানা রুমী (রহঃ) খুব চমৎকারভাবে বলেছেন—

چونکہ بریخت بہ بند دبستہ باش

چوں کشاید چابک وبرجستہ باش

অর্থাত, মহান আল্লাহ তাআলা যখন তোমাকে আবদ্ধ রাখতে চান তখন তুমি আবদ্ধ ও বন্দী থাকো। আর যখন তোমাকে তিনি একটু স্বাধীন আর খোলা রাখতে চান তখন খোলাই থাকো।

মহিলাদের চেহারাও ঢেকে রাখতে হবে

ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদ ফুকাহায়ে কিরাম (রহঃ) মহিলাদের চেহারা এবং হাতের পাঞ্জা সতরের বাইরে হিসেবে গণনা করেছেন। এর অর্থ হচ্ছে নামাযের মধ্যে যদি এই চেহারা এবং পাঞ্জা বাইরে থাকে তবে তাতে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না বরং নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। ফুকাহায়ে কিরাম পায়ের পাতার ক্ষেত্রেও একই বিধান দিয়েছেন। এ তিনটি অঙ্গ ব্যতীত মহিলাদের সমস্ত শরীর সতরের অন্তর্ভুক্ত। যদি তার মধ্য হতে কোন একটি অঙ্গ নামাযের মধ্যে খোলা থাকে বা খুলে যায় তবে নামায শুদ্ধ হবে না। এই মাসআলাহ হচ্ছে সতর ঢাকার ক্ষেত্রে। কিন্তু যেসব পুরুষের সাথে মহিলাদের দেখা করা বৈধ নয়, এমন গাইরে মাহরাম লোকদের থেকে মহিলাদের পর্দা করার বিধান উপরের বিধান থেকে ভিন্নতর। পর্দার মাসআলার ভিত্তি হচ্ছে, ফিৎনা হওয়ার আশঙ্কার উপর, আর একথা পরিষ্কার যে, চেহারা হচ্ছে মানুষের শরীরের একটি অন্যতম বিশিষ্ট অঙ্গ। এ চেহারা গায়র মাহরাম পুরুষের সামনে খুলে দেয়াই একটা বড় ফিৎনা। এ কারণেই হযরত ফুকাহায়ে কিরাম গায়র মাহরাম পুরুষদের সামনে মহিলাদেরকে তাদের চেহারা খোলা রাখার অনুমতি দেননি।

উপরোক্ত মাসআলার ব্যাপারে হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, পবিত্র কুরআনের আয়াতে অকাট্যভাবে রয়েছে—

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ

অর্থাত, মহিলাদের প্রতি নির্দেশ হচ্ছে, তারা যেন নিজেদের পাসমূহকে মাটির উপর এত জোরে না ফেলে, যাতে তাদের পায়ের অলংকারে আওয়ায হয় এবং তা গায়র মাহরাম পুরুষদের কানে পৌছে যায়।

এ কথাও পরিষ্কার যে, অলংকার মহিলাদের শরীরের কোন অংশ নয়। বরং এটি একটি ভিন্ন ও পৃথক বস্তু এবং তার আওয়ায দ্বারা তেমন কোন বড় ফিৎনা হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। যতটা ফিৎনার সম্ভাবনা রয়েছে চেহারা খোলা রাখার দ্বারা। সুতরাং একটি পৃথক বস্তুর আওয়ায দ্বারা সৃষ্ট সম্ভাব্য ফিৎনাকে যখন পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতে প্রতিহত ও বারণ করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে এমনটি কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, মহিলাদের মূল সৌন্দর্য ও আকর্ষণীয় অঙ্গ চেহারা খুলে রাখার অনুমতি শরীয়তে দিয়ে দেয়া হবে।

দারিদ্র থাকা সত্ত্বেও মুখাপেক্ষীহীনতাই হলো বুযুর্গী

আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীন তাদের জীবন কাটিয়েছেন অত্যন্ত কৃচ্ছতা ও দুঃস্থতার মধ্য দিয়ে। যদিও তাদের সে গরীবী, দুঃস্থতা ও দারিদ্রকে তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সুন্নাতের অনুসরণের স্বার্থে স্বেচ্ছায়ই বরণ করে নিয়েছিলেন। কারণ, তারা যদি ইচ্ছা করতেন, তবে অঢেল সম্পদের প্রাচুর্য গড়ে তুলতে পারতেন। কিন্তু তাদের অন্তরে কখনো এ জাতীয় চিন্তার স্থান হয়নি। এর পরেও যাই কিছু আল্লাহ পাক তাদেরকে দান করেছিলেন তা গরীব–মিসকিনের জন্য এবং দ্বীনী কাজের পিছনে খরচ করে দিয়েছেন আর নিজেরা চরম দুঃস্থতার মাঝে জীবন যাপন করেছেন।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, হযরত নানুতবী (রহঃ)–এর কাছে দুই জোড়ার বেশী কাপড় কখনো ছিলো না। এক জোড়া পরনে থাকতো অপর জোড়া ধোয়ার জন্য দিয়ে দিতেন। বর্তমানের মাশায়েখগণ তো নবাবী জিন্দীগী যাপন করেন। যদিও তারা লোকদের থেকে অমুখাপেক্ষী ভাব বজায় রাখেন এবং এমনটি বজায় রাখা উচিত বটে। কিন্তু এই অমুখাপেক্ষীতাও ঐ স্তরের বুযুর্গী বা কামাল নয় যা পূর্ব যুগের বুযুর্গানে দ্বীনের ছিলো। কারণ তারা দুঃস্থতা–দারিদ্র্যের মাঝে থেকেও অমুখাপেক্ষীতা বজায় রেখেছেন।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

একটি মজার কথা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, একবার মুরাদাবাদের একটি সভায় কোন একটি দ্বীনী কাজের জন্য ব্যাপকভাবে চাঁদা উঠানোর প্রয়োজন দেখা দিলো। হযরত থানবী (রহঃ) সেখানে বললেন যে, আমি আর কিছু বলছি না শুধু এতটুকু বলছি যে, এই 'পান চিবানো' বন্ধ করে দিন, যাতে মুসলমানদের লক্ষ–কোটি টাকা বিনষ্ট হয়ে যায়। এ কথার মর্ম এই ছিলো, পান খাওয়া ছেড়ে দিন এবং তাতে যে পয়সা বেঁচে যাবে তা দ্বীনের পথে চাঁদা দিয়ে দিন।

মুরীদের সংশয়ের সংশোধন

হিন্দুস্থানে খেলাফত আন্দোলন চলাকালীন সময়ে হযরত থানবী (রহঃ) শরীয়ত সম্মত বিভিন্ন কারণে সে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি। হিন্দুস্থানের মুসলমান এবং অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম সে আন্দোলনে শরীক ছিলেন। জনৈক ডেপুটি কালেক্টর সাহেব হযরত থানবী (রহঃ)এর মুরীদ ছিলেন। তিনি হযরত থানবী (রহঃ)–এর এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করার উপর কিছু সংশয়ের কথা লিখে পাঠালেন। হযরত থানবী (রহঃ) তার জবাবে লিখলেন, এ ক্ষেত্রে উত্তম পন্থা হচ্ছে, আপনি কিছুদিনের জন্য আমার অনুকরণ থেকে ছুটি গ্রহণ করুন। অতঃপর ফিৎনা দূরীভূত হয়ে যাওয়ার পর প্রকৃত বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। তখন যদি আপনার আমার সাথে সম্পর্ক রাখতে ইচ্ছা হয়, তবে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করুন।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ঐ সময় লোকদের বিভিন্ন প্রশ্ন ও সংশয়ের প্রয়োজন পরিমাণ জবাব দিতেন। কিন্তু একজন মুরীদ ও অনুসারীর জন্য এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপনকে হযরত থানবী (রহঃ) তার ইসলাহ ও আত্মশুদ্ধির পথে অন্তরায় মনে করেই উপরোক্ত জবাব দিয়েছিলেন।

ইনসাফপূর্ণ শিষ্টাচার শিক্ষা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ)–এর শেষ বয়সে স্বাস্থ্যগত দুর্বলতার কারণে সর্বদাই একটা শারীরিক সমস্যা লেগেই থাকতো এবং তার চিকিৎসাও চলতে থাকতো। চিকিৎসক ছিলেন হাকীম মুহাম্মদ

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হাশিম সাহেব থানবী (রহঃ)। যিনি ছিলেন হযরত থানবী (রহঃ)–এর একজন অত্যন্ত ভক্ত মুরীদ। হযরত থানবী (রহঃ) যদি কখনো তাঁকে ডেকে পাঠাতেন তবে তিনি তা নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করে সন্তুষ্টচিত্তে হাযির হতেন। কিন্তু হযরত থানবী (রহঃ)–এর অভ্যাস ছিলো, তিনি যতক্ষণ এমন কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে না পড়তেন, যাতে তাঁর চলাফেরা করা মুশকিল হতো ততক্ষণ তিনি হাকীম সাহেবকে ডাকতেন না বরং নিজেই হাকীম সাহেবের বাড়ীতে হাযির হয়ে যেতেন, এবং তার কাছ থেকে চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ গ্রহণ করতেন। হযরত থানবী (রহঃ) বলতেন, আমি জানি যে, আমি যদি তাকে আমার এখানে আসতে বলি তবে সে অসন্তুষ্ট হবে না বা এটাকে কোন বোঝা মনে করবে না। কিন্তু এমনটি করাকে আমি ইনসাফ পরিপন্থী কাজ মনে করি। কারণ, এখানে প্রয়োজন তো আমার। কিন্তু কষ্ট করবে হাকীম সাহেব এটা হয় না। কেননা আমি হলাম প্রার্থী আর হাকীম সাহেব হলেন প্রার্থিত। আর নিয়ম হলো প্রার্থী ব্যক্তি প্রার্থিত ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হবে।

আমি নিজেই (সংকলক) অনেকবার দেখেছি যে, খানকার যে জায়গায় হযরত থানবী (রহঃ) বসতেন, তার ঠিক সামনে একটু দূরত্বেই মাদরাসা ছিলো। আর সেই মাদারাসার কাছেই খানকার প্রধান ব্যবস্থাপক, হযরত থানবী (রহঃ)–এর ভাতিজা হযরত মাওলানা শিব্বির আলী সাহেব বসতেন। যখন কোন ইলমী মাসআলার ব্যাপারে হযরত থানবী (রহঃ) মাদরাসার কোন উস্তাদের সাথে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করতেন কিংবা খানকার ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে ভাই জনাব শিব্বির আলী সাহেবের সাথে কোন প্রয়োজন হতো, সেক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় হযরত থানবী (রহঃ) নিজেই উঠে তাদের কাছে যেতেন এবং তাদের সাথে কথা বলে পুনরায় ফিরে আসতেন এবং নিজের কাজে লিপ্ত হয়ে যেতেন। তাদেরকে নিজের কাছে ডেকে আনা তিনি পসন্দ করতেন না। কারণ, এমনও তো হতে পারে যে, হযরত থানবী (রহঃ) যখন তাদেরকে ডেকে পাঠালেন তখন তাঁরা এমন কোন যরুরী কাজে লিপ্ত রয়েছেন—যে কাজ ছেড়ে আসা তাদের জন্য মুশকিল, ফলে তাদের কষ্ট হবে।

এই ছিলো ঐ ইনসাফপূর্ণ শিষ্টাচার, যে ব্যাপারে হযরত থানবী (রহঃ) শুধু কথার মাধ্যমেই নয় বরং নিজে তা বাস্তবায়িত করে সারাজীবন

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

লোকদেরকে তার শিক্ষা দিয়ে গেছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অনুকরণীয় ও বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের মাঝেও খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিই এই বিশেষ গুণটির ব্যাপারে লক্ষ্য রেখে থাকেন।

এ প্রসঙ্গেই হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, কোন মজলিস বা সভায় যদি আমার হাঁচি আসে তবে আমি নীচু আওয়াযে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলি। যাতে মজলিস বা সভার সকল লোকদের উপর 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে তার জবাব দেয়া ওয়াজিব না হয়। কারণ, অনেক সময় লোকেরা বিষয়টি লক্ষ্য করতে পারে না বা এদিকে খেয়াল থাকে না। কিংবা অন্য কোন অন্তরায় থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে সে ব্যক্তি গুনাহগার হয়ে যাবে। এবং হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, এ ব্যাপারে আমার কাছে বিশিষ্ট শায়ের মুতানাব্বীর এ শে'রটি খুব পসন্দনীয়—

اقل سلامی حب ما خف عنکم

واسکت کیما لا یکون جواب

অর্থাত, আমি আপনাকে খুব কম সালাম করি যাতে আপনার উপর সালামের জবাব দেয়ার বোঝা না পড়ে। আর আমি অধিকাংশ সময় চুপ থাকি, প্রশ্ন কম করি যাতে আপনার উপর তার জবাব দেয়ার কষ্ট না আসে।

স্পষ্টবাদিতার স্তর

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আহলুল্লাহ বা বুযুর্গানে দ্বীন সর্বদা স্পষ্ট কথা বলে থাকেন। যদি তারা কাউকে তার কোন ত্রুটির কথা বলতে ইচ্ছা করেন তবে স্পষ্ট ভাষাতেই তা বলে দেন। এ ত্রুটির কথা বলার পিছনে যেহেতু তাদের উদ্দেশ্য থাকে ঐ ব্যক্তির প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করা এবং তাকে সংশোধন করা। তাই তাদের এ বলার দ্বারা কেউ অসন্তুষ্ট হয় না। বরং এটি তার প্রতি একটি অনুদান ও অনুগ্রহ বলেই সে মনে করে। পক্ষান্তরে সহমর্মিতা প্রদর্শন বা সংশোধনের উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ যদি কারো ত্রুটিকে এভাবে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে তবে সেখানে এক ধরনের অসন্তোষ এবং কঠোরতা বিদ্যমান থাকে এবং অপর ব্যক্তির নিকট তা অপসন্দনীয় মনে হয়। এবং তার প্রতি কারো আকর্ষণও সৃষ্টি হয় না।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

বুযুর্গানে দ্বীনের কঠোরতা প্রদর্শনের হাকীকত

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, গুড়হী এলাকার বাসিন্দা মৌলবী সিদ্দীক আহমদ সাহেব একবার আলীগড়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ–এর কাছে সাক্ষাতের জন্য গেলেন। কথা প্রসঙ্গে সেখানে হযরত শাহ ইসহাক সাহেব মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ)–এর আলোচনা আসলো। স্যার সৈয়দ বললেন যে, লোকেরা মনে করে তিনি দ্বীনের ব্যাপারে খুব কঠোরতা করে থাকেন। কিন্তু বাস্তব বিষয় হচ্ছে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিজের প্রতি তো বাস্তবেই খুব কঠোরতা করতেন, খুটিনাটি সংশয়–সন্দেহের বিষয় থেকেও তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে বেঁচে থাকতেন। কিন্তু সাধারণ লোকদের প্রতি তিনি কস্মিনকালেও কঠোরতা করতেন না! বরং তাদের জন্য তিনি শরীয়তের সহজতর সুযোগ তালাশ করতেন। অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) আরো বললেন, আমি শুনেছি যে, মাওলানা রশীদ আহমদ সাহেব গাঙ্গুহী (রহঃ)–এর নীতিও এ রকমই ছিলো।

নিজের চেষ্টা ও মহান আল্লাহর প্রতি ভরসা

অনেক অজ্ঞ লোকেরা 'চেষ্টা–প্রচেষ্টা চালানো' ও 'আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা' করাকে একটি অপরটির সাথে সাংঘর্ষিক ও বিপরীত বলে মনে করে থাকে। এ বিষয়টির হাকীকত একটি হাদীস দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায়। প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

أَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوْا عَلَى اللّٰهِ

অর্থাত, তোমরা নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সংক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা চালাও। অতঃপর আল্লাহ পাকের উপর ভরসা কর।

হযরত থানবী (রহঃ) উপরোক্ত বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে, প্রত্যেক কাজ ও প্রত্যেক উদ্দেশ্যে নিয়মতান্ত্রিক প্রচেষ্টা এবং সাধারণ সতর্কতা অবলম্বন করবে। অতঃপর আন্তরিক দৃঢ়তা সহকারে বিষয়টি আল্লাহ পাকের উপর ছেড়ে দিয়ে নিজ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাকওয়া অবলম্বন করা

একবার হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) এক এলাকায় গেলেন। সেখানকার নবাব সাহেব হযরত থানবী (রহঃ)–এর খিদমতে একশত

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

একাত্তর টাকা নাযরানা পেশ করলো। হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, সে সময় আমার সাথে অন্যান্য আলেমগণও ছিলেন। ঐ নবাব সাহেব তাদেরকেও এই পরিমাণ নাযরানা দিলেন। ঐ নাযরানার ব্যাপারে আমার সন্দেহ ছিলো বিধায় তা গ্রহণ করতে মন চাচ্ছিলো না। কিন্তু সেই মজলিসেই যদি আমি গ্রহণ করতে অস্বীকার করি তবে অন্যদেরও এ পন্থাই অবলম্বন করতে হতো। সে জন্য অন্যদের যাতে কোন ক্ষতি বা লোকসান না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে গোপনে ঐ নবাবের উযীরকে বলে দিলাম যে, আমি এই নাযরানা গ্রহণ করবো না। প্রথমতঃ আমি স্বাভাবিকভাবেই এ ধরনের নাযরানা গ্রহণ করি না। দ্বিতীয়তঃ এ নাযারানার ব্যাপারে আমার সংশয় হচ্ছে যে, এ মালের মালিক তো নবাব সাহেব ঠিকই কিন্তু এর মধ্যে বাইতুল মালেরও কিছু অংশ আছে। আর তার বাইতুল মাল বা সরকারী কোষাগার থেকে কিছু গ্রহণ করার অধিকার আমার এজন্য নেই যেহেতু আমি তার শাসনাধীন এলাকার লোকদের কোন খেদমত করি না। এই হলো আদাবে মোয়াশারাত বা আচার–আচরণগত শিষ্টাচার। সকলের জন্যই যা রক্ষা করে চলা উচিত।

এ প্রসঙ্গেই হযরত থানবী (রহঃ) এরপর ইরশাদ করেন যে, ইবাদতের আরকান এবং আহকাম মর্যাদার বিচারে খুবই উত্তম এবং মর্যাদাশীল কিন্তু মু'আশারা বা আচার–আচরণের আরকান অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এক্ষেত্রে আরকান রক্ষা না করলে অন্যের কষ্ট হয়।

অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) 'যিয়াউল কুলূব' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, যতক্ষণ মানুষের আখলাক (বাতেনী স্বভাব) ঠিক না হবে ততক্ষণ তার মাঝে আল্লাহ পাক পর্যন্ত পৌছার যোগ্যতা ও উপযুক্ততাই সৃষ্টি হবে না। (আর একথা অত্যন্ত পরিস্কার যে, মু'আশারাত বা আচার–আচরণ সংশোধন হওয়া ব্যতীত আখলাক সংশোধন হওয়া সম্ভব নয়।)

জীনেরাও আল্লাহ পাকের ওলীগণকে সম্মান করে

থানাভোন এলাকায় একজন জীন ছিলো যার নাম ছিলো 'শাহামত'। সে অনেক লোককে কষ্ট দিতো। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) তার নামে একটি চিরকুট লিখে দিলেন, যাতে তিনি ঐ জীনকে আল্লাহ পাকের আযাবকে ভয় করার উপদেশ দিয়েছেন। এই চিরকুট দেখে ঐ

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

জীন বললো, এটা যদিও এমন কোন তাবীয নয়, যার দ্বারা জীন পালিয়ে যেতে বাধ্য। কিন্তু এটি এমন কোন সাধারণ ব্যক্তির চিঠিও নয়, যাকে উপেক্ষা করা যায়। সুতরাং আমি চলে যাচ্ছি। ভবিষ্যতে আর কাউকে কোন কষ্ট দিবো না। কবি যথার্থই বলেছেন—

ہر کہ ترسید از حق وتقوی گزید

ترسد از وے جن وانس وہر کہ دید

অর্থাত, যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে এবং আল্লাহকে ভয় করে, তাকে সমগ্র জীন ও ইনসানসহ যেই দেখে সেই ভয় পায়।

আলিমের সম্মান

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, দ্বীনের মঙ্গল কামনার দাবী হচ্ছে, উলামায়ে কিরামের সহযোগী এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। এক্ষেত্রে কোন আলেমের আমল খারাপ হলেও তাকে সহযোগিতা করবে। কেননা যদি সাধারণ লোকদের অন্তর থেকে উলামাদের প্রতি ভক্তি—শ্রদ্ধা ও মর্যাদা দূরীভূত হয়ে যায় তবে দ্বীন শেষ হয়ে যাবে। কারণ, তারা উলামাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও কুধারণার শিকার হয়ে শেষে কারো কথাতেই কান দিবে না।

একটি রহস্যময় কথা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ পাকের ইশকে মাতাল এক মাজযূব ব্যক্তি কত চমৎকার রহস্যময় কথা বলেছেন, তিনি বলেছেন, 'আকল ঐ বস্তুর নাম যে আল্লাহকে লাভ করতে পারে। আর আল্লাহ ঐ মহান সত্তার নাম যা আকল বা জ্ঞানে ধরে না। হযরত থানবী (রহঃ) 'আল্লাহকে লাভ করা' কথাটির মর্ম বর্ণনা করে বলেছেন, এর অর্থ হলো, আল্লাহ পাককে লাভ করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা। এ চেষ্টা থেকে কখনো গাফেল হওয়া যাবে না।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

২১শে রমাযান ১৩৪৮ হিজরী জুমআর পরের মালফূযাত

আল্লাহ পাকের ইশকে পাগল ও সাধারণ পাগলের মধ্যে পার্থক্য

অনেকে সাধারণ পাগলদেরকে আল্লাহর ইশকে পাগল মনে করে তাদের পিছনে ঘুরে বেড়ায়। ফলে তারা দ্বীন ও দুনিয়া উভয় দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রথমতঃ হযরত থানবী (রহঃ)–এর শিক্ষা ছিলো, যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ পাকের ইশকে পাগল তার দ্বারা লাভের আশা কম, ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। তাই এ ধরনের লোকদের সাথে অধিক পরিমাণে উঠাবসা পরিহার করাই উত্তম। কিন্তু বর্তমান যুগে অবস্থাতো এই যে, লোকেরা সাধারণ মাথা খারাপ ও পাগলদেরকে অনুসরণ করতে শুরু করে দিয়েছে এবং তাদেরকেই ইমাম বানিয়ে নিয়েছে।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, বাস্তব কথা হচ্ছে, আল্লাহ পাকের ইশকে দেওয়ানা এবং সাধারণ মাথা খারাপ পাগলের মাঝে পার্থক্য বুঝতে পারা কোন সাধারণ ব্যাপার নয়। এটা শুধু তারাই বুঝাতে পারেন যারা আধ্যাত্মিক লাইনের সাধক পুরুষ এবং আহলে নিসবত ও আল্লাহ পাকের ওলী। এসব মহান ব্যক্তিগণ যাদেরকে মাজযূব বা আল্লাহ পাকের ইশকে দেওয়ানা বলে আখ্যায়িত করেন তারাই শুধু আল্লাহ পাকের আশেক–পাগল। আর তা না হলে বুঝতে হবে এরা মাথা খারাপ পাগল। এক্ষেত্রে যদি তাদের কোন কোন কাশফ শুদ্ধও হয়ে যায়, তবুও তারা মাথা খারাপ পাগল বলেই বিবেচিত হবে। কারণ, অনেক সময় মাথা খারাপের কাশফও সঠিক হতে পারে।

ইলমে কালাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের আকায়েদ

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, ইলমে কালাম তথা দর্শন শাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তিবর্গ মহান আল্লাহ পাকের সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন, তা প্রকৃতপক্ষে বিদ'আত পন্থী ও মুরতাদদের কথার খণ্ডনের জন্য বলেছেন। এদের ইলমী পরিভাষা হিসেবে শুধু 'মানা'' (সম্ভাবনা প্রকাশ করা) এর পর্যায়েরই থাকা উচিত। যার সারকথা

হচ্ছে, যদি এমন অবস্থা হয় তবে এমনটি হওয়া সম্ভব এবং এর সম্ভাবনা রয়েছে, অসম্ভব নয়। কিন্তু তার অর্থ কোনদিনও এমন নয় যে, বাস্তবেই আল্লাহ পাকের কাছে বিষয়টি এমনই। কিন্তু বাস্তবে এখন যা হচ্ছে, তা হলো, পরবর্তী যুগের মুতাকাল্লিমীন তথা দর্শনবিদগণ সম্ভাবনা প্রকাশ করার স্তরে না থেকে তারা দাবীদার হয়ে বসে আছেন। এবং নিজেদের উদ্ভাবনকৃত সম্ভাবনাসমূহকে ইসলামের আকীদা–বিশ্বাসের পর্যায়ে মনে করছেন।

(বিষয়টিকে একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝানো হচ্ছে, এক্ষেত্রে দর্শন শাস্ত্রের একটি প্রসিদ্ধ কথাকে ধরা হোক যেমন জিস্‌ম (বা শরীর) কি দ্বারা গঠিত হয়েছে এ ব্যাপারে দর্শনবিদগণ মানতেকীদের (যুক্তিবাদীদের) বিপরীতে বলেছেন, কোন বস্তুর জিসিম বা শরীর অনেকগুলো পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে। 'হায়ূলা' (উপাদান) এবং 'সূরত' (আকৃতি) দ্বারা জিস্‌ম বা শরীর গঠিত নয়। তারা একথা এজন্য বলেছেন, যেহেতু দর্শনবিদদের কথামত যদি জিস্‌ম বা শরীর উপাদান এবং আকৃতির সমন্বয়ে গঠিত বলে মেনে নেয়া হয়, তাহলে তার ফলাফলে শরীরকে 'কাদীম' বা অবিনশ্বর বলে মেনে নিতে হয়। এখানে মুতাকাল্লেমিনগণ অপর একটি সম্ভাবনার কথা প্রকাশ করেছেন। তাহলো, এমনও তো হতে পারে যে, শরীর اجزاء لايتجز তথা অনেকগুলো পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। এ বিষয়টিকে যদি শুধু সম্ভাবনার পর্যায়ে রাখা হতো তবে তা দুরস্ত ও সঠিক ছিলো। কিন্তু পরবর্তী যুগের দর্শনবিদগণ বিষয়টিকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যেন এটি ইসলামের একটি আকীদা ও বিশ্বাস। আর একথা পরিষ্কার যে, কোন বিষয় ইসলামের আকীদা বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত হতে হলে সেজন্য অকাট্য দলীল–প্রমাণ থাকতে হয়। এক্ষেত্রে তো তা নেই।)

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, এ কারণেই আমি বলে থাকি যে, ইলমে কালামকে শুধু বিদ'আতীদের খণ্ডন এবং পারিভাষিক 'মানা'' তথা সন্দেহ ও সম্ভাবনার পর্যায়ে রাখতে হবে এবং আকায়েদসমূহকে পূর্বসূরী বুযুর্গানে দ্বীনের ন্যায় এ ধরনের বিতর্ক থেকে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নমুক্তও রাখতে হবে।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

ওহী ও ইলহামের পার্থক্য

হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, ওহীর বিরোধিতা করা মহাপাপ, এ কারণে পরকালে শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু ইলহামের বিরোধিতা করলে কোন গোনাহ হবে না এবং এজন্য পরকালেও কোন শাস্তি নির্ধারিত নেই। কিন্তু ইলহামের অধিকারী ব্যক্তি যদি নিজ ইলহামের পরিপন্থী কাজ করে তবে সাধারণতঃ দুনিয়াতেই তার শাস্তি সে পেয়ে যায় এবং সে কোন কষ্ট বা মুসীবতে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

একটি শে'র-এর বিশ্লেষণ

জনৈক সাধকের নিম্নোক্ত শে'রটি প্রসিদ্ধ রয়েছে—

اے تو از حال گذشتہ توبہ جو کے کنی توبہ ازیں توبہ بگو!

উক্ত শে'রের সারকথা হচ্ছে, পিছনের গোনাহকে বারবার স্মরণ করে বার বার তাওবা করতে থাকা থেকে বারণ করা। বরং একবার পরিপূর্ণ ইখলাস, বিনয় ও রোনাজারীর মাধ্যমে তাওবার সমস্ত শর্ত সহকারে তাওবা করে নেয়ার পর মন-মানসিকতাকে তা থেকে মুক্ত করে নিতে হবে। এ কথার বিশ্লেষণে হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন—

'পূর্বের গুনাহকে স্মরণ করে তাওবাকে বারবার নবায়ন করা সাধারণতঃ জনগণের জন্য উপকারী কিন্তু আল্লাহ ওয়ালা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য বার বার নিজের পূর্বের গুনাহ নিয়ে ভাবতে থাকা উপকারী বিষয় নয় বরং কোন কোন সময় এ জাতীয় চিন্তা-ভাবনা এক ধরনের পর্দা ও অন্তরায় সৃষ্টি করে। তাই এ ধরনের বিশেষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উচিত হলো, ভবিষ্যতে আল্লাহ তাআলার সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করার চেষ্টা ফিকির চালিয়ে যাওয়া। এবং এর মাঝেই পরিপূর্ণ মনোনিবেশ করা। তবে সে জন্য শর্ত হলো, এর আগে পরিপূর্ণ ইখলাস ও অনুতাপ সহকারে তাওবার সকল শর্ত আদায় করে তাওবা করে নিতে হবে। এরপর আবার অতীত জীবনের গুনাহের ভাবনায় লিপ্ত হয়ে পড়া কোন কোন সময় বাধা ও অন্তরায় সৃষ্টি করে। যেমন কোন বুযুর্গ ব্যক্তি বলেছেন—

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

ماضی و مستقبلت پردہ خداست

অর্থাত, তোমার অতীত ও ভবিষ্যত আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য লাভের পথে অন্তরায় ও বাধাস্বরূপ।

অপরদিকে যেহেতু তাওবার হাকীকত হচ্ছে পর্দা বা অন্তরায়কে দূরীভূত করা। আর সাধারণ জনগণের জন্য গুনাহের কথা স্মরণ না করা হচ্ছে, পর্দা বা অন্তরায় স্বরূপ। আর বিশেষ লোকদের জন্য গুনাহকে বেশী বেশী স্মরণ করাটা অন্তরায় হয়ে থাকে। যেমন দুই ব্যক্তির মাঝে পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ হওয়ার পর আবার যখন দু'জনের মাঝে আপোষ হয়ে দোস্তী ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে যায় এবং উভয়ের মন পরিষ্কার হয়ে যায়, তখন অতীতের দুশমনী এবং কষ্টের কথা স্মরণ করা ঠিক নয়। এমনটি বন্ধুত্বের পরিপন্থী।

মানুষকে গাল-মন্দ করার কুফল

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, যে ব্যক্তি লোকদেরকে গাল-মন্দ করা এবং অপরের প্রতি সর্বদা অপবাদ ও অভিশম্পাত করায় লিপ্ত থাকবে সে কখনো বাতেনী বরকত লাভ করতে সক্ষম হবে না। কেননা অন্যের দোষ চর্চা বা অন্যকে গালমন্দ করার কাজে এমন ব্যক্তিই লিপ্ত হতে পারে যে, নিজে নিজের পরিণাম সম্পর্কে খবর রাখে না। পক্ষান্তরে যার মধ্যে নিজের ব্যাপারে চিন্তা-ফিকির থাকে তার সর্বদা নিজের মধ্যকার অভাব ও দোষ-ত্রুটিই নযরে আসতে থাকে। অন্যের ব্যাপারে দখলদারী করার সুযোগই সে পায় না। কবি বলেন—

گہ رشک برد فرشتہ بر پاکی ما　　گہ خندہ زند دیو ز ناپاکی ما

ایمان چو سلامت بہ لب گور بریم　　احسنت برین چستی و چالاکی ما

অর্থাত, কখনো আমাদের মাঝে ফেরেশতার গুণ এতই প্রবল হয় যে, স্বয়ং ফেরেশতারা পর্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয়ে যায়। আবার কখনো মন্দ স্বভাব এত প্রাবল্য লাভ করে যা দেখে শয়তানেরও হাসি পায়। সুতরাং যেদিন সঠিক ঈমান নিয়ে কবরে যেতে পারবো শুধু সে দিনই আমরা নিজেদের বুদ্ধিমত্তা ও সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাতে পারবো।

www.banglakitab.weebly.com　www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

লোকালয় ও নির্জনতার অবস্থা

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)–এর মাঝে ক্রন্দন আর হযরত ঈসা (আঃ)–এর মাঝে প্রফুল্লতার প্রাবল্য ছিলো। একবার তাঁদের পরস্পরে কথা হলো। হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) হযরত ঈসা (আঃ)কে বললেন, ঐ ব্যক্তির মাঝে কি আল্লাহ পাকের ভয় নেই যে সর্বদা হাসিখুশির মধ্যেই সময় কাটায়? হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, যে সর্বদা কান্নাকাটির মধ্যে কাটায় সে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ। তখন মহান আল্লাহ তাদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য একজন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা এসে এই ফায়সালা করলেন যে, যখন নির্জনে থাকা হয় তখন তো ঐ অবস্থাটাই ভাল যা হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)–এর মাঝে রয়েছে। অর্থাত আল্লাহ পাকের ভয় ভীতি, অস্থিরতা এবং ক্রন্দন। আর সাধারণ লোকের মজলিসে এবং লোক সমাগমে ঐ অবস্থাটা ভাল যা হযরত ঈসা (আঃ)–এর মাঝে রয়েছে। অর্থাত সহাস্যবদন ও প্রফুল্ল মিযাজে লোকদের সাথে মিলিত হওয়া। যাতে আল্লাহ পাকের বান্দারা তার ব্যাপারে নিরাশ না হয়ে যায়।

হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেব কিরানুবী (রহঃ)–এর স্মৃতিশক্তি

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেব কীরানুবী (রহঃ) যিনি 'ইযহারুল হক রদ্দু ঈসাইয়্যত' নামক গ্রন্থের লিখক। তার স্মরণশক্তি ছিলো খুবই তীক্ষ্ণ। চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ কিতাব 'কানূনে শাইখ'–এর কয়েকটি পৃষ্ঠা পাঠ করলেন। এরপর বাড়ীতে এসে তিনি তার সবটাই মুখস্ত লিখে নিলেন। আরেকবার 'ইফকুল মুবীন' নামক কিতাবের একটি পৃষ্ঠা প্রথমে তিনি একবার শুনে পরে তা একটানে মুখস্থ শুনিয়ে দিলেন।

মাওলানা সাহেবকে আল্লাহ পাক জমি–জমা দান করেছিলেন। জমি–জমা সম্পর্কে বুঝার জন্য তিনি একবার একজন দলীলপত্র বিশেষজ্ঞ পাটওয়ারীকে ডেকে এনে সমস্ত কাগজপত্র পাঠ করিয়ে শুনলেন এবং সাথে সাথেই তার সব মুখস্থ হয়ে গেলো।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

বুযুর্গানে দ্বীনের আদব ও সম্মান

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, ইলমী তাহকীকসমূহের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার চাইতে পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীনের আদব ও সম্মানের ব্যাপারে অধিক চিন্তাশীল ও তা আদায়ের ব্যাপারে অধিক যত্নবান হওয়া উচিত। কারণ এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা মানুষের মাঝে বিশেষ এক ধরনের বিচক্ষণতা ও তাহকীক করার যোগ্যতা সৃষ্টি করে দেন।

দ্বীনের ব্যাপারে অযৌক্তিক ধৃষ্টতা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, দুনিয়ার বড় বড় শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ লোকেরা যে যেই সাবজেক্ট বা বিষয় সম্পর্কে জানে না, সে ব্যাপারে তার একথা বলতে কোন সংকোচ বা দ্বিধা আসে না যে, 'এ ব্যাপারে আমি অবগত নই', যেমন কোন ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যদি ডাক্তারী কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তবে অনায়াসেই সে বলে দেয় যে, আমি ডাক্তার নই। অনুরূপ কোন ডাক্তারের কাছে যদি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় তবে সে বলে দেয় যে, আমি ইঞ্জিনিয়ার নই। কিন্তু আমি জানি না পবিত্র কুরআন এবং দ্বীনকে মানুষ এমন মনে করে কেন, যে ব্যক্তি কখনো দ্বীনের প্রাথমিক বিষয়াদিও পাঠ করে দেখেনি সেও দ্বীনের ব্যাপারে নির্দ্বিধায় তার মত্ ঠুকে দেয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি সে নিজে যা বুঝে তা নিয়েই বাড়াবাড়ি করতে থাকে। অথচ দ্বীনের ব্যাপারে তার কোন জ্ঞানই নেই। (আপাতদৃষ্টিতে এর কারণ তো এই মনে হয় যে, দ্বীনের মাহাত্ম্য মানুষের অন্তরে নেই আর এজন্যই তারা দ্বীনকে একটা সাধারণ বস্তু মনে করে বসে আছে।)

সরকারী একজন পদস্থ ব্যক্তির সূদকে হালাল করার বহুত খায়েশ ও চিন্তা মাথায় ছিলো। সে বলতো, মুসলমানগণ অন্যান্য জাতির তুলনায় পিছনে পড়ে যাওয়ার কারণ হলো, তাদের ধর্মে সূদ হারাম। হযরত থানবী (রহঃ) তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, বনী উমাইয়্যা যারা দুনিয়াতে উন্নতি সাধন করেছে তারা কি সূদকে হালাল করেছিলো? যদি তারা সূদকে হালাল করে না থাকে, তবে বুঝা গেলো যে, দুনিয়ায় উন্নতি সাধন করা সূদের উপর নির্ভরশীল নয়।

সেই সরকারী পদস্থ লোকটি একটি আয়াতেরও ভুল ব্যাখ্যা করতো এবং তা নিয়েই সে বাড়াবাড়ি করতো। তার সে ভুল কথার পক্ষে প্রমাণ

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হিসেবে সে বলতো যে, খাজা হাসান নেযামী এ আয়াতের এরূপ মর্মই বর্ণনা করেছেন। এ লোকটি বিভিন্ন মামলা মোকদ্দমার ফায়সালা করতো। হযরত থানবী (রহঃ) তাকে বললেন, আমি যদি কোন মুকাদ্দমার উকিল হয়ে আপনার সামনে আসি এবং আলোচ্য একটি কানূনের এমন ব্যাখ্যা পেশ করি যা তার শাব্দিক অর্থের সাথে সামঞ্জস্যশীল কিন্তু হাইকোর্ট ঐ কানূনের যে ব্যাখ্যা প্রদান করে আমার ব্যাখ্যা তার বিপরীত। এখন আপনি কি আমার বর্ণিত সে ব্যাখ্যা মতেই মামলার রায় ঘোষণা করে দিবেন এবং একথা লিখে দিবেন যে, আশরাফ আলী এই কানূনের এই ব্যাখ্যা দিয়েছে। যদি আপনি এমনটি করেন তবে দেখবেন সরকারের পক্ষ থেকে আপনাকে (তিরস্কারমূলক) কত রকমের কত উপাধি দেয়া হয়।

একজন সাধারণ লোকের মূল্যবান কথা

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, হাজী আবদুল্লাহ গোজার কীরানুবী একজন বেইলম মূর্খ মানুষ ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত মুত্তাকী ও পরহেযগার এবং তিনি হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ)–এর খাদেম ছিলেন। তিনি বলতেন, দ্বীনের যে পরিমাণ রাহবর ও অনুসরণীয় ব্যক্তি এবং দ্বীনের কর্মী লোক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন এলাকায় তৈরী হয়েছেন এবং তাদের কীর্তি দুনিয়ার মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে সে ব্যাপারে যদি চিন্তা করে দেখা হয় তবে দেখা যাবে যে, তাদের প্রায় সকলেই সাধারণতঃ শাইখ বা সাইয়্যেদ এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (এর কারণও অত্যন্ত পরিস্কার যে, সাইয়্যেদ হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর আওলাদ আর শাইখ হলেন হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)–এর সন্তান।)

বুযুর্গানে দ্বীনের বিনয়

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বভাব ছিলো বিনয় ও নম্রতা। (ইলম ও আমলে এক বুযুর্গ অপর বুযুর্গ অপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেরা নিজেদেরকে সকলের তুলনায় নিম্নস্তরের ভাবতেন।)

হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন যে, আলহামদুলিল্লাহ! আমিও আমার দিল থেকে কাউকেই ছোট মনে করি না। কারণ, আমি প্রত্যেক

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

ফাসেক ব্যক্তির ব্যাপারে বর্তমানে এবং কাফের ব্যক্তির ব্যাপারে ভবিষ্যতে এমন সম্ভাবনার কথা মনে রাখি যে, হতে পারে এ ব্যক্তি আল্লাহ পাকের দরবারে বর্তমান সময়ের সকল মাশায়েখ ও আল্লাহ পাকের ওলীদের থেকেও উত্তম ও ভাল।

আমল সংশোধনের মুরাকাবা

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, প্রসিদ্ধ কিতাব 'শরহুস সুদূর' এর মধ্যে আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। রেওয়ায়েতটি হলো, আলমে বরযখে (ইন্তিকাল ও হাশরের মধ্যবর্তী সময়ে) জীবিত লোকদের আমল তাদের যেসব পূর্ব পুরুষ এবং বিশেষ আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনদের ইন্তিকাল হয়ে গেছে তাদেরকে দেখানো হয় এবং তাদেরকে সে ব্যাপারে অবগত করানো হয়। জীবিত লোকেরা যদি এ বিষয়টি তাদের অন্তরে জাগরুক রাখে এবং বিষয়টি কল্পনা করে যে, আমি যা কিছু করছি তা আমার পিতা, উস্তাদ, পীর কিংবা অন্যান্য মুরব্বী আত্মীয়-স্বজনদের সামনে পেশ করা হবে। তখন তারা আমার এ আমল দেখে কি বলবেন, আমাকে কেমন ভাববেন। এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা মানুষকে অনেক খারাপ কাজ এবং গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

আল্লাহওয়ালাদের সাথে বেয়াদবীর কুফল

হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ) বলেন—

بس تجربہ کردیم دریں دیر مکافات   بادردکشاں ہرکہ درافتاد برافتاد

অর্থাত, দীর্ঘ সময় যাবৎ আমি এ ব্যাপারে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেছি যে, বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে গোস্তাখী ও বেয়াদবীতে যে লিপ্ত হয়েছে সে নিজেকে বরবাদ করে দিয়েছে।

আল্লাহওয়ালাদের সাথে বেয়াদবী এবং গোস্তাখীমূলক কোন আচরণ করা নিজের পরকাল ও পরিণামকে বিনষ্ট করার একটি দাওয়াত মাত্র। এ জাতীয় আচরণ যারা করে, তাদের খাতেমা বা মউত নিকৃষ্ট অবস্থায় হওয়ার খুবই আশঙ্কা থাকে।

এ ধরনের আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিবর্গ থেকে কোন মাসআলা

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

ইজতিহাদের ক্ষেত্রে যদি কোন ভুল-ত্রুটিও প্রকাশ পায় তবে যে ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে সে ভুল বুঝতে পারে তার জন্য সে ব্যাপারে প্রতিবাদ করা তো আবশ্যকীয় এবং তার সে ভুলকে দলীল প্রমাণসহ বর্ণনা করাও যরুরী। কিন্তু তার ব্যক্তিসত্তার প্রতি কোন বেয়াদবীমূলক শব্দ কিংবা কোন গোস্তাখীমূলক অপবাদ আরোপ করা থেকে খুব সাবধানতার সাথে বেঁচে থাকতে হবে।

মাখলূকের খিদমত দ্বারাও আল্লাহর দিদার লাভ হতে পারে

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তাআলা তার কিছু বান্দাকে কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি নিজের সাথে এবং নিজের কাজে লিপ্ত রাখতে পসন্দ করেন। তাদের জন্য এর মধ্যেই ফযীলত ও বরকত নিহিত রয়েছে। আবার কিছু লোককে তিনি তার মাখলুকের বিভিন্ন ব্যবস্থাপনায়ও তাদের ইসলাহের কাজে নিয়োজিত করেন যাতে তারা এর মাধ্যম হয়ে আল্লাহ পাকের জামাল ও সৌন্দর্যসমূহ প্রত্যক্ষ করার কাজে লিপ্ত থাকতে পারে। যেমন চশমার মাধ্যমে দেখা। এমনটি ঐ লোকদের জন্যও নিরাপদ আর এর মাধ্যমেই তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। (এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ পাকের বান্দাদের মাঝে দ্বীনী খিদমত করা যেমন তাদের শিক্ষা, দীক্ষা, তাদের মাঝে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করাতো ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত আছেই, সাথে সাথে তাদের দুনিয়ার জীবনে একটু আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করাও ইবাদতের শামিল, যদি তা ভাল নিয়্যত অর্থাত, আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার নিয়্যতে হয়। এবং এমনটি আল্লাহ পাকের জামাল ও সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করতে পারার জন্য মাধ্যম হয়ে থাকে।)

হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন, মহব্বত এবং ভালবাসা লাভের হকদার তো একমাত্র আল্লাহ পাক। তাই মহব্বত তো শুধু তার সাথেই হতে হবে, আর আল্লাহ পাকের সৃষ্টজীবের প্রতি থাকবে 'শফকত' তথা স্নেহ-মমতা। আল্লাহ পাকের ওলীগণের সাধারণ সৃষ্টজীবের প্রতি স্নেহ-মমতা সবচাইতে অধিক থাকার কারণ হলো, তারা এসব সৃষ্টিকে সরকারী জিনিস মনে করে থাকেন। আর তার সকল সৃষ্টির সাথে এ দৃষ্টিভঙ্গীতে সম্পর্ক রাখেন যে, এ সবই হলো আল্লাহ পাকের জিনিস।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

২৬শে রমযান ১৩৪৮ হিজরীর মালফূযাত

তাওহীদ-এর হাকীকত

হযরত শাহ গাউস আলী পানীপতী (রহঃ)-এর ইন্তিকালের পূর্ব মুহূর্তের মুমূর্ষু অবস্থায় তার যবানে নিম্নোক্ত শে'রটি উচ্চারিত হচ্ছিলো—

چیست توحید آنکہ از غیر خدا　　فرد آئی در خلاء و در ملا

উপরোক্ত শে'রের মর্ম হচ্ছে, তাওহীদ শুধু মুখে আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় বলে স্বীকার করে নেয়ার নাম নয়। বরং বাস্তব জীবনে তার এরূপ প্রভাব পড়তে হবে যে, একাকিত্বে এবং লোক সমাগমে একমাত্র আল্লাহ পাকের সাথেই সম্পর্ক এবং তার সাথেই সম্বন্ধ ও ভালবাসা, তার দরবারেই আশা ও আকাংখা আর একমাত্র তার প্রতিই ভয় থাকবে (অন্য কারো প্রতি নয়)।

প্রচলিত সবীনা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আমি একবার শবীনার মাহফিলে শরীক হয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে আমি পবিত্র কুরআনের সাথে এমন অপমানজনক আচরণ করতে দেখতে পেলাম যার কারণে ভবিষ্যতের জন্য তাওবা করে নিলাম। এজন্য এখন আমি শবীনা করতে লোকদেরকে নিষেধ করে থাকি। শুধু পানিপথের লোকদেরকে নিষেধ করি না। কারণ তথাকার লোকদের মাঝে পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে একটা বিশেষ আগ্রহ ও আকর্ষণ আছে। বিধায় তারা শবীনার মধ্যেও কুরআন শরীফকে যথেষ্ট সম্মানের সাথে তিলাওয়াত করে এবং অন্যরা সম্মানের সাথে শুনতে থাকে।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত রমযানের শ্রেষ্ঠ ইবাদত

খানকায়ে উপস্থিত লোকজন যারা শুধু ইবাদতের উদ্দেশ্যেই এখানে এসে একত্রিত হয়েছে, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, পবিত্র রমযান মাসকে তো শুধু কুরআন

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

শরীফ তিলাওয়াত করার জন্যই নির্ধারিত রাখা উচিত। আমি যদি নতুনভাবে কাউকে যিকির শোগলে লিপ্ত রাখার সূচনা করার ইচ্ছা করি তবে রমযান মাসে তা করি না। বরং রমযানের পর তাকে সে কাজে লিপ্ত করে দেই। পবিত্র রমযানে তো শুধু ঐ সকল ইবাদতেই লিপ্ত থাকা উচিত, যা হাদীস শরীফে বর্ণিত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। যেসব ইবাদতকে বয়ান বা ভূমিকা দিয়ে ইবাদত প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় না। সুফিয়ায়ে কিরামের (রহঃ) দেয়া বর্তমান প্রচলিত বিভিন্ন আমলসমূহ ইবাদতের ভূমিকাস্বরূপ। প্রকৃত ইবাদত ঐ সমস্ত আমল যা কুরআন ও হাদীসে সরাসরি বর্ণিত বা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে।

সময়ের মধ্যে বরকত

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) গোমতীর ময়দানে আসর ও মাগরিবের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে পূর্ণ কুরআন শরীফ খতম করেছেন। এটা ছিলো সময়ের বরকত যা কারামত হিসেবেই তাঁর থেকে প্রকাশ পেয়েছিলো। এমনটি আল্লাহ পাকের ওলীগণেরই নসীব হয়ে থাকে।

'ইবরীয' নামক গ্রন্থে শাইখ আবদুল আযীয দাব্বাগ (রহঃ)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ঘটনাটি হলো, শাইখ আবদুল আযীয (রহঃ)কে হযরত খিযির (আঃ) কোন একটি বিশেষ ওযীফা পাঠের জন্য বলে দিয়েছিলেন। যা সকাল থেকে শুরু করে ইশার নামায পর্যন্ত সময়ে পূর্ণ করা যেতো। এরপর যখন সময়ে বরকত হতে শুরু করলো তখন মাগরিব পর্যন্ত সময়ে সে অযীফা শেষ হয়ে যেতো। এরপর আসর পর্যন্ত, এরপর যোহর পর্যন্ত। এমনকি শেষ পর্যন্ত সময়ে এত বরকত হতে লাগলো যে, সে দীর্ঘ ওযীফা সকাল থেকে শুরু করে চাশতের নামাযের সময় (সকাল ৮/৯টা)-এর মধ্যেই পূর্ণ হয়ে যেতে থাকলো।

হযরত মির্যা মাযহার জানে জাঁনা শহীদ (রহঃ)

হযরত মির্যা মাযহার জানে জাঁনা শহীদ (রহঃ) একজন শিয়া ঘাতকের হাতে শাহাদত বরণ করেছিলেন। শাহাদতের রাতে তিনি খাবে দেখেন হযরত ফাতিমা (রাযিঃ) তার কাছে লাল জামা পরিধান করে তাশরীফ এনেছেন। খাব দেখেই তিনি তার তাবীর বুঝতে পারলেন যে,

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

তিনি শহীদ হবেন। সেমতে পরদিন সকাল থেকেই তিনি শাহাদতের জন্য খুব হাসিখুশী অবস্থায় অপেক্ষা করছিলেন। তখন তার মুখে ছিলো নিম্নোক্ত পংক্তিমালা—

سرجدا کرد از تنم یارے کہ باما یار بود

قصہ کوتہ کرد ورنہ دردسر بسیار بود

بلوح تربت من یافتند از غیب تحریرے

کہ این مقتول را جز بیگناہی نیست تقصیرے

অর্থাত, আমার ধড় থেকে মাথা এমন বন্ধুই বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন, যার সাথে পূর্ব থেকেই বন্ধুত্ব ছিলো। ব্যাপারটি তিনি খুব সংক্ষেপেই সারলেন (মাথাটা কেটে দিলেন) অন্যথায় মাথা নিয়ে তো ব্যথা ছিলো অনেক। আমার গোপন খাতায় তারা আমার যে অপরাধ গোপনে লেখা দেখতে পেয়েছে তাহলো এই, নিহত ব্যক্তির কোন অপরাধ না থাকাই তার একমাত্র অপরাধ।

মাদরাসার ব্যাপারে কথা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেছেন যে, আমার ছাত্র জীবনে একজন ইংরেজ কালেক্টর একবার দেওবন্দ মাদরাসায় আসার তারিখ হলো। আমি হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)–এর খিদমতে জানতে চাইলাম, ঐ লোকটি এসে যদি মাদরাসায় কিছু চাঁদা দেয় তবে আপনি তা গ্রহণ করবেন কিনা? তিনি জবাব দিলেন হাঁ গ্রহণ করবো। আমি পুনরায় জানতে চাইলাম, অতঃপর আপনি সে টাকা কোথায় খরচ করবেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমাদের কাছে খরচের এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেসব ক্ষেত্রে প্রায় সবরকম টাকাই খরচ করা যায়। আমরা তার ঐ চাঁদা মল সাফকারী মেথরদের বেতন হিসেবে দিয়ে দিবো।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আমি পুনরায় জানতে চাইলাম, সে লোক যদি কোন পরামর্শ দেয় তবে আপনি তা গ্রহণ করবেন কিনা? তিনি উত্তর দিলেন, না তা গ্রহণ করবো না, আমরা তাকে বলে দিবো যে, আমাদের সকল কাজই একটি মজলিসে শুরা তথা পরামর্শ

পরিষদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। আমরা আপনার এ পরামর্শও উক্ত পরিষদে উত্থাপন করবো (যদি সেখানে সিদ্ধান্ত হয় তবে তা বাস্তবায়িত করা হবে।)

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম (রহঃ) দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি চাঁদা গ্রহণের জন্য সরকারী বা ধনী লোকদের তোশামোদ করা কখনোই পসন্দ করতেন না। অনুরূপ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) সর্বদা মাদরাসার মঙ্গলজনক দিক বিবেচনায় রাখা সত্ত্বেও কারো কাছে চাঁদা তুলবার জন্য যেতেন না।

প্রশংসাকারীর জবাব

অমৃতসর এলাকার এক ব্যক্তি একবার হযরত থানবী (রহঃ)-এর প্রশংসা করে আরবী ভাষায় একটি কাসীদা (কবিতা) লিখে পাঠালো। হযরত থানবী (রহঃ) তার জবাবে একটি ফার্সী শে'র লিখে সেটি ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। ফার্সী শে'রটি ছিলো নিম্নরূপ—

گفتم اے یوسف زبانم دوختی   وز پشیمانی تو جانم سوختی!

অর্থাত, আমি বললাম, ওহে ইউসুফ তুমি তো আমার মুখটাকেই সেলাই করে আটকে দিলে। এবং এত লজ্জা আমাকে দিলে যে, আমার আত্মাটাকেই জ্বালিয়ে শেষ করে দিলে।

অতঃপর হযরত (রহঃ) একটি আরবী শে'র পাঠ করলেন। শে'রটি হলো—

هنيئا لأرباب الكمال كمالهم

وللعاشق المسكين مايتجرع

অর্থাত, বিভিন্ন গুণে পরিপূর্ণ ও কামাল ব্যক্তিদের পূর্ণতা মুবারক হোক এবং আশেক মিসকীনের জন্য ঐ অস্থিরতা ও চিন্তাই মোবারক হোক যা সে ঢোক ঢোক করে পান করছে।

অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বললেন, যতক্ষণ মনের মাঝে এ খটকা ও সংশয় বিরাজমান থাকে যে, 'কি অবস্থায় আমার মউত হবে?' ততক্ষণ অন্তর কোন কামাল বা বুযুর্গীতে সন্তুষ্ট হয় না। কোন কিছুর জন্যই অন্তর সামনে অগ্রসর হতে চায় না।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

একটি হাদীসের ব্যাখ্যা

হাদীস শরীফে এসেছে, একবার সূরায়ে ইখলাস (কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ) পাঠ করলে এক তৃতীয়াংশ কুরআন শরীফ পাঠ করার সওয়াব পাওয়া যায়, এর দ্বারা অনেকে মনে করে থাকে যে, তিনবার সূরায়ে ইখলাস পাঠ করলে পূর্ণ কুরআন শরীফ পাঠের সওয়াব পাওয়া যায়।

এ প্রসঙ্গে হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, হযরত শাহ ইসহাক সাহেব মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) বলতেন, উক্ত হাদীস দ্বারা এমনটি আবশ্যকীয় নয় যে, তিনবার সূরায়ে ইখলাস (কুল হুওয়াল্লাহ সূরা) পড়ে নিলে পূর্ণ কুরআন শরীফ খতম করার সওয়াব লাভ হয়ে যাবে বরং তিনবার সূরায়ে ইখলাস পাঠকালে পবিত্র কুরআনের এক–তৃতীয়াংশ তিনবার পাঠের সওয়াব হবে। যেমন কেউ পবিত্র কুরআনের (এক থেকে) দশ পারা তিনবার পাঠ করে নিলো।

হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ)–এর একটি হিকমতের কথা

হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ) বলেন যে, দুনিয়ায় যদি কেউ চিন্তা ও অস্থিরতা থেকে বেঁচে থাকতে চায় তবে তার জন্য একমাত্র পন্থা হলো সে কারো কাছ থেকে কোন লাভ বা উপকার লাভের আশা করবে না।

উপরোক্ত কথার হাকীকত হলো, সকল অস্থিরতা ও পেরেশানীর মূলে রয়েছে মনের বিভিন্ন রকম আশা আকাংখা যা মানুষ খেয়াল করে, যখন সেটা পূর্ণ হয় না তখন মনে খুব দুঃখ আসে। তবে একথা পরিস্কার যে, এই ধরনের আশা ও আকাংখা, যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে একমাত্র আল্লাহ পাকের সাথে সম্পৃক্ত ও জড়িত হওয়া। এমনটি শুধু আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ ব্যক্তিদের দ্বারাই অর্জিত হতে পারে। কবির ভাষায়—

امید و ہراسش نباشد زکس ہمیں است بنیاد توحید و بس

অর্থাত, তার কোন ব্যক্তির কাছে কোন আশা বা আকাংখা থাকে না, যত আশা আর কামনা তার মাঝে রয়েছে সে সবকিছুর মূলেই একমাত্র আল্লাহ তাআলা। এছাড়া আর অন্য কিছুই তার মনের মাঝে নেই। এটাই তাওহীদ তথা একত্ববাদের বুনিয়াদ।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

তাবীয-কবয সম্পর্কে কথা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, 'হিসনে হাসীন' নামক গ্রন্থে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে—

من لم يقرء اكتبها في صك

অর্থাত, যে পড়তে পারে না সে যেন কোন কাগজে লিখে নেয়।

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, যেসব প্রয়োজনের জন্য তাবীয-কবয লিখা হয় তার মধ্যে মূল বিষয় হলো, দু'আ এবং আয়াতসমূহ পাঠ করা। আর তাই বেশী উপকারী। লিখে গলার মধ্যে ঝুলিয়ে দেয়া শুধু তাদের জন্য যারা পড়তে পারে না। যেমন কোন বাচ্চা সন্তান কিংবা এমন গণ্ডমূর্খ যার মুখ থেকে কুরআন শরীফ এবং দু'আর শব্দ উচ্চারণ করানো কঠিন। বর্তমান সময়ে লোকদের মাঝে আল্লাহ পাকের নাম মুখে নেয়া এবং পাঠ করার কোন আগ্রহ নেই। এ কারণে তাদেরকে যদি কোন ওযীফা বা দু'আর কথা বলে দেয়া হয়, তবে তারা তা গ্রহণ করতে চায় না। এমনকিছু তারা চায় যাতে তাদের নিজের কিছুই করতে না হয়। এক্ষেত্রে যদি কোন একটা ফুঁক মেরে দেয়া হয় কিংবা কোন লিখিত কিছু একটা দিয়ে দেয়া হয়, এর দ্বারাই যেন তাদের সব কাজ সমাধা হয়ে যায়।

অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, একবার এক পাহলোয়ান কুস্তিতে বিজয়ী হওয়ার জন্য আমার কাছে তা'বীয চাইলো। আমি তাকে বললাম, তোমার প্রতিপক্ষ যদি কোন মুসলমান না হয়, তবে তোমাকে তা'বীয দিব অন্যথায় দিবো না।

(বুঝা গেলো, কাউকে কোন তা'বীয দিতে হলে এটাও দেখতে হবে যে, তা'বীয গ্রহিতা সে তা'বীয দ্বারা কারো প্রতি কোন যুলম বা অবিচার করবে কিনা। কিংবা কোন নাজায়েয কাজে এটাকে ব্যবহার করবে কিনা। নাজায়েয কাজে কোন সাহায্য করা যেমন জায়েয নয়, তেমনি সেক্ষেত্রে তা'বীয দেওয়াও জায়েয নয়।)

বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে তুলনা

বর্তমানে স্কুলসমূহে এবং অনেক মাদরাসাতেও বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পড়াশোনা করা হয় এবং এ বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে হাকীমুল উম্মত হযরত

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, যে তালিবে ইলম নিজের ধর্ম ও মতাদর্শ সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবগতি রাখে না এবং যার মাঝে এখনো নিজ ধর্মের ব্যাপারে দৃঢ়তা ও স্থিরতা তৈরী হয়নি তার জন্য ভিন্ন ধর্ম বা ভিন্ন মতাদর্শের কিতাব বা বইপত্র পাঠ করা খুবই ভয়াবহ ও বিপদজনক।

'আফযাল' এবং 'আকমাল'-এর পার্থক্য

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, সাহাবায়ে কিরামের (রাযিঃ) প্রত্যেকেই সারা দুনিয়ার মুসলমানদের থেকে উত্তম। পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফের সুস্পষ্ট বক্তব্য তার পক্ষে প্রমাণ। কিন্তু তারা 'আফযাল' বা উত্তম হওয়া একথাকে প্রমাণ করে না যে, প্রত্যেক সাহাবীই (রাযিঃ) প্রত্যেক ইলমী কামালের দিক থেকেও সব লোকদের তুলনায় 'আকমাল' বা সর্বাধিক পরিপূর্ণ। আইম্মায়ে মুজতাহিদীন হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), হযরত ইমাম শাফী (রহঃ), হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) ও আহমদ ইবনে হাম্মল (রহঃ) সহ অন্যান্য মুজতাহিদগণ তারা মুজতাহিদ ছিলেন, ইলমে ফিকাহ্-এর ক্ষেত্রে তারা কামেল বা পরিপূর্ণ ছিলেন। আবার 'সাহাবায়ে কিরামের (রাযিঃ) মাঝেও কিছু কিছু সাহাবী এমন ছিলেন যারা মুজতাহিদ ছিলেন না। কিন্তু এর দ্বারাও মুজতাহিদ ইমামগণের 'আফযাল' হওয়া প্রমাণিত বা আবশ্যকীয় হয় না। সারকথা হচ্ছে, 'আফযাল' হওয়া এক জিনিস, আর 'আকমাল' হওয়া ভিন্ন জিনিস। 'আফযাল' হওয়ার ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ পাকের দরবারে মকবুলিয়্যত লাভের উপর আর কামাল বা 'আকমাল' হলো আপন চেষ্টার্জিত এবং এটি একটি ইচ্ছাধীন বিষয়।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, দুনিয়ার লোকেরা যদি আলিম এবং তালিবে ইলমদেরকে মুতাকাব্বির বা অহংকারী বলে তবে সেটা তাদেরকে হীন ও অপমানিত বলার চাইতে ভাল। অর্থাত, আলেমগণের জন্য তাকাব্বুরীর দুর্নামটা তোশামোদ, খোশামোদের দুর্নাম থেকে উত্তম। হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আমি আল্লাহ পাকের শপথ করে বলছি যে, ছিঁড়া কাপড় কিংবা ভাঙ্গা জুতা কোন অপমানের বিষয় নয়—অপমান হচ্ছে, কারো সামনে হাত সম্প্রসারিত করে দেয়া। এবং অন্যের কাছে নিজের প্রয়োজন পেশ করা।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

২১শে জুমাদাল উলা ১৩৫৭ হিজরী বৃহস্পতিবার সকালের বৈঠকের মালফুযাত

বুযুর্গানে দ্বীনের বাতানো পদ্ধতি ও শিক্ষার অধিকাংশ ব্যবস্থাপনামূলক এজন্য কুরআন-হাদীসের প্রমাণ আবশ্যকীয় নয়

হযরত সুফিয়ায়ে কিরাম মানবাত্মার সংশোধন তথা ইসলাহে নফসের জন্য কিছু রূহানী চিকিৎসা এবং কিছু সাধনা ও মুজাহাদার বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। যা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ এবং সাহাবা (রাযিঃ) ও তাবেঈ (রহঃ)গণের আমল দ্বারা প্রমাণিত নয়। এজন্য কিছু লোকের মাঝে এমন সন্দেহের সৃষ্টি হয়ে থাকে যে, এগুলো হয়তো বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে অনেকে এসব পদ্ধতিকেই ভুল বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। এবং সুফিয়ায়ে কিরাম (রহঃ)-এর প্রতি কুধারণা পোষণ করে থাকেন। অবশ্য অনেক মূর্খ তাসাওউফসেবীরা এমন কিছু বিদ'আতে যে লিপ্ত হয়নি তা নয়। তারা আকাবিরে দ্বীনের নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে শিরক ও বিদ'আতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। তাসাওউফের হকপন্থী ইমামগণ এবং পূর্বসূরী বুযুর্গানে দ্বীন ওসব থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) এ বিষয়টির সারাংশ অল্প কথায় এভাবে পরিস্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, যা নিম্নরূপ—

'হযরত সুফিয়ায়ে কিরাম (রহঃ) সালেক বা আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত মুরীদদের জন্য যেসব ব্যবস্থা ও নিয়ম পদ্ধতি বাতলে দেন তা মূলতঃ কোন আহকাম বা শরীয়তের মৌলিক বিধান নয়। যার ফলে কুরআন শরীফ ও হাদীসে পাকে তার সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ তালাশ করারও প্রয়োজন নেই। বরং এটা হচ্ছে ইসলাহে নফসের জন্য একটা চিকিৎসা ও ব্যবস্থা মাত্র। এ কারণে এটা প্রত্যেক ব্যক্তির মন-মানসিকতা হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন 'কিবর' বা অহংকার হারাম এবং তা দূর করা ফরয। এটা তো আহকামের অন্তর্ভুক্ত যা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। কিন্তু এই কিবর বা অহংকার দূর করার জন্য তরীকতের মাশায়েখগণ প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা ও মানসিকতা বিবেচনা করে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও উপযুক্ত ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। যেমন

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

কাউকে বলেন, তুমি নামাযী ব্যক্তিদের জুতা সোজা করবে আবার কাউকে বলেন যে, নিজের অযোগ্যতার কথা মানুষের সামনে ঘোষণা করে দিবে।

এগুলো শুধু ইনতিজামী ব্যবস্থা এবং চিকিৎসা মাত্র। তাই এর জন্য পবিত্র কুরআন ও হাদীসে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ বা দলীল থাকতে হবে এমনটি আবশ্যকীয় নয়। এরপরও যদি কোন প্রমাণ বা দলীল বর্ণনা করে দেয়া হয়, তবে তা নফলের পর্যায়ে একটি অতিরিক্ত পাওনা মাত্র।

সারকথা হচ্ছে, শরীয়তের আহকামের জন্য শরীয়তের মৌলিক বিষয় কুরআন, হাদীস এবং পূর্বসূরীগণের আমল প্রমাণ হিসেবে থাকা আবশ্যকীয়। যে বিষয় পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ এবং সাহাবা (রাযিঃ) ও তাবেঈ (রহঃ)গণের আমল দ্বারা প্রমাণিত নয়, সে বিষয়কে শরীয়তের আহকাম হিসেবে গণ্য করা হবে বিদ'আত। তবে শরীয়তের আহকামের উপর আমল করার ক্ষেত্রে যেসব মানসিক অন্তরায় সামনে আসে সেসব অন্তরায় দূরীভূত করার জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেগুলো শুধু চিকিৎসা বা ব্যবস্থা মাত্র। ঐ সকল চিকিৎসা বা ব্যবস্থাদি কুরআন সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হওয়া আবশ্যকীয় নয়। যেমন মানুষের শারীরিক চিকিৎসার বিষয়টিও অনুরূপ। কোন অসুস্থ ব্যক্তির জন্য কোন হাকীম বা কোন ডাক্তার যে কোন ঔষধ কিংবা কোন বিশেষ খানা গ্রহণ বা কোন খানা বর্জনের আদেশ দেয় তখন যদি কেউ এ প্রশ্ন করে যে, আমার যে এই ঔষধই খেতে হবে বা এ পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হবে তা কোন আয়াত বা কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত? তবে এ প্রশ্ন যে নিতান্তই অজ্ঞতা এবং মূর্খতার পরিচায়ক তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ডাক্তার যে ঔষধটা খেতে দিলো সে ঔষধটা হালাল হওয়া তো কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু খাওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য যেসব নিয়ম-কানুন ডাক্তার বা হাকীমগণ বলে দেন (যেমন খানার আগে বা পরে, ২ চামচ বা ৪ চামচ ইত্যাদি) সেগুলো পালন করার জন্য তা কোন আয়াত বা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই এসব বিধান বা নিয়ম-নীতি বাতলে দেয়া হয়।

তবে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, কোন ব্যক্তি যদি হাকীম এবং ডাক্তারের বাতলে দেয়া এসব ব্যবস্থা ও নিয়ম পদ্ধতি এবং শর্তাবলীকে ইবাদত মনে করে পালন করে তবে এগুলোই বিদ'আতে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

পরিণত হবে। নফস বা আত্মার চিকিৎসা এবং শুদ্ধি যে প্রয়োজন, তা তো কুরআন হাদীস এবং সাহাবা (রাযিঃ) ও তাবেঈ (রহঃ)গণের আমল দ্বারা প্রমাণিত এবং এমনটি করা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত ও সওয়াবের কাজ। কিন্তু নফসের সে চিকিৎসার কোন বিশেষ পদ্ধতিকেই ইবাদত এবং সওয়াবের ভিত্তি স্থির করা হলে এবং কেউ তা না করলে তাকে খারাপ মনে করতে থাকা হলে তা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। বিষয়টি ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, একবার একজন গায়রে মুকাল্লিদ (মাযহাব অস্বীকারকারী) ব্যক্তি যে ছিলো অত্যন্ত নেক মানুষ, সে আমাকে এই মর্মে পত্র লিখলো যে, আপনার দরবারে আমারও তো কিছু অংশ আছে (অর্থাত আমিও তো আপনার দরবার থেকে উপকৃত হওয়ার অধিকার রাখি)। হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আমি তার পত্রের জবাবে লিখে দিলাম, আমার এখানে তো প্রত্যেক মুসলমানেরই অংশ আছে কিন্তু আপনি আমাকে এতটুকু কথা অন্ততঃ বলে দিন যে, আপনি তো ইমাম আযম হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)–এর অনুকরণ করেন না। সে ক্ষেত্রে আমার অনুকরণ আপনি করবেন কিনা? এরপর দীর্ঘদিন তার আর কোন চিঠিপত্র এলো না।

একটা দীর্ঘ সময় পর আবার তার চিঠি এলো, দয়া করে আমার উপর থেকে এ প্রশ্নটি তুলে নিন এবং আমাকে কিছু কথা বলে দিন। সে উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অস্থির হয়ে যাওয়ার কারণ হয়তো এটাই যে, সে যদি আমার অনুকরণ করার কথা স্বীকার করে নেয়, তখন পাল্টা প্রশ্ন দেখা দিবে যে, ইমাম আযম (রহঃ)–এর অনুকরণ করাকে আপনি নাজায়েয বলে থাকেন, সেক্ষেত্রে আমার অনুকরণ করা কিভাবে জায়েয হয়ে গেলো। আর যদি সে আমার অনুকরণ করাকেই অস্বীকার করে তখন প্রশ্ন হবে যদি আপনি আমার কথাই না মানেন তবে কাজ হবে কিভাবে। কিন্তু সে যদি বাস্তবেই আমাকে জিজ্ঞাসা করতো, তবে আমি তাকে সঠিক জবাব বলে দিয়ে নিজেই হেরে যেতাম।

সঠিক জবাব ছিলো এই যে, ইমাম সাহেবের (রহঃ) অনুকরণ তো আহকামের ব্যাপারে করানো হয়ে থাকে। সেসব আহকামের কোন কোনটাকে আমরা বিভিন্ন রেওয়ায়েত এবং দলীল–প্রমাণের পরিপন্থী মনে করে থাকি। এজন্যই তার শর্তহীন অনুকরণ করাকে নাজায়েয বলে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

থাকি। আর আপনার অনুকরণ তো হবে শুধু ইন্তিজামী ব্যাপারে। যেমন চিকিৎসকের ক্ষেত্রে কোন হাকীম বা ডাক্তারের অনুসরণ ও অনুকরণ করা হয়। আর এটাকে তো আমরা জায়েয মনে করি।

শাইখের প্রতি মহব্বত থাকা অত্যন্ত যরুরী

শাইখের প্রতি মহববত থাকার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, বর্তমানে লোকদের মাঝে কিছুটা 'ইতিকাদ' বা সুষ্ঠু বিশ্বাস থাকলেও তাদের মাঝে 'ইনকিয়াদ' তথা ইত্তিবা ও অনুকরণ অনুসরণ নেই। আর আসলে কাজের ক্ষেত্রে অনুকরণ অনুসরণই অধিক প্রয়োজন। আর এই অনুসরণের মানসিকতা মহব্বত ও ভালবাসা দ্বারা সৃষ্টি হয়। এ কারণেই এই তরীকতের লাইনে শাইখের প্রতি মহব্বত থাকা অত্যন্ত যরুরী বিষয় এবং কাজের ক্ষেত্রে এটি মূল ভিত্তি। আর এ কারণেই আমি কাউকে তাড়াহুড়া করে বাই'আত করে নেই না। বরং আমার এবং তার মাঝে কতটুকু মুনাসাবাত বা সামঞ্জস্য সৃষ্টি হলো সে বিষয়টি লক্ষ্য করতে চেষ্টা করি (পরস্পরের মাঝে সামঞ্জস্য সৃষ্টি হলেই তবে তাকে বাই'আত করে নেই)। কারণ পারস্পরিক মুনাসাবাত সৃষ্টি না হলে মহব্বতও সৃষ্টি হয় না। আর মুনাসাবাত সৃষ্টির নিদর্শন হচ্ছে, যদি ঐ মহববতের লোকটিকে নিজের চোখে কোন গুনাহের কাজেও লিপ্ত দেখতে পায় তবে তার ব্যাপারে বুযুর্গ হওয়ার ধারণা তো নষ্ট হয়ে যায় ঠিক এবং এটা নষ্ট হওয়াই উচিত কিন্তু তা সত্ত্বেও তার মহব্বত নষ্ট হয় না। কেননা এমতাবস্থায় তার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা এবং তার অনুকরণ করা তো জায়েয নয় এবং তার ব্যাপারে সুধারণা ও বিশ্বাস পরিত্যাগ করা ওয়াজিব। কিন্তু মহববত মানুষের ইচ্ছাধীন কোন বিষয় নয়। এ মহব্বত যার প্রতি সৃষ্টি হয় তা এমনি অবস্থাতেও বিদূরিত হয় না। যেমন আল্লাহ না করুন কারো পিতা যদি মুরতাদ হয়ে যায়, কিংবা বড় কোন পাপ কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে তার প্রতি সুধারণা তো সাথে সাথেই নষ্ট হয়ে যায়। যেমন প্রথমে তাকে মুমিন মনে করা হতো, এখন তাকে কাফের মনে করে। কিংবা পূর্বে তাকে নেককার ও ভাল মানুষ মনে করা হতো, এখন তাকে গুনাহগার মনে করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুত্রের মন থেকে পিতাসুলভ মহব্বত এবং ভালবাসা তখনো দূরীভূত হয় না। বরং পিতার এহেন অধঃপতন দেখে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সে মহব্বত আরো বৃদ্ধি পায়। ফলে সে লোকদের কাছে কিভাবে তাকে পুনরায় ইসলামে ফিরিয়ে আনা যায় সে পদ্ধতি জিজ্ঞাসা করতে থাকে।

ওয়ায ও তাবলীগের গুরুত্বপূর্ণ আদব

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, ওয়ায ও তাবলীগের ক্ষেত্রে আমার সার্বক্ষণিক নিয়ম ও অভ্যাস হচ্ছে যে, কথা যতই খারাপ এবং কড়া হোক না কেন এবং মানুষের চাহিদা ও ইচ্ছার পরিপন্থী হোক না কেন, কিন্তু তার শিরোনাম এবং বর্ণনাভঙ্গী খুব নম্র এবং যথাসাধ্য এ পর্যায়ে রাখি যাতে মানুষের মন তা গ্রহণ করে নেয়। যাতে কথা শুনেই লোকদের মাঝে আতঙ্ক এবং অনিহা সৃষ্টি না হয়ে যায় এবং মানুষের মনে কষ্ট আসতে পারে এ জাতীয় শব্দ সর্বদাই পরিহার করে কথা বলি। বিরুদ্ধবাদীদের কথার জবাব দেয়ার ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতিই অবলম্বন করে থাকি আর দেখা গেছে যে, এর দ্বারাই বেশী ফায়দা হয়।

একবার এক কসাইর দাওয়াতে আমি জৌনপুর গেলাম এবং তার বাড়ীতেই মেহমান হলাম। সেখানে আমার কাছে কবিতা আকারে লেখা একটি চিঠি পৌছলো। যেখানে আমার সম্পর্কে চারটি কথা লিখা ছিলো।

প্রথম কথাটি হলো—আপনি মূর্খ।

দ্বিতীয় কথাটি হলো—আপনি জোলা (তাঁতী)।

তৃতীয় কথাটি হলো—আপনি কাফের।

চতুর্থ কথাটি হচ্ছে—ওয়ায করতে বসলে পাগড়ি গুটিয়ে বসবেন (এর অর্থ হলো ওয়াযের মধ্যে হিসাব নিকাশ করে কথা বলবেন।)।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আমি এই চিঠির কথা কারো কাছে প্রকাশ করলাম না। পরের দিন যখন আমার বয়ান করা সময় হলো, তখন আমি মিম্বারে বসে উপস্থিত লোকদের লক্ষ্য করে বললাম, উপস্থিত সম্মানিত ভাইয়েরা আমার! আজকে বয়ান করার পূর্বে আপনাদের সাথে একটি বিষয়ে পরামর্শ করতে হবে। আর তা হলো, আমার কাছে একটা চিঠি এসেছে, তার মধ্যে আমার সম্পর্কে চারটি কথা লিখা হয়েছে। যার মধ্যে প্রথম কথাটি সম্পর্কে আমার কিছুই বলার নেই। কারণ পত্রের লিখক সেখানে আমাকে মূর্খ বলেছে। আর আমি নিজেই তো নিজেকে শুধু মূর্খ নয় গণ্ডমূর্খ বলে স্বীকার করি। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় কথাটির ব্যাপারেও আমার কোন বক্তব্য নেই। কারণ

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সেখানে আমাকে জোলা (তাঁতী) বলা হয়েছে। আর জোলা বা তাঁতী হওয়া তো কোন দোষের বিষয় নয়। আর যদি এর মধ্যে কোন দোষের কিছু থেকেও থাকে তবে সে জন্যও আমি দায়ী নই। কারণ জোলা হওয়াটা আমার ইচ্ছাধীন কোন বিষয় নয়। যেমন কোন ব্যক্তি অন্ধ হলো বা কানা হলো। সুতরাং এখানেও সারকথা এই হলো যে, এটা কোন আলোচনার বিষয় নয়। এছাড়া আমি এখানে কোন বিয়ে–শাদী করার জন্যও আসিনি, যেজন্য আমার বংশ যাচাই বাছাই করে দেখতে হবে। এর পরেও যদি কারো কোন কারণ ছাড়াই আমার বংশ সম্পর্কে যাচাই বাছাই করে দেখার ইচ্ছা হয়, তবে সে ব্যাপারে আমি আমার নিজের মুখে আর কি বলবো। যার যাচাই করার ইচ্ছা হয় সে আমার বাড়ীর ঠিকানা এবং আমার এলাকার বিশিষ্ট লোকদের নাম জেনে নিয়ে, তাদের কাছ থেকে বিষয়টি যাচাই বাছাই করে নিতে পারে যে, আমি বাস্তবেই জোলা নাকি অন্য কোন বংশের লোক।

তৃতীয় কথাটির ব্যাপারেও আমার আপনাদের সাথে পরামর্শ করার কিছু নেই। কারণ সেখানে আমাকে কাফের বলা হয়েছে এক্ষেত্রে আমার পিছনের অবস্থায় আমি কাফের ছিলাম না মুসলমান ছিলাম সে বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই আমি এখন সকলের সামনে কালেমা পড়ে নিচ্ছি—

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

এখন তো আমি মুসলমান হয়ে গেছি, যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান পরিপন্থী কোন কথা বা কাজ আমার থেকে প্রকাশ না পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তো আমাকে মুসলমানই বলা হবে।

তবে পত্র লেখকের চতুর্থ কথাটি সম্পর্কে আপনাদের সাথে আমার পরামর্শ করার প্রয়োজন রয়েছে সে কথাটি হলো, ওয়াযের ক্ষেত্রে আমার সর্বদা নিয়ম হলো, ইচ্ছাকৃতভাবে আমি কখনো ইখতিলাফী (মতবিরোধপূর্ণ) মাসআলাহ বর্ণনা করি না। বরং যথাসম্ভব তা থেকে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করি। কিন্তু যদি আলোচনার মাঝে কখনো এসে যায় তবে স্বাভাবিকভাবে তা বলে ফেলি। কিন্তু বলার ক্ষেত্রে এমন নম্র ধারায় এবং মার্জিত শব্দে বর্ণনা করি যাতে মানুষের মনে কষ্ট না লাগে। এখনো আমি যদি বয়ান করি তবে সে ধারাতেই স্বাধীন মনোভাব নিয়ে বয়ান

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

করবো। এরপর তার ফলাফল যাই হোক না কেন। এজন্য আপনাদের সাথে আমার পরামর্শের বিষয় হলো। ওয়ায করাতো আমার কোন পেশা নয়। এবং আমার যে ওয়ায করার খুব শখ তাও নয়। মানুষ আমাকে অনুরোধ করে বিধায় কিছু বলি। এখন আপনারা যদি আমাকে অনুরোধ করেন বা পরামর্শ দেন তাহলে আমি কিছু কথা বলবো অন্যথায় কিছুই বলবো না।

অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আপনাদের পরামর্শ দেয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্য আমি আমার নিজের মতটাও প্রকাশ করছি তা হলো, ওয়ায চলতে থাকবে। এবং আমার ধারণা যে, যিনি আমাকে চিঠি দিয়েছেন তিনিও নিশ্চয়ই এখানে উপস্থিত আছেন। সুতরাং আমার কোন কথা যখন তার কাছে অপসন্দ মনে হবে, সাথে সাথে তিনি আমাকে বাধা দিবেন। আমি তৎক্ষণাৎ ওয়ায বন্ধ করে দিবো। যদি এই মজমায় বাধা দিতে তিনি কোন প্রতিবন্ধক বা সংকোচ অনুভব করেন, তবে আমি আজ যোহরের পরে মিছলী শহরে চলে যাবো। আমি চলে যাওয়ার পর তিনি আমার বয়ানের কঠোর প্রতিবাদ করবেন। এতটুকু বলে আমি চুপ হয়ে গেলাম এবং লোকদেরকে বললাম, আপনারা আপনাদের মতামত পেশ করুন। সাথে সাথে চতুর্দিক থেকে আওয়ায আসতে লাগলো 'আপনি অবশ্যই বয়ান করুন এবং স্বাধীনভাবেই করুন।'

আমি বয়ান শুরু করলাম এবং আমার অভ্যাস অনুসারে নেক আমলের প্রতি উৎসাহমূলক কথা এবং গুনাহের কাজের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শনমূলক কথা এবং শরীয়তের মৌলিক বিষয়াদির উপর আলোচনা করলাম। কথা প্রসঙ্গে কিছু আনুষাঙ্গিক বিষয়ের উপরও আলোচনা হলো। এক পর্যায়ে সেখানে বিদ'আত ও বিভিন্ন ভ্রান্ত রসম ও রেওয়াজের কথাও এসে গেলো। ফলে আমি খুব বিস্তারিতভাবেই বিষয়টি আলোচনা করলাম। সম্পূর্ণ মজমা তখন এক অভূতপূর্ব পরিবেশের মাঝে নিমজ্জিত ছিলো। ওয়ায শেষ হওয়ার পর জৌনপুর এলাকার একজন প্রসিদ্ধ মৌলভী সাহেব শুধু এতটুকু বললেন যে, মাওলানা! একথাগুলো বলার প্রয়োজন ছিলো না। আমি অত্যন্ত লৌকিকতামুক্তভাবে তাকে বললাম, তাতো আমার জানা ছিলো না আমি তো প্রয়োজনীয় কথা মনে করেই বলেছি। আপনি যদি সে সময় আমাকে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সতর্ক করে দিতেন তবে আর আমি আলোচনা করতাম না। এখন তো আলোচনা হয়েই গেছে। এখন তো আর কিছু করার নেই, তবে একটা পথ আছে তাহলো আপনি অন্য কোন সময়ে আমার কথাগুলোর প্রতিবাদ ও খণ্ডন করে দিতে পারেন এবং আজকের এই সভাতেই ঘোষণা করে দিন যে, অমুক দিন অমুক সময় আজকের এই বয়ানের প্রতিবাদ এবং খণ্ডন করা হবে। আমি ওয়াদা করছি, আপনি এমনটি করলে আমি সে ব্যাপারে কিছুই বলবো না।

জৌনপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের একজন ছিলেন মাওলানা আবদুল আউয়াল সাহেব। তিনি তখন দাঁড়ালেন এবং ঐ মৌলভী সাহেবকে খুব গাল–মন্দ করলেন এবং বললেন, আপনি সব সময়ই এ ধরনের কথা বলে থাকেন। এরপর তিনি উপস্থিত লোকদের লক্ষ্য করে ঘোষণা দিয়ে বললেন, ভাইসব! আপনারা সকলেই জানেন যে, আমি মিলাদপন্থী এবং কিয়ামপন্থী। কিন্তু হক কথা ওটাই যা হুযূর বয়ানে বলেছেন। এরপর তিনি আমাকে তার বাড়ীতে নিয়ে গেলেন এবং আমাকে মেহমান হিসেবে তার বাড়ীতে রেখে মেহমানদারী করলেন।

আরো একটি ঘটনা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, ঢাকার নবাবের মীলাদ মাহফিল করার খুব আগ্রহ ছিলো। নিজেই মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করতেন এবং নিজেই মীলাদ পড়তেন। তিনি যখন আমার কাছে মাসআলাহ জিজ্ঞাসা করলেন, তখন আমি তার জবাবের ক্ষেত্রে নম্রতার প্রতি এতটা লক্ষ্য রাখলাম যে, বিদ'আত শব্দটা পর্যন্ত লিখলাম না। বরং শুধু এতটুকু লিখলাম যে, শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই। তিনি জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। ফলে সাথে সাথে মীলাদ পড়া ছেড়ে দিলেন। এরপর আমি যখন ঢাকা গেলাম এবং তখন আমি তার বাসায়ই মেহমান ছিলাম। সে সময় সাধারণ লোকের মজলিসে অনেক ওয়াযই হলো। কিন্তু নবাবজাদা এবং নেতৃস্থানীয় লোকেরা সাধারণ লোকদের সে মজলিসে আসেনি। তার ইচ্ছা হলো, কোনভাবে তাদেরকেও কিছু বয়ান শোনানো হোক। কিন্তু আমার শর্ত ছিলো, আমার বয়ানে কোন সাধারণ লোক আসতে চাইলে তাকে বাধা দেয়া যাবে না।

তারা তখন যে পদ্ধতি গ্রহণ করলো তা হলো, শহর থেকে ৭/৮

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

মাইল দূরে একটি ওয়াযের ব্যবস্থা করলো। যেখানে গাড়ী কিংবা মটর সাইকেল ছাড়া পৌঁছা সম্ভব ছিলো না। সে মাহফিলে তারা নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে গেলো। কিছু সাধারণ লোক সেখানেও গিয়ে উপস্থিত হলো, তবে তাদের সংখ্যা ছিলো খুবই কম। যাই হোক মাহফিল প্রস্তুত হলো। তাদের অবস্থার প্রেক্ষিতে কিছু প্রয়োজনীয় কথা বলা আমার দরকার ছিলো যার মধ্যে দাড়ির বিষয়টিও ছিলো। কারণ সকলকেই দেখলাম, দাড়ি মুণ্ডানো কিন্তু বর্ণনার ক্ষেত্রে আমি বর্ণনাধারা ও ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এতটা নম্রতার প্রতি লক্ষ্য রাখলাম যাতে তাদের মধ্যে কোন বিরক্তিভাব সৃষ্টি না হয়।

আমি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললাম, উপস্থিত ভাই সকল! এ কথা তো বলারও অপেক্ষা রাখে না যে, দাড়ি মুণ্ডানো গুনাহের কাজ। কারণ এটা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু কথা হলো দাড়ি মুণ্ডানো যাদের অভ্যাস হয়ে গেছে এবং এটাকে তারা নিজেদের সৌন্দর্য বলে মনে করছে, তারা এ অভ্যাসকে কিভাবে পরিত্যাগ করতে পারে। এজন্য আমি তাদেরকে একটি সহজ পদ্ধতি বলে দিচ্ছি, যাতে তাদের কোন কাজেও বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় এবং কিছুটা হলেও তারা উপকৃত হতে পারে। সে পদ্ধতিটি হচ্ছে, আমি তাদেরকে একাজে বাধা দিচ্ছি না, তবে দিনের বেলা এ কাজ করে রাতে আল্লাহ পাকের দরবারে নিজের গুনাহের কথা স্বীকার করে তার প্রতি তারা অনুশোচনা প্রকাশ করবে যে, আয় আল্লাহ! আমি বড়ই অযোগ্য, নিতান্তই খবীস ও নোংরা, বড়ই গুনাহগার। আমাকে আপনি আপনার বিধান মেনে চলার তাওফীক দান করুন। অতঃপর সকালে উঠে আবার সেই কাজ (দাড়ি মুণ্ডানো) করুন। আবার রাতের বেলা আল্লাহ পাকের সামনে গুনাহের কথা স্বীকার করে ফরিয়াদ করুন।

হযরত থানবী (রহঃ)–এর একথা শুনে উপস্থিত লোকদের কেউ কেউ বলে উঠলো, হযরত! যে আল্লাহর দরবারে এভাবে অনুশোচনা ও ফরিয়াদ করবে, সেকি কখনো দাড়ি মুণ্ডাতে পারে। হযরত থানবী (রহঃ) বললেন, আমি কি বলেছি দাড়ি মুণ্ডাতেই থাকবে? আমি বলছি যে, যদি দাড়ি মুণ্ডাতেই হয়, তবে সাথে রাতের বেলা এ কাজটিও করতে থাকবে। এর দ্বারা আপনার সৌন্দর্য এবং ফ্যাশনেও কোন পার্থক্য আসবে না এবং কারো অভ্যাসেও বিঘ্ন সৃষ্টি হবে না। তবে এর দ্বারা গুনাহ অনেকটা

সূচীপত্র

হালকা হয়ে যাবে এবং এমনও সম্ভব যে, ধীরে ধীরে আল্লাহ পাক তাকে সে গুনাহ থেকেই মুক্ত করে দিবেন।

সারকথা হলো ওয়ায ও তাবলীগের ক্ষেত্রে আমার পদ্ধতি ছিলো এরূপ, যাতে লোকদের মাঝে কোন আতঙ্ক ও অনিহা সৃষ্টি না হয়। বর্ণনাভঙ্গী যাতে নম্র ও শ্রোতাদের কাছে পসন্দনীয় হয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে লোকেরা সেদিকে লক্ষ্য রাখে না।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

জুমাদাস সানিয়াহ ১৩৫৭ হিজরীর বৈঠক

তাসাওউফের সারবস্তু খুবই সহজ

আল্লাহ পাকের নিয়ম হচ্ছে, যেসব জিনিস মানুষের জন্য খুব বেশী প্রয়োজন, সেসব জিনিস অর্জন করা তিনি আসান করে দিয়েছেন। মানুষের সবচাইতে বেশী প্রয়োজন 'হাওয়া।' আর তা সব সময় সকল স্থানে বিনা পয়সায় পাওয়া যায়। বরং এটা কেমন যেন জোর করেই ভাগ দিয়ে দেয়ার মত। যদি কেউ এ থেকে বাঁচার ইচ্ছাও করে তবে সে ইচ্ছায় সফলকাম হওয়াও মুশকিল।

দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষের অধিক প্রয়োজন পানি। তাও ব্যাপকভাবে বিনা পয়সায় পাওয়া যায়। অবশ্য কোন কোন স্থানে খুব সামান্য মূল্যও নেয়া হয়। এমনিভাবে অন্যান্য জিনিসও। আর মানুষের সবচাইতে কম উপকারী হলো, স্বর্ণ, চান্দী ইত্যাদি জাওহারসমূহ। আর এগুলো হচ্ছে সবচাইতে বেশী দামী।

আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে যাওয়ার পথ যেহেতু ব্যাপকভাবে মানুষের প্রয়োজনীয় ও উপকারী বস্তু তাই সৃষ্টিগত দিক থেকে সেটা সহজলভ্য হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মুশকিল হলো লোকদের অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়িই বিষয়টিকে কঠিন বানিয়ে রেখেছে। বর্তমানে মানুষের ইচ্ছা বহির্ভূত এবং নিষ্প্রয়োজনীয় নীতিমালা এবং আমলের নাম রেখেছে তাসাওউফ। অথচ সেগুলো মূলতঃ কোন তাসাওউফ নয়। বরং তাসাওউফ তো হচ্ছে, এই বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করার নাম যে, যখন আমরা মহান আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করবো তখন হাদীস পাকের ওয়াদা মতে আল্লাহ পাক আমাদের মনোনিবেশ থেকে বেশী আমাদের দিকে মনোনিবেশ দান করবেন। এর মধ্যে তো কোন নফল আমলেরও প্রয়োজন নেই তবে ফরয আমলগুলো ঠিক ঠিকভাবে আদায় করে নেয়া আবশ্যক। আর এতটুকুই যথেষ্ট। উলামায়ে কিরাম লিখেছেন অধিক পরিমাণে নফল ইবাদত করার চাইতে পরিপূর্ণভাবে ফরয ইবাদতগুলো পালন করা অধিক উত্তম। আর এটি মানুষের মন–মানসিকতার সাথেও সামঞ্জস্যশীল। যেমন এক ব্যক্তি

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

দাওয়াত দিয়ে দশ প্রকার খানা খাওয়ায়। কিন্তু তা সবই খারাপ। পক্ষান্তরে অপর এক ব্যক্তি শুধু এক প্রকারের খানা প্রস্তুত করে এবং তা খুব ভাল ও উন্নত। এক্ষেত্রে একথা স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে, আপনি ঐ দশ প্রকারের খানার তুলনায় এই এক প্রকারের খানাকেই অগ্রাধিকার দিবেন।

মুসনাদে ইমাম আহমদ (রহঃ)–এর মধ্যে একটি হাদীস আছে, যে হাদীসটি 'আত্তাকাশশুফ' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। সে হাদীসের মর্ম হচ্ছে, একবার কয়েকজন সাহাবী (রাযিঃ) বসেছিলেন। অপর একজন সাহাবী তাদের কাছ দিয়ে যেতে লাগলে তাদের মধ্য থেকে একজন সাহাবী (রাযিঃ) বললেন, ঐ ব্যক্তির প্রতি আমি অসন্তুষ্ট ও গোশ্বা। একজন সাহাবী (রাযিঃ) উঠে গিয়ে এ কথাটা ঐ সাহাবী (রাযিঃ)কে বললেন, যিনি ঐ স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন। সংবাদ পেয়ে ঐ সাহাবী (রাযিঃ) ফিরে এলেন। এবং জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি আমার সম্পর্কে একথা বলেছেন—

انى لابغض هذا

(আমি এই ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট ও গোশ্বা)

অপর সাহাবী (রাযিঃ) কথাটা স্বীকার করলেন যে, হাঁ আমি একথা বলেছি। প্রথম সাহাবী পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আমার প্রতি গোশ্বা ও অসন্তুষ্টির কারণ কি? দ্বিতীয়জন উত্তর দিলেন, আমি তোমাকে কখনো কোন নফল নামায পড়তে দেখিনি এবং নফল রোযাও রাখতে দেখিনি। প্রথম সাহাবী এবার বললেন, আচ্ছা আপনি আমাকে ফরয আমলের ক্ষেত্রে কখনো কোন শিথিলতা করতে দেখেননি তো? দ্বিতীয়জন উত্তর দিলেন, না, ফরয আমলে কখনো শিথিলতা করতে দেখিনি। এবার প্রথম সাহাবী (রাযিঃ) বললেন, আমি তো এটাকেই যথেষ্ট মনে করি। এরপর বিষয়টির সমাধানের জন্য উভয়েই উঠে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর দরবারে উপস্থিত হলেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম সাহাবী (রাযিঃ)–এর রায় (ফরয আমলকে যথেষ্ট মনে করা)কেই সঠিক বলে বর্ণনা করলেন।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

১১ই শাবান ১৩৫৪ হিজরীর মালফূযাত

মযলূম অপদস্থ হয় না

কিছুলোক একবার শরীয়তসম্মত কোন কারণ ছাড়াই একজন আলেমের বিরোধিতা করতে লাগলো। তার দুর্নাম ও বদনাম করে তাকে অপদস্থ করার জন্য তারা তৎকালীন সময়ের প্রচলিত সব ধরনের কৌশলই অবলম্বন করলো। এ কারণে ঐ আলেম বেচারা অত্যন্ত ব্যথিত ও ভগ্নহৃদয় হয় পড়েছিলেন। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বললেন, 'মযলূম কখনো অপমানিত হয় না।' কারণ পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা পরিস্কার প্রমাণিত যে, সে আল্লাহ পাকের সাহায্যপ্রাপ্ত। পবিত্র কুরআনে নিহত ব্যক্তির ঐ সব ওলীগণ যাদের প্রতি নির্যাতন করা হচ্ছে যারা মাযলূম তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে—

فَلَا يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا

অর্থাত, নিহত ব্যক্তি (যাকে হত্যা করা হয়েছে) তার ওলীগণের জন্য উচিত হলো, তারা যখন নিহত ব্যক্তির হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ পাবে, তখন প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে যেন অতিরঞ্জন না করে। কারণ তারা এমনিতেই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত।

অর্থাত, তাদের সাথে রয়েছে মহান আল্লাহর সাহায্য। এজন্য তাদের শুকরিয়া আদায় করা উচিত। আর যালিম ব্যক্তির যুলুমের প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত কিছু করে নিজেই যাতে যুলুমের মধ্যে লিপ্ত হয়ে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

সারকথা হচ্ছে, এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি মাযলূম বা অত্যাচারিত হয়, মহান আল্লাহর সাহায্য ও মদদ তার সাথে থাকে। আর যে ব্যক্তি স্বয়ং আল্লাহ পাকের সাহায্যপ্রাপ্ত তাকে আবার অপদস্থ করতে পারে কে।

দেওবন্দের মাসিক পত্রিকা সম্পর্কে বক্তব্য

আমার (সংকলক) দারুল উলূম দেওবন্দের খিদমতকালীন সময়ে বুযুর্গানে দ্বীনের পরামর্শে 'আল-মুফতী' নামে একটা মাসিক পত্রিকা চালু করেছিলাম। যার মধ্যে ফাতাওয়া ছাড়াও সাধারণ জনগণের জন্য উপকারী বিভিন্ন বিষয়ও প্রকাশ করা হতো। পত্রিকাটি প্রকাশের ব্যাপারে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

আমার তেমন কোন সাহায্য সহযোগিতাকারীও ছিলো না এবং এমন কোন আর্থিক পুঁজিও ছিলো না, যার দ্বারা পত্রিকাটি চলতে পারে। আমিই ছিলাম পত্রিকাটির বাপ–মা। বিষয়বস্তু লিখা থেকে শুরু করে ছাপানো এবং ডাকে পাঠানো পর্যন্ত সব কাজই আমি নিজের হাতে করছিলাম। প্রতি বছর লোকসান হওয়া সত্ত্বেও ১৩৫৪ হিজরী থেকে শুরু করে ১৩৬২ হিজরী পর্যন্ত আট বছর পত্রিকাটি চালু রেখেছি। একদিন হযরত থানবী (রহঃ)–এর দরবারে উপস্থিত লোকদের মাঝে আমি অধমও উপস্থিত ছিলাম। হযরত থানবী (রহঃ) আমাকে ডেকে বললেন—

'আপনার পত্রিকা 'আল–মুফতী' তো খুবই উপকারী। সব বিষয়গুলোই সারনির্যাস ও আবশ্যকীয় বিষয়। আমি তো অনেককে বলেছি যে, তার মূল্য তো এক বৎসরে মাত্র একটাকা পঁচিশ পয়সা (সোয়া টাকা) কিন্তু এসব বিষয় যদি সোয়া লাখ টাকায়ও জমা করা যায় তবে তাও সস্তায় লাভ করা হবে।'

প্রয়োজন পরিমাণে ইলম ও আমলই ওলী হওয়ার জন্য যথেষ্ট

একবার দেওবন্দে একজন লোক হযরত থানবী (রহঃ)কে প্রশ্ন করলো, আপনারা (আপনারা বলে তার উদ্দেশ্য ছিলো, হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ), হযরত নানুতবী (রহঃ) সহ সকল আকাবীরে দেওবন্দ) বহুত বড় আলেম এবং ফাযেল। আর আপনারা সকলে গিয়ে হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব (রহঃ)–এর কাছে মুরীদ হয়েছেন। আমার এটা বুঝে আসে না যে, সেখানে এমন কি বস্তু ছিলো, যার কারণে আপনাদের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ গিয়ে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। হযরত থানবী (রহঃ) এর জবাবে বললেন—

হাঁ, আমাদের দৃষ্টান্ত হলো এ রকম, যেমন কোন ব্যক্তির সকল প্রকার মিষ্টির নাম এবং তালিকা ভালভাবে মুখস্থ আছে কিন্তু সে তার একটাও খেয়ে দেখেনি। পক্ষান্তরে অপর এক ব্যক্তি এমন আছেন যিনি সব ধরনের মিষ্টি খেয়েছেন কিন্তু কোন প্রকার মিষ্টির নাম তার মুখস্থ নেই। এখন যে ব্যক্তি মিষ্টি খেতে পারছেন, তার তো এমন প্রয়োজন নেই যে, সে সেই মিষ্টির নাম মুখস্থ করার জন্য অন্য কারো কাছে যাবে। কিন্তু যার শুধু নাম আর শব্দ মুখস্থ আছে সে ঐ মিষ্টির স্বাদ গ্রহণকারী ব্যক্তির কাছে মুখাপেক্ষী, যাতে সে তার সংস্পর্শে থেকে মিষ্টি খেতে এবং তার স্বাদ গ্রহণ করতে পারে।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

আলিমগণের মতপার্থক্যে সাধারণ লোকের করণীয়

উলামায়ে কিরামের মাঝে বিভিন্ন মতামত ও তার ভিত্তিতে ইজতিহাদী মাসআলাহসমূহের মাঝে মতপার্থক্য একটি সহজাত বিষয় বলা চলে। এমনটি হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) ও তাবেঈনে কিরাম (রহঃ)–এর যুগ থেকেই চলে আসছে। এ জাতীয় ইখতিলাফ বা মতপার্থক্যকে হাদীস শরীফে 'রহমত' বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর নিন্দনীয় মতভেদ যা থেকে বেঁচে থাকার জন্য পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা হলো, ঐ পর্যায়ের মতভেদ যা বিভিন্ন পার্থিব স্বার্থ ও প্রবৃত্তির চাহিদার উপর ভিত্তি করে সংঘটিত হয়ে থাকে। কিংবা যেক্ষেত্রে মতভেদের পরিধি অতিক্রম করে অতিরঞ্জনের শিকার হয়ে সীমালংঘন করা হয়। কিন্তু বর্তমানে উলামায়ে কিরামের এই সঠিক ইখতিলাফ বা মতপার্থক্যকেও সাধারণ লোকেরা উলামা সম্প্রদায়ের প্রতি কুধারণা পোষণ করার কাজে ব্যবহার করে চলেছে। এবং সরল–সোজা সাধারণ লোকেরা তাদের মজ্জাগত ভ্রান্তিতে লিপ্ত থেকে বলতে থাকে যে, উলামাদের মাঝেই যখন মতভেদ তখন আমরা কোন্ দিকে যাবো। অথচ দুনিয়ার বিভিন্ন কাজে তারা বেশ চতুরতার পরিচয় দিতে পারে। যেমন ডাক্তার বা হাকীমদের মাঝে কোন রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে নিজ নিজ পথ অবলম্বন করে নিতে পারে এবং সে মতপার্থক্যের কারণে সকল ডাক্তারদের প্রতি কুধারণাও পোষণ করে না।

একবার এক লোক গাংগুহ এলাকা থেকে হযরত থানবী (রহঃ)–এর বরাবরে একটি চিঠি পাঠালো। যে চিঠিতে সে দারুল উলূম দেওবন্দ এবং তথাকার কিছু উলামায়ে কিরামের মতামতের বিরোধিতা করে তাদের মত 'দ্বীনী মঙ্গল চাহিদার বিপরীত রয়েছে' বলে মন্তব্য করেছে। সে বিষয়ে হযরত থানবী (রহঃ)–এর মতও ছিলো ঐ আলিমগণ থেকে ভিন্ন। যে ব্যক্তি চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলো, সে ছিলো হযরত থানবী (রহঃ)–এর অনুসারী এবং ভক্ত। সে চিঠি লিখেছে খুব বিস্তারিতভাবে। সে লিখেছে, আমি সকল আলেমের প্রতিই ভক্তি–শ্রদ্ধা রাখি, তবে এ বিষয়টা সামনে আসাতে আমি খুব দ্বিধা–দ্বন্দ্বে পড়ে গেছি। বিষয়টি নিয়ে অন্যান্যদের সাথে আমার আলোচনাও হচ্ছে, এ কারণে আমি বড় মানসিক কষ্ট ভোগ করছি। হযরত! আমাকে বলে দিন আমি কি করতে পারি।

হযরত থানবী (রহঃ) সে লোকের পত্রের জবাবে লিখছেন—

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

আসসালামু আলাইকুম।

আপনি আপনার দ্বীনকে ঠিক করার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন। ইনশাআল্লাহ আপনি তার আজর ও প্রতিদান লাভ করবেন। যেহেতু প্রত্যেক অসুস্থ ব্যক্তির জন্য চিকিৎসা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সে মতে আপনার জন্য যে ব্যবস্থা লাভজনক ও উপকারী আমি তা লিখে দিচ্ছি—

کار خود کن کار بیگانہ مکن

"অর্থাৎ, নিজের কাজ করতে থাকুন অন্যের কাজ করতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। মুখ, কলম এবং অন্তর সর্বদিক থেকে চুপ থাকুন। অস্থিরতায় ধৈর্যধারণ করুন। কারো প্রতি খুব বেশী ভক্তি শ্রদ্ধা ও আস্থা প্রকাশ করারও দরকার নেই। আবার কারো প্রতি অনাস্থা বা কুধারণা পোষণ করারও প্রয়োজন নেই। কারণ এর উভয়টিই কষ্টদায়ক। এ ব্যাপারে কিয়ামতের মাঠেও আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হবে না।"

একটি আয়াতের তাফসীর ও তাহকীক

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا

অর্থাত, যদি তোমরা মহান আল্লাহর নি'আমতরাশি গণনা করতে থাকো, তবে তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না।

এখানে একটি সংশয় হতে পারে, তাহলো, কিছু গরীব ও দুঃস্থ লোক এমন হয়ে থাকে, যাদের কাছে খুব সীমিত কিছু জিনিস থাকে এবং তা গুণেও শেষ করা যায়। তাদের ব্যাপারে উপরের আয়াতের 'গণনা করে শেষ করতে পারবে না' কথাটি কিভাবে সঠিক হতে পারে। এর জবাব তো একেবারেই পরিষ্কার তাহলো, প্রত্যেক বিপদ থেকে বেঁচে থাকতে পারাও একটি নি'আমত। আর বিপদ–মুসীবত গণনা করে কেউ শেষ করতে পারে না। এ কারণে একেবারে দীন ও হীন একজন মানুষের প্রতিও আল্লাহ পাকের এত অধিক নি'আমত রয়েছে, যা গণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়।

এরপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, এ আয়াতের আরো একটি তাফসীর মনে আসছে। তা হলো, আরবীতে احصاء শব্দের অর্থ যেমন গণনা করা হিসেবে প্রসিদ্ধ। অনুরূপ তার আরো একটি অর্থ আছে,

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করা। এই অর্থ হিসেবে আয়াতের মর্ম হবে, প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহ পাক এত অধিক নি'আমত দান করেছেন যে, তারা তার সবটা একই সময় ব্যবহার করতে পারে না। বরং কোন কোন নি'আমত ব্যবহার থেকে বাহিরে থেকে যায়। যেমন স্বয়ং মানুষের সৃষ্টি ও অস্তিত্বের ক্ষেত্রে যেসব নি'আমত দান করা হয়েছে, তার মধ্যে অনেকটা আছে এমন যা প্রয়োজন থেকেও আল্লাহ পাক অধিক দান করেছেন। আল্লাহ পাক মানুষকে দু'টি চোখ দান করেছেন। অথচ দেখার কাজ একটি চোখ দিয়েও চলতে পারে। কানও দুটি দিয়েছেন অথচ শ্রবণের কাজ একটি কান দ্বারাও হতে পারে। হাত পা দুটি করে দান করেছেন। যার মধ্যে দুটিকেই (হাত–পা) মানুষ সর্বদা একসাথে কাজে লাগায় না। শীতের সামানপত্র গরমের সময়ে, আবার গরমের সামানপত্র শীতে কাজে লাগানো যায় না। সুতরাং যে কোন একজন দীনহীন ও দুঃস্থ মানুষের ব্যাপারেও একথা বলা সঠিক যে, সে আল্লাহ পাকের দেয়া যাবতীয় নি'আমতকে একই সাথে ব্যবহার করতে পারে না।

উক্ত আয়াতের এ তাফসীরটি আমার খেয়ালে পূর্ব থেকেই ছিলো। কিন্তু কোন দলীল–প্রমাণ না থাকার কারণে তা আলোচনা করা থেকে বিরত ছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ! আজকে একটা হাদীসে উক্ত তাফসীরের পক্ষে প্রমাণ খুঁজে পেয়েছি। তাহলো আল্লাহ পাকের 'আসমাউল হুসনা' (সুন্দর নামসমূহ) সম্পর্কে হাদীস শরীফে আছে—

من احصاها دخل الجنة

অর্থাত, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের নামসমূহের 'ইহসা' (احصاء) করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

উক্ত হাদীসে احصاء শব্দ সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের দু' রকম বক্তব্যই প্রমাণিত আছে। একটা হলো احصاء لفظا অর্থাত নামসমূহকে মুখস্থ করে নেয়া। অপরটি হলো احصاء استعمالا অর্থাত উক্ত নামসমূহের চাহিদা ও দাবীর প্রতি আমল করা।

সুতরাং যেভাবে একটি হাদীসে احصاء শব্দের দুটি তাফসীর বা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনের আয়াত لا تحصوها এ ক্ষেত্রেও উভয় ব্যাখ্যাই হতে পারে।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

২৫শে শা'বান ১৩৫৪ হিজরীর মালফূযাত

'ইবনে মানসূর' সম্পর্কে তাহকীক

ইবনে মানসূর যে সাধারণ মানুষের কাছে 'মানসূর' নামেই প্রসিদ্ধ এবং انا الحق (আমিই খোদা) বাক্যটি বলার কারণে তাকে কতল করা হয়েছিলো। তার ব্যাপারে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী যুগের উলামায়ে কিরামের বক্তব্য পরস্পর বিরোধী এবং একটি অপরটির বিপরীত। অনেকে তার বুযুর্গী এবং আল্লাহওয়ালা হওয়ার বিষয়টিকেই অস্বীকার করেন। আবার অনেকে তাকে সকল ওলীগণের থেকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম বলে থাকেন।

এ ব্যাপারে হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, ইবনে মানসূর সম্পর্কে আমার মতামত হচ্ছে, তিনি একজন 'আরেফ' ব্যক্তি ছিলেন, এটা ঠিক এবং 'সাহেবে হাল' (আল্লাহ পাকের ইশক ও প্রেমে পাগল) ছিলেন তাও সত্য, তবে তিনি 'সাহেবে কামাল' বা পূর্ণতার অধিকারী বুযুর্গ ছিলেন না। তিনি হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ)–এর সাগরেদগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং হযরত জুনাইদ (রহঃ) তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন।

অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, এটা হচ্ছে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা। আর এর পক্ষে আমার কাছে প্রমাণও বিদ্যমান রয়েছে। তাহলো, শাইখ যদি কোন মুরীদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যান, তবে সে কারণে পরকালে তার ধ্বংস যদিও অনিবার্য নয়, কিন্তু দুনিয়ায় সে অবশ্যই কোন শাস্তির শিকার হয় এবং যে কোন মুসীবতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আমার এরূপ বাস্তব অভিজ্ঞতা ঐ ইলহামের ব্যাপারেও রয়েছে যা সঠিক ইলহামী শক্তি থাকার পরে হয়। এ ধরনের ইলহামের বিরোধিতা করলে অন্ততঃ দুনিয়াতে যে কোন একটি মুসীবতে লিপ্ত হয়ে পড়তে হয়।

দুনিয়াদার ব্যক্তিদের সাথে আল্লাহওয়ালাদের সাক্ষাতের নিয়ম

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, দুনিয়াদার কোন ধনী ব্যক্তি কিংবা নেতৃস্থানীয় লোক যদি কোন আলিম বা

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

ওলীআল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত করতে আসে, তবে সেক্ষেত্রে হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)–এর শিক্ষা হলো, তার সাথে রুক্ষ আচরণ করবে না। এবং হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, এ কারণেই আমার অভ্যাস হচ্ছে, আমীর বা নেতৃস্থানীয় লোক যদি শিষ্টাচার ও আদব বজায় রাখে তবে সাধারণ লোকদের তুলনায় তাকে একটু বেশী সম্মান করা উচিত।। কারণ এরা কিছুটা সম্মান লাভেই অভ্যস্ত। আর ইসলামের একটি নীতি আছে—

انـزلوا الناس منـازلهم

অর্থাত, দুনিয়ায় যার যেরূপ সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে, সে অনুপাতেই তার সাথে আচরণ করবে।

এ নীতি অনুযায়ী এ ধরনের লোকদের সাথে এরূপ আচরণ করাই যথাযথ।

কিন্তু সে নিজেই যদি কোন অহংকারমূলক আচরণ করে কিংবা আলেম সমাজকে খাটো করে দেখার কোন কাজ তার থেকে প্রকাশ পায়, তবে কস্মিনকালেও তাকে কোনরূপ পরওয়া করা যাবে না, তার কাজ বা আচরণের সমুচিত জবাব দিয়ে দিতে হবে। সারকথা হচ্ছে, তাকেও কোন অপমান করবে না এবং তার সামনে নিজেকেও নিজে অপমানিত করবে না।

অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) পুনরায় বলেন, প্রকৃতপক্ষে অপমান হচ্ছে, কারো সামনে নিজের প্রার্থনার হস্ত প্রসারিত করা এবং নিজের প্রয়োজন ও চাহিদার কথা তার কাছে ব্যক্ত করা। ফাটা কাপড়, ছেঁড়া জুতা, তালি লাগানো পোশাক কোন অপমানকর বস্তু নয়।

সগীরা ও কবীরা গুনাহ

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, যে গুনাহকে সগীরা অর্থাত ছোট গুনাহ বলা হয়, সেটা বড় গুনাহের তুলনায় ছোট অন্যথায় প্রত্যেক গুনাহ্ই বড়। কেননা তাতে মহান আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর নাফরমানী ও অবাধ্যতা করা হয়। যেমন শুকনো খড়কুটো দিয়ে তৈরী চালা বা বেড়াকে আগুনের বড় অংগার যেমন জ্বালিয়ে শেষ করে দেয় তেমনি ছোট অগ্নিস্ফুলিংগও একই পরিণতি বয়ে আনে। কারণ ছোট স্ফুলিংগও যখন জ্বলে উঠে তখন তাও

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

বড় অংগারে পরিণত হয়ে যায়। এজন্য গুনাহকে সগীরা (ছোট) কবীরা (বড়) হিসেবে ভাগ করাটা গুনাহের মধ্যকার পারস্পরিক তুলনা ও সম্পর্কের হিসেবেই হয়ে থাকে। সগীরা গুনাহকে ছোট মনে করে বেপরোয়া হয়ে যাওয়াটাও নিজের ধ্বংসকে ডেকে আনারই নামান্তর। উহুদের যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থায় সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)–এর পরাজয়কে পবিত্র কুরআনে একটি পদস্খলনের ফলাফল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কুরআনে পাকে ইরশাদ হচ্ছে—

إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا

অর্থাত, তাদের কিছু কাজের কারণে শয়তান তাদেরকে পদস্খলিত করেছে। এই ঘটনা থেকে একথা পরিস্কার হয়ে যায় যে, সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) তো কখনো কবীরা গুনাহে লিপ্ত হতেন না কিন্তু এই সগীরা বিষয়কেই উহুদে পরাজয়ের কারণ বলা হয়েছে।

নবী (আঃ)গণ থেকে সগীরা গুনাহও প্রকাশ পায় না

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, মাওলানা সাইয়্যেদ মুর্তযা হাসান সাহেব আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ)–এর গবেষণালব্ধ মত এই ছিলো যে, নবী (আঃ)গণ থেকে নবুওয়তের আগে কিংবা পরে কোন গুনাহে কবীরা যেমন প্রকাশ পায় না, তেমনি গুনাহে সগীরাও তাদের দ্বারা সংঘটিত হয় না।

হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন যে, হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহঃ)–এর তাহকীক ও গবেষণা দ্বারাও এ কথাটির পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহলো, তিনি বলেছেন, যেসব বিষয়কে নবী (আঃ)গণের পদস্খলন হিসেবে গণ্য করা হয়েছে তাও প্রকৃতপক্ষে কোন গুনাহ নয় বরং সেটাও ইবাদতেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বড় ও উন্নত ইবাদতের পরিবর্তে এ জাতীয় ইতা'আত বা ইবাদতে লিপ্ত হয়ে পড়া নবী (আঃ)গণের উচ্চ মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এ কারণে সেসব ক্ষেত্রে সতর্ক করা হয়েছে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী কথা

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, ইবাদত ও

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

ইতাআত–অনুসরণের চেয়ে বড় উপকারিতা তো হলো আখিরাতে সওয়াব লাভ করা। আর কোন আমল তার সমুদয় শর্ত ও আদব রক্ষা করে আদায় করা হলে অবশ্যই তা লাভ হবে। এর অপর একটি উপকারিতা রয়েছে—তাহলো, বিশেষ বিশেষ আমলের একটা প্রভাব ও বরকত দুনিয়াতেই লাভ হয়ে থাকে। কিন্তু সেসব সুফল ও বরকত লাভ করার জন্য শর্ত হচ্ছে, আমল করার সময় ঐ সুফল ও বরকত লাভের নিয়্যত মনে থাকতে হবে। সাধারণভাবে যেসব লোকেরা এসব বরকত লাভ করতে পারে না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার কারণ হয় সে সুফল ও বরকত লাভের নিয়্যত না থাকা। যেমন নামাযের একটা বরকত হলো, এর দ্বারা মানুষের অন্যান্য সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক লাভ হয়। এ কথা পবিত্র কুরআন শরীফেও আলোচিত হয়েছে। এই বরকত কোন ব্যক্তি তখনই লাভ করতে পারবে, যখন সে নামাযের যাবতীয় শর্ত ও আদব সহকারে নামায আদায় করবে এবং সাথে সাথে এরূপ নিয়্যতও মনে পোষণ করবে যে, এ নামাযের উসীলায় আমার মাঝে অন্যান্য সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সৎসাহসও অবশ্যই সৃষ্টি হবে।

কারামতের স্তর

আল্লাহর ওলীগণের কাছ থেকে বিভিন্ন কারামত প্রকাশ পাওয়া হক ও বাস্তবসম্মত। এ কথার উপর উম্মতের ইমামগণের ঐক্যমত রয়েছে। কিন্তু সাধারণ লোকের মাঝে কারামতকে বহুত বড় কিছু মনে করা হয়, পক্ষান্তরে বুযুর্গানে দ্বীনের আসল কামাল তথা বুযুর্গীর বিষয়ের প্রতি কোন লক্ষ্যই করা হয় না। এ ব্যাপারে হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন—

বিচক্ষণ আলিমগণের দৃষ্টিতে কারামতের মর্যাদা ঐ মৌলিক যিকির থেকেও কম, যা একাগ্রতাহীনভাবে করা হয়। হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আমার কাছে এর কারণ এটাই বুঝে আসে যে, আল্লাহ পাকের যিকির সেটা যদি মনোযোগ ও একাগ্রতার সাথে নাও হয় তবুও তার জন্য কিছুটা হলেও আজর ও সওয়াব বান্দা লাভ করে থাকে। আর আজর ও সওয়াবের মাধ্যমেই আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জিত হয়ে থাকে। কিন্তু কারামতের বিষয়টি এমন নয়। কারণ সেটি তো শুধু একটি ঘটনার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এর দ্বারা যেমন কোন প্রতিদান বা সওয়াব লাভ হয়

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

না, তেমনি তার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন ন্যূনতম অগ্রগতিও আসে না।

হযরত (রহঃ) আরো বলেন যে, কারামতের মধ্যে কোন বুযুর্গের ইচ্ছা বা আমল কোন কার্যকর ভূমিকা রাখে না। কোন কোন সময়ে বুযুর্গ নিজেও জানতে পারেন না যে, তার থেকে কারামত প্রকাশিত হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আঃ)–এর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

لَوْلَا أَنْ رَّاٰى بُرْهَانَ رَبِّهٖ

অর্থাত, হযরত ইউসুফ (আঃ) যদি নিজের প্রভুর পক্ষ থেকে কোন বুরহান ও দলীল প্রত্যক্ষ না করতেন (তবে তিনি জোলায়খার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিলো)।

'আল্লাহ পাকের বুরহান' বলে যে কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে তার ব্যাখ্যার মধ্যে একটি বক্তব্য এরূপও আছে যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) সে নির্জন কক্ষে তখন হযরত ইয়াকুব (আঃ)কে মুখে আঙ্গুল দেয়া অবস্থায় সামনে দেখতে পেয়েছেন। এটাই ছিলো 'আল্লাহ পাকের বুরহান' বা দলীল। যার কারণে হযরত ইউসুফ (আঃ) নিজেকে হিফাযত করতে পেরেছিলেন। যদি এই তাফসীর সঠিক হয়, তবে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এটা ছিলো হযরত ইয়াকুব (আঃ)–এর কারামত কিংবা মুজিযাহ। কিন্তু হযরত ইয়াকুব (আঃ)–এর তো তার খবরও ছিলো না। কারণ, হযরত ইয়াকুব (আঃ) যদি একথা জানতেন যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) মিসর সম্রাটের ঘরে আছে, তবে পরবর্তীতে তিনি একথা বলতেন না, যা নিম্নরূপ—

يَا بَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ

অর্থাত, হে আমার সন্তানেরা! যাও তোমরা ইউসুফ এবং তার ভাই (বিনয়ামিন)কে তালাশ করো।

৪ঠা রমযান ১৩৫০ হিজরীর মালফূযাত

কাশফ সম্পর্কে একটি কথা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, দুনিয়ায় ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ঘটনাবলীর ব্যাপারে মানুষের ইচ্ছার বাইরে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে কোন কোন সময় পূর্ব অবগতি দান করা হয়। আবার কখনো এমনটি মানুষের কিছু কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেও অর্জিত হয়ে থাকে। আর তখন সেটা হয় মানুষের ইচ্ছাধীন ও অর্জিত বিষয়। তাহলো কিছু সাধনা ও আমলসমূহের দ্বারা ভবিষ্যত বিষয়াবলী সম্পর্কে 'কাশফ' বা অবগতি লাভ হতে থাকে। আর এ জাতীয় কাশফ ফাসেক, বদকার এমনকি কাফেরেরও হতে পারে।

বুযুর্গানে দ্বীনের কথা প্রসঙ্গে

কোন কোন বুযুর্গ ব্যক্তির এমন কথা যা আপাতদৃষ্টিতে আদব ও শিষ্টাচার পরিপন্থী। সে সম্পর্কে মাওলানা রুমী (রহঃ) বলেছেন—

گفتگوئ عاشقان درکار رب   جوشش عشق است نے ترک ادب

আল্লামা রুমী (রহঃ) আরো বলেন—

بے ادب تر نیست زوکس در جہاں   با ادب تر نیست زوکس درنہاں

উপরের শে'র দুটির সারমর্ম হচ্ছে, যেসব লোক আল্লাহ পাকের মহব্বত মাহাত্ম্যের মাঝে নিজেকে বিলীন করে দিয়েছে, তাদের থেকে বেয়াদবী বা শিষ্টাচার পরিপন্থী কাজ হওয়ার তো কোন সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু কখনো মহব্বতের আধিক্য হেতু আল্লাহ পাকের ধ্যান ও তার জন্য দেওয়ানা হয়ে গিয়ে শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথ লক্ষ্য রাখা সম্ভব হয় না। এ কারণেই যেসব বুযুর্গানে দ্বীনের উপর এ ধরনের অবস্থার প্রাবল্য রয়েছে তাদের কিছু শব্দ বা বাক্য আপাতদৃষ্টিতে যদিও আদব বা শিষ্টাচার পরিপন্থী মনে হয়, তবুও তাদের প্রতি কুধারণা পোষণ করা যাবে না। কিন্তু তাই বলে তাদের সেসব শব্দ বা বাক্য নিজেও বলে বেড়াতে

www.banglakitab.weebly.com   www.islamfind.wordpress.com

পারবে না। যার মাঝে আল্লাহ্ পাকের ধ্যানের ঐরূপ প্রাবল্য থাকবে না সেও ঐ আশেক বুযুর্গের মত ঐ সকল শব্দ ব্যবহার করবে যা আপাতদৃষ্টিতে শিষ্টাচার পরিপন্থী মনে হয় তা মোটেও দুরস্ত নেই।

বিনয় সম্পর্কিত একটি ঘটনা

একবার ঈদগাহের সমাবেশে এক ব্যক্তি হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ)–এর কোন একটি কাজের উপর প্রশ্ন তুললো। ঐ প্রশ্ন যদিও বিলকুল অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত ছিলো, তা সত্ত্বেও হযরত থানবী (রহঃ) লোকটির পায়ে পড়ে গেলেন এবং বললেন, নিঃসন্দেহে আমি বড়ই অপরাধী এবং গুনাহগার। বুঝতেই পারা যায় যে, হযরত থানবী (রহঃ)–এর উপর তখন এরূপ অবস্থার প্রাবল্য ছিলো, যে অবস্থায় মানুষ নিজে নিজেকে সকল বস্তু থেকে অধিক খারাপ এবং নীচু ও হীন মনে করতে থাকে।

সেমা' সংক্রান্ত বিশ্লেষণ

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, সুফিয়ায়ে কিরামের মাঝে তো সেমা' (গান শোনা)–এর ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। কোন কোন আলিম বিশেষ কিছু শর্ত আরোপ করে সেমা'র অনুমতি দিয়েছেন এবং তারা নিজেরাও এর উপর আমল করেছেন। আবার কেউ কেউ সরাসরি নিষেধ করে দিয়েছেন। তবে এ কথার উপর সকলেই একমত যে, এই সেমা' তরীকতের লাইনের কোন অংশ নয় বা এটা ঐ সকল আমলের অন্তর্ভুক্ত নয়, যা আত্মশুদ্ধির জন্য বিভিন্ন তবকা বা স্তরের সুফিয়ায়ে কিরাম নির্ধারণ করেছেন। সুফিয়ায়ে কিরামের (রহঃ) চার তরীকা হলো, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া এবং কাদেরিয়া। এই চার তরীকার কোন তরীকার মধ্যেই সেমা' সালেক বা তরীকতের সাধকের জন্য মা'মুল বা অযীফা হিসেবে নির্ধারণ করেননি। তবে কোন ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের কোন রুগীর জন্য অনুমতি দিয়ে দেয়া হয়। যেমন কোন কোন ক্ষেত্রে ডাক্তারগণ 'সংখিয়া' নামক একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থের মাধ্যমেও রোগের চিকিৎসা করে থাকেন। সারকথা হচ্ছে, সেমা' তরীকতের লাইনে কোন খাবার নয় বরং ঔষধ।

সাইয়্যেদুত্ ত্বায়েফাহ হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) সেমা' সম্পর্কে বলেছেন—

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

مبتدی را مضر باشد و منتہی را حاجت نیست

অর্থাত, সেমা' প্রাথমিক পর্যায়ের সাধকদের জন্য ক্ষতিকর। আর শেষ পর্যায়ের সাধকগণের জন্য এর কোন প্রয়োজন নেই।

ইংরেজদের সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)-এর একটি বিজ্ঞ মন্তব্য

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) বলতেন, আল্লাহ পাকের বহুত বড় অনুগ্রহ যে, তিনি ইংরেজদের মধ্যে দুটি দোষ রেখে দিয়েছেন। যার কারণে হিন্দুস্থানের লোকদের ঈমান রক্ষা পেয়েছে। একটি হলো, কৃপণতা। অপরটি হলো অহংকার। ইংরেজ শাসন ব্যবস্থায় মুসলিম প্রশাসনের ন্যায় দান-অনুদানের কোন দফতর নেই। আর তাদের অহংকার এতই অধিক যে, তারা হিন্দুস্থানীদের থেকে একেবারেই পৃথক হয়ে থাকে এবং তাদের কোন মজমা বা সমাবেশে অংশগ্রহণকে নিজেদের জন্য অপমানের বিষয় মনে করে।

একটি জ্ঞাতব্য বিষয়

এটা ছিলো ঐ সময়ের অবস্থা যখন মুসলমানদের মাঝে ইসলামী এবং জাতীয় স্বকীয়তা ও অবস্থানের প্রাবল্য বিদ্যমান ছিলো এবং তারা যখন খানাপিনা, উঠাবসা এবং স্বাভাবিক জীবনধারায় ইংরেজদের অনুকরণকে দোষণীয় মনে করতো। কিন্তু নিতান্তই দুঃখজনক কথা হলো, বর্তমানে মুসলমানদের মাঝে লর্ড ম্যাকালের সুদূরপ্রসারী বিষাক্ত ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার লাভ করেছে। ফলে ধীরে ধীরে তাদের মধ্য হতে ইসলামী এবং জাতীয় স্বকীয়তা বোধের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। মুসলমানগণ এখন প্রত্যেক কাজেই নিজেদেরকে ইংরেজ বানিয়ে দেখাতে পারলেই যেন আনন্দ পায় এবং একেই কামাল বা সফলতা মনে করে। এ কারণে ইংরেজদের সাথে তাদের উঠাবসা ও সম্পর্ক বৃদ্ধি পেয়েছে। যার অনিবার্য ফলাফল এই দাঁড়িয়েছে, যা আজ আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারছি। আধুনিক শিক্ষা লাভের পর একজন মুসলমানের নামটাই শুধু মুসলমান থেকে যায়। দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদির প্রতি অলসতা এবং বেপরওয়া ভাব প্রদর্শন করা তাদের স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়, আর অতি সম্প্রতি

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

তো দ্বীন ও তার মৌলিক বিষয়াদির উপর বিভিন্ন প্রশ্নও উত্থাপন করতে শুরু করেছে।

হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অসীয়্যত

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ (রহঃ) অসীয়্যত করেছিলেন, ভাই! কারো সাথে খুব বেশী জড়িয়ে পড়ো না। যখন কোন ব্যাপারে ঝগড়া হয়, তখন তাকে ছেড়ে তার থেকে পৃথক হয়ে যাও।

অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আমি সর্বদা এ রকমই করে আসছি।

তাসাওউফ স্বভাবজাত ইলমের অন্তর্ভুক্ত

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, যদি তাসাওউফের মৌলিক বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য করা হয়, তবে দেখা যাবে তার সবটাই মানুষের স্বভাবজাত ইলমের অন্তর্ভুক্ত। যদি স্বভাব ও মানসিকতার মাঝে সামান্য সুস্থতাও বিদ্যমান থাকে, তবে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের ঐ জিনিস আসবে যা বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন।

'সাওয়াদে আযম'-এর ব্যাখ্যা

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, ফিতনা এবং মতবিরোধের সময় প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সাওয়াদে আযম' (বড় দল)-এর অনুসরণ করার উপদেশ প্রদান করেছেন। 'সাওয়াদে আযম' এর মর্ম কি এ নিয়ে মুফাসসিরীনদের মাঝে বিভিন্ন মত রয়েছে। তার মধ্যে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মর্ম আমার কাছে যেটা বুঝে আসে তাহলো, এর দ্বারা উদ্দেশ্য তো তাই যা বাহ্যিক শব্দ থেকে বুঝে আসে। অর্থাত, যে দিকে বেশী লোক এবং যাদের মজমা বর থাকে তাদেরই অনুসরণ করবে। আমার মতে একথাটা 'খাইরুল কুরূন' তথা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগের সাথে সংশ্লিষ্ট। যে যুগে সার্বিক বিচারে ভালরই প্রাধান্য ছিল। বর্তমান সময়ের সংখ্যাধিক্যে ঐ হাদীসের লক্ষ্যভুক্ত নয়। কারণ বর্তমানে তো তাদের দলও ভারী, যারা ভ্রান্তপথ ও মতাবলম্বী। আর সে দলেই লোকসংখ্যা বেশী।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

তাসাওউফ-এর সারবস্তু

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, তাসাওউফ-এর সারবস্তু হলো দুটি। একটি হলো, আল্লাহ পাকের যিকির। আর দ্বিতীয়টি মলো, শরীয়তের আহকাম মেনে চলা। সুফিয়ায়ে কিরাম (রহঃ) বিভিন্ন ধরনের যেসব মা'মূল বা অযীফা দিয়ে থাকেন। তা মূলতঃ তরীকতের কোন অংশ নয় ওগুলো শুধু প্রয়োজনবশতঃ ব্যবহার করা হয়।

খুশু' বা একাগ্রতার হাকীকত

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, নামাযে খুশু ও একাগ্রতার হাকীকত হলো, মনের স্থিরতা। অর্থাত, চিন্তা-ফিকিরের আন্দোলিত হওয়ার বিষয়টি থেমে যাওয়া বা বন্ধ হয়ে যাওয়া। আর এমনটি অর্জন করা মন ও মানসিকতা অনুসারে বিভিন্ন রকমে হয়ে থাকে। কারো যদি মনের স্থিরতা এমনভাবে অর্জিত হয় যে, সে মনে মনে ধ্যান করলো, পবিত্র বাইতুল্লাহ আমার সামনে আছে, তবে তার জন্য এটাই উত্তম। আবার কারো জন্য যদি এমনটি সহজ হয় যে, সে যে শব্দগুলো মুখে উচ্চারণ করছে, তার প্রতি ধ্যান করবে, তবে সেক্ষেত্রে তার জন্য এমনটি করাই মুনাসিব বা উচিত। আর যার পক্ষে আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্তার দিকে মনোনিবেশ করা সহজ হয় তবে তার ক্ষেত্রে এটাই সবচাইতে ভাল ও উত্তম।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, একটি যরুরী কথা যা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত হয়েছে। তাহলো, খুশু' বা একাগ্রচিত্ততার ক্ষেত্রে খুব বেশী বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে বেশী বাড়াবাড়ি করা হলে দু' এক রোকন আদায় করার পর মন-মানসিকতার মাঝে ক্লান্তি এসে যায় এবং তখন ধ্যান ও খেয়াল বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

কখনো ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি মনের মাঝে অন্যান্য ধ্যান-খেয়াল আসা-যাওয়া করতে থাকে, তবে তা খুশু বা একাগ্রচিত্ততার পরিপন্থী নয়। তবে সেজন্য শর্ত হচ্ছে ঐসব ধ্যান ও খেয়ালের প্রতি লক্ষ্য ও মনোনিবেশ করা যাবে না। একটি বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি এভাবে বুঝা যায়, যেমন কেউ যদি কোন একটা বিন্দুকে দেখতে চায়, তবে স্বাভাবিকভাবে তার আশপাশের প্রতিও নযর পড়ে। কিন্তু যেহেতু অন্তরের মনোনিবেশ সেদিকে থাকে না, তাই সেটা হিসাবেও আসে না।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

বরং সেক্ষেত্রে একথাই বলা হয় যে, সে ঐ বিন্দুটিকেই দেখছে।

অনুরূপভাবে অন্তরের মনোনিবেশ যখন বিশেষভাবে কোন বস্তুর প্রতি নিবদ্ধ থাকে, তখন স্বাভাবিক নিয়মেই তার আশেপাশের কিছু জিনিসও তার সামনে থাকবে। কিন্তু ওসব জিনিস শুধু সামনে থাকাটাই ঐ মনোনিবেশের ক্ষেত্রে বাধা বা অন্তরায় নয়। যতক্ষণ ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ জিনিসগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করা না হবে।

কাশফ ও কারামতের পার্থক্য

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, 'কাশফ'–এর মর্ম কথা হচ্ছে, ঐ সকল ঘটনাবলী যা 'আলমে মিসাল' তথা মিসালী জগতে সংঘটিত হচ্ছে এবং সাধারণ নযর থেকে যা অদৃশ্য। তা–ই কখনো কারো নযরের সামনে এসে যায় এবং সে তা দেখ নেয়। আর এমনটি সাধারণতঃ তখনই হয় যখন অন্তর বিভিন্ন বস্তু ও সকল প্রকার সম্পৃক্ততা থেকে মুক্ত ও খালি থাকে, তখন এমন হওয়াটা কোন অসম্ভব কিছু নয়। আর এর জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে মকবুল হতে হবে এমনটি তো নয়ই বরং মুসলমান হওয়াও শর্ত নয়। এ ধরনের কাশফ কাফির এবং ফাসিকেরও হতে পারে। এমনকি পাগল ও মাতালেরও হতে পারে। কারামতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কারণ কারামতের অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহ প্রদত্ত সম্মান, যা এ ধরনের ফাসেক, কাফের পাগলদের লাভ হতে পারে না। তবে কখনো আবার আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে তার বিশেষ কোন বান্দাকে এ ধরনের কাশফ, কারামত হিসেবেও প্রদান করা হয়ে থাকে। তখন সেই কাশফই হয় কারামত। যেমন আল্লাহ পাকের ওলীগণের কাশফ সাধারণতঃ কারামতই হয়ে থাকে। আর যে কাশফ কারামত হিসেবে হয়ে থাকে, তার বিশেষ নির্দশন হচ্ছে, এ ধরনের কাশফের সাথে নম্রতা, নিজের হীনতা, ভগ্ন হৃদয় অবস্থা ও নিজের অপারগতা অনুভূত হতে থাকে। যে কাশফের সাথে এই নিদর্শন থাকবে না বরং নিজের মাঝে অহংকার ও গৌরববোধ অনুভব করবে তা কারামত নয়, বরং একে শরীয়তের পরিভাষায় 'ইস্তিদরাজ' বলা হয়। এ ধরনের 'ইস্তিদরাজ' থেকে আল্লাহ পাকের দরবারে পানাহ ও আশ্রয় চাওয়া উচিত।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

১৩ই রমযান ১৩৫০ হিজরী, শুক্রবারের মালফূযাত

অনুভব শক্তির তীক্ষ্ণতা প্রসঙ্গে

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আমার একটানা তিনদিন যাবৎ ঘুম হচ্ছিলো না। আজ রাতে আল্লাহ পাকের রহমত হয়েছে। শেষ রাতে আমি বসে বসে পড়তেছিলাম। এক পর্যায়ে আমি দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসলাম। তখন মাত্র চার-পাঁচ মিনিট চোখ লেগে থাকলো। এ চার পাঁচ মিনিটেই তিনদিন বিনিদ্র থাকার ক্লান্তি ও কষ্ট দূর হয়ে গেলো। এটা হলো ঐ বিশেষ ধরনের ঘুম যার ব্যাখ্যাও আমি করতে পারবো না যে, এটা কোন্ পর্যায়ের ঘুম।

(অধমের (সংকলকের) মনে হচ্ছে, বদর যুদ্ধে সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)-এর প্রতি যে এক ধরনের ঘুম সামান্য সময়ের জন্য অবতীর্ণ করে দেয়া হয়েছিলো, যার দ্বারা সকলের ক্লান্তি দূরীভূত হয়ে গিয়েছিলো এবং সকলে নতুনভাবে চৈতন্য লাভ করেছিলেন। যার আলোচনা পবিত্র কুরআনে এসেছে, ইরশাদ হচ্ছে—

أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنكُمْ

অর্থাত, (অতঃপর আল্লাহ তোমাদের উপর) শান্তি অবতীর্ণ করলেন যা ছিলো তন্দ্রার মত, যার ফলে তোমাদের মধ্যে একদল লোক ঝিমুচ্ছিলো।

যা মহান আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বিশেষ ফযল ও অনুগ্রহ বলে পরিস্কারভাবে প্রতীয়মান হয়। সে ধরনের বিশেষ ফযল ও অনুগ্রহ যদি আল্লাহ পাক তার অন্য কোন বান্দাকেও দান করে সৌভাগ্যশালী করেন, তাতে অসম্ভবের কি আছে—মুহাম্মদ শফী)

অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, অভিজ্ঞ হাকীমগণ আমার আসল রোগ 'যাকাওয়াতুল হিস' (অনুভূতির তীক্ষ্ণতা) বলে স্থির করেছেন। আর 'যাকাওয়াতুল হিস' বা অনুভূতির তীক্ষ্ণতা যদিও প্রকৃতপক্ষে একটি কামাল বা বুযুর্গী কিন্তু যখন তা সীমা অতিক্রম করতে থাকে সে সময় তার দ্বারা কষ্ট হতে থাকে। তখন ডাক্তারগণ তাকে রোগ

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

বলে ঘোষণা করেন। এবং তার জন্য এমন কিছু ঔষধ হিসেবে দিয়ে থাকেন যার দ্বারা অনুভূতির তীক্ষ্ণতা কিছুটা হ্রাস পায় এবং তার মাঝে খানিকটা অতীক্ষ্ণতা ও নির্বোধভাব সৃষ্টি হতে পারে।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আমার অবস্থা হচ্ছে, যদি চৌকির উপর বিছানা কিংবা বিছানার চাদর একদিকে একটু বেশী হয়ে যায়, অন্যদিকে একটু কম হয়ে যায় তবে যতক্ষণ আমি তা ঠিক করে না নিবো, ততক্ষণ আমার ঘুম আসবে না। হযরত মির্যা মাযহার জানেজানাঁ (রহঃ)-এর জীবনীতে এ ধরনের অনেক ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। ডাক্তারদের নযরে এমনটিকেও রোগ বলা হয়ে থাকে। আমি সর্বদা আল্লাহ্ পাকের দরবারে দু'আ ও মিনতী করছি, আয় আল্লাহ্! আপনি আমার মিযাজ ও মানসিকতা যেহেতু এ রকম করে দিয়েছেন সুতরাং দয়া করে আপনি আমাকে পরকালেও বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। সেখানে জান্নাতবাসীগণের জুতা রাখার স্থানে একটু জায়গা পেলেই তা আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয় হবে।

জান্নাতবাসীদের কোন অনুশোচনা হবে না

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, জান্নাতের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তাদের তুলনায় উপর স্তরের লোকদেরকে দেখে কোন অনুশোচনা করবে না। বরং প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ অবস্থার মধ্যে মগ্ন থাকবে।

অধম (সংকলক) তখন হযরত থানবী (রহঃ)কে প্রশ্ন করেছিলো, তবে আর পরস্পরের মাঝে স্তরের পার্থক্য হওয়াতে লাভ কি? উত্তরে হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, জ্ঞানগত ও বিশ্বাসগত দিক থেকে তার আসর ও প্রভাব বিদ্যমান থাকবে মানসিক দিক থেকে নয়। তার দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন মাসকলাইয়ের ডাল যদি খুব ভালভাবে পাকানো হয়, তবে তা আমার কাছে কোর্মা থেকেও বেশী পসন্দনীয়। যদিও জ্ঞানগত দিক থেকে আমি একথা জানি যে, বাস্তবিকপক্ষে কোর্মাই হলো উত্তম।

বুযুর্গানে দ্বীনের চিঠিতে শে'র লিখা

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, বুযুর্গানে দ্বীনের পত্রে শে'র (কবিতা) লিখা আদবের পরিপন্থী। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে যা এসে যায়

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

তাতে কোন অসুবিধা নেই।

অধম (সংকলক) যখন হযরত থানবী (রহঃ)–এর খানকায় অবস্থানরত ছিলাম সে সময়ের একটি চিঠিতে আমি হাফেয–এর একটি শে'র লিখে দিয়েছিলাম। শে'রটি ছিলো নিম্নরূপ—

شراب لعل وجائے امن و ، یار مہربان ساقی

دلا کئے بہ شود کارت اگر اکنوں نخواہد شد

অর্থাত, মূল্যবান শরাব, নিরাপদ স্থান আর অত্যন্ত দয়ালু সাকীর পানশালায় তুমি আছো। ওহে দিল! এখনো যদি তোমার কাজ উত্তম ও উন্নত না হয়, তবে আর কখন হবে?

আমাদের বুযুর্গ খাজা আযীযুল হাসান মাজযুব (রহঃ) যিনি তখন সে মজলিসে উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমার চিঠির এই শে'রটির কথা উল্লেখ করে বললেন, এই শে'রটি তো অত্যন্ত উপযুক্ত স্থানেই ব্যবহার করা হয়েছে। মনে চায়, অবশ্যই তাকে বিষয়টি সম্পর্কে যেন লিখা হয়। একথা শুনে হযরত থানবী (রহঃ) মুচকি হেসে চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর হযরত থানবী (রহঃ) বললেন, মিয়া আমাদের বুযুর্গদের ক্ষেত্রে তো 'যদি না হয়' এর কোন আশংকা নেই। লোকদের শুধু কাজ করে যাওয়া উচিত। তারা ঐ 'যদি না হয়' আর 'যদি হয়' এর চিন্তার মধ্যেই কেন পড়ে থাকে।

ফাতাওয়া লিখা সম্পর্কে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আমার ছাত্র জীবনে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) লোকদের জিজ্ঞাসিত মাসয়ালার জবাব লিখার জন্য অধিকাংশ সময়েই আমাকে দায়িত্ব দিতেন। একবার আমি একটা ফাতাওয়া খুব দীর্ঘ করে বিস্তারিতভাবে লিখে হুযূরের সামনে পেশ করলাম। তখন তিনি বললেন, মনে হয় অবসর খুব বেশী। আমরা তো জানি যে, এক সময় প্রশ্নের বিরাট স্তূপ তোমার সামনে থাকবে। তখন কি এতটা বিস্তারিত লিখতে পারবে।

এটা ছিলো হযরত থানবী (রহঃ)–এর ভবিষ্যদ্বাণী। এখন বাস্তবেই যখন দেখতে পাই যে, প্রশ্নের একটি বিরাট স্তূপ আমার সামনে, তখন

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

অনেক সময় জবাব লিখতে গিয়ে শুধু হাঁ এবং না লিখেই ক্ষান্ত করি।

অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, ফিকাহ এবং হাদীসের সাথে আমার পরিপূর্ণ সম্পৃক্ততা নেই। এর চাইতে তাফসীরের সাথে আমার তুলনামূলক বেশী সম্পর্ক রয়েছে। আর আলহামদুলিল্লাহ! সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ!! তাসাওউফের সাথে আমার পরিপূর্ণ মুনাসাবাত ও সম্পৃক্ততা রয়েছে।

মুজাদ্দিদ ও কুতুব-এর কিছু নিদর্শন

তৎকালীন সময়ের একজন বিশিষ্ট বুযুর্গ হযরত মাওলানা সৈয়্যদ মুর্তযা হাসান সাহেব (রহঃ)। যিনি হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ)-এর সাথে একই শ্রেণীতে পড়াশুনা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও হযরত থানবী (রহঃ)-এর বুযুর্গীর কারণে হযরত (রহঃ)-এর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও তার অনুসরণের মানসিকতা নিয়ে দরবারে হাযির হতেন এবং কখনো পূর্ণ রমযান মাসই তিনি খানকায় কাটিয়ে দিতেন। তিনিও তখন এক মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই বলে হযরত থানবী (রহঃ)কে প্রশ্ন করলেন যে, হযরত! আমরা আপনাকে বর্তমান সময়ের মুজাদ্দিদ মনে করি। আপনি প্রচলিত বিনয়ের আশ্রয় না নিয়ে আমাদেরকে সঠিক কথাটি বলে দিন যে, আমাদের ধারণা ঠিক কিনা?

হযরত থানবী (রহঃ)-এর উত্তরে বললেন, আমি খুব বেশী বিনয় দেখাই না (কারণ অধিক বিনয় দেখাতে গেলে তা একপ্রকারের লৌকিকতা হয়ে যায়) আপনারা যা ধারণা করছেন তার সম্ভাবনা তো রয়েছে, তবে তা নিশ্চিত না।

অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, 'কুতবুল ইরশাদ হওয়ার নির্দশন হলো, যে ব্যক্তি ঐ বুযুর্গের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা পোষণ না করে, তার অনুকরণের মানসিকতা না রাখে বরং তার প্রতি বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করে, সে ঐ বুযুর্গের বিশেষ ফায়েয ও বরকত থেকে বঞ্চিত হয়। বঞ্চিত হয় ঠিক তবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। অর্থাত এর উপর তার মুক্তি নির্ভরশীল নয়, তবে বাতেনী উন্নতি সাধিত হয় না।

আল্লাহ পাকের হিফাযত

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, খেলাফত

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

আন্দোলন চলাকালে তার প্রোগ্রামসমূহে যেহেতু আমি অংশগ্রহণ করিনি, তাই সাধারণ লোকেরা আমার বিরোধী হয়ে গিয়েছিলো। সে সময় আমি লক্ষ্য করেছি যে, আমাদের বড় ঘরের সামনে সর্বদাই কোন একজন আল্লাহর ইশকে দেওয়ানা লোক পড়ে থাকতো। একজন চলে গেলে সাথে সাথে আরেকজন এসে যেতো। আমি বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ পাক আমাদের হেফাযতের জন্য এ ব্যবস্থা করেছেন।

নবী (আঃ)গণ থেকে কোন গুনাহ প্রকাশ পায় না

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) বলতেন, নবী (আঃ)গণ থেকে প্রকৃতপক্ষে কোন গুনাহের কাজ প্রকাশ পায় না। তাঁদের কিছু কথা ও কাজকে পবিত্র কুরআনে 'ইসয়ান' (অপরাধ) ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। তা শুধুমাত্র ঐ কাজের বাহ্যিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করেই করা হয়েছে। কারণ বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা দেখতে গুনাহ বা অপরাধের মতই ছিলো। আর এসব কিছুরই বাস্তব অবস্থা এবং হাকীকত ছিলো, আনুগত্য ও ইবাদত। মজলিসে উপস্থিত লোকদের কেউ কেউ বর্ণনা করলেন যে, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম সাহেব (রহঃ)–এর গবেষণা ও তাহকীক উপরোক্ত বক্তব্যের অনুরূপই ছিলো, যা কাসেমুল উলূম নামক পুস্তিকায় প্রকাশ করা হয়েছে।

একজন আলিম এবং একজন আরিফ

পূর্ববর্তী বিশিষ্ট আলিমগণের একজন ছিলেন হযরত মুফতী এলাহী বখ্শ সাহেব কান্ধলভী। তাকওয়ার ক্ষেত্রে তিনি খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে কষ্টের কারণে কোকানোর পরিবর্তে তিনি 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলছিলেন। মুফতী সাহেবের এক ভাই যিনি আলিমও ছিলেন আবার আরিফ (আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন নেককার ব্যক্তি)ও ছিলেন, তিনি দেখলেন যে, মুফতী সাহেব নিজে ইচ্ছা করে 'আহ আহ' বলার পরিবর্তে আল্লাহ আল্লাহ যিকির করছেন। তখন তিনি বললেন, ভাই সাহেব আহ্ আহ্ বলতে থাকুন তবে কিছুটা আরাম পাবেন। দেখা গেলো যে, বাস্তবেও তাই হলো।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, তার ভাইয়ের সম্ভবতঃ এটাই অনুভূত

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হয়েছে যে, স্বাভাবিকতা পরিহার করে স্বেচ্ছায় আল্লাহ আল্লাহ বলার মধ্যে এক ধরনের দাবী পাওয়া যায়। আর অসুস্থ অবস্থায় আল্লাহ পাক মানুষের কাছ থেকে তার হীনতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করাকেই পসন্দ করেন। মাওলানা রুমী (রহঃ) বলেছেন—

چونکہ بر میخت بہ بندد بستہ باش چوں کشاید چابک و برجستہ باش

অর্থাত, মহান আল্লাহ যখন তোমাকে আবদ্ধ রাখতে চান, তখন তুমি আবদ্ধ ও বন্দী থাকো। আর যখন তোমাকে তিনি একটু স্বাধীনতা ও সুযোগ দান করেন তখন তুমি তা গ্রহণ করে স্বাধীন ও খোলাই থাকো।

পূর্বকালের এবং বর্তমানকালের ছাত্রের পার্থক্য

হিজরী চৌদ্দতম শতাব্দীর প্রথম বৎসর ১৩০১ হিজরী সনে হযরত থানবী (রহঃ) দারুল উলূম দেওবন্দে প্রচলিত পন্থার দরসী ইলম হাসিল করা সমাপ্ত করেন। সে সময় দারুল উলূমে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, সনদ বিতরণের সভা হবে। এবং সকলেই জানতে পারলো যে, সে সভায় শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্রদেরকে সনদ দেয়া হবে। সেমতে যারা দাওরায়ে হাদীস শিক্ষা শেষ করেছেন তারা একত্রিত হলেন। তাদের মধ্যে হযরত থানবী (রহঃ)ও ছিলেন। তারা একত্রিত হয়ে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)–এর খেদমতে হাযির হলেন এবং তাঁর কাছে আরয করলেন যে, হযরত! আমরা তো কিছুই জানি না। আমাদেরকে যদি দারুল উলূম থেকে সনদ দেয়া হয় তবে এতে দারুল উলূমের বদনাম হবে। এজন্য সনদ দেয়ার বিষয়টি মুলতবী করে দিলে ভাল হয়।

একথা শুনে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব (রহঃ) বললেন, কে বলেছে তোমরা কিছু জানো না, এখানে তোমরা নিজেদের উস্তাদগণের সামনে আছো, এজন্য তোমাদের কাছে মনে হচ্ছে তোমরা কিছুই জানো না। আমি আল্লাহ পাকের কসম করে বলছি, তোমরা যেখানেই যাবে প্রত্যেকেই একেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে সন্দেহ নেই।

পরবর্তী বুযুর্গদের মাঝে কারামত অধিক হওয়ার কারণ

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, ইমাম আহমদ

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

ইবনে হাম্বল (রহঃ)–এর কাছে কোন এক লোক প্রশ্ন করেছিলো যে, সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) থেকে স্বাভাবিকতা পরিপন্থী কাজ (কারামত) খুব কমই প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু পরবর্তী সময়ের ওলীগণের মাঝে এর আধিক্য লক্ষ্য করা যায়, এর কারণ কি? এর জবাবে হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর যুগের নিকটবর্তী সময় হওয়ার কারণে সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)–এর সময়ে এবং কুরুনে উলা বা প্রথম যমানার লোকদের অন্তরে দ্বীন গ্রহণের যোগ্যতা শক্তিশালীভাবে উপস্থিত ছিলো এবং তাদের সামনে বিভিন্ন নিদর্শন ও প্রমাণ বর্তমান ছিলো। এজন্য তখন তাদেরকে স্বাভাবিকতা পরিপন্থী আশ্চর্য কোন কারামত দেখানোর তেমন প্রয়োজন ছিলো না। পরবর্তীতে যখন ঈমানের মধ্যে দুর্বলতা বৃদ্ধি পেলো তখন এর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

খাজা আযীযুল হাসান মাজযূব (রহঃ) তখন সে মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, ব্যাপারটা যদি এমনই হয়, তবে বর্তমান সময়ের দাবীতো হলো, কারামত এবং স্বাভাবিকতা পরিপন্থী কাজ সবচাইতে বেশী হওয়া। হযরত থানবী (রহঃ) তখন বললেন, হিকমত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। বর্তমান সময়ে কারামত কম হওয়ার পিছনে অন্য কোন হিকমত রয়েছে।

দীর্ঘসময় যাবত বুযুর্গানে দ্বীনের আলোচনা হওয়ার পর যখন মজলিস শেষ হলো, তখন খাজা আযীযুল হাসান সাহেব বললেন, ঐ সকল বুযুর্গানে দ্বীনের আলোচনার মধ্যেও এক আশ্চর্য ধরনের আকর্ষণ রয়েছে। শুধু আকর্ষণই নয় বরং আগুন লেগে যায়। আমার তো সমস্ত শরীরে উত্তাপ সৃষ্টি হয়ে যায়। তিনি যখন একথা বলছিলেন, তখনো তার শরীর থেকে ঘাম ঝরছিলো।

একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, কাজ করার দ্বারা রাস্তা খুলে যায়, এই অপেক্ষা করা ঠিক নয় যে, পূর্ব থেকেই যদি রাস্তা দেখতে পাই তবে সামনে বাড়বো, এর উদাহরণ এরূপ—যেমন কোন বড় রাস্তার দু' পাশে যদি গাছ লাগানো থাকে এবং রাস্তাটি সোজাভাবে সামনে এগিয়ে যায়। এরূপ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে যদি সম্মুখে দৃষ্টি করা হয় তাহলে দেখা যাবে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

কিছু দূর সামনে গিয়ে উভয় দিকের গাছগুলো পরস্পর মিলে গেছে। (এরপর আর কোন রাস্তা নেই) কিন্তু যতই সামনে বাড়বে ততই রাস্তা খুলতে থাকবে এবং তা নযরে আসতে থাকবে।

মাওলানা রুমী (রহঃ) খুব চমৎকার বলেছেন—

گرچہ رخنہ نیست عالم را پدید!

خیرہ یوسف واری باید دوید

অর্থাত, যদিও কোন ছিদ্রপথ বা রাস্তা পৃথিবীতে নাও থাকে তবুও হযরত ইউসুফ (আঃ)–এর মত সম্ভাব্য চেষ্টা হিসেবে দরজা পর্যন্ত তোমাকে যেতে হবে এবং দেখতে হবে তারপর কি হয়।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

শা'বান ও রমাযান ১৩৪৯ হিজরীর মালফূযাত

একটি শে'র ও তার মর্ম

কোন এক কথা প্রসঙ্গে হযরত (রহঃ) বললেন—

چوں تو یوسف نیستی یعقوب باش ہمچو اودر گریہ وآشوب باش

অর্থাত, তুমি যদি ইউসুফ (আঃ) হতে না পারো, তবে ইয়াকুব (আঃ) হও এবং তার মত ক্রন্দন করতে এবং অশ্রু প্রবাহিত করতে শিখ।

এর মর্মই হচ্ছে, তরীকতের সালেকের জন্য হাল ও ইশকের অধিকারী হতে হবে। এবং যেই হাল বা ইশকের অবস্থা তার সামনে আসে তাকে গুরুত্ব দেয়া তার জন্য খুব প্রয়োজনীয় বিষয়।

আল্লাহ পাকের গুণাবলী সম্পর্কে

দর্শনবিদ বা মুতাকাল্লিমীন আল্লাহ পাকের সিফাত সম্পর্কে বলেছেন, তা আল্লাহ পাকের 'আইনে যাতও নয় আবার গাইরও নয়' অর্থাত আল্লাহ পাকের গুণাবলী অবিকল আল্লাহর সত্তাও নয় আবার তা থেকে একেবারে ভিন্ন কিছুও নয়। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, এখানে 'আইন' (অবিকল সত্তা) বলতে মানতেকী পরিভাষায় 'আইন' উদ্দেশ্য। অর্থাত, একেবারে অবিকল আল্লাহ পাকের যাত বা সত্তা। আর 'গাইর' (ব্যতিক্রমী বা ভিন্ন) বলে এখানে গাইরে উরফী বা পারিভাষিক 'গাইর' উদ্দেশ্য। অর্থাত কোনরূপ সম্পর্কহীন ভিন্ন বস্তু। এর দ্বারা সারকথা এই হলো যে, মহান আল্লাহ পাকের গুণাবলী যদিও তার অবিকল যাত বা সত্তা নয় কিন্তু তাই বলে একেবারে ভিন্ন ও কোনরূপ সামঞ্জস্য সম্পর্কহীন বস্তুও নয়।

মি'রাজের আয়াতের বিশ্লেষণ

শবে মি'রাজে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর একটি সফর তো যমীনেই হয়েছে। তাহলো মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত। এরপর দ্বিতীয় সফর সেখান থেকে আসমানের দিকে।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

কিন্তু পবিত্র কুরআনের আয়াত

اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا

অর্থাত মহান আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাকে রাত্রিকালে ভ্রমণ করিয়েছেন। এর মধ্যে শুধু প্রথমে যে যমীনে সফর করেছেন তার কথাই বলা হয়েছে। আসমানের দিকে যে সফর করেছেন তার কথা আলোচনা করা হয়নি। এর কারণ হলো আয়াতে রাত্রিকালীন সফর বলে একটি কথা রয়েছে। আর দিন ও রাত হলো, এই দুনিয়ার ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত। আসমানে এ ধরনের রাত্র-দিন নেই, যা সূর্য উদিত হওয়া ও ডুবে যাওয়ার কারণে হয়ে থাকে। এ কারণে সফর শব্দের সাথে রাত্রের কথা থাকার কারণে শুধু যমীনের সফরের কথাই আলোচনা করা হয়েছে। আর আসমানের সফরের কথা সুরায়ে নজম-এর মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে—

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى

অর্থাত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত সফর করেন।

একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, অনেক লোকের মাথায় এ ধরনের চিন্তা থাকে যে,আমি এমন হবো যাতে দলে দলে লোক আমার দিকে ধাবিত হয়ে যায়। বিষয়টি ভালভাবে বুঝে নিন যে, লোকদের কারো প্রতি ধাবিত হওয়া কোন কামাল বা বুযুর্গীর বিষয় নয়। বরং আসল কামাল ও বুযুর্গী হলো, নিজে ধাবিত হতে পারা। অর্থাত নিজে আল্লাহ পাকের দিকে ধাবিত হওয়ার গুণ অর্জন করতে হবে। এরপর আল্লাহ পাক তার প্রতি অন্যদের ধাবিত করে দেন কিংবা না দেন সবই তাঁর ইচ্ছা। আর এ উভয় অবস্থার মধ্যে শুধুমাত্র মঙ্গলই নিহিত। তাই যে অবস্থাই সামনে আসুক না কেন তাঁর প্রতি শোকর গোযার এবং সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

একজন ইংরেজ ঐতিহাসিকের কথা

একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেছেন যে, ইসলাম হিন্দুস্থানে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

অধিকতর প্রসার লাভ করেছে সুফিয়ায়ে কিরাম এবং ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে। (কথাটা একজন ইংরেজ ঐতিহাসিকের হলেও কত মূল্যবান এবং বাস্তবসম্মত কথা, তা একটু ভেবে দেখলেই আমরা অনুমান করতে পারি—অনুবাদক)

আজমীর শরীফ

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, একবার আহমদাবাদ যাওয়ার সময় হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহঃ)–এর সাথে আজমীর শরীফ যাওয়া হলো, সেখানে গিয়ে মা'নুবী বা বাস্তব ও অপার্থিব দৃষ্টিতে সে দরবারকে একটি উন্নতমানের শাহী দরবার বলেই মনে হতে লাগলো। তথাকার প্রত্যেকটা দেয়াল ও দরোজা নূরে পরিপূর্ণ দৃশ্যমান হচ্ছিলো।

উলামায়ে কিরামের পারস্পরিক মতপার্থক্য

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, মাওলানা আবদুল হক খায়রাবাদী ও মাওলানা আবদুল হাই সাহেব লাক্ষ্ণৌবী (রহঃ) দ্বয়ের মাঝে কিছু মাসআলার ক্ষেত্রে ইলমী মতপার্থক্য ছিলো। কিছু লোক একবার মাওলানা আবদুল হাই সাহেব (রহঃ)–এর সামনে নিন্দার দৃষ্টিতে মাওলানা আবদুল হক সাহেব (রহঃ) সম্পর্কে আলোচনা করলে মাওলানা আবদুল হাই সাহেব (রহঃ) তাদেরকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিলেন।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ)–এর কথা

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ) 'ফুয়ূযুল হারামাঈন' নামক কিতাবে লিখেছেন, কয়েকটা ক্ষেত্রে প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আমার মন–মানসিকতার বিরুদ্ধে বাধ্য করেছেন। একটি হলো, মানসিকভাবে হযরত আলী (রাযিঃ)কে সর্বাধিক সম্মান করা আমার কাছে পসন্দনীয় ছিলো। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাইখাইনকে (হযরত আবু বকর (রাযিঃ) ও হযরত উমর (রাযিঃ)দ্বয়কে) হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে অধিক সম্মানী ভাববার জন্য বাধ্য করেছেন।

আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো তাকলীদ বা ইমাম মেনে চলার প্রতি

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

মানসিকভাবে আমার মাঝে অনীহা ছিলো কিন্তু প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার মাযহাবের বাইরে যেতে বারণ করে দিয়ে আমাকে মাযহাবের তাকলীদ করতে বাধ্য করেছেন।

প্রতিশোধ গ্রহণ ও ধৈর্যধারণের মূলনীতি

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, মাওলানা মুহাম্মদ আলী সাহেব মোংগীরী (রহঃ) হযরত শাহ ফযলুর রহমান সাহেব (রহঃ) গঞ্জ মুরাদাবাদীর খলীফা ছিলেন। প্রাথমিক অবস্থায় একজন মাজযূব ও দেওয়ানা ধরনের লোকের কাছ থেকেও তিনি ইস্তিফাদা ও উপকার হাসিল করেন। তার একটি মালফূয আমার স্মরণ আছে, তিনি বলেছেন—

"যদি কেউ তোমাকে কষ্ট দেয়, তবে তুমি তার প্রতিশোধও নিও না আবার পুরোপুরি ধৈর্যও ধারণ করো না।"

তার মর্ম এই ছিলো যে, পরিপূর্ণ সবর করার কারণে কখনো ঐ কষ্টদাতা ব্যক্তির উপর আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে কোন একটা আযাব এসে যায়, এজন্য তার প্রতি দয়ার দৃষ্টি রেখে সাধারণ কিছু প্রতিশোধমূলক কাজ করে নাও।

হযরত শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (রহঃ) 'হাদীসে লাদুদ'-এর ব্যাখ্যা এই মূলনীতির ভিত্তিতে করেছেন, 'লাদুদ' ঐ ঔষধকে বলা হয়, যা বিশেষ পদ্ধতিতে অসুস্থ ব্যক্তির কণ্ঠনালীতে প্রবেশ করানো হয়। হাদীসের ঘটনাটি হলো নিম্নরূপ—

একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হলেন। সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)-এর মাঝে পরস্পর পরামর্শ হলো যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'লাদূদ' (কণ্ঠনালীতে ঔষধ প্রবেশ) করাতে হবে। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করতে নিষেধ করলেন। কিন্তু এরপর হঠাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অচেতন হয়ে গেলেন। হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) খেয়াল করলেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিষেধ করার বিষয়টি ছিলো, একটি স্বভাবসুলভ ব্যাপার। কারণ অসুস্থ ব্যক্তির স্বভাবতই ঔষধের প্রতি অনীহা ভাব থাকে। এটা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবশ্য পালনীয় কোন নিষেধাজ্ঞা নয়। এজন্য

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) অচেতন অবস্থায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'লাদূদ' (কণ্ঠনালীতে ঔষধ প্রবেশ) করালেন। যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুঁশ ফিরে এলো, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে আমাকে 'লাদূদ' করেছিলো। এরপর তিনি বললেন, আমাকে 'লাদূদ' করানোর কাজে যারা যারা অংশগ্রহণ করেছে, তাদের সকলকে 'লাদূদ' করাতে হবে। সেমতে তেমনই করা হলো।

উল্লিখিত ঘটনায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরোধিতাকারীদের কাছ থেকে তিনি নিজের প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বাভাবিক অভ্যাস হলো নিজের কোন ব্যাপারে কারো কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না করা। হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ) বলেন, ঐ সময় প্রতিশোধ গ্রহণ করা সম্ভবতঃ এই মঙ্গলজনক দিক সামনে রেখেই হয়েছিলো যে, এ সকল সাহাবী (রাযিঃ) যাদের থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিষেধাজ্ঞার পরিপন্থী কাজ প্রকাশ পেয়েছিলো, তারা যাতে দুনিয়া বা আখিরাতে বড় ধরনের কোন শাস্তিতে নিমজ্জিত হয়ে না পড়ে।

হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ) বলেন, একবার এক বুযুর্গ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার সাথে ছিলো তারই একজন মুরীদ। পথিমধ্যে তারা একটি কূয়া দেখতে পেলেন যে কূয়া থেকে লোকেরা পাত্রে পানি ভরে নিচ্ছিলো। তাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধা মহিলাও ছিলো। সে মহিলা এ বুযুর্গকে দেখে তাকে লক্ষ্য করে কিছু অশালীন ও খারাপ কথা বললো। এবার ঐ বুযূর্গ তার মূরীদকে আদেশ দিলেন ঐ মহিলাকে মারার জন্য। কিন্তু ঐ মুরীদ খুব অস্থির হলো, কারণ এ বুযুর্গ কোনদিন কারো কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না। অথচ এখন আমাকে একজন বৃদ্ধা মহিলাকে মারার জন্য আদেশ দিচ্ছেন। সম্ভবতঃ আমিই ভুল শুনেছি বা ভুল বুঝেছি। এ কারণে মুরীদের তাকে মারতে কিছুটা বিলম্ব হয়ে গেলো। এরই মধ্যে ঐ বৃদ্ধা সেখানেই পড়ে মারা গেলো। তখন ঐ বুযুর্গ মুরীদকে লক্ষ্য করে বললেন, যালিম! তুমিই এ বৃদ্ধাকে খুন করলে। যখন এ বৃদ্ধা আমার প্রতি অশালীন শব্দ উচ্চারণ করলো, তখন আমি দেখতে পেলাম আল্লাহ পাকের গযব তার দিকে ধাবিত হচ্ছে। তাকে ঐ গযব থেকে উদ্ধার করার একটাই পথ ছিলো তা হলো আমার তার থেকে কিছু প্রতিশোধ নিয়ে নেয়া। এ কারণেই আমি তাকে প্রহার করার আদেশ

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

করেছিলাম। কিন্তু তুমি তা করতে বিলম্ব করে ফেললে, যে কারণে আল্লাহ পাকের আযাব তাকে গ্রাস করে ফেলেছে।

সময়ের মাঝে বরকত

এ কথাটি খুবই প্রসিদ্ধ বরং অকাট্য বাস্তব যে, আল্লাহর ওলীগণের সময়ের মাঝে খুব বেশী বরকত হয়ে থাকে। তারা অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বড় বড় কাজ সমাধা করে থাকেন। হযরত ইমাম গাযযালী (রহঃ)–এর লিখা কিতাবসমূহকে যদি তার পূর্ণ বয়সের মধ্যে হিসাব মত ভাগ করে দেয়া হয় তবে প্রতিদিনের ভাগে পড়ে ১৬ খণ্ডের একটি রচনা, যা কোনভাবেই বুঝে আসার কথা নয়।

এছাড়া শাইখ আবদুল ওয়াহহাব শা'রানী (রহঃ) তার লিখিত গ্রন্থ 'আল ইওয়াকীত ওয়াল জাওয়াহের' এর মধ্যে বলেছেন যে, এই কিতাবের মধ্যে তিনশত বাব বা অধ্যায় রয়েছে। এর প্রত্যেকটা অধ্যায় লিখার পর পর আমি শাইখে আকবর ইবনে আরাবী (রহঃ)–এর লিখিত কিতাব 'আল ফুতূহাত' শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করেছি। আল ফুতূহাত কয়েক হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব। সেমতে 'আল–ইওয়াকীত ওয়াল জাওয়াহির' কিতাবটি লিখার সময় সম্পূর্ণ 'ফুতূহাত' গ্রন্থটি তিনশত বার পাঠ করা হয়েছে। এর সাথে তিনি একথাও লিখেছেন যে, এ কিতাবটি আমি ৩০ দিনে লিখেছি। সেমতে প্রতিদিন 'ফুতূহাত' দশবার পাঠ করা হয়েছে। যে কিতাবটিতে দুই হাজারেরও অধিক পৃষ্ঠা রয়েছে। উলামায়ে কিরাম, সুলাহায়ে ইযাম এবং বুযুর্গানে দ্বীনের এ ধরনের অনেক ঘটনা প্রসিদ্ধ রয়েছে।

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, সময়ের মধ্যে এত অধিক প্রশস্ততা ও বরকত কিভাবে সৃষ্টি হয়। কারণ ঘন্টাতো ষাট মিনিটেই হয়, এর থেকে তো আর বাড়ে না। তারপর রাত্র ও দিন চব্বিশ ঘন্টাতেই হয়ে থাকে, এর থেকেও বৃদ্ধি পায় না। এক্ষেত্রে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসেম তানুতবী (রহঃ) গবেষণাসুলভ বক্তব্য হচ্ছে, সময়ের একটা দৈর্ঘ্য রয়েছে যা সকলেই জানে। ঘন্টা আর মিনিটের এই হিসাব হলো সময়ের দৈর্ঘ্য। অনুরূপভাবে সময়ের মাঝে একটি প্রস্থও রয়েছে যা সাধারণ নযরে দেখা যায় না। এ সকল বুযুর্গানে দ্বীন সময়ের সেই প্রস্থতার মাঝেই বড় বড় কাজ সমাধা করে নেন।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

বুযুর্গানে দ্বীনের লৌকিকতামুক্ত মেহমানদারী

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)–এর সাহেবজাদা হাকীম মুঈনুদ্দীন সাহেব নানুতবী (রহঃ)–এর কাছে একবার হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহঃ) মেহমান হয়ে আগমন করলেন। হযরত হাকীম সাহেব (রহঃ)–এর ঘরে তখন খানা পাকানোর কোন কিছুই ছিলো না। তিনি সেদিন অভুক্ত ছিলেন। ফলে হাকীম সাহেব নিজ মেহমান হযরত গাংগুহী সাহেব (রহঃ)কে পরিষ্কার ভাষায় জানালেন যে, আমাদের ঘরে আজ খাবার কিছুই নেই আমরা আজ অভুক্ত তবে অনেকেই আপনাকে দাওয়াত দিতে এসেছে কিন্তু আমি তা গ্রহণ করিনি। আজকে যদি আপনি অনুমতি দান করেন, তবে দাওয়াত কবুল করে নিবো। জবাবে হযরত গাংগুহী (রহঃ) বললেন, না আজ আমি কারো দাওয়াত কবুল করবো না। আপনার ঘরে আপনারা যখন আজ অভুক্ত থাকছেন, আমিও অভুক্ত থাকবো।

এভাবে সারাদিন কেটে গেলো। সন্ধ্যার সময় এক ব্যক্তি হাকীম সাহেব (রহঃ)কে দশটি টাকা দিলো। তখন তিনি হযরত গাংগুহী (রহঃ)–এর কাছে এসে বললেন, এখন তো আমার হাতে পয়সা এসে গেছে সুতরাং কিছু উন্নতমানের খানা পাকানোর ইচ্ছা করেছি। এতে একটু সময় বেশী লাগবে তাই আপনাকে খানিকটা অপেক্ষা করতে হবে।

হযরত গাংগুহী (রহঃ) প্রসঙ্গে

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আমি স্বপ্নযোগে এক বুযুর্গের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম যে, হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহঃ) কোন্ স্তরের ব্যক্তিত্ব? ঐ বুযুর্গ জবাব দিলেন, 'তিনি কুতবুল ইরশাদ'। অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, অনেকে আমার সম্পর্কেই আমাকে প্রশ্ন করে যে, আপনি কুতবুল ইরশাদ কিনা? আমি তার জবাবে বলি, হওয়া এবং না হওয়া উভয়টিরই সম্ভাবনা রয়েছে। হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন যে, হযরত শাইখ আবদুল কুদ্দুস গাংগুহী (রহঃ) নিজের লিখার শেষে লিখতেন—

دعا گوئے عالم

অর্থাত, গোটা আলমের জন্য দু'আ ও মঙ্গল কামনা করছি।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

এটা হযরত শাইখ আবদুল কুদ্দুস গাংগুহী (রহঃ)–এর কুতুব হওয়ারই ইঙ্গিত বহন করে। কারণ গোটা আলমের কুতুবগণ সমস্ত সৃষ্টিজীবের জন্যই মঙ্গলকামী হন।

একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, দ্বীনদারীর পুরোটাই নির্ভরশীল কোন বুযুর্গের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধাসহকারে তার অনুসরণ এবং তার হাতে নিজেকে অর্পণ করে দিয়ে তার পূর্ণাঙ্গ অনুকরণের উপর। তবে ভক্তি বিশ্বাস সহকারে যার অনুসারী হবে তার ব্যাপারে খুব সতর্কতা সহকারে, ভালভাবে জেনে শুনে তাহকীক করে নেয়া আবশ্যক। অন্যথায় কারো অনুকরণ করেও পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে হয়।

লোকদেরকে অস্থিরতা থেকে বাঁচানো

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, আমি সফরের অবস্থায় নিজের সামানপত্র নিজে বহন করতাম না। এর কারণ ছিলো আমি এমনটি করলে এর দ্বারা আমার সফর সঙ্গীদের খুব কষ্ট হয়, তারা দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দেয় এবং খুব অস্থির হয়ে যায়। আমি যদি কখনো সকালে খুব ভোরে খানকায় চলে আসি তবে যে লোক ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রাতে আরাম করে ঘুমাতে থাকে তাকে আমি ঘুম থেকে ডেকে উঠাই না। যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজে নিজের সময়মত স্বাভাবিকভাবে ঘুম থেকে না উঠতো, ততক্ষণ আমি বাহিরে মসজিদে বসে থাকতাম।

হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)–এর বাণী

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, হাদীস শরীফে উম্মতে মুহাম্মদী তিহাত্তর গ্রুপে বিভক্ত হওয়া এবং তার মধ্যে শুধু একটি গ্রুপ বেহেশতে ও বাকী বাহাত্তর গ্রুপ দোযখে যাওয়া সম্পর্কে যে কথাটি বর্ণিত হয়েছে এর অর্থ এই নয় যে, এই বাহাত্তর গ্রুপ চিরদিনের জন্যই দোযখে যাবে এবং যে গ্রুপটি মুক্তিপ্রাপ্ত তাদের জন্যও এমনটি আবশ্যকীয় নয় যে, তারা দোযখ থেকে একেবারেই মুক্ত থাকবে। বরং হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে, বাহাত্তর গ্রুপের লোকদের আকীদা–বিশ্বাস ও আমল উভয়টির জন্যই

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

আযাব হবে, আর মুক্তিপ্রাপ্ত দলটির কারো যদি শাস্তি হয় তাহলে তা শুধু আমলের প্রতি যথাযথ লক্ষ্য না করার কারণে শাস্তি হবে, এ উভয় দলের কোন দলই চিরদিনের জন্য জাহান্নামী নয়।

ইলমে মুকাশাফার তাহকীক না করা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, 'উলূমে মুকাশাফাহ' তথা আধ্যাত্মিকভাবে অর্জিত জ্ঞানসমূহের তাহকীক এবং তা মযবূত করার পিছনে না পড়ার জন্য আমি তোমাদেরকে অসীয়্যত করছি। এমনটি কক্ষণো করা উচিত নয়। কারণ এটি খুবই আশঙ্কাজনক বিষয়। রেলগাড়ীতে সকলেই আরোহণ করে কিন্তু রেলের ইঞ্জিনের কলকব্জার তাহকীক কোন মুসাফির করতে যায় না।

নিজের মাঝে যোগ্যতা সৃষ্টি করা

এক বুযুর্গ অসীয়্যত করলেন যে, কখনো মালফূযাত মুখস্থ করার চিন্তায় লিপ্ত হবে না। বরং এমন চেষ্টা করবে, যাতে তোমার মুখ থেকেও এ ধরনের দামী কথা ও মালফূযাত বের হতে থাকে।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, মালফূযাত মুখস্থ করার দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন, একটি অসম্পূর্ণ কূপ খোদাই করা হলো। এরপর বিভিন্ন কূপ থেকে পানি এনে তার মধ্যে জমা করা হলো। এর চাইতে উত্তম হলো ঐ কূপটাকে আরো বেশী করে খোদাই করে সেটাকে পানির স্তর পর্যন্ত পৌছে দেয়া, যাতে সেই কূপের মধ্য থেকেই পানি নির্গত হতে পারে। এ কারণেই কোন বিশেষ মালফূযের তাহকীক করার পিছনে লেগে যাওয়া উচিত নয়। তবে স্বাভাবিকভাবে যা মুখে এসে যায় সেটাকে মালফূয বানিয়ে নেয়া ভাল।

এক পাগলের সচেতনতা

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, কোন এক ব্যক্তি আল্লাহ পাকের প্রেমে আত্মহারা এক পাগল দেওয়ানাকে জিজ্ঞাসা করেছিলো যে, আকল কি জিনিস? সে জবাব দিয়ে দিলো, যা আল্লাহ পাককে লাভ করতে পারে, অতঃপর তাকে পুনরায় প্রশ্ন করা হলো, আল্লাহ কি? সে জবাব দিলো, যা মানুষ আকল বা জ্ঞান দ্বারা বুঝতে পারে না। (একজন পাগল

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হওয়া সত্ত্বেও তার জবাব ছিলো কত বাস্তবসম্মত, একজন সতর্ক ও সচেতন মানুষের মত—অনুবাদক)

একটি দার্শনিক ও মানতেকী বিষয়

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, ربط حادث بالقديم (স্থায়ী বস্তুর সাথে অস্থায়ী বস্তুর সম্পৃক্ততা)–এর বিষয়টি দর্শন শাস্ত্রবিদ ও মানতেকীদের নিকট খুবই কঠিন একটি বিষয়। তার পরিপূর্ণ হাকীকত কারোই পুরোপুরি বুঝে আসে না। এর আসল কারণ হলো, 'রবত' হচ্ছে একটা সম্পর্ক। আর কোন সম্পর্ক ঐ সময় পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে বুঝা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত পরস্পর সম্পৃক্ত দুটি বস্তুকে ভালভাবে না বুঝবে, আর এখানে সম্পৃক্ত দুটি বস্তুর একটি হলো 'হাদেস' বা অস্থায়ী যার সম্পর্কে অবগতি লাভ করা মানুষের জন্য খুবই কঠিন। আর অপরটি হলো 'কাদীম' বা স্থায়ী ও চিরঞ্জীব সত্তা যার হাকীকতের জ্ঞান লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

مسئله وحدة الوجود (একক অস্তিত্ব)–এর বিষয়টিও ربط حادث بالقديم–এর একটি পদ্ধতি। হুকামা বা ইলমে হিকমত সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মাঝে যে পাঁচটি পদ্ধতি প্রসিদ্ধ রয়েছে এটি তারই অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে وحدة الوجود তাসাওউফের কোন বিষয় নয়। বরং এটি একটি দার্শনিক বিষয়। সুফিয়ায়ে কিরাম তাদের আগ্রহ ও ইচ্ছার ভিত্তিতে বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে এর দ্বারা কার্যসিদ্ধি করেছেন।

একটি মজার কৌতুক

খাজা আযীযুল হাসান সাহেব একবার হযরত থানবী (রহঃ) এর খিদমতে আরয করলেন, আমার কাছে یادگار غالب নামক কবি গালিব এর শ্রেষ্ঠ কবিতার একটি সংকলন রক্ষিত আছে। আপনি যদি মাঝে মাঝে দেখেন, তবে আমি তা আপনার কাছে রেখে দিবো। তখন হযরত থানবী (রহঃ) বললেন, এখানে মাগলুব (পরাজিত)দের কথা শুনবার, তাদের অবস্থা দেখবারই তো সুযোগ পাই না, গালিব (বিজয়ী)–এর কালাম (কবিতা) দেখবো কখন?

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

বুযুর্গানে দ্বীনের একটি কথা

কেউ কেউ এ কথাটিকে হাদীস বলেও উল্লেখ করেছেন, কথাটি হলো, তিন ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করো, একজন ঐ ব্যক্তি যে কোন সম্প্রদায়ের কাছে সম্মানিত ছিলো, এরপর সে অপদস্ত হয়ে গেছে। দ্বিতীয় জন ঐ ব্যক্তি, যে প্রথমে সম্পদশালী ছিলো পরে গরীব ও দুঃস্থ হয়ে গেছে। তৃতীয় ঐ আলিম ব্যক্তি, যে জাহেল লোকদের খেলনায় পরিণত হয়েছে।

সংযত নীতি

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, বিশিষ্ট ও মুহাক্কিক ব্যক্তিগণের নীতি হলো, তারা নিজেদের আমলের ক্ষেত্রে খুব সংকীর্ণ পথে চলেন এবং অধিক পসন্দনীয় ও উত্তম দিকটিকেই তারা অবলম্বন করেন। কিন্তু মতামত প্রকাশ ও ফাতাওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে প্রশস্ততা ও সুযোগ বাকী রাখেন এবং লোকদের জন্য যথাসম্ভব সহজতর পন্থা তালাশ করেন। যেমনটি একটি হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে—

ما كرهت فدعه ولا تحرمه على احد

অর্থাত, সন্দেহযুক্ত যে বিষয়টি তোমার পসন্দ নয়, নিজের আমলের ক্ষেত্রে তা তুমি পরিত্যাগ করো। কিন্তু অন্যের জন্য তা হারাম বলে দিও না।

কিয়াম ও মীলাদ

কানপুরের কোন এক স্থানে হযরত থানবী (রহঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর পবিত্র সীরাতের আলোচনা করলেন। সেখানে প্রচলিত কোন বিদ'আত ইত্যাদি বিলকুল ছিলো না। ওয়ায শেষ হওয়ার পর কিছু বদমাইশ ধরনের লোক মিলে একটা বিশৃংখলা সৃষ্টি করলো। তারা কয়েকজন মিলে দাঁড়িয়ে দরূদ শরীফ পড়তে শুরু করলো এবং অন্যদেরকেও দাঁড়াতে বললো। মাহফিলের সকল লোক দাঁড়িয়ে গেলো। এমনকি আমাদের কিছু আলেমও দাঁড়িয়ে গেলেন। কিন্তু হযরত থানবী (রহঃ) বসে থাকলেন। তখন একজন তালেবে ইলম আরবী ভাষায় হযরত থানবী (রহঃ)কে বললো, হযরত ! এখানে এমনটি করা ঠিক হবে না। কিন্তু হযরত থানবী (রহঃ) তখন উচ্চ আওয়াযে পড়লেন—

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق

অর্থাত, আল্লাহ পাকের নাফরমানী করে কোন মাখলুক বা সৃষ্টির অনুকরণ জায়েয নয়।

অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বললেন, অত্যন্ত দৃঢ় মনোবলের কথা হলো, কোন লোক যদি এরূপ পরিস্থিতির শিকার হয়, তবে নিজে এরূপ কাজে অংশগ্রহণ করবে না। তবে দুর্বল মনোভাবের লোকদের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণেরও অনুমতি রয়েছে। (২৫শে শাবান, ১৩৪৯ হিজরী)

বেয়াদবীর পরিণাম

একবার এক ব্যক্তিকে হযরত থানবী (রহঃ) তার মানসিকতা ও পসন্দের পরিপন্থী কোন একটি কথা বলেছিলেন। সে ব্যক্তি থানাভোন থেকে ফিরে গিয়ে চিঠিতে লিখলো যে, আপনি আমাকে খুব অপমান ও অবজ্ঞা করেছেন। যদি ইলমের আদব রক্ষা করার বিষয়টি অন্তরায় না হতো তবে আমি আপনার থেকে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করতাম।

এরপর সে লোকের অপর একটি চিঠি এলো, তাতে সে লিখেছে, যেদিন আমি আপনার ব্যাপারে ঐ কথাগুলো লিখেছি, সেদিন থেকেই আমার দৃষ্টিশক্তি কমতে শুরু করেছে এবং প্রতিদিনই তা কমে যাচ্ছে। আমার ভয় হচ্ছে আমি অন্ধ হয়ে যাই কিনা। তাই আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা করে দিন।

হযরত থানবী (রহঃ)–এর জবাবে লিখলেন, আপনার প্রথম ধারণা যে, আমি আপনাকে অপমান ও অবজ্ঞা করেছি। এটা ছিলো একটা অমূলক ধারণা মাত্র। আর আপনার দ্বিতীয় ধারণা যে, আমাকে ঐ কথা লিখার কারণেই আপনার দৃষ্টিশক্তি ক্রমেই লোপ পাচ্ছে, এটাও আরেকটা অমূলক ধারণা। তবে অবস্থা যাই হোক, আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং আপনার জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে দু'আ করছি।

তাবীয–কবয

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, হযরত গাংগুহী (রহঃ) বলতেন, কোন কোন সময় এ বিষয়ের উপর অনুশোচনা হয় যে, আমি তাবীয–কাবজ শিখলাম না কেন। এর দ্বারা তো মানুষের উপকার হতো।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

আমলের ক্ষেত্রে ইখলাস

লাক্ষ্ণৌ-এর ফেরেংগী মহলের কিছু আলেম বেহেশতী জেওর কিতাবের উপর অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করলো এবং হযরত থানবী (রহঃ)-এর বিরুদ্ধে অনেক কঠিন কথা বললো। এরপর সে আলেমদের মনে আল্লাহ পাক হযরত থানবী (রহঃ) সম্পর্কে কিছু ভক্তি শ্রদ্ধা সৃষ্টি করে দিলেন। ফলে তারা থানাভোন হাযির হওয়ার ইচ্ছা করলো এবং হযরত খাজা আযীযুল হাসান (রহঃ)-এর মাধ্যমে হযরত (রহঃ)-এর কাছে থানাভোন আসার অনুমতি চাইলো। হযরত থানবী (রহঃ) তাদেরকে থানাভবন আসার অনুমতি দিলেন। তবে তিনি খাজা আযীযুল হাসান সাহেব (রহঃ)-এর কাছে বললেন যে, এসব আলেমগণ যখন থানাভোন আসবেন তখন আমি তাদের ইযযত-সম্মান এবং যত্ন সমাদর ও মেহমানদারী খুব ভাল ভাবে করবো। কিন্তু কথাবার্তা তাদের সাথে খুব বেশী বলবো না। কারণ আমি যদি এমনটি করি তবে নিয়্যত খুব খারাপ হয়ে যাবে। কারণ এদের সাথে বেশী কথা বলার দ্বারা নিজের কামালাত ও ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোই উদ্দেশ্য হবে। কেননা তাদের উপকৃত করার নিয়্যত এখানে সম্ভব নয়। কারণ হলো, তাদের পক্ষ থেকে আমার কাছ থেকে উপকৃত হওয়ার নিয়্যত থাকবে এমনটি আশা করা যায় না। (সুতরাং তারা নিজেরা যখন উপকৃত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসবে না, সেক্ষেত্রে আমার তাদের উপকার করার নিয়্যত কিভাবে সম্ভব হতে পারে।)

হযরত থানবী (রহঃ)-এর বাণী

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, গাইরে মুকাল্লিদ হওয়া বা তাকলীদ ও মাযহাবকে অস্বীকার করা নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ, তবে বদদ্বীনীর প্রমাণ নয়। তবে যারা মুজতাহিদ ইমামগণের প্রতি অভিশম্পাৎ করে তাদের এরূপ কাজ বদদ্বীনী।

অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আমি একজন গাইরে মুকাল্লিদকে বাই'আত করেছিলাম এবং তাকে উপদেশ দিয়েছিলাম যে, মীলাদ-ফাতেহা পাঠকারীদেরকে পাইকারী হারে কখনো খারাপ বলবে না। কারণ তাদের মাঝে এমন লোকও থাকে যাদের নিয়্যতও ঠিক থাকে এবং আকীদাও ঠিক থাকে। শুধু একটি ফিকহী মাসআলার ব্যাপারে মতপার্থক্য

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

রয়েছে এবং সেই মাসআলার ক্ষেত্রে হানাফী ও শাফী মাযহাবের মাঝেও মতানৈক্য রয়েছে। সে মাসআলাটি হলো, যে মুস্তাহাব এবং নেক আমলের মধ্যে কিছু নিন্দনীয় বিষয় ও বিদ'আত ঢুকে পড়ে সে সম্পর্কে। এ ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের নীতি হচ্ছে, ঐ মুস্তাহাব আমলটিকেই পরিত্যাগ করতে হবে, যার মধ্যে অভ্যাসগতভাবে কিছু নিন্দনী ব্যাপার ও বিদআত ঢুকে পড়েছে। আর শাফী মাযহাবের রায় হচ্ছে, ঐ মুস্তাহাব আমলকে পরিত্যাগ করবে না। তবে ঐ নিন্দনীয় বিষয় ও বিদ'আতকে ঐ আমল থেকে দূর করে দিতে হবে।

নিজ প্রবৃত্তির হিসাব-নিকাশ

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, আমার মিযাজের মধ্যে এক ধরনের কঠোরতা আছে।যদিও তার একটা তাবীল বা ব্যাখ্যা আমি এবং আমার দোস্ত-আহবাবগণ করে থাকি। কিন্তু আমি বুঝাতে পারি যে, এটা আমার একটা দুর্বলতা।

মানুষের নামের প্রতিক্রিয়া

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, কানপুরে এক ব্যক্তি ছিলো, যার নাম ছিলো 'কলীমুল্লাহ' (আহত, অসুস্থ)। সে অধিকাংশ সময়ই অসুস্থ থাকতো। আমার কাছে এসে সে বিষয়টি জানালো। আমি তাকে বললাম, আপনার নাম পরিবর্তন করে 'কলীমুল্লাহ'-এর স্থলে 'সলীমুল্লাহ' (সুস্থ) রাখুন। লোকটি তাই করলো। নাম পরিবর্তন করে রাখার সাথে সাথেই লোকটি সুস্থ হয়ে গেলো।

'নিসবত' অর্জন করার পথ

সুফিয়ায়ে কিরামের পরিভাষায় একটি বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার নাম হলো, 'হুসুলে নিসবত' বা নিসবত (সম্পর্ক) অর্জিত হওয়া। আর এটাই আলামত আল্লাহ পাকের ওলী হওয়ার জন্য। আর সেই বিশেষ অবস্থার সারকথাকে হযরত থানবী (রহঃ) দুটি শব্দে বর্ণনা করে দিয়েছেন। তাহলো সার্বক্ষণিক ইতা'আত ও ইবাদত এবং অধিক পরিমাণে যিকির। অর্থাত সাহেবে নিসবত বা নিসবতের অধিকারী ঐ ব্যক্তিই হয়ে থাকেন যিনি সর্বদা শরীয়তের বিধি-নিষেধের অনুসারী

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

থাকেন, সকল প্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকেন এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ পাকের যিকির করেন। এই 'নিসবত' অর্জন করা একটি ইচ্ছাধীন ব্যাপার নাকি মানুষের ইচ্ছা বহির্ভূত আল্লাহ পাকের দান, এ ব্যাপারে আমার (সংকলক) সংশয় ছিলো, তাই বিষয়টি জানার জন্য আমি হযরত থানবী (রহঃ)–এর খিদমতে প্রশ্ন করলে হযরত থানবী (রহঃ) বললেন—

'নিসবত' অর্জন করার বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাকের একটা দান (যাকে তাসাওউফের পরিভাষায় 'ওয়াহবী' বলা হয়।) এর মধ্যে মানুষের ইচ্ছার কোন দখল নেই। তবে নিজের অর্জিত ও ইচ্ছাধীন কিছু আমলের ভিত্তিতেই এটি অর্জন হয়ে থাকে। সেসব আমল করা হলে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এ নি'আমত দানের ব্যাপারে ওয়াদা রয়েছে। অর্থাত বিশেষ বিশেষ কিছু আমল আছে, যা সম্পাদন করা হলে আল্লাহ পাক আপন ওয়াদার ভিত্তিতে 'নিসবত'–এর মত উন্নত আত্মিক অবস্থা বান্দাহকে দান করে থাকেন।

মাদরাসা ও ছাত্রদের জন্য বিশেষ নসীহত

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, আমাদের সময়ে ছাত্রদের মাঝে তাদের উস্তাদগণের নীতি ও অভ্যাস ছাড়া অন্য কারো নিয়ম–নীতি বা স্বভাব জায়গা করে নিতে পারতো না বা কোনরূপ প্রভাবও সৃষ্টি করতো না। ছাত্রদের ছিলো তাদের উস্তাদগণের প্রতি বিশেষ ভক্তি–শ্রদ্ধা ও মহব্বত এবং উস্তাদগণের মাঝে ছিলো ছাত্রদের প্রতি বিশেষ স্নেহ ও মায়া। এখন মন–মানসিকতা বদলে গেছে। বর্তমানে ছাত্র ও উস্তাদের মাঝে ঐ সম্পর্ক আর নেই। এ কারণেই ইলমী যোগ্যতা ও আলেমসুলভ রং ও স্বভাব তাদের মাঝে সৃষ্টি হয় না। এছাড়া ইলম ও আমল কোন ক্ষেত্রেই তাদের মাঝে মযবুতী সৃষ্টি হয় না।

ইলমী যোগ্যতা ও আমলী অভ্যাস সবই বর্তমানে দুর্বল হয়ে গেছে। এ কারণে বর্তমানে মাদারাসাসমূহের মধ্যে ছাত্রদেরকে আমলী প্রশিক্ষণ এবং উস্তাদগণের খিদমতের আগ্রহ ও জযবা সৃষ্টি করা খুবই প্রয়োজন। এবং এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা আবশ্যক, যাতে ছাত্র ও উস্তাদগণের মাঝে পরস্পর সম্পর্ক ও যোগসূত্র সৃষ্টি হতে পারে। আর ইলমী যোগ্যতার ক্ষেত্রে স্বল্পতা পূর্ণ করার জন্য হযরত হযরত থানবী (রহঃ)

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

বলেন যে, আমার মতে বর্তমানে মাদরাসাগুলোতে তাফসীরে জালালাইন পড়ানোর পূর্বে পবিত্র কুরআনের তরজমা গুরুত্বসহকারে পড়িয়ে নেয়া খুবই যরুরী।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আলহামদুলিল্লাহ এমনিতেই তো আমার প্রত্যেক উস্তাদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি ও তাদের প্রতি মহব্বত ছিলো। বিশেষতঃ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)-এর প্রতি অন্তরে বিশেষ মহব্বত ছিলো। সে সময় গাংগুহতে হযরত গাংগুহী (রহঃ)-এর দরবারে দাওরায়ে হাদীসের দরস হতো। সেখানে সিহাহ সিত্তা (হাদীস শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাব) পড়াতেন হযরত গাংগুহী (রহঃ) নিজে। দারুল উলূম দেওবন্দের অধিকাংশ ছাত্রই দাওরায়ে হাদীসের পূর্ব বৎসরের কিতাবসমূহ (মিশকাত জামা'আত) দেওবন্দে পড়ে দাওরায়ে হাদীস পড়ার জন্য গাংগুহ চলে যেতো। অল্প কিছু ছাত্র শুধু দেওবন্দে থেকে যেতো। আমার যেহেতু হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)-এর সাথে বিশেষ মহব্বত ছিলো, তাই তাদের ত্যাগ করে অন্যত্র গিয়ে দাওরা পড়া আমার কাছে বিশ্বাসঘাতকতা ও নাশুকরী বলে মনে হয়েছে। (তাই আমি অন্যদের মত চলে যাইনি) আল্লাহ পাকের শোকর যে, তিনি দয়া করে ইলমে হাদীসেও আমাকে আমার অন্যান্য সাথীদের তুলনায় (যারা গাংগুহ চলে গিয়েছিলো) নীচে রাখেননি।

হায়াতুল মুসলিমীন-এর বৈশিষ্ট্য

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, 'হায়াতুল মুসলিমীন' তো প্রকৃতপক্ষে একটি রাজনৈতিক গ্রন্থ। মুসলমানদের জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতি এবং সর্বরকম সফলতাই হলো, এ কিতাবের মূল লক্ষ্য। তবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে লিখা হয়েছে যে, যদি মুসলমানগণ এর অনুসরণ করে, তবে তাতেই মুসলমানদের ঐ ঐক্যবদ্ধ শক্তি ও সম্মান অর্জিত হতে পারে যা কোন রাজনৈতিক আন্দোলন দ্বারা অর্জন করা সম্ভব নয়।

হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন যে, আমাদের দায়িত্ব হলো হক ও সত্যকে প্রচার করে দেয়া। এরপরে দল তৈরী করা কিংবা কারো পিছনে একেবারে লেগে থাকা, কিছুটা হলেও কুপ্রবৃত্তির চাহিদার মিশ্রণ থেকে মুক্ত নয়।

কবির ভাষায়—

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

جملہ اوراق کتب درنار کن سینہ را با نور حق گلزار کن

অর্থাত, কিতাবের সকল পাতা তুমি আগুনে ফেলে দাও এবং তোমার সীনাকে তুমি আল্লাহ পাকের নূর দ্বারা গোলযার করে নাও।

মাওলানা মুযাফফর হুসাইন সাহেব (রহঃ)

হযরত মাওলানা মুযাফফর হুসাইন সাহেব কান্ধলভী (রহঃ) কিতাব দেখে ওয়ায করতেন। কিন্তু এতেই উপস্থিত লোকদের মাঝে এক আশ্চর্য ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতো। লোকেরা এই প্রতিক্রিয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে হযরত কান্ধলভী (রহঃ) বললেন, আমি যখন কোন কথা বলি তখন আমার অন্তরে এই আকাংখা থাকে যে, সকলেই যদি একথা অনুযায়ী কাজ করতে শুরু করে দিতো। নিচের কথাটি বিলকুল সঠিক যেমন বলা হয়েছে—

ہر چہ از دل خیزد بر دل ریزد

অর্থাত, যে ব্যক্তি দিলের দ্বারা কাউকে আকর্ষণ করে (দ্বীনের পথে ডাকে) তার সে ডাক বা বক্তব্য শ্রোতার দিলের উপর গিয়েই পড়ে।

ওয়ায ও নসীহত দ্বারা কারো অন্তরে প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে চাইলে, ওয়াযকারী ও উপদেশদাতাকে অত্যন্ত মঙ্গলকামী মনোভাব সম্পন্ন এবং অন্তর দ্বারা ইসলাহ, সংশোধন ও শুদ্ধি কামনাকারী হওয়া সবচাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

সম্পদ ও সম্মানের সঠিক উপকারিতা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, সম্মানের আসল উপকারিতা হলো, دفع مضرت বা অনিষ্ট দূর করা। আর সম্পদের আসল উপকারিতা হচ্ছে جلب منفعت বা উপকারকে আকর্ষণ করা। অর্থাত, সম্পদ খরচ করে মানুষ নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করে উপকৃত হয়। কিন্তু সম্মান দ্বারা 'জলবে মান ফা'আত' বা উপকারকে আকর্ষণ করার কাজ নেয়া হলে, তবে তা হালাল হওয়ার বিষয়টি সন্দেহমুক্ত নয়। কারণ কখনো কোন মানুষ অন্যের সম্মান ও প্রতিপত্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিছু দিয়ে দেয়। কিন্তু অন্তর তার উপর নিঃসংকোচ

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হয় না। এমতাবস্থায় ঐ সম্মান–প্রতিপত্তি দ্বারা অর্জিত উপকার ও ফায়দা হারাম হবে। সম্পদ ও সম্মানের ব্যাপারে উস্তাদ মরহুম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকূব সাহেব (রহঃ)–এর দুটি শে'র সর্বদা স্মরণ রাখার যোগ্য। শে'র দুটি হচ্ছে—

آفریں تجھ پہ ہمت کوتاہ   طالب مال ہوں نہ طالب جاہ

مال اتنا کہ جس سے ہو خورد ونوش   جاہ اتنا کہ ہوں نہ میں پامال

অর্থাত, আমার নিজের মনকে আমি ধন্যবাদ দেই, যেহেতু আমার আরযু–আকাংখা খুবই কম। আমি কোন মালদৌলতও কামনা করি না এবং কোন উচ্চসম্মানও আশা করি না। তবে এতটুকু সম্পদ শুধু কামনা করি, যার দ্বারা আমার খানাপিনা হতে পারে। আর সম্মান এতটুকুই আমার কাম্য, যেটুকুর দ্বারা মানুষের কাছে পদদলিত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

বাদশাহ্ আকবরের ভ্রান্ত মতবাদ প্রসঙ্গে

বাদশাহ আকবরের ভ্রান্ত কর্মকাণ্ড এবং ভ্রান্ত আকীদা ও আমল সকলের কাছেই প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু আমি কোন একটি ইতিহাসের কিতাবে দেখেছি যে, সে ইন্তিকালের পূর্বে উলামায়ে কিরামকে একত্রিত করে সকলের সামনে তাওবা করেছে। এ কারণে তাকেও ছোট মনে করবে না বরং নিম্নের কথাটির উপর আমল করবে—

ہیچ کافر را بخواری منگرید

অর্থাত, কোন কাফেরকেই অবজ্ঞা ও অনিহার নযরে দেখো না।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতবী (রহঃ) একবার এক হিন্দু বেনিয়াকে মরার পরে স্বপ্ন দেখলেন যে, সে জান্নাতে বসবাস করছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এখানে কিভাবে এলে? সে জবাব দিলো, আমি মউতের পূর্বে ইসলামের কালেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিলাম। আমার সে ইসলাম আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়েছে।

স্যার সৈয়্যদ–এর নযরে উলামায়ে দেওবন্দ

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়্যদ আহমদ সম্পর্কে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, এই ব্যক্তির মাঝে মুসলমানদের জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির আগ্রহ ও নিষ্ঠাপূর্ণ মহব্বত বিদ্যমান ছিলো। নিজের বিরুদ্ধাচরণকারী লোকদেরকেও উপকার করতে তিনি কখনো কৃপণতা করেননি। আমি তার পত্রিকা 'তাহযীবুল আখলাক'–এর মধ্যে দেখেছি, সেখানে সে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) এবং দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী (রহঃ)দ্বয় সম্পর্কে লিখেছে যে, এরা হলেন ফেরেশতা স্বভাবের মানুষ। সেখানে হযরত গাংগুহী (রহঃ)–এরও প্রশংসা করা হয়েছে।

একজন বুযুর্গ আলেম একবার আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেন। লোকেরা তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরিয়ে দেখালো এবং স্যার সৈয়্যদ–এর সাথেও সাক্ষাৎ করালো। ঐ বুযুর্গ আলেম বলেন, যতক্ষণ আমি তাঁর কাছে বসেছিলাম, ততক্ষণ তিনি বুযুর্গানে দ্বীনের আলোচনাই করতে থাকলেন। এক পর্যায়ে তিনি শাহ ইসহাক সাহেব (রহঃ)–এর আলোচনা করতে শুরু করলেন যে, লোকেরা তাঁকে কঠোর মনে করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি শুধু নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারেই কঠোর ছিলেন (নিজের উপর তিনি খুব কঠোরতা করতেন।) অন্যদের জন্য তিনি খুবই নম্র ছিলেন। এবং আমি শুনেছি যে, হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহঃ)ও এরূপই ছিলেন।

শিশুদের মেধা ঃ একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) একবার একটি ঘটনা শুনিয়েছিলেন। ঘটনাটি হলো, একবার এক রাজ্যের হিন্দু রাজা মারা গেলো। তার সন্তানদের মাঝে একটি নাবালেগ (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) সন্তানও ছিলো। মূলতঃ সে সন্তানেরই ঐ রাজার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু রাজার ভাইদের লোভ হলো যে, তারাই এই রাজ্যের কর্তৃত্ব দখল করবে। রাজার নাবালেগ সন্তান এই রাজ্য চালাতে পারবে না। কিন্তু সে রাজ্যের উযীরগণের একান্ত ইচ্ছা ছিলো, রাজার ছেলেই এ রাজ্যের অধিকর্তা হবে। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি তৎকালীন সময়ের বাদশাহ আলমগীরের সামনে উপস্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিলো। সেমতে উযীরগণ রাজার ঐ সন্তানকে নিয়ে দিল্লী রওয়ানা করলো। এবং সারা পথ ঐ সন্তানকে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সম্ভাব্য বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর শিখাতে থাকলো যে, বাদশাহ্ যদি তোমাকে এই প্রশ্ন করে, তবে তুমি তার এই জবাব দিবে। যখন তারা সকলে নিজেদের শিখানো শেষ করলো এবং সকলে দিল্লী পৌঁছে গেলো তখন রাজার সে সন্তান উযীরদেরকে লক্ষ্য করে বললো, এসব প্রশ্ন ও তার উত্তর তো আপনারা আমাকে শিখিয়ে দিলেন এবং আমি তা মুখস্থ করে নিলাম। কিন্তু যদি বাদশাহ এছাড়া অন্য কোন প্রশ্ন আমাকে করেন, তবে আমি কি করবো?

(এই ছোট্ট ছেলের মুখে এ ধরনের বুদ্ধিমানসুলভ প্রশ্ন শুনে) উযীরগণ বললো, আপনি যে এতটা বুদ্ধিমান তা আমরা আগে বুঝতে পারিনি। যদি বুঝতে পারতাম তবে আমরা পথে পথে আপনাকে কিছুই শিখানোর চেষ্টা করতাম না। এখন আর আমাদের কোন চিন্তা নেই। কারণ যার মাথায় এ ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশ্ন সৃষ্টি হতে পারে, তাকে সকল প্রশ্নের জবাব আল্লাহ্ পাকই শিখিয়ে দিবেন।

এরপরের ঘটনা হলো, যখন তারা শাহী দরবারে পৌঁছলো তখন দরবার ভেঙ্গে গেছে। বাদশাহ আলমগীর (রহঃ) নিজের পারিবারিক বাসগৃহে চলে গেছেন। তিনি যখন এই বাচ্চার আগমন সংবাদ পেলেন, তখন তিনি তাকে নিজে অন্দর মহলে তলব করলেন। বাদশাহ আলমগীর (রহঃ) তখন বাড়ীর একটি হাউযের পাড়ে লুঙ্গি পরে গোসল করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। এমতাবস্থায় এ ছেলে যখন উপস্থিত হলো তখন ঠাট্টাচ্ছলে বাদশাহ তার উভয় হাতের বাজু ধরে হাউজের উপর নিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, ফেলে দেবো? ছেলেটি একথা শুনে হেসে উঠলো। বাদশাহ যখন এ বিষয়টিকে আদবের দৃষ্টিতে বিবেচনা করলেন (এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি হাসলে কেন?) তখন ছেলেটি উত্তর দিলো, এই কারণে আমার হাসি পেয়েছে যে, আপনি তো এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব যে, আপনি যার একটি মাত্র আঙ্গুল ধরেন তাকে কোন নদী ডুবাতে পারে না। আর আমার তো দুটি বাজুই আপনি শক্ত করে ধরে রেখেছেন। সুতরাং আমি কিভাবে ডুবে যেতে পারি। একথা শুনে বাদশাহ আলমগীর (রহঃ) তাকে নিজের কোলে তুলে নিলেন এবং ঐ রাজ্যের রাজত্ব তার নামেই লিখে দিলেন।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

প্রয়োজন পরিমাণে অমুসলিমদের সম্মান

একবার একজন হিন্দু ডেপুটি কালেক্টর হযরত থানবী (রহঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করার জন্য তাঁর মজলিসে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা করলো। হযরত থানবী (রহঃ) তাকে আসার অনুমতি দিয়ে দিলেন। এরপর যখন সে মজলিসে এলো, তখন তার সম্মানার্থে হযরত (রহঃ) নিজে দাঁড়িয়ে গেলেন। কিন্তু মজলিসে উপস্থিত অন্যান্যদের সকলকে বসে থাকতে বললেন। যখন লোকটি চলে গেলো তখন হযরত থানবী (রহঃ) বললেন, আমি তো দাঁড়িয়েছি এজন্য যে, সে আমার মেহমান ছিলো। আর মেহমানকে সম্মান করতে শরীয়তে আদেশ করা হয়েছে। আর আপনাদেরকে দাঁড়াতে এজন্য নিষেধ করেছি যেহেতু আপনাদের তাকে সম্মান দেখানোর কোন প্রয়োজন ছিলো না। এর দ্বারা মেহমানের সম্মান করাও হলো আবার একজন অমুসলিমকে প্রয়োজনের অধিক সম্মান দেখানো থেকেও বাঁচা গেলো।

সাধারণ লোকদের দ্বীন ও ঈমানের ঠিকানা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, যখন কোন সাধারণ লোক উলামায়ে কিরামের প্রতি প্রশ্ন তুলে, তবে সে প্রশ্ন যদি সঠিকও হয় তবুও মনে চায় ঐ আলেমগণেরই সাহায্য করতে। আপাতদৃষ্টিতে যদিও এমনটি করা পক্ষপাতিত্বের মত দেখায়। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে আমার নিয়্যত থাকে যাতে সাধারণ লোকেরা আলেমগণের ব্যাপারে বিতশ্রদ্ধ হয়ে না যায়। কারণ যদি তারা আলেমগণের ব্যাপারে বিতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে তবে তাদের দ্বীন ও ঈমানের আর কোন ঠিকানা থাকে না।

অমুসলিম শাসকদের সাথে সম্পর্ক

অমুসলিম শাসকদের সাথে সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, তাদের প্রতি মহব্বত এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব হলো একটা বাতেনী ফিৎনা। আর তাদের অসন্তুষ্টি হলো যাহেরী বা প্রকাশ্য ফিৎনা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এই উভয় ফিৎনা থেকে মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করার কথা শিখিয়েছেন। হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে—

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفِتَنِ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ

অর্থাত, আয় আল্লাহ্! আমি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য (যাহেরী-বাতেনী) সকল ফিৎনা থেকে আপনার দরবারে পানাহ (আশ্রয়) চাই।

গায়রে মাহরাম মহিলাদের প্রতি নযর

গায়রে মাহরাম তথা বেগানা মহিলাদের প্রতি নযর করা প্রসঙ্গে হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ) বলেন, এ গুনাহটি যদিও গুনাহ হিসেবে সগীরা কিন্তু এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার হিসেবে এটি অনেক কবীরা গুনাহ থেকেও বেশী কঠিন গুনাহ। হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন যে, মহিলাদের গায়রে মাহরাম পুরুষদের থেকে পর্দায় না থাকার নিন্দনীয়তা ও খারাবী এতটাই সুস্পষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত বিষয় যে, যদি এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে একটি হুকুমও না আসতো তবুও মানুষের মানবিক জ্ঞান ও অনুভূতির দাবী এটাই হতো যে, মহিলাদেরকে পর্দায় রাখতে হবে।

আপনি কোন ব্যক্তিকেই এমন করতে দেখবেন না যে, সে একশ' টাকার নোট রেললাইনের উপর বা রাস্তায় ফেলে রাখছে। বরং সে টাকাকে গোপনে পকেটের ভিতরে রাখার ব্যাপারে খুব সচেতন ও যত্নবান হওয়াকে স্বাভাবিক বিষয় বলে মনে করা হয়। কারণ বাইরে বের করে ফেলে রাখলে অসৎ লোকদের তা ছিনিয়ে নেয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তবে মহিলাদের মূল্য কি একশ' টাকার নোটের সমানও নয়? যার কারণে তাদেরকে অসৎ লোকদের নযর থেকে লুকানোর প্রয়োজন হবে না।

পত্রে লিখা সালামের উত্তর দেয়াও ওয়াজিব

চিঠিপত্রের মধ্যে কারো পক্ষ থেকে যে সালাম লিখিতভাবে আসে তার উত্তর দেয়াও ওয়াজিব। তা মৌখিকভাবে দেয়া হোক বা লিখিতভাবে দেয়া হোক কিংবা দুনোভাবেই দেয়া হোক। মৌখিক সালামের ক্ষেত্রেও একই বিধান যে, আসল জবাব দেয়াটাই ওয়াজিব। আর সে জবাব সালামদাতাকে শোনানো হলো মুস্তাহাব।

(এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, যদি সালাম দাতা ব্যক্তি জবাব শুনতে না পায় তবে জবাব শুদ্ধ হবে না, জবাব শুনিয়ে দেয়া আবশ্যক। তবে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সালামদাতা ব্যক্তি যদি দূরে থাকে এতটা দূরে যে তাকে জবাব শুনানো খুব কষ্টকর তবে সে ক্ষেত্রে শুধু মৌখিকভাবে জবাব দিয়ে চেহারা দ্বারা ইশারা করে দিবে, যাতে সালামদাতা বুঝতে পারে যে, সালামের জবাব দেয়া হয়েছে।)

দরূদ ও সালাম সংক্ষিপ্তকরণ প্রসঙ্গে

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর পবিত্র নামের সাথে দরূদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব। এক্ষেত্রে যদি কেউ শুধু صلعم (সাল'আম) শব্দ লিখে দেয় (কিংবা বাংলায় (সা.) লিখে রাখে) কিন্তু মুখে দরূদ ও সালাম পাঠ না করে তবে আমার ধারণা হলো, এর দ্বারা ওয়াজিব আদায় হবে না।

একথা আলোচনার সময় সে মজলিসে কয়েকজন আলেমও উপস্থিত ছিলেন। তারা হযরত থানবী (রহঃ)–এর একথার সাথে দ্বিমত পোষণ করলেন এবং বললেন, বর্তমানে صلعم শব্দটিই পূর্ণ দরূদ শরীফের উপর পুরোপুরি ইশারা করে থাকে। বিধায় এ শব্দটির ব্যবহারই যথেষ্ট বলে মনে হয়। তখন হযরত থানবী (রহঃ) বললেন, এর দ্বারা আমার কাছে বিষয়টি পরিস্কার হলো না। আর আসল কথা হলো, প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর মত সৃষ্টির প্রতি এমন দয়ালু ও অনুগ্রহশীল ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা–ফিকির করাটাই আমার মোটেও বুঝে আসে না। যদি তিনিও আমাদের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ততার আশ্রয় নিয়ে কাজ করতে থাকেন, তবে আমাদের উপায় হবে কি।

অধম সংকলকের কথা হচ্ছে, এক্ষেত্রে যদি কোন প্রয়োজনীয়তা থেকেই থাকে, তবে দরূদ ও সালাম সংক্ষিপ্ত করার সবচাইতে বেশী প্রয়োজন ছিলো হযরত মুহাদ্দিসীনে কিরামের। যাদের সংকলিত হাদীসগ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক লাইনেই প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর পবিত্র নাম এসেছে। কিন্তু আপনি হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণের কিতাবসমূহ খুলে দেখুন, তারা প্রত্যেকবার নামের সাথে পুরাপুরিভাবে দরূদ ও সালাম লিখেছেন। তারা সংক্ষিপ্ত করা পসন্দ করেননি।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

জনৈক 'সৈয়্যদ সাহেব' এর ঘটনা

জনৈক সৈয়্যদ সাহেবের ঘটনা এরূপ আছে যে, সে এক মৌলভী সাহেবের কাছে এলো এবং সে নিজেকে 'সৈয়্যদ' (নবী বংশ) বলে প্রকাশ করে কিছু চাইলো। তখন ঐ মৌলভী সাহেব প্রশ্ন করলেন যে, আপনি যে সৈয়্যদ তার প্রমাণ কি? লোকটি উত্তর দিলো যে, আমার মুখে বলা ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ তো আমার কাছে নেই। একথা শুনে মৌলভী সাহেব তাকে কিছুই দিলেন না।

রাতের বেলা ঐ মৌলভী সাহেব ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলেন যে, হাশরের ময়দান কায়েম হয়ে গেছে। তার ছাতিফাটা পানির পিপাসা হলো। প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাউযে কাউসার থেকে আপন উম্মতদেরকে পানি পান করাচ্ছেন। তখন এ মৌলভী সাহেবও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এবং বললেন, আমিও আপনার উম্মত সুতরাং আমাকেও হাউযে কাউসার দান করুন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে বললেন, তুমি যে আমার উম্মত এর প্রমাণ কি? একথা শুনে ঐ মৌলভী সাহেব নিজের কৃতকর্মের উপর খুবই লজ্জিত হলেন।

পবিত্র চুল মুবারক

দুনিয়ার অনেক স্থানেই প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র চুল মুবারক সংরক্ষিত আছে বলে দাবী করা হয়। এবং তা লোকদেরকে দেখানো হয়। কিন্তু সাধারণতঃ তা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চুল হওয়ার পক্ষে কোন প্রমাণ বা সনদ থাকে না। এমতাবস্থায় ঐ চুলের ব্যাপারে কিরূপ আচরণ করা উচিত। এক্ষেত্রে হযরত শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) বলেন যে, এতটুকু কথা তো সহীহ হাদীসসমূহের মাধ্যমেই প্রমাণিত রয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উযূ করার সময় যে পানি পড়তো এবং যেসব চুল মাথা মুবারক থেকে কাটা হতো তা নষ্ট হতে দিতেন না। বরং তা ইযযত ও সম্মানের সাথে বরকত মনে করে সাহাবায়ে কিরামের (রাযিঃ) মাঝে বন্টন হওয়ার কথাও প্রমাণিত আছে। আর একথাও পরিস্কার যে, চুলের সংখ্যাও হতো অনেক। এ কারণে দুনিয়ার অনেক স্থানে প্রিয়নবী হযরত

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চুল মুবারক সংরক্ষিত থাকা কোন অসম্ভব বিষয় নয়। আর এসব ক্ষেত্রে বিষয়গুলো সহীহ সনদ ও প্রমাণাদি দ্বারা সাব্যস্ত হওয়াও কোন আবশ্যকীয় কিছু নয়। কারণ এগুলো তো আহকামে শরীয়ত নয়। এ কারণে মহব্বতের দাবী হলো, যেখানে এই চুল নকল বা কৃত্রিম হওয়ার কোন প্রমাণ বিদ্যমান না থাকে, সেখানে ঐ চুলের প্রতি সম্মানই প্রদর্শন করবে। হযরত শাহ সাহেব (রহঃ) এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত শে'রটি পাঠ করেন—

مرا از زلف تو موئے پسند است ہوس را رہ مدہ بوئے پسند است

অর্থাত; তোমার মাথার কেশরাজি থেকে একটি কেশ (চুল)ও আমার কাছে বড়ই প্রিয় ও পসন্দনীয়। সুতরাং আমার অনুভূতি যাতে শুধু তোমার চুলের পসন্দনীয় ঘ্রাণ গ্রহণ ছাড়া অন্য দিকে না যায় সেটাই কামনা করি।

নিজের বিরোধীদের সাথে আলিমগণের আচরণ

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, যখন কোন ব্যক্তি আমার কোন কিতাবের বিরুদ্ধে কিছু লিখে। অতঃপর সে যখন আমার কাছে আসে তখন তার প্রতি প্রথম নযর দিতেই আমার মনে এই খেয়াল আসে যে, আমার কোন একটা ভুল হয়ে গেছে। আমি তাকে এমন নযরেই দেখি যে, আমার কি ভুল হয়েছে? (তা যেন সে আমাকে বলে দেয়) যাতে আমি সে ভুলের বিষয়টি তার কাছ থেকে শুধরিয়ে নিতে পারি। আমার কিতাবের বিরুদ্ধে কিছু লিখেছে তাই আমি তার জবাব দেবো এই নিয়্যতে তাকে দেখি না।

মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন ছাহেব-এর ন্যায়পরায়ণতা

মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন বাটালুভী (রহঃ) ছিলেন আহলে হাদীস এবং গাইরে মুকাল্লিদ কিন্তু তিনি মানসিক দিক থেকে ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ। হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আমি নিজে তার লিখা কিতাব 'ইশাআতুস সুন্নাহ'-এর মধ্যে তার একটি বিষয় পড়েছি যার সারকথা নিম্নরূপ—

"পঁচিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পেরেছি যে, গাইরে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

মুকাল্লিদী তথা মাযহাব অস্বীকার করার নীতি বেদ্বীনীর দরোযা স্বরূপ।"

তার এ কথাটিকে হযরত গাংগুহী (রহঃ) 'সাবীলুস সিদাদ' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

একটি হাদীসের ব্যাখ্যা

হাদীস শরীফে প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لا يقص الا اميرا و ماموراو مختال

অর্থাত, ওয়ায তিন ধরনের ব্যক্তিই করতে পারে। প্রথমতঃ ঐ ব্যক্তি যে মুসলমানদের আমীর। সে মুসলমানদেরকে ওয়ায শুনাবে। দ্বিতীয়তঃ ঐ ব্যক্তি যাকে আমীর ওয়ায করার জন্য আদেশ করেন। এই প্রকারের ব্যক্তি ছাড়া যে ওয়ায করবে সে হবে মুতাকাব্বির বা অহংকারী। যে নিজেকে অন্যদের থেকে বড় মনে করে ওয়ায করার জন্য দাঁড়িয়ে যায়, হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, বর্তমান সময়ে তো কোন আমীর মা'মুর (আদেশ দানকারী এবং যাকে আদেশ করা হয়) নেই। আর সকলকে মুতাকাব্বির এবং অহংকারীও তো বলা যায় না। এজন্য আমার খেয়াল হচ্ছে, যে সকল আলিমকে সাধারণ লোকেরা ওয়ায করতে বলে তারা সাধারণ লোকের পক্ষ থেকে মামূর বা নির্দেশপ্রাপ্ত। কেননা যে আমীর সেও তো মূলতঃ সাধারণ লোকদের পক্ষ থেকেই মা'মুর বা নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

নামাযে কাতার সোজা করার গুরুত্ব

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগুহী (রহঃ) ইমামতি করার সময় কাতার সোজা করার অপেক্ষা করতেন। তিনি নামায সে সময়ই শুরু করতেন, যখন তিনি একথা ভালভাবে জেনে নিতেন যে, কাতার সোজা করা হয়েছে।

(হাদীস শরীফেও কাতার সোজা করার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বুযুর্গানে দ্বীনও কাতার সোজা করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য রাখতেন। যা আমরা উপরের মালফূয থেকে বুঝতে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

পারলাম। সুতরাং এ বিষয়ে অবহেলা তো নয়ই বরং পরিপূর্ণ গুরুত্ব ও সচেতনতা সহকারে বিষয়টির প্রতি আমাদের সকলের যত্নবান হওয়া উচিত—অনুবাদক।)

ইলমে কালাম দ্বীনের কোন মৌলিক বিষয় নয়

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, ইলমে কালামের বেশীর ভাগ মাসআলাহ্ ও বিষয় 'মানা' অর্থাত দলীল তলবের পর্যায়ের। এগুলো কোন শরঈ মাসাইল বা মূলনীতি নয়। যেমন মুতাকাল্লিমীন বা দর্শন শাস্ত্রবিদগণ تركيب اجسام তথা শরীর গঠিত হওয়ার ব্যাপারে جزء لا يتجزى বা পরমাণু দ্বারা জিসিম বা শরীর গঠিত হওয়ার প্রবক্তা। এটা মূলতঃ তাদের দাবী নয় বরং এটা তাদের একটা 'মানা'। অর্থাত তারা বলতে চান যে, শরীর পরমাণু দ্বারা গঠিত কথাটি মেনে নেয়া অসম্ভব হওয়ার পক্ষে প্রমাণ কি?

হযরত শাইখ আবুল হাসান আশআরী (রহঃ) যিনি ইলমে কালামের একজন ইমাম তার পরিস্কার বক্তব্য দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। সম্ভবতঃ শরহে আকাইদ–এর হাশিয়ায় (টীকায়) এ ঘটনা উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তি হযরত আবুল হাসান আশআরী (রহঃ)–এর প্রসিদ্ধির কথা শুনে তার সাথে সাক্ষাত করার জন্য রওয়ানা হলো। ঘটনাক্রমে পথেই তার সাথে সাক্ষাত হয়ে গেলো। তিনি তখন একটি বিতর্কানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য রাজদরবারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। ঐ লোকটি তার কাছেই জিজ্ঞাসা করলো যে, শাইখ আশআরীকে কোথায় পাওয়া যাবে? তিনি বললেন, আপনি আমার সাথে চলুন, আমি আপনাকে তার সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিব।

তারা শাহী দরবারে পৌছে গেলেন। বিতর্ক শুরু হয়ে গেলো। যখন সকলের বক্তব্য শেষ হয়ে গেলো, তখন হযরত আশআরী (রহঃ) দাঁড়ালেন এবং অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে সকলকে বিস্মিত করে দিয়ে সকলের সমস্ত প্রশ্ন ও সংশয়ের জবাব দিয়ে সকলকে স্তব্ধ করে দিলেন। মজলিস যখন শেষ তখন ঐ লোকটি বুঝতে পারলো যে, ইনিই হলেন আবুল হাসান আশআরী। তখন লোকটি হযরত আশআরী (রহঃ)–এর খিদমতে আরয করলো, আপনি অযথাই এ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বিতর্ক হতে দিলেন। আপনি যদি প্রথমেই এ বক্তব্য উপস্থাপন করতেন, তবে কারো

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

কথা বলারই কোন সুযোগ থাকতো না। একথা শুনে হযরত আশআরী (রহঃ) বললেন, ধর্মদ্রোহী নাস্তিকদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন ও সংশয় উত্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত আমার এ বক্তব্যের কোন প্রয়োজন ছিলো না। প্রশ্ন ও সংশয় উত্থাপিত হওয়ার পূর্বেই যদি আমি এ জাতীয় বক্তব্য রাখতাম তবে তা পূর্বসূরী বুযুর্গানে দ্বীনের নীতিবিরুদ্ধ হওয়ার কারণে তা বিদ'আতে পরিণত হতো। কিন্তু ধর্মদ্রোহী নাস্তিকদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন ও সংশয় যখন সামনে এসে গেছে তখন আমার জন্য সেগুলোর উত্তর দেয়া ওয়াজিব হয়ে গেছে।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, এটাই হলো ইলমে কালামের মকাম বা স্তর। অর্থাত যখন এবং যেখানে নাস্তিক মুর্তাদ এবং কাফের গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বিভিন্ন সংশয়, সন্দেহ এবং প্রশ্ন উত্থাপন করা হবে, তখন তার জবাব দেয়া ওয়াজিব। অন্যথায় সে ব্যাপারে চুপ থাকাই ভাল ও নিরাপদ। যেমনটি পূর্বসূরী বুযুর্গানে দ্বীন এবং তাবেঈনে কিরামের নীতি ছিলো।

ইজতিহাদী মাসয়ালার ব্যাপারে আকাবীরে দেওবন্দের উদারতা

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, যখন আমি কানপুরে হাদীস পড়াতাম, সে সময় একবার আমার অন্তরে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করার বিষয়টি অগ্রগণ্য ও অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হলো। সেমতে আমি তার উপর আমলও করতে শুরু করলাম। কিন্তু আমি নিজের কোন দোষ কিংবা গুণকে নিজের বুযুর্গ মুরব্বীর কাছ থেকে গোপন রাখা পসন্দ করতাম না। এ কারণে বিষয়টি লিখে আমি হযরত গাংগুহী (রহঃ)–এর বরাবরে পাঠিয়ে দিলাম। এর জবাবে হযরত গাংগুহী (রহঃ) আমাকে কিছুই বললেন না। কিন্তু মাত্র কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পরই আমার নিজের কাছেই ইমামের পিছনে সূরায়ে ফাতিহা না পড়ার বিষয়টি অগ্রগণ্য বলে মনে হলো এবং এরপর থেকে আমি ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া ছেড়ে দিলাম। এ বিষয়টিকেও আমি হযরত গাংগুহী (রহঃ)–এর খিদমতে লিখে পাঠালাম। তিনি এবারও আমাকে কিছুই বললেন না।

কখনো কখনো কোন কোন লোক হযরত মাওলানার কাছে আমার

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করেছে। তখন হযরত আমার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন। এর কারণ এটাই ছিলো যে, হযরতের একথা জানা ছিলো যে, এ মিয়া যা কিছু করে তা ভাল উদ্দেশ্যেই করে।

মাওলানা আবদুল হক খায়রাবাদীর একটি ঘটনা

একজন গ্রাম্য খান সাহেব একবার মাওলানা খায়রাবাদীর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য উপস্থিত হলো। সে সময়টি ছিলো চাষাবাদ ও ফসল বোনার মৌসুম। মাওলানা খায়রাবাদী সাহেব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ সময় আপনি এখানে এসে গেলেন (ফসলাদির কাজকর্ম দেখবে কে?) লোকটি জবাব দিলো, আমার ফসলাদি ও বাড়ীঘরের সব কাজকর্ম খাজা আজমীরীর উপর ছেড়ে দিয়ে আমি চলে এসেছি। তখন মাওলানা খায়রাবাদী বললেন, আমরা তো এতদিন মনে করে আসছিলাম যে, হযরত খাজা আজমীরী আল্লাহ পাকের একজন ওলী, এখন জানলাম যে, তিনি একজন গৃহস্থ এবং তিনি ক্ষেত-খামার ও বাড়ীঘরের কাজকর্মও ভালভাবে করতে পারেন।

কোন এক লোক মাওলানার কাছে মীলাদ পড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বললেন, খু-উ-ব ভাল কাজ। কারণ যারা মীলাদ পড়ে তারা মিষ্টির ভাগ দ্বিগুণ পায়।

ঐক্যবদ্ধ কাজ প্রসঙ্গে

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, বর্তমান সময়ে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ কাজ বিভিন্ন বালা ও ফিৎনা থেকে মুক্ত নয়। প্রথমতঃ ঐক্যই হয় না। আর যদি কখনো কিছু হয়, তবে সেখানে قُلُوبُهُمْ شَتَّى (তাদের অন্তর পরস্পর বিচ্ছিন্ন)-এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এজন্য আমি এখন যেসব কাজ একাকী করা যায় তাই করি। কিন্তু যে কাজ মজমা বা দলবদ্ধতার উপর নির্ভরশীল, সেসব কাজ নিয়ে মাথা ঘামাই না।

কোন ব্যাপারে বাড়াবাড়ি নিজের জন্যই ক্ষতিকর

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, কোন সম্প্রদায় বা কোন ধর্মের লোকদের বিরুদ্ধে খুব বেশী কঠোরতা বা বাড়াবাড়ি করা এবং শক্ত শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ এমনটি যে করে স্বয়ং

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

তার জন্যই এটা ক্ষতিকর হয়। এ ব্যাপারে আমার বহু অভিজ্ঞতা হয়েছে। হযরত মাওলানা নযীর হুসাইন সাহেব দেহলভী (রহঃ) প্রথমে একজন পাক্কা হানাফী ছিলেন। তিনি হানাফীদের মুফতী এবং কাযীও ছিলেন। তিনি গাইরে মুকাল্লিদদেরকে খুবই খারাপ বলতেন এবং তাঁদের সম্পর্কে খুব কঠিন কঠিন শব্দ ব্যবহার করতেন। এরপর এক সময় নিজেই গাইরে মুকাল্লিদ হয়ে গেলেন। ফলে মুকাল্লিদীনদেরকে খুব খারাপ বলতে শুরু করলেন। এমনকি হযরত ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) সম্পর্কেও বেয়াদবীমূলক শব্দ বলতেন। এ কারণে হযরত গাংগুহী (রহঃ) তার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু তার মাঝে ন্যায়পরায়ণতার গুণ খুব প্রবল ছিলো। এজন্য হযরত গাংগুহী (রহঃ)–এর সামনে কেউ যখন তার দোষ বর্ণনা করতো তখন তিনি তার একটা অন্য ব্যাখ্যা দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে দিতেন।

তাফসীরে বয়ানুল কুরআনের শিরোনাম

হযরত থানবী (রহঃ) এর মজলিসে একবার এক লোক তাফসীরে বয়ানুল কুরআনের মধ্যে আয়াতের সাথে অন্য আয়াতের সম্পৃক্ততা দেখানোর যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তার খুব প্রশংসা করলো এবং বললো, এটা একটা আজীব ও আশ্চর্য বিষয়। হযরত থানবী (রহঃ) তখন বললেন, নিঃসন্দেহে এটাও আল্লাহ পাকের একটি বিশেষ অনুগ্রহ। কিন্তু আমার কাছে এটি খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় নয়। কারণ আয়াতের মধ্যকার পরস্পর সম্পর্ক দেখানোর প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী নয়। তবে ঐ তাফসীরের মধ্যে একটি বিষয় এমন আছে যা আমি অত্যন্ত কষ্ট ও মেহনত করে সম্পাদন করেছি। যেমনটি আজ পর্যন্ত অন্য কোন তাফসীরে আমার নযরে পড়েনি। সে বিষয়টি হলো, কুরআন শরীফের বিষয়সমূহের আলোকে এক একটি শিরোনাম আমি আয়াতের শুরুতে সন্নিবেশিত করে দিয়েছি। কোন আলিম ব্যক্তি যদি মূল কুরআন শরীফের পার্শ্বে এই শিরোনামগুলোই শুধু লিখে নেন তবে পূর্ণ তাফসীরের কাজ তিনি এর দ্বারাই নিতে পারেন।

ইজতিহাদী মাসআলার ক্ষেত্রে তাহকীকের স্তর

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, যেসব মাসআলার

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামগণের মাঝে ইখতিলাফ ও মতপার্থক্য আছে, সে সব মাসআলাহ নিয়ে খুব বেশী আলাপ আলোচনা ও তাহকীক করতে যাওয়া স্বাভাবিকভাবেই অপসন্দনীয়। কারণ এসব ক্ষেত্রে সকল প্রকার তাহকীক ও গবেষণার পরেও পরিণাম এটাই হয় যে, নিজের মাযহাব সঠিক, তবে ভুলের আশঙ্কাযুক্ত, আর অন্যদের মাযহাব ভুল তবে ঠিক হওয়ার সম্ভাবনাযুক্ত।

যতই তাহকীক আর গবেষণা করা হোক না কেন, কোন মুজতাহিদ ইমামের মাসলাক বা মতামতকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়। এ কারণে আমি মতপার্থক্যযুক্ত মাসআলা নিয়ে খুব বেশী তাহকীক থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলি।

কখনো কখনো আগন্তুকদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন ও সংশয়ের কথা উত্থাপন করা হয়। তখন আমি তাদেরকে এতটুকু কথা বলে দিয়েই ক্ষান্ত করি যে, আমি প্রশ্নকারী ব্যক্তিকেই জিজ্ঞাসা করি, আপনি যে মাসআলাটি জিজ্ঞাসা করলেন, সেটি কি 'কতঈ' (অকাট্য) নাকি 'যন্নী' (সন্দেহযুক্ত)? এ কথাতো পরিষ্কার যে, কোন 'কতঈ' বা অকাট্য বিষয় ইজতিহাদের ক্ষেত্র নয় এবং সেখানে মতপার্থক্যেরও কোন অবকাশ নেই। তাই স্বভাবতই লোকটি জবাব দেয়, মাসআলাটি 'যন্নী' বা সংশয়যুক্ত। তখন আমি তাকে বলে দেই, যে বিষয়টি 'যন্নী' বা অকাট্য নয় তার দাবী তো এটাই যে, মাসআলাটির বিপরীত দিকটির সম্ভাবনাও তার মাঝে বিদ্যমান থাকে। সুতরাং এক্ষেত্রে যদি আপনার কোন সংশয় সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে তা হোক। এর দ্বারা তো একথাটাই ভালভাবে প্রমাণিত হয় যে, এ মাসআলাটি 'যন্নী' বা সংশয়যুক্ত। এ জাতীয় সংশয় হলে তাতে কোন ক্ষতি নেই।

হযরত শাহ ইসহাক সাহেব (রহঃ)-এর একটি ঘটনা

হযরত শাহ ইসহাক সাহেব দেহলভী (রহঃ) যখন হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন তখন এই উদ্দেশ্যে তিনি আজমীরের রাস্তা গ্রহণ করলেন যাতে রাস্তায় হযরত খাজা সাহেব (রহঃ)-এর মাযার যিয়ারত করার সুযোগ হয়। আজমীর শরীফে হযরত শাহ ইসহাক সাহেবের একজন সাগরেদ ছিলেন। তিনি ঐ সাগরেদকে নিজের আগমন সংবাদ জানিয়ে দিলেন। কিন্তু সেই সাগরেদ সাহেব তার উত্তরে হযরত শাহ

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সাহেবকে লিখলেন, আপনি অনুগ্রহপূর্বক এখানে আসবেন না। কারণ এখানকার লোকদেরকে আমি মাযারসমূহ যিয়ারত করার জন্য সফর করতে নিষেধ করে আসছি। কারণ এখানকার লোকেরা এ ব্যাপারে খুব বেশী বাড়াবাড়ির শিকার হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় যদি আপনি এখানে আগমন করেন, তবে আমি কতজন লোককে এ কথা বলে বেড়াবো যে, হযরত এখানে স্বতন্ত্র সফর করে আগমন করেননি, বরং হজ্জ সফরে যাওয়ার পথে এখানে আসা হয়েছে।

ঐ সাগরেদের চিঠির জবাবে হযরত শাহ সাহেব (রহঃ) পুনরায় তাকে লিখলেন যে, আমি তো এমনটি মনকে মানিয়ে নিতে পারছি না যে, আমি আজমীর শরীফের পথে যাবো অথচ মাযারে একবার উপস্থিত হবো না। অবশ্য আপনার ভাল খেয়ালটিও একটি লক্ষ্যণীয় বিষয়। এজন্য উভয় দিক রক্ষা করার পদ্ধতি এই হবে যে, আমি যখন ওখানে উপস্থিত হবো, তখন আপনি একটি ওয়ায মাহফিলের ব্যবস্থা করবেন এবং সে মাহফিলে আপনি কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সওয়ারী প্রস্তুত করা এবং স্বতন্ত্র সফর করার বিরুদ্ধে বয়ান করবেন। আমিও সেই মজলিসে উপস্থিত থাকবো। এরপর আপনার ওয়ায যখন শেষ হবে তখন আমি ঘোষণা করবো যে, আমার ভুল হয়ে গেছে আমি তাওবা করছি আর কখনো এমনটি করবো না।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, এই ব্যক্তি ছিলেন ঐ লোক, যাদেরকে মানুষ ওহাবী বলে। অথচ এরূপ কাজ আশিকদের ছাড়া কেউ করতে পারে না। (অধম সংকলক বলছে) উস্তাদ ও সাগরেদের লৌকিকতামুক্ত আচরণ এবং দ্বীনের ফিকির ও গুরুত্বের বিষয়টিও এ ঘটনায় অনুসরণযোগ্য।

একটি দু'আর বরকত

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, ছোট সময় একটি কিতাব আমার নযরে পড়েছিলো, সম্ভবত কিতাবটি ছিলো মুফতী সাদুল্লাহ সাহেবের লিখা। সে কিতাবে দেখেছি, হযরত ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন যে, আমি যা কিছু লাভ করেছি তা এই দু'আটির বরকতেই লাভ করেছি। দুআটি হলো—

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ عَلٰى طَاعَتِكَ

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

অর্থাত, আয় আল্লাহ্ আমি আপনার ইতা'আত ও ফরমাবরদারী করার ব্যাপারে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আমি তখন থেকেই এই দুআটির উপর আমল করে আসছি। হিফযখানার ছাত্ররা তাবীয চাইতে আসলে, আমি তাদেরকেও এই দুআটি শিখিয়ে দিয়ে বলতাম, প্রত্যেক নামাযের পরে এগারবার এই দুআটি পাঠ করবে। (৩০শে শাবান, ১৩৪৯ হিজরী)

জবর ও কদর সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক কথা

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, দুনিয়ায় মানুষের ইচ্ছাধীন কোন কাজই দুটি 'মাসিয়্যাত' বা ইচ্ছা ছাড়া সংঘটিত হয় না। একটি হলো, আল্লাহ পাকের 'মাসিয়্যাত' বা ইচ্ছা। আর দ্বিতীয়টি হলো, বান্দার ইচ্ছা। যারা শুধু নিকটবর্তী মাসিয়্যাত তথা বান্দার ইচ্ছার প্রতি নযর রেখেছে, তারা 'কাদরী' সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত হয়েছে। আর যারা শুধু দূরবর্তী মাসিয়্যাত তথা আল্লাহ পাকের ইচ্ছার প্রতি নযর রেখেছে, তারা 'জবরী' সম্প্রদায় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আর যারা উভয় মাসিয়্যাত বা ইচ্ছার প্রতি নযর রেখেছে তারা আহলে সুন্নাত-এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

একটি আয়াতের তাফসীর ও তাহকীক

অধিক বিবাহ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ইরশাদ হচ্ছে—

وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً

অর্থাত, যদি তোমাদের এরূপ আশঙ্কা হয় যে, তোমরা অধিক বিবিগণের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা ও সমতা রক্ষা করতে পারবে না সেক্ষেত্রে তোমরা শুধু একজন মহিলাকেই বিবাহ করবে। এমতাবস্থায় অন্য কোন বিবাহ করলে তোমরা অন্যায় ও অসমতার গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাবে। এরপর সামনের আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ

অর্থাত, তোমাদের ক্ষমতা নেই যে, তোমরা একাধিক বিবিগণের মাঝে সমতা রক্ষা করবে।

এই আয়াতে পরিষ্কারভাবে একথাকে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের একাধিক বিবির মাঝে ন্যায় ইনসাফ ও সমতা রক্ষা করার

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

শক্তি ও ক্ষমতাই নেই। এই দুই আয়াতকে একত্রিত করে কেউ কেউ এরূপ ফলাফল বের করে থাকেন যে, ন্যায় ও সমতা রক্ষার ক্ষমতা নেই। আর যখন এরূপ হয় (ন্যায় ও সমতা রক্ষার ক্ষমতা না থাকে) তখন শুধু একজন স্ত্রী বিবাহ করে ক্ষ্যান্ত করা ওয়াজিব। এর দ্বারা একথা আবশ্যকীয়ভাবে প্রমাণিত হয় যে, একাধিক বিবাহ করাই জায়েয নয়।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, উপরোক্ত দুটি আয়াতের মধ্যে আরবী 'আদল' শব্দের অর্থ এক নয় বরং ভিন্ন। প্রথম আয়াতে আদল শব্দের অর্থ হলো ঐ আদল বা ইনসাফ যা মানুষের এখতিয়ারভুক্ত বা ইচ্ছাধীন। অর্থাত, আচার-আচরণে সমতা বিধান করা। আর দ্বিতীয় আয়াতের মধ্যে যে 'আদল'কে ক্ষমতার বহির্ভূত বলা হয়েছে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ আদল বা ইনসাফ যা মানুষের এখতিয়ার বহির্ভূত। অর্থাত, আন্তরিক ভালবাসার ক্ষেত্রে সকলকে সমান পর্যায়ে রাখা, আর এটা মানুষের ইচ্ছাধীন বিষয় নয়। পবিত্র কুরআনের আয়াতের মধ্যেই এ ব্যাখার পক্ষে ইশারা রয়েছে। এর পরে বলা হয়েছে—

فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ

অর্থাত, (কোন এক স্ত্রীর প্রতি) তোমরা একেবারে পুরোপুরি আকর্ষিত হয়ে ঝুকে পড়ো না।

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আদল বা ইনসাফ রক্ষা করার ক্ষমতা না থাকার দ্বারা এই আন্তরিক আকর্ষণই উদ্দেশ্য। আর আন্তরিক আকর্ষণ কোন মানুষের এখতিয়ারভুক্ত নয়। এ কারণে প্রথম আয়াত দ্বারা শুধু এতটুকু কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছাধীন আদল বা ন্যায়পরায়ণতা ও সমতা রক্ষা করতে পারবে না বলে আশঙ্কা করে, তার জন্য একাধিক বিবাহ করা নিষিদ্ধ। আর এখতিয়ার বহির্ভূত আদল ও ইনসাফ রক্ষা করার ব্যাপারে মানুষকে আদেশ করা হয়নি। সর্ব ব্যাপারে মহান আল্লাহ পাকই সর্বাধিক অবগতির অধিকারী।

দুনিয়াদার দরবেশের পরিচয়

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, যে দরবেশের দিকে দুনিয়াদার লোকদের আকর্ষণ বেশী দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে সে দরবেশ হয় না। সে নিজেও হয় একজন দুনিয়াদার। কারণ একটি মূলনীতি এরূপ আছে—

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

الجنس يميل الى الجنس

অর্থাত, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের জাত ও শ্রেণীর প্রতি ধাবিত ও আকর্ষিত হয়।

সুতরাং যদি দরবেশের মধ্যে দুনিয়াদারী না থাকতো, তবে দুনিয়াদার লোকেরা তার প্রতি ধাবিত হতো না এবং তার দরবারে এসে একত্রিত হতো না।

আদাবে মুআশারাত-এর গুরুত্ব

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, পূর্ববর্তী নেককার বুযুর্গানেদ্বীনের মাঝে আদাবে মু'আশারাত বা চালচলনে শিষ্টাচার রক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব ও সচেতনতা ছিলো। যেমনটি পবিত্র কুরআন, হাদীসেও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আফসোসের বিষয় হলো, বর্তমানে সে ব্যাপারে উদাসিনতা এতটাই বেড়ে গেছে যে, মনে হয় এটা দ্বীনের কোন অংশই নয়। সাধারণ লোকের কথা তো দূরে উলামায়ে কিরাম এবং বিশেষ ব্যক্তিবর্গও আদাবে মু'আশারাত তথা আচার- আচরণের শিষ্টাচারের ব্যাপারে সীমাহীন উদাসিনতা প্রদর্শন করে থাকেন।

অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, মেহমানকে সম্মান করা এবং তার যত্নসমাদর ও আতিথেয়তা করা মেঝবানের (যার বাড়ী মেহমান আসে) উপর তো আবশ্যক। সাথে সাথে মেহমানেরও কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। যার মধ্যে অন্যতম হলো, মেঝবান তাকে যেখানে বসতে দেয় সেখানেই বসে যাবে। অনেক সময় মেহমানকে কোন বিশেষ জায়গায় বসতে দেয়ার পিছনে মেঝবানের কোন বিশেষ ভাল নিয়্যত ও উদ্দেশ্য থাকে। যেমন পর্দা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখা। এছাড়া মেহমানদারী গ্রহণের আদবসমূহের মধ্যে এটাও একটা আদব যে, মেহমান মেঝবানকে এমন কোন জিনিসের হুকুম করবে না বা এমন কিছু চাইবে না যা প্রস্তুত করা তার জন্য মুশকিল হয়। যদিও তা নিম্নমানের কোন জিনিস হয়। কিংবা কোন আসান বা সহজ বস্তু হয়। কারণ অনেক সময় সাধারণ জিনিস হওয়া সত্ত্বেও, তা না পাওয়া যাওয়ার কারণে মেঝবানকে যথেষ্ট অস্থিরতা পোহাতে হয়।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন যে, মেহমানদারী গ্রহণের আদবসমূহের আরো একটি অন্যতম আদব হলো, খানার ক্ষেত্রে কোন বিশেষ খানা যদি মেহমান না খায়, তবে আগেই মেঝবানকে তা জানিয়ে দিবে। একেবারে খাওয়ার সময় দস্তরখানের উপর বসে এরপর বলা যে, আমি এটা খাই না, ওটা খাই না, এমনটি নিতান্তই ভদ্রতা বিবর্জিত কাজ।

দু'জন বুযুর্গ প্রসঙ্গে কথা

মুজাফফর নগর জিলার কিরানা অঞ্চলের বাসিন্দা মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরানুভী (রহঃ) তো নিজের লিখা কিতাবসমূহ এবং প্রসিদ্ধ খৃষ্টান পাদ্রী ফাণ্ডার–এর সাথে বিতর্কে বিজয়ী হওয়ার কারণে খুবই খ্যাতি সম্পন্ন ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। আর তার ভাই বুযুর্গ সুলভ মানসিকতার অধিকারী, একজন অভিজ্ঞ হাকীম এবং তৎকালীন সময়ের বিশিষ্ট ওলী আল্লাহ ছিলেন। হযরত থানবী (রহঃ) তার নামটিও বলেছিলেন। কিন্তু আমার এ মুহূর্তে তা স্মরণ নেই। তার অবস্থাও ছিলো আশ্চর্য রকম। যখন তিনি বাজারে যেতেন তখন মহল্লার বিধবা এবং বৃদ্ধাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে যেতেন তাদের বাজারে কোন দরকার আছে কিনা! যারা যারা বিভিন্ন প্রয়োজনের কথা জানাতো, তাদের সকলের কাজ সমাধা করে নিয়ে আসতেন। একবার গমের একটা বস্তা বেঁধে নিজেই মাথায় বহন করে নিয়ে আসছিলেন। অবস্থা দেখে লোকেরা দৌড়ে এসে তার কাছ থেকে বোঝা নিয়ে নিলো।

তিনি যেহেতু একজন অভিজ্ঞ হাকীম ছিলেন সেমতে রোগেরও চিকিৎসা করতেন। যেসব রুগী তার বাড়ীতে এসে রোগের চিকিৎসা নিতো তাদের থেকে তিনি কোন ফি গ্রহণ করতেন না। রুগী দেখাতে কেউ যদি তাকে কোন মহল্লায় নিয়ে যেতো, তবে সে জন্য মাত্র আট আনা ফি নির্ধারিত ছিলো। তিনি তাহাজ্জুদের নামাযের পর সকল রুগীদের সুস্থতার জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে দু'আ করতেন। অত্যন্ত সরলসোজা বুযুর্গ এবং গভীর ইলমের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন।

একবার গ্রামে কিছু লোক শবে মিরাজ উপলক্ষে একটা কবিতা পড়ছিলো। যার মর্ম ছিলো এরূপ—"আসমানে সাড়া পড়ে গেছে আল্লাহ পাকের রাসূল আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসছেন।"

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

একথা শুনে তিনি বলে উঠলেন, মিথ্যা, আল্লাহ পাকের কসম একথা মিথ্যা। সহীহ বুখারী শরীফের হাদীসের মধ্যে তো এরূপ বর্ণনা আছে যে, যখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে আসমানে প্রবেশ করতে চাইলেন, তখন আসমানের দারওয়ানগণ প্রশ্ন করেছিলেন যে, আপনার সাথে কে? যখন তিনি নাম বলেছেন, তখন দরোজা খোলা হয়েছে। যদি আসমানে আগেই সাড়া পড়ে গিয়ে থাকতো তাহলে তো আর প্রশ্ন করার কোন প্রয়োজন হতো না।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) সে হাকীম সাহেবের আরো অনেক আশ্চর্য ও দুর্লভ অবস্থা ও ঘটনাবলী শুনিয়ে ছিলেন। অপর বুযুর্গ তারই ভাই মাওলানা রহমতুল্লাহ কীরানুভী (রহঃ)। খৃষ্টানদের জবাবে তার লিখা একটি কিতাব 'ইযহারুল হক' নামে আরবী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। অতঃপর সেটি ইংরেজীসহ অন্যান্য ভাষাতেও অনুবাদ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। আর অতি সম্প্রতি (তৎকালীন সময়ের কথা) তার সে কিতাবটির উর্দূ অনুবাদ এবং বিশ্লেষণধর্মী ব্যাখ্যা (শরাহ) দারুল উলূম করাচীর পক্ষ থেকে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তার শুরুতে মাওলানা সাহেবের জীবনাদর্শের কিছুটা সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

হিন্দুস্থানের যমীনে সংঘটিত ১৮৫৭ সালের আযাদী আন্দোলন, যার শেষ পরিণামে ইংরেজ গোষ্ঠী বিজয়ী হয় এবং হিন্দুস্থানের উলামা ও মাশায়েখগণের কিছুসংখ্যক ইংরেজ গোষ্ঠীর নির্যাতনের শিকার হয়ে শাহাদত অথবা বন্দীত্ব বরণ করেন। আর কিছুসংখ্যক আত্মগোপন করেন এবং কিছুসংখ্যক উলামা ও মাশায়েখ নিরাপদ স্থানে হিজরত করে চলে যান। অতঃপর ইংরেজ গোষ্ঠী চাইলো যে, তাদের ধর্মীয় পাদ্রীদের দ্বারা দাওয়াতী মিশন চালু করার মাধ্যমে হিন্দুস্থানের মুসলমানদের মেধা ও অন্তর থেকে ইসলামের নাম-নিশানা মুছে দিবে। যাতে তারা অন্তর দ্বারা ইংরেজদের আনুগত্য মেনে নিতে পারে। এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বিভিন্ন শহরে এবং বিভিন্ন মহল্লায় খৃষ্টান পাদ্রীদের টিম ঘুরে বেড়াতে লাগলো। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে উলামায়ে কিরাম এবং সাধারণ লোকদেরকে চ্যালেঞ্জ করতো। সে সময় বেঁচে থাকা বুযুর্গানে দ্বীন ও উলামায়ে কিরামের মাঝে যারা গোপন স্থানে আত্মগোপন করেছিলেন,

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

তারা এই ফিৎনার মুকাবিলা করলেন। এ সময় যারা এই ফিৎনার বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিলেন, তাদের তালিকার শীর্ষে ছিলেন হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ কীরানুভী (রহঃ)। খৃষ্টানদের সবচাইতে বড় পাদ্রী ফাণ্ডার-এর সাথে তিনি বিতর্ক করেছেন এবং সে মজলিসেই তার কাছ থেকে লিখিতভাবে এই স্বীকারোক্তি নিয়ে ছেড়েছেন যে, ইঞ্জিলের মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন (তাহরীফ) হয়েছে।

অতঃপর এই পাদ্রীই মুসলমানদের খেলাফতের মারকায (রাজধানী) কুস্তুনতুনিয়ায় (বর্তমানে কনষ্টান্টিনোপল) গিয়ে পৌঁছুলো এবং পুনরায় সেখানে চ্যালেঞ্জ করলো। সে সময় সুলতান আবদুল আযীয খানের শাসন ছিলো। কিন্তু পূর্ববর্তী খলীফা সুলতান আবদুল হামীদ খানও তখন উপস্থিত ছিলেন। সেমতে সুলতান আবদুল হামীদ খান ঐ পাদ্রীর চ্যালেঞ্জের জবাব দেয়ার জন্য মাওলানা রহমতুল্লাহ কীরানুভী (রহঃ)কে দাওয়াত দিলেন। এবং মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেব তখন খৃষ্টবাদী মতবাদের গোমর ফাঁক করে দেয়ার জন্য তার বেনযীর কিতাব 'ইযহারুল হক' লিপিবদ্ধ করেন। যে কিতাব সম্পর্কে খৃষ্টান পাদ্রীদের মন্তব্য হলো, এই কিতাব যদি প্রচার হতে থাকে তবে দুনিয়াতে আর খৃষ্টানদের কোন অস্তিত্ব থাকবে না।

তার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, কুস্তনতুনিয়া থেকে মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেব পবিত্র মক্কা মুআযযামায় গমন করেন। (আমার সংকলক) স্মরণ হচ্ছে যে, মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেবকে মক্কা শরীফ থেকেই কুস্তনতুনিয়ায় দাওয়াত দিয়ে আনা হয়েছিলো। কুস্তনতুনিয়ার সুলতানী আলেমগণ যখন মাওলানার লিখা 'ইযহারুল হক' কিতাবটি দেখলেন, তখন তারা খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে, এই কিতাবের লেখক পবিত্র মক্কায় অবস্থান করছেন। তখন তাদের পরামর্শে সুলতান তাঁকে দাওয়াত করলেন। পাদ্রী ফাণ্ডার যখন জানতে পারলো যে, মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেব এখানে আসছেন, তখন সাথে সাথে সে কুস্তনতুনিয়া থেকে পলায়ন করলো।)

যা হোক মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেব মক্কা শরীফে কিছুদিন অবস্থান করে দেখতে পেলেন, সেখানকার লোকেরা হিন্দী লোকদের তিলাওয়াত ইত্যাদি শুনে হাসে। নিজের জাতির প্রতি মহব্বতের দাবীতে তিনি

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সেখানে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করলেন। যার নাম রাখলেন 'মাদরাসা সলতিয়্যাহ'। এবং একজন মিসরী কারী যাকে সুলতান আবদুল হামীদ খানের শাসনভার গ্রহণের সময় পাঁচশত কারীর মধ্যে থেকে নির্বাচন করা হয়েছিলো। তাঁকে সেখানে কিরাআত এবং তাজভীদ শিক্ষা দেয়ার জন্য শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করলেন এবং কিছু হিন্দী ছাত্র তার কাছে পড়াতে দিলেন। যাদেরকে ঐ কারী সাহেব কিরআত ও তাজভীদ শিক্ষা দিবেন। সেসব ছাত্রের মধ্যে যারা পরিপূর্ণভাবে পড়াশুনা করে সফলকাম হয়েছেন তাদের মধ্যে কারী আবদুল্লাহ সাহেব ছিলেন একজন অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি। তার চেষ্টা–মেহনত এবং তার মধ্যকার সৌভাগ্যমণ্ডিত শুভলক্ষণ দেখে মিসরী কারী সাহেব অত্যন্ত আগ্রহ ও গুরুত্বসহকারে তাঁকে পূর্ণ বিষয়টি ভালভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। এমনকি কোন কোন লোক কারী আবদুল্লাহ সাহেবের উস্তাদ মিসরী কারী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কারী আবদুল্লাহ কি সমস্ত হিন্দুস্থানীদের মধ্যে উত্তম কারী? তিনি তার উত্তরে বললেন, না বরং সে সমস্ত আরবদের মধ্যে উত্তম।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আমি যখন দ্বিতীয় বার পবিত্র মক্কায় গমন করলাম তখন আমার খেয়াল হলো যে, এবার কিছুদিন এখানে (হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)–এর খিদমতে) অবস্থান করবো। এবং সে সময় কারো কাছ থেকে কুরআন শরীফের তাজভীদ মশক করে নিব। ঘটনাক্রমে একদিন হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) অনেক আলেম এবং কারীদেরকে দাওয়াত করলেন এবং দাওয়াতে উপস্থিত হয়ে প্রত্যেক কারী সাহেব পবিত্র কুরআনও পড়ে শুনালেন। তাদের সকলের মধ্যে আমার কাছে কারী আবদুল্লাহ সাহেবের তিলাওয়াত সবচাইতে বেশী পসন্দ হলো। কারণ তার তিলাওয়াতের মাঝে কোন রং ঢং ছিলো না। আমি তার কাছে কুরআন শরীফ মশক করার দরখাস্ত করলাম এবং মশক করতে শুরুও করে দিলাম। আলহামদুলিল্লাহ মশকের মধ্যে এমন সুন্দর অবস্থা হলো যে, বালাখানায় আমি যখন কারী সাহেবের কাছে মশক করতাম, তখন নিচের শ্রোতাদের জন্য এটা পার্থক্য করা মুশকিল হতো যে, আমি পড়ছি না কারী সাহেব পড়ছেন। কিন্তু কারী সাহেব বলতেন যে, এটা হলো হিন্দুস্থানের আবহাওয়ার আসর বা প্রতিক্রিয়া। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর এ অবস্থাটা বাকী থাকবে না। হাঁ তবে যদি পারো প্রতিদিন একাকী বসে অন্তত এক পারা করে এভাবে তিলাওয়াত করার অভ্যাস

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

করে নিও, তবে এ অবস্থাটা বাকী রাখতে পারবে।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আমি নিয়মিতভাবে তা করতে পারিনি। মাওলানা রহমতুল্লাহ কীরানুভী (রহঃ)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন, প্রথম অবস্থায় তিনি হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)-এর ভক্ত ও অনুসারী ছিলেন না। বরং তিনি সূফিয়ায়ে কিরামের ব্যাপারে বিভিন্ন বিতর্কমূলক বিরোধী কথাবার্তা বলতেন এবং হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)-এর সাথেও তর্ক-বিতর্কমূলক আলোচনা হতো।

একবার তিনি হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)কে বললেন, আপনি তো নিজেকে নিজে জুনাইদ বাগদাদী মনে করেন। হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) বললেন যে, হাঁ আমারও আপনাকে এ কথা বলার অধিকার আছে যে, আপনি নিজেকে নিজে বু আলী সীনা মনে করেন কিন্তু প্রমাণ কারো কাছেই নেই।

হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) বললেন, আসল জিনিস হচ্ছে, দ্বীনী মাদরাসা। তখন মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেব বললেন, ঠিক তাই যদি হয়,তবে সমস্ত মসজিদগুলো ভেঙ্গে মাদরাসা বানিয়ে দিন। এরপর মাওলানা বললেন, শুধু তাসবীহ ঘুরালে এতে কি হয়? হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) জবাবে বললেন, তাসবীহ ঘুরানোর দ্বারা এই হয় যে, আপনার মত শত শত লোক আমার পায়ের উপর এসে পড়ে। আবার কখনো আমার মত লোকও আপনার কাছে আসে। (হযরতের (রহঃ) কথা এখানে শেষ) [৫ রমযানুল মুবারক, ১৩৪৯ হিজরী]

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেছিলেন যে, প্রাথমিক অবস্থায় মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেব হযরত হাজী সাহেবের (রহঃ) ভক্ত ও অনুসারী ছিলেন না। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পরবর্তীতে এই অবস্থা ছিলো না (অর্থাত মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেব হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)-এর অনুসারী হয়ে গিয়েছিলেন।) আল্লাহ পাকই সর্বাধিক জ্ঞাত।

বাকীর কারণে মূল্য বাড়িয়ে দেয়া প্রসঙ্গে

অধম (সংকলক) একবার হযরত থানবী (রহঃ)-এর খিদমতে প্রশ্ন করেছিলেন যে, অনেক কোম্পানী নগদ এবং বাকী বিক্রির দামের মধ্যে পার্থক্য করে থাকে। যেমন, নগদ কিনলে যে বস্তুর মূল্য একশত টাকা,বাকী কিনলে তার মূল্য ধরে একশত দশ টাকা। এটা মূলতঃ সূদ

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

খাওয়ার একটা কৌশল।

এ ব্যাপারে হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, ফতওয়া তো জায়েয বলেই দিতে হবে। (যেমনটি হিদায়া কিতাবের মধ্যে আছে।) তবে একথা বলে দিতে হবে যে, এটা সূদের সাথে সাদৃশ্য হওয়ার কারণে মাকরূহ। দ্বিতীয়তঃ এমনটি করা তো মানবতা ও ভদ্রতা পরিপন্থী।

দুনিয়াদারদের নযরে বুযুর্গানে দ্বীনের সংস্পর্শ

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) ঘটনা বর্ণনা করেছেন, রামপুরের শাসক হাকীম জিয়াউদ্দীন সাহেব যখন হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব (রহঃ)–এর খিদমতে থানাভোন আসতে শুরু করলো, তখন মহল্লার লোকেরা তার পিতাকে বললো, জনাব! আপনার ছেলের ব্যাপারে খুবই দুঃখ হয়, সে একজন ভাল ও বিশিষ্ট লোক হওয়ার পরেও নষ্ট হয়ে গেলো। কারণ খারাপ সংশ্রবে থাকলে তার প্রতিক্রিয়া খারাপই হয় (ভাল হয় না)।

অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও হাদিয়া গ্রহণ

১৩৪৯ হিজরীর ৫ই রমযানের ঘটনা। একজন আলিম, যাকে বর্তমানে খুব প্রসিদ্ধ ও সম্মানী আলেম মনে করা হয়। কোন কারণে সে সময় ঐ আলিমের প্রতি হযরত থানবী (রহঃ)–এর অসন্তুষ্টি ছিলো। সে সময় সে হজ্জে গেলো এবং সেখান থেকে ফিরে এসে হজ্জের বিভিন্ন তাবাররুক খেজুর, যমযমের পানি হযরত (রহঃ)–এর জন্য পাঠিয়ে দিলো। তখন হযরত (রহঃ) ঐ আলেম ব্যক্তিকে বলে পাঠালেন, এ হাদিয়াগুলোর দুটি দিক রয়েছে একটি হলো আপনার হাদিয়া হওয়ার দিক থেকে। আর অপর দিকটি হলো, মক্কা–মদীনার তাবাররুক হওয়া হিসেবে। দ্বিতীয় দিকটির বিচারে এ হাদিয়া ফেরৎ পাঠানো বেয়াদবী। এজন্য মাঝামাঝি একটা পন্থা অবলম্বন করলাম। এ বলে যমযমের একটা পাত্র এবং কয়েকটা খুরমা খেজুর রেখে বাকী সব ফেরৎ পাঠিয়ে দিলাম।

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ)

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) যখন বাদশাহী ছেড়ে দিয়ে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

নির্জনতা অবলম্বন করলেন, তখন উযীর ও মন্ত্রীবর্গের একটি প্রতিনিধি দল তাঁর খিদমতে হাযির হলো এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো যে, আপনি বাদশাহী ছেড়ে দিলেন কেন? আমরা সকলেই তো আপনার বাধ্যগত। তখন হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) জবাব দিলেন যে, একটি বিশেষ চিন্তা আমার অন্তরকে বেষ্টন করে রেখেছে। আর চিন্তাক্লিষ্ট অবস্থায় রাজ্য শাসনের কাজ সম্পাদন করা কঠিন। আগত লোকেরা তখন বললো, আপনি বলুন আপনার কিসের চিন্তা, আমরা আপনার সে চিন্তা দূর করার ক্ষেত্রে আপনাকে সহযোগিতা করবো। তখন হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) বললেন যে, পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَ فَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ

অর্থাত, আখিরাতে মানুষের একটি দল জান্নাতে যাবে এবং একটি দল দোযখে যাবে। এবং হাদীস শরীফে আছে, কিয়ামতের দিনে মহান আল্লাহ সমস্ত মাখলুককে নিজের কুদরতী মুষ্টির মধ্যে ভরে নিবেন। ডান মুষ্টির মধ্যে যাদের নিবেন তারা বেহেশতে আর বাম মুষ্টির মধ্যে যাদের নিবেন তারা দোজখে যাবে।

এখন আমার মাথায় এই চিন্তার সৃষ্টি হয়েছে যে, আমি দুই দলের কোন দলভুক্ত এবং দুই মুষ্টির কোন মুষ্টির অন্তর্ভুক্ত হবো। এই চিন্তা ও অস্থিরতা আমাকে বাদশাহী ব্যবস্থাপনা পরিচালনার অযোগ্য করে দিয়েছে। প্রকৃত কথা এটাই যে, যখন পরকালের চিন্তা মানুষের মাথায় এসে যায় তখন দুনিয়ার কর্মকাণ্ডের সাথে তার সম্পর্ক রক্ষা করা কঠিন হয়ে যায়। কবি কত সুন্দর বলেছেন— خود چہ جائے جنگ جدل نیک وبد

کیں دلم از صلحہا ہم می آمد

অর্থাত, নেক আর বদের ঝগড়া তার নিজ স্থানে থাক। আমার মনের কথা তো আমার মনেই আছে যে, আমি নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হতে আশাবাদী।

প্রসিদ্ধি কামনা একটি বড় ফিৎনা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, 'জামেউস

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সগীর' নামক গ্রন্থে একটি মারফু হাদীস আমার নযরে পড়েছে। যার বিষয়বস্তু এরূপ, আলিমের জন্য এটা বহুত বড় একটা ফিৎনা যে, সে কামনা করতে থাকে—তার কাছে এসে লোক বসে থাকুক।

(উপরোক্ত বক্তব্যের বিষয়বস্তুর সাথে আমরা আমাদের কর্মকাণ্ডকে বিচার করে দেখলে কি দেখবো। বর্তমানে আমাদের প্রায় সকল কর্মকাণ্ডের পিছনেই যেন খ্যাতি, সুনাম আর প্রসিদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য কাজ করে। এ জাতীয় উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের আশায় আমরা যেন কোন কাজই করতে জানি না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সঠিক বুঝ ও ইখলাস দান করুন, আমীন—অনুবাদক)

ইসলামের এক আশ্চর্য পদ্ধতি

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আমি কিছু লোকের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলাম। তাদেরকে আমি এই পরামর্শ দিলাম, তোমরা অন্য কারো হাতে বাই'আত হয়ে যাও! তবে আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবো। ফলে তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনটি করেও নিলো এবং আমিও বাস্তবেই তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম।

বাহ্যিক মান-মর্যাদা কামনা প্রসঙ্গে

হযরত গাংগুহী (রহঃ) একজন শাইখ ও মুরীদের ঘটনা শুনিয়েছেন। ঘটনাটি হলো, মুরীদ অনেক ইবাদত বন্দেগী এবং সাধনা করতো কিন্তু তার কোনই সুফল ও প্রতিক্রিয়া হতো না। শাইখ ঐ মুরীদকে অনেক ওযীফা বদল করে দিয়েছেন এবং অনেক কৌশল ও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তার বাতেনী অবস্থা সংশোধন হতে দেখা গেলো না। অতঃপর শাইখ এমন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন, যা বাহ্যিক ইযযত ও মান-সম্মানের পরিপন্থী ছিলো। মুরীদ সে ব্যবস্থা মতে কাজ করতে পারলো না। তখন বুঝা গেলো যে, এ লোকটি বাহ্যিক সম্মান অন্বেষণকারী ছিলো। এই সম্মানকামিতাই তার ইসলাহ ও শুদ্ধির পথে জগদ্দল পাথর হয়ে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।

বুযুর্গানে দ্বীন সম্মান-মর্যাদা কামনা সংশোধনের জন্য নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে বড় বড় মুজাহাদা করেছেন। হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, এতটুকু সম্মান-মর্যাদা কামনা করা জায়েয আছে যতটুকুর দ্বারা

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

লোকদের যুলম–অত্যাচার থেকে বেঁচে থাকা যায়। কিন্তু তাই বলে এটা দ্বীনী উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর এই পরিমাণ থেকে বেশী সম্মান–মর্যাদা কামনা করা হলে তা দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর। এ কারণেই হাদীস শরীফে নিম্নোক্ত দু'আর কথা শিখানো হয়েছে। দু'আটি হলো—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ فِىْ عَيْنِىْ صَغِيْرًا وَّ فِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا

অর্থাত, আয় আল্লাহ! আমাকে আমার নিজের নযরে ছোট এবং লোকদের নযরে বড় বানিয়ে দিন।

দু'আটি তো সম্মান–মর্যাদা লাভের জন্য একটি দু'আ কিন্তু হাদীস শরীফে শুধু দু'আর কথা শিখিয়েই ক্ষ্যান্ত করা হয়েছে। এর জন্য কোন কৌশল বা ব্যবস্থা গ্রহণের পথ বাতলে দেয়া হয়নি। যা থেকে বুঝা যায় যে, সম্মান প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই দেয়া হয়ে থাকে। কোন কৌশল বা ব্যবস্থা দ্বারা অর্জন করা যায় না।

হযরত গাংগুহী (রহঃ)–এর কসম

হযরত গাংগুহী (রহঃ) একবার একটি চিঠিতে কসম করে লিখলেন যে, 'আমি কিছুই না।' তার উপর আলিমগণের এরূপ সন্দেহ সৃষ্টি হলো যে, এ কসম কিভাবে দুরস্ত হলো। আসল কথা হলো, হযরত গাংগুহী (রহঃ) যে কামাল ও বুযুর্গী লাভের আঁশা করেন, সে হিসেবে তিনি কসম করেছেন। আর আমরা তাঁকে তাঁর অর্জিত বুযুর্গীর হিসেবেই বুযুর্গ মনে করি। কিন্তু হযরত গাংগুহী (রহঃ)–এর কাছে যেহেতু এমন বুযুর্গীটাই কাম্য ছিলো, যার দরজা ছিলো অনেক উপরে তার তুলনায় তাঁর কাছে তাঁর অর্জিত বুযুর্গীর যেন কোন মূল্যই নেই (তাই তাঁর এরূপ কসম করা বেঠিক হয়নি।)

লোকদের সাথে আচার–আচরণে পার্থক্য

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, আমি একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সকলের সাথে আচার–আচরণে সমতা রক্ষা করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিলাম। একটা সময় পর্যন্ত আমি এমনটি করেছিও। কিন্তু এতে আমার অনেক কষ্টও হয়েছে এবং এরপর এ কথাও আমার বুঝে এসেছে যে, এমনটি করা তো সুন্নাতের পরিপন্থী। কেননা প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত শাইখাইন (হযরত আবু বকর (রাযিঃ) ও হযরত উমর (রাযিঃ)দ্বয়)–এর সাথে যে আচরণ করেছেন তা তো অন্যদের সাথে করেননি। অনেক সময় মজলিসেও এমন কিছু কাজ হতো, যার দ্বারা তাদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেতো। তখন থেকে আর এর জন্য আমি চেষ্টা করি না। উপস্থিতভাবে যার সাথে যেরূপ আচরণ করতে মনে চায়, তার সাথে সেরূপ আচরণই করি।

মাদরাসা ও খানকার চাঁদা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, একবার আমাদের মাদরাসার জন্য এক লোক চার হাজার টাকা পাঠিয়ে দিলো। এবং সে এই শর্ত আরোপ করলো যে, রেজিষ্টারের সামনে আমার এ দানের সত্যতা স্বীকার করে দিতে হবে। আমি তার সে শর্ত মঞ্জুর না করে তার টাকা ফেরৎ পাঠিয়ে দিলাম।

এরপর হযরত থানবী (রহঃ) পূর্বাপর কথার সাথে সামঞ্জস্যতার কারণে নিম্নের শে'রগুলো পড়লেন। পূর্বাপরের কথা আমার স্মরণ নেই তবে শে'রগুলো আধ্যাত্মিক সাধকদের জন্য শিক্ষামূলক (তাই শে'রগুলো এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে—)

اے بادشہ خوباں داد از غم تنہائی　　دل بے تو بجان آمد وقت است کہ باز آئی

اے درد توام درمان بر بستر ناکامی　　وے یاد توام مونس در گوشۂ تنہائی

فکر خود و رائے خود در عالم رندی نیست　　کفر است درین مذہب خود بینی و خود رائی

অর্থাত, (উপরের শে'র কটির মর্ম হচ্ছে) হে আমার হৃদয় রাজ্যের রাজা মহান আল্লাহ। তোমার বিরহ যন্ত্রণায় আমি কাতর, তোমা বিহনে আমার জীবন ওষ্ঠাগত। সুতরাং তুমি আমার হৃদয়রাজ্যে ফিরে আসো। ব্যর্থতা ও নিরাশার এ কাতর রোগের তুমিই ঔষধ বা প্রতিষেধক। আমার এই নিঃসঙ্গতায় তোমার স্মরণই শুধু সাথী। তরীকতের পথে নিজের চিন্তা, নিজের রায় তথা আমিত্ব বলতে কিছু নেই বরং এই পথে আমি আর আমিত্বকে কুফরীতুল্য মনে করা হয়।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

দেওবন্দী কাফেলায় হযরত গাংগুহী (রহঃ)-এর অবস্থান

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) হযরত গাংগুহী (রহঃ)কে অনেক আদব ও সম্মান করতেন। অনুরূপভাবে উলামায়ে দেওবন্দের নূরানী কাফেলার সকল সদস্যই হযরত গাংগুহী (রহঃ)কে সবচাইতে বেশী ইযযত-সম্মান ও আদব করতেন। তবে হযরত গাংগুহী (রহঃ)-এর শাইখের সাহেবজাদা হিসেবে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)-এর যদিও একটা মুরব্বীসুলভ অবস্থান ছিলো কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি হযরত গাংগুহী (রহঃ)-এর প্রতি যথেষ্ট আদব বজায় রেখে চলতেন। আর বাস্তব কথা হলো, এসব বুযুর্গানে দ্বীন যখন কোন একটি মজলিসে একত্রিত হতেন তখন প্রত্যেকেই একে অপরকে আগে বাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করতেন এবং একে অপরকে ইযযত-সম্মান প্রদর্শন করতে থাকতেন। কোন অপরিচিত লোকের বুঝা কঠিন ছিলো যে, এঁদের মধ্যে বড় কে।

কিতাব নিয়ে কি করবো?

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, একবার হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) ইচ্ছা করলেন যে, তাঁর সমস্ত কিতাব আমাকে দিয়ে দিবেন। তখন আমি হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)-এর খিদমতে আরয করলাম, হযরত! কিতাব নিয়ে কি করবো, আমাকে আপনার সীনা মুবারক থেকে কিছু দান করুন। হযরত হাজী ছাহেব (রহঃ) আমার এই কথা শুনে খুব সন্তুষ্ট হলেন।

হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)-এর খিদমতে ছয় মাস

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)-এর খিদমতে আমার মাত্র ছয়মাস থাকা হয়েছে। হযরত হাজী ছাহেব (রহঃ)ও আমাকে ছয় মাস থাকার কথাই বলেছিলেন। আমি আরো কিছুদিন বেশী অবস্থান করতাম। কিন্তু এজন্য করিনি, যেহেতু হযরত হাজী ছাহেব (রহঃ)-এর স্নেহ আমার প্রতি অনেক বেশী ছিলো। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে যার বহিঃপ্রকাশও ঘটতেছিলো। এ কারণে অনেকে প্রতিহিংসায় লিপ্ত ছিলো, ফলে তারা হযরত হাজী ছাহেব (রহঃ)-এর কাছে আমার সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ করতো। কিন্তু

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হযরত হাজী ছাহেব (রহঃ) কখনোই কারো কোন অভিযোগকে গুরুত্ব দেয়ার যোগ্য মনে করেননি।

রমযান শরীফে ইবাদত

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, রমযানুল মুবারকে আমার মনে চায় ঐ সকল ইবাদতই বেশী বেশী করতে, যা পরিস্কারভাবে পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। সুফিয়ায়ে কিরামের ইজতিহাদ ও গবেষণালব্ধ ইবাদত এবং বিশেষ ধরনের যিকির শোগল ইত্যাদি এ মাসে করতে মনে চায় না।

হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)-এর শাজারা

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আমি অনেক দরবেশের কাছ থেকে শুনেছি যে, বুযুর্গানে দ্বীনের নামের শাজারা (কাব্য) তো লোকেরা অনেকই লিখেছে। কিন্তু কোন শাজারাই হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)-এর শাজারা থেকে উত্তম নেই। তার মধ্যে একটা দরদ ও আবেদন আছে, যদিও তা শে'রের মানগত দিক থেকে খুব উচ্চাংগের নয়।

ইলহাম অবশ্য পালনীয় বিষয় নয়

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, কোন বুযুর্গের ইলহাম কারো জন্য অকাট্য বা আবশ্যকীয় হয় না। এমনকি যে ব্যক্তির ইলহাম হয় তার উপরও সে ইলহামের অনুসরণ করা শরীয়তের কোন ওয়াজিব বিষয় নয়। যার উপর আমল করা না হলে গুনাহ হতে পারে, তবে নিজের ইলহামের বিরোধিতা করা হলে, কখনো কখনো দুনিয়াতেই কোন মুসীবত ও কষ্ট এসে যায়।

একবার এক বুযুর্গ এক শহরে গমন করলেন। তখন অপর এক বুযুর্গ যিনি এ শহরেই থাকতেন, তিনি ইচ্ছা করলেন, আগমনকারী বুযুর্গের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। কিন্তু সে সময় তার প্রতি ইলহাম হলো 'যেয়োনা'। ফলে তিনি বসে গেলেন। কিছুক্ষণ পড়ে আবার তার যাওয়ার ইচ্ছা হলো তখন পুনরায় তার প্রতি একই ইলহাম হলো 'যেয়ো না'। ফলে এবারও তিনি বসে পড়লেন। এরপর তৃতীয়বার আবার তার মাঝে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হলো এবং তিনি উঠে রওয়ানা

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

করলেন। কিন্তু দু' চার কদম চলার পরই একটা কিছুর সাথে ধাক্কা খেয়ে তিনি পড়ে গেলেন এবং তাঁর পা ভেঙ্গে গেলো। পরে এ বুযুর্গ জানতে পারলেন যে, যে বুযুর্গ এসেছেন, তিনি বিদআতে লিপ্ত ছিলেন। সুতরাং এ বুযুর্গ সেখানে গেলে এতে সাধারণ মুসলমানদের ক্ষতি হতো। নিজের ইলহামের মুখালাফাত বা বিরোধিতা করার কারণে এ ধরনের কোন কষ্ট ও মুসীবত আসে ঠিক কিন্তু এর কারণে আখিরাতে কোন আযাব হয় না।

হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন যে, এ অবস্থা হলো, ইজতিহাদী ভুলের অবস্থা। যার কারণে কোন ধমকী আসে না বা অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হয় না। তবে কোন কোন সময় দুনিয়ায় কিছুটা কষ্টের শিকার হতে হয়।

আউলিয়ায়ে কিরামের মাযার থেকে ফায়েয হাসিল

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, আউলিয়ায়ে কিরামের কবর থেকে এরূপ ফায়েয হাসিল হতে পারে, যার দ্বারা সম্পর্ক মযবুত হয়। আধ্যাত্মিক তালীম বা শিক্ষার ফায়েয কবর থেকে লাভ হয় না। অধম (সংকলক) হযরত থানবী (রহঃ)কে প্রশ্ন করেছিলাম যে, মাযারসমূহ থেকে ফায়দা হাসিল করার বিশেষ কোন পদ্ধতি আছে কিনা? জবাবে হযরত হযরত থানবী (রহঃ) বললেন, শুধু ফাতেহা ইত্যাদি পাঠ করে কবরবাসীর প্রতি মনোনিবেশ করে বসে যাবে। এর দ্বারা সম্পর্কের মাঝে শক্তি সৃষ্টি হয়। সম্পর্কের মাঝে শক্তি সৃষ্টি হওয়ার এ বিষয়টি অনেকের তো পরিপূর্ণভাবে বুঝে আসে এবং তারা অনুভবও করতে পারে। তা না হলেও অন্ততঃ এতটুকু তো অবশ্যই অনুভব করতে পারে যে, অন্তরের মাঝে একটা নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে খুব বেশী চেষ্টা ফিকির করা উচিত নয় কারণ পূর্বসূরী কোন কোন বুযুর্গের বক্তব্য হচ্ছে—

روباہ زندہ بہ کہ شیر مردہ

অর্থাত, মরা বাঘের চাইতে জীবিত শৃগালও উত্তম।

এর মর্ম হচ্ছে, জীবিত পীর যদিও কিছুটা নাকেস বা অসম্পূর্ণ হয়, তবুও সে মুর্দা কামেল পীর থেকে ফায়দা অর্জনের দিক দিয়ে অধিক উপকারী। কেননা সে তো তালীম করে আর তালীমের দ্বারা কোন কোন সময় শক্তিশালী নিসবত বা সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায়।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে মাযারসমূহ থেকে অর্জন করা ফায়েয এবং অবস্থা স্থায়ী হয় না। সেখান থেকে দূরে চলে গেলেই তা শেষ হয়ে যায়, হযরত (রহঃ) আরো বলেন যে, মৃত্যু ব্যক্তি শুনতে পায় কিনা—এ নিয়ে ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে কিন্তু কাশফের অধিকারী আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, মৃত ব্যক্তিরা শুনতে পায়।

নিসবত 'সলব' করার হাকীকত

কোন এক ব্যক্তি হযরত থানবী (রহঃ)-এর কাছে প্রশ্ন করলো যে, কোন কোন মাশায়েখ অন্যের নিসবতকে 'সলব' করে বা ছিনিয়ে নিয়েছেন বলে যে কথাটি প্রসিদ্ধ আছে তার হাকীকত কি? জবাবে হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বললেন, প্রকৃত 'নিসবত' তো আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্কের নাম। তা কেউ সলব বা ছিনতাই করতে পারে না। কিন্তু একটি 'নিসবত' আছে সাধারণ লোকের ইসলাহ বা সংশোধন। তা সলব করা বা ছিনিয়ে নেয়া যেতে পারে। এই নিসবতে আনন্দ ও প্রফুল্লতার অবস্থা হয়ে থাকে। যা আল্লাহ পাকের যিকির এবং ইবাদতের আধিক্যের মধ্যে নির্ধারিত হয়। এরূপ অবস্থা নফসানী বা প্রবৃত্তিগত, রুহানী অবস্থা নয়। যেমন অস্থিরতা, প্রফুল্লতা ইত্যাদি। তা সলব করা বা ছিনিয়ে নেয়ার দ্বারা এমনিতে তো কোন ক্ষতি নেই, তবে এর দ্বারা আমলের সহজতা দূর হয়ে যায়। যদি কোন ব্যক্তি সহজ না হওয়া সত্ত্বেও কষ্ট স্বীকার করে সকল কাজ পুরা করতে থাকে, তবে এর দ্বারা তার কোন দ্বীনী ক্ষতি হয় না। তবে যে ব্যক্তি তার মোকাবেলা করতে না পারে এবং আমলের সহজতা দূর হয়ে যাওয়ার পরে আমলের মধ্যে কম করে দেয় তবে এটা দ্বীনী ক্ষতিও বটে। এজন্য এটা নাজায়েয। অবশ্য সালেক বা সাধক নিজেই যদি নিজের প্রয়োজনে এমনটি করে,তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই। যেমনটি কোন কোন বুযুর্গের ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, যে ব্যক্তি অধিক যিকির-শোগলে লিপ্ত হয়ে 'হক্কুল ইবাদ' বা বান্দার হক আদায়ের ফরয দায়িত্ব সম্পাদনে অলসতা করতে শুরু করে দিয়েছে তার এই 'নিসবতে ইমবিসাত' তথা প্রফুল্লতার নিসবত তিনি ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন। ফলে সে সকল হকসমূহ আদায় করতে শুরু করেছে।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

ওলীগণের 'নিসবত' কাকে বলে?

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, সুফিয়ায়ে কিরামের পরিভাষায় যাকে 'নিসবত' বলা হয় তা ঐ 'তাআল্লুক মাআল্লাহ' বা আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্কের নাম, যার জন্য দুটি আবশ্যকীয় বিষয় রয়েছে। একটি হলো, সার্বক্ষণিক ইতা'আত বা বাধ্যগত থাকা। আর অপরটি হলো অধিক পরিমাণে যিকির। যিকিরের সাথে সার্বক্ষণিক কথাটা এজন্য লাগানো হয়নি যেহেতু এটা মানুষের সাধ্যের ভিতরে নয়। কিন্তু বাধ্যগত থাকা অর্থাত আহকামে শরীয়তের অনুসরণ করার ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব মানুষের দ্বারা হওয়া সম্ভব।

হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন যে, ওলীগণ থেকে গুনাহ প্রকাশ পেতে পারে। তবে গুনাহ প্রকাশ পাওয়ার পর আর তার সাথে এই বিশেষ নিসবত অবশিষ্ট থাকে না। অবশ্য তাওয়াজ্জুহ বা মনোনিবেশ করার দ্বারা তা পুনরায় ফিরে আসে।

একটি আয়াতের সংশয় ও তার অপনোদন

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে—

رفع عن امتى الخطاء والنسيان

অর্থাত, আমার উম্মতের উপর থেকে অনিচ্ছা কৃত ও ভুলবশতঃ কৃত কাজের দায় উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। অর্থ হলো, ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও ভুলে হয়ে যাওয়া কাজে কোন গুনাহ হবে না। কিন্তু পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে—

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا

অর্থাত, হে আমাদের রব! অনিচ্ছায় কিংবা ভুলে আমাদের দ্বারা কোন কাজ হয়ে গেলে, সে জন্য আমাদের পাকড়াও করা থেকে মুক্তিদান করুন।

উপরোক্ত আয়াতে অনিচ্ছাকৃত বা ভুলবশতঃ হয়ে যাওয়া কাজের জন্য পাকড়াও না করার দু'আর উপর এই সংশয় হতে পারে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বর্ণনা মুতাবিক অনিচ্ছাকৃত

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

ও ভুলক্রমে হয়ে যাওয়া কাজের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। এরপর আবার এই দু'আ করার কি প্রয়োজন।

মাওলানা রুমী (রহঃ) এর জবাবে বলেছেন, যদিও অনিচ্ছা ও ভুলের গুনাহ আল্লাহ পাক নিজ দয়া ও অনুগ্রহে ক্ষমা করে দিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তো সেগুলো পাকড়াও করার মত অপরাধ। কারণ তার থেকে বেঁচে থাকা এক হিসেবে মানুষের এখতিয়ারভুক্ত। অর্থাত, এসব কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের এখতিয়ারভুক্ত যেসব আসবাব ও বিষয় রয়েছে সেগুলো অবলম্বন করার ক্ষেত্রে কোনরূপ অলসতা যাতে না হয়, সেজন্য দু'আ করা।

একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আমার অসীয়্যত হচ্ছে, বুযুর্গানে দ্বীনের শে'র–কবিতা ও কথা দ্বারা কোন মাসআলার ক্ষেত্রে প্রমাণ পেশ করা কস্মিনকালেও উচিত নয়। কারণ শে'রের ক্ষেত্রে অধিকাংশ অর্থই শব্দের অধীনস্ত হয়ে যায়, তবে পূর্ব থেকেই যে মাসআলাহ স্বীকৃতভাবে জানা আছে, সে মাসআলার সাথে শে'রকে সামঞ্জস্যশীল করে নেয়া দুরস্ত আছে ঠিক, কিন্তু তাই বলে শে'র দ্বারা কোন স্বতন্ত্র মাসআলাহ বের করা দুরস্ত নয়। হযরত মাওলানা রুমী (রহঃ) বলেন—

معنی اندر شعر جزء باخبط نیست   چوں غلا سنگ ست اورا ضبط نیست

অর্থাত, শে'র ও কবিতার অভ্যন্তরে তার মর্ম তার শব্দের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল নয় (শব্দের সাথে মর্মের পার্থক্যও হতে পারে।) যেমন এক ধরনের পাথর যা কখনো স্থির থাকে না বরং সামান্য ধাক্কায়ই তা শুধু নড়াচড়া করে।

হযরত শাহ ইসহাক (রহঃ) ও তার ভাই হযরত শাহ ইয়াকুব (রহঃ)

হযরত মাওলানা শাহ ইসহাক সাহেব দেহলুভী (রহঃ)–এর অভ্যাস ছিলো, কোন ব্যক্তি যদি তাদেরকে সুপারিশ করতে বলতো তবে সাথে সাথেই তিনি সুপারিশ করে দিতেন। কিন্তু তার ভাই শাহ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) কারো জন্য সুপারিশ করতেন না। শাহ ইসহাক সাহেব (রহঃ)–এর

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

ভিতরে আল্লাহ পাকের সৃষ্টির উপকার করার মানসিকতা প্রবল ছিলো। আর শাহ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) বলতেন যে, সুপারিশ করা নিঃসন্দেহে মুস্তাহাব। কিন্তু আমি দেখি যার কাছে সুপারিশ করা হয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তার কষ্ট হয়। আর মুমিনকে কষ্ট–তাকলীফ থেকে বাঁচানো ওয়াজিব। এ কারণে আমি ওয়াজিবের মুকাবিলায় মুস্তাহাব আদায়ের চিন্তা করি না।

একবার হযরত শাহ ইসহাক সাহেব (রহঃ)–এর সাথে এক লোক সাক্ষাৎ করতে এলো। এবং তার কাছে এমন এক ব্যক্তির বরাবরে সুপারিশ করার আবেদন করলো, যে ব্যক্তি হযরত শাহ সাহেবের বিরোধী ছিলো। শাহ সাহেব সাথে সাথেই সুপারিশ লিখে দিলেন। যখন ঐ ব্যক্তি হযরত শাহ সাহেবের চিঠি নিয়ে তার কাছে পৌছুলো, তখন সেই বেয়াদব হযরত শাহ সাহেবের সুপারিশের চিঠিটাকে মুচড়িয়ে একটা দড়ির মত বানিয়ে দিলো এবং ঐ লোকটিকে বললো, নাও এটা নিয়ে যাও এবং শাহ সাহেবকে গিয়ে বলো, এটাকে আপনার অমুক স্থানে ঢুকিয়ে রাখুন (একটা অশ্লীল গালি উচ্চারণ করলো)। অবস্থা দেখে এ লোকটিও অত্যন্ত বিস্মিত হলো এবং সোজা শাহ সাহেবের কাছে ফিরে এলো এবং সেই বেয়াদব যে শব্দটি উচ্চারণ করেছিলো সেটা নকল করে শুনালো। এ কথা শুনে শাহ ইসহাক সাহেব (রহঃ) বললেন, যদি আমি জানতাম যে, সে যা বলেছে আমি সেই কাজ করলে তোমার কাজটি হয়ে যাবে, তবে আমি তা করতেও কোন দ্বিধা করতাম না। কিন্তু আমি জানি ওটা একটা বেহুদা কাজ ছাড়া কিছুই নয়।

এরপর ঐ লোকটি এখান থেকে পুনরায় ঐ ব্যক্তির কাছে গেলো এবং শাহ সাহেবের কথা তাকে শুনালো। শাহ সাহেবের কথা শোনার সাথে সাথে ঐ লোকটির মাঝে এক ধরনের উন্মত্ততা ও দেওয়ানা ভাব সৃষ্টি হয়ে গেলো এবং তৎক্ষণাৎ লোকটি হযরত শাহ সাহেবের দরবারে উপস্থিত হয়ে হযরত শাহ সাহেবের মুরীদ হয়ে গেলো।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) নবাব মাহমুদ আলী সাহেব (রহঃ)–এর কাছে প্রতি বৎসর একবার যেতেন। তিনি লোকদের বিভিন্ন সুপারিশ একটা সাদা কাগজে লিখতে থাকতেন এবং যখন নবাব সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তখন সেই সুপারিশের বিরাট ফিরিস্তি তাঁকে পাঠ করে শোনাতেন। এবং অধিকাংশ সুপারিশই নবাব

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সাহেবের কাছ থেকে মঞ্জুর করাতেন আর কিছু কিছু সুপারিশের ব্যাপারে নবাব সাহেব অপারগতা প্রকাশ করতেন। কিন্তু এই ধারাবাহিকতা চলতে চলতে তা এতটাই দীর্ঘ হয়ে গেলো যে, একবার নবাব সাহেব বাধ্য হয়ে বললেন যে, হযরত! আপনি এত অধিক পরিমাণে সুপারিশ নিয়ে আসবেন না। তখন মাওলানা সাহেব বললেন, ঠিক আছে, যদি আপনার একথাই ঠিক হয় তবে ভবিষ্যতে আমাকে আপনার এখানে আসার ব্যাপারেও অপারগ মনে করবেন। আমার তো আপনার কাছে আসার উদ্দেশ্যই এটা যে, আমি আপনাকে লোকদের বিভিন্ন অবস্থা ও প্রয়োজন সম্পর্কে অবগত করাবো। যদি তা আপনার কাছে ভাল না লাগে তবে আমি ভবিষ্যতে আপনার কাছে আসার ব্যাপারেও অপারগতা প্রকাশ করছি। আর একথাও ঠিক যে, আমি যত সুপারিশই আপনার কাছে করি। কিন্তু এ কথা তো বলি না যে, এর সবটাই আপনাকে পূর্ণ করতে হবে। বরং আমি শুধু আপনাকে অবগত করি এরপর কি করবেন সেটা আপনার ব্যাপার।

সুপারিশ সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা

অধম সংকলক (মুফতী শফী রহঃ) বলছে যে, হাদীস শরীফে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুপারিশ করার ফযীলত বর্ণনা করেছেন, আর এর দ্বারা একটা বিশেষ ফায়দা এটাও যে, সাধারণ ও সম্পর্কহীন লোকদের কথা বড়দের কাছে পৌছে যায়। তবে সাথে সাথে এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, যার কাছে সুপারিশ করা হয়, তার যাতে কোন কষ্ট না হয়। এবং নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি দ্বারা সুপারিশ গ্রহণ করতে যাতে তাকে বাধ্য করা না হয়। বরং নিজের কথা ও কাজের দ্বারা তাকে বুঝিয়ে দেয়া উচিত যে, যদি সুপারিশ গ্রহণ করা নাও হয়, তবে তাতেও আমার কোন কষ্ট হবে না। এ ধরনের সুপারিশ করা তো মুস্তাহাব। আর যে সুপারিশের মাঝে অন্যের ইচ্ছা ও অধিকারকে নিজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি দ্বারা খর্ব করা হয়, তা সম্পূর্ণ নাজায়েয। (এই ব্যাখ্যাও হযরত থানবী (রহঃ)–এর কাছ থেকে শুনেছি।)

আশ্চর্য মেহমানদারী

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী (রহঃ) ধনী

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

মেহমানদেরকে সাধারণ খানা এবং গরীবদেরকে উন্নতমানের খানা খাওয়াতেন। কেউ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাবে বললেন, ভাই! মেহমানকে তো এমন খানাই খাওয়ানো উচিত যা সাধারণতঃ সে খায় না।

বুযুর্গানে দ্বীনের ধৈর্য ও দয়া

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি এক বুযুর্গকে গালাগালি করতো। আর সে বুযুর্গ তার কাছে হাদিয়া পাঠাতেন। এর পর লোকটি বুযুর্গকে গালি দেয়া ছেড়ে দিলো। তখন ঐ বুযুর্গও তার কাছে হাদিয়া পাঠানো বন্ধ করে দিলেন। লোকটি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে বুযুর্গ বললেন, ভাই এটা তো লেনদেনের ব্যাপার। আগে তুমি আমাকে একটা জিনিস দিতে তাই তার পরিবর্তে আমিও তোমাকে একটা জিনিস দিতাম। এখন তুমিও দেয়া ছেড়ে দিয়েছো তাই আমিও বন্ধ করে দিয়েছি।

নির্জনতা অবলম্বনের কারণ

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, হযরত মির্যা মাযহার জানে জাঁনা (রহঃ)–এর কাছে কেউ প্রশ্ন করলো যে, আপনি লোকদের সাথে উঠাবসা করেন না কেন? তিনি জবাব দিলেন যে, আমার মানসিকতা খুবই নাজুক এবং সূক্ষ্ম। লোকদের ছোটখাটো ভুল কর্মকাণ্ডের কারণেই আমার কষ্ট হয়। এবং আমি দেখতে পাই যে, আমার কষ্টের কারণে তাদের উপর আল্লাহ পাকের গোশ্বা ও গযব নেমে আসে। আমি যতই দু'আ করেছি যে, আমার কারণে যাতে কারো প্রতি কোন কঠোরতা বা আযাব না আসে কিন্তু আমার সে দু'আ কবুল হয়নি। এ কারণে আমি লোকদের থেকে পৃথক (নির্জনে) থাকি।

ধৈর্যের শক্তি ঃ একটি ঘটনা

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আহমদ সাহেব দেহলুভী (রহঃ)–এর সাহেবজাদা মুস্তফার কাছ থেকে এ ঘটনা শুনেছিলাম যে, এক বুযুর্গ ধৈর্য ও সহনশীলতায় খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন। কোন এক ব্যক্তি একবার তাঁর ধৈর্য পরীক্ষা করার জন্য তার দরজায় গেলো। এবং দরজায় আওয়ায দিয়ে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

তাঁকে ডাকলো। তিনি সামনে আসলে লোকটি তাঁকে বললো, আমি আপনার মাকে বিয়ে করতে চাই। কেননা আমি শুনেছি যে, সে এতই সুন্দরী যে, ...। একথা বলে সে একটা অশ্লীল কথা মুখে বললো।

বুযুর্গ ধৈর্যের সাথে সব শুনতে থাকলেন। যখন লোকটি তার সব কথা শেষ করলো তখন বুযুর্গ বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, তবে আমার মা যেহেতু সুস্থ বিবেক রাখেন এবং তিনি বালেগা (প্রাপ্তবয়স্কা) তাই তার কোন ব্যাপার হলে সেক্ষেত্রে তার নিজের ইচ্ছারও গুরুত্ব রয়েছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করে আসি। তিনি যদি রাযি থাকেন তাহলে কোন অসুবিধা নেই। একথা বলে বুযুর্গ অন্দর মহলের দিকে রওয়ানা করলেন। হঠাৎ একবার তিনি পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, লোকটির ধড় হতে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে। এ দৃশ্য দেখে তিনি বললেন—

قتله صبری

আমার ধৈর্যই তাকে হত্যা করেছে।

এ কারণে এক আধা পাগল ধরনের আশেক ব্যক্তি এই নসীহত করেছেন যে, যখন কেউ তোমাকে মন্দ বলে, তবে তুমি তার প্রতিশোধও নিও না আবার পুরাপুরি ধৈর্যও ধারণ করো না। এর অর্থ হচ্ছে, তার থেকে পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ করো না আবার পূর্ণ ধৈর্যও ধারণ করো না। কিছু একটা তাকে বলে দাও। যাতে সে আল্লাহ পাকের গযব ও গোস্বা থেকে রক্ষা পেতে পারে।

হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ)-এর একটি ঘটনা

শাইখুল আরব ওয়াল আযম হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (রহঃ)-এর বিনয়-নম্রতা ও মেহমানদারীর এক আশ্চর্য ঘটনা শুনিয়েছেন মৌলভী মাহমূদ সাহেব রামপুরী (রহঃ)। তিনি বলেন, একবার দেওবন্দে আমাদের একটা প্রয়োজন দেখা দেয়ায় আমরা রামপুর থেকে দেওবন্দে এলাম। তখন একজন হিন্দু ব্যবসায়ীও আমাদের সাথী হলো। তারও এ জাতীয় কোন প্রয়োজন দেওবন্দে ছিলো। যখন আমরা শহরে পৌঁছে গেলাম, তখন ঐ হিন্দু ব্যবসায়ী লোকটি বললো, আপনারা যেখানে থাকবেন যদি আমারও সেখানে থাকার ব্যবস্থা হতো, তবে ভাল হতো। মৌলভী মাহমূদ সাহেব (রহঃ) বললেন, আমরা হযরত শাইখুল

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হিন্দের (রহঃ) বাড়ীতে মেহমান হয়েছি। এরপর তিনি ঐ হিন্দু ব্যবসায়ীকে এখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

রাতের বেলা যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়লো, তখন আমি দেখলাম যে, হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ) ঐ হিন্দু লোকটির কাছে গেলেন এবং আস্তে আস্তে তার পা টিপতে লাগলেন। এ অবস্থা দেখে আমি বললাম যে, হযরত! আপনি একি করছেন? যদি এমনটি করতেই হয়, তবে এ খিদমতের জন্য আমি প্রস্তুত আছি। তখন হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ) বললেন, তা হয় না, লোকটি তো আমার মেহমান। তার খেদমত ও সম্মান করা আমার দায়িত্ব।

হাঁচি ও তার জবাব

মাসআলাহ হলো, যদি কোন মুসলমান হাঁচি দেয় এবং 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে তবে তা যারা শুনবে তাদের সালামের জবাবের ন্যায় 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে তার জবাব দেয়া ওয়াজিব। এ কারণেই এখানে এরূপ কথাও আছে যে, হাঁচিদাতার একটু উচ্চ আওয়াযে আলহামদুলিল্লাহ বলা উত্তম। যাতে লোকেরা 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে তার জবাব দিতে পারে। এতে তারাও সওয়াব লাভ করতে পারবে এবং হাঁচিদাতার জন্যও দু'আ হয়ে যাবে। আল্লামা শামী (রহঃ) এ মতকেই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে বর্ণনা করেছেন।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, যেখানে লোকেরা নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকে এবং সেখানে যদি এরূপ আশংকা থাকে যে, যদি আমরা সেখানে উচ্চ আওয়াযে আলহামদুলিল্লাহ বলি, তবে তাদের জবাব দিতে কষ্ট হবে। এমতাবস্থায় উচ্চ আওয়াযে আলহামদুলিল্লাহ না বলাই উত্তম।

যাহেরী ও বাতেনী বিষয়ে ফিকাহ ও ইজতিহাদ

শরীয়তের যাহেরী আহকামের ক্ষেত্রে যেমন ইজতিহাদ ও ফিকাহ-এর প্রয়োজন হয় অনুরূপভাবে বাতেনী আহকামের ক্ষেত্রেও তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যাহেরী আহকামের ইজতিহাদ প্রসিদ্ধ ইমাম এবং ফকীহগণ করে থাকেন। আর বাতেনী বিষয়ের ফকীহ হলেন সুফিয়ায়ে কিরাম। হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) বলেন, যে মাসআলাহ যাহেরী আহকামের সাথে সম্পৃক্ত এবং সেক্ষেত্রে যদি ফুকাহা এবং সুফিয়ায়ে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

কিরামের মাঝে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে আমি ফুকাহাদের বক্তব্যকেই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে জানি। কিন্তু যদি মাসআলাটি বাতেনী বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তবে সে ক্ষেত্রে আমি সুফিয়ায়ে কিরামের কথাকে গ্রহণ করি। কারণ বাতেনী ব্যাপারে সুফিয়ায়ে কিরামের তাহকীক ও মতামত অধিক গ্রহণযোগ্য ও নিরাপদ।

অধম সংকলক (মুফতী শফী সাহেব) বলছে যে, ইমাম গাযযালী (রহঃ) নিজ কিতাব 'ফাতিহাতুল উলূম' এর মধ্যে লিখেছেন যে, চার প্রসিদ্ধ ইমাম এবং অধিকাংশ ফকীহ ও মুজতাহিদ ইমাম তারা শুধু যাহেরী শরীয়তেরই ইমাম নয় বরং তারা তাসাওউফ ও আধ্যাত্মিকতা এবং বাতেনী বিষয়সমূহেরও ইমাম। হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)–এর এই কথা ব্যাপকভাবে সাধারণ যাহেরী আলেমগণের জন্য বলেই মনে হয়। যারা বাতেনী বিষয়ে প্রসিদ্ধ নয়। (সর্ব ব্যাপারে আল্লাহ পাকই ভাল জানেন।)

অন্যান্য প্রাণী ও মানুষের মাঝে পার্থক্যের কারণ

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, দুনিয়ায় যত রকম প্রাণী রয়েছে সেগুলোর পরস্পরের মাঝে শক্তি ও যোগ্যতার ক্ষেত্রে কম–বেশী হয়ে থাকে। কখনো কোনটা এতই শক্তিশালী হয় যে, দুটির কাজ একাই সমাধা করতে পারে। আবার কোনটা এর চাইতেও বেশী শক্তিশালী হয়। যার ফলে তার একটিই চারটি, ছয়টি, আটটি বা দশটির কাজ একাই সম্পাদন করতে পারে। কখনো একটি ঘোড়া এত শক্তিশালী হয় যে, সেটি একাই চারটি ঘোড়ার কাজ করতে পারে। আবার কখনো একটি গাধা চারটি গাধার বোঝা বহন করতে পারে। এমনিভাবে সকল প্রাণীর মাঝেই শক্তির এই কম–বেশী হওয়ার বিষয়টি সকল মানুষেরই জানা আছে। কিন্তু শক্তি ও যোগ্যতার এই ব্যবধান মানব জাতির মধ্যে অন্য সকল জাতের প্রাণী থেকে এতই বেশী যে, তার কোন সীমা নেই। কখনো একজন মানুষ একশ' মানুষের আবার কখনো একজন মানুষ হাজার মানুষের বরং লক্ষ মানুষের কাজ একাই সম্পাদন করতে পারে।

হাদীস শরীফের এই ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, ফেরেশতাগণ প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সাথে পুরো দুনিয়াকে

পরিমাপ করেছেন। তাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যক্তি সত্তাই সবকিছুর উপর অধিক ভারী ও ওযনদার প্রমাণিত হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, একজন মানুষ সমস্ত দুনিয়ার সমান বা তার চাইতেও বেশী হতে পারে। এ কারণে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) বলতেন যে, প্রকৃতপক্ষে মানুষ কোন একটি জাতি নয় বরং এর মধ্যে রয়েছে অনেক জাতি। অর্থাত, 'ইনসান' শব্দটি কোন نوع নয় বরং এটি হলো একটি جنس এবং 'ইনসান' এর বিভিন্ন ফরদ হচ্ছে نوع যাকে মানতেকীগণ افراد বলে থাকেন, তা মূলতঃ افراد নয় বরং انواع যেন ইনসানের প্রত্যেক ফরদই ভিন্ন ভিন্ন এক একটি نوع তবে তা منحصر فى فرد واحد অর্থাত এগুলো এমন نوع যার فرد শুধু একটি।

হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)-এর একটি অসীয়্যত

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, যখন কোন ব্যাপারে লোক তোমাদের সাথে ঝগড়া করে, তখন তোমরা ভিজা-শুকনা (কাঁচা-পাকা) সব তার সোপর্দ করে দিয়ে তার থেকে পৃথক হয়ে যাও। এর একটি উদাহরণ হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। যেমন কোন এক ব্যক্তি নতুন বিবাহ করেছিলো। তার কিছু কিছু দাড়ি সাদা হয়ে গিয়েছিলো। সে নাপিতের কাছে গিয়ে বললো, আমার দাড়ির মধ্য থেকে সাদা চুলগুলো বেছে বেছে কেটে দাও। নাপিত লোকটি তার সম্পূর্ণ দাড়ি মুণ্ডিয়ে তা সামনে রেখে দিলো এবং বললো, (কাঁচাপাকা সবই আপনার সামনে দিলাম) আপনি নিজেই বেছে নিন, আমার এত সময় নেই।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আমার পূর্ণ জিন্দেগীর অভ্যাস এ রকমই। কিছুদিন হলো আমি শহরের জামে মসজিদে প্রতি সপ্তাহে একদিন বয়ান করতাম। যে বয়ানে আমি বিবাহ-শাদীর ক্ষেত্রে প্রচলিত ভ্রান্ত রুসম ও রেওয়াজ সংশোধনের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছি। ফলে লোকদের মাঝে আমার কথার সাথে বিরোধমূলক কিছু আলাপ-আলোচনা হলো এবং তা আমার কান পর্যন্তও পৌছুলো। আমি পবিত্র রমযানের শেষ জুমআর ওয়াযের শেষে লোকদের বসিয়ে বললাম, আমি যা কিছু বলি তা শুধু আপনাদের উপকারের জন্য বলি। দ্বীনী

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

ফায়দা তো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। আর দুনিয়ার ফায়দা হলো, অপব্যয় থেকে বাঁচা এবং সে অপব্যয়ের কারণে সৃষ্ট মুসীবতসমূহ থেকে রক্ষা পাওয়া। আর ওয়ায করা আমার কোন পেশা নয়। যদি আপনারা আপনাদের ফায়দা ও উপকার না চান, তবে আমি ঘোষণা করছি যে, এই বয়ানই আমার শেষ বয়ান। এরপর আর আমার প্রতি কারো বিরক্তি ও সমালোচনার মনোভাব সৃষ্টি হবে না ইনশা আল্লাহু তা'আলা। আমার এ কথা শুনে অনেকেই কাঁদতে শুরু করলো এবং পায়ের উপর ঝাপিয়ে পড়ে বলতে লাগলো, আমাদের তো কোন অপরাধ নেই। কিছু আহমক ও নির্বোধ লোক কি কথা বললো, আমাদের উপর তার শাস্তি কেন আরোপ করা হবে। হযরত থানবী (রহঃ) বললেন, নিশ্চয়ই আপনাদের কোন অপরাধ নেই আপনারা আমাকে আপনাদের বাড়িতে নিয়ে ওয়ায করাবেন, আমি ওয়ায করবো। সেমতে এলাকার ঘরে ঘরে অনেক ওয়ায হলো। এভাবে ঘরে ঘরে ওয়ায বেশী উপকারী সাব্যস্ত হলো। কারণ ঐ সকল রুসম–রেওয়াযের তাবেদারী করার একটা বড় কারণ সাধারণতঃ মহিলারাই হয়ে থাকে। ঘরে ঘরে করা এই ওয়ায বেশীর ভাগ মহিলারাই শুনেছে। ফলে আমার আসল উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেছে। হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন যে, এটা আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ যে, এলাকার লোকেরা আমার বয়ানের কোন বিরোধিতা করতো না। এ কারণে এখন থানাভোন থেকে ভ্রান্ত রুসম প্রায় উঠেই গেছে।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)–এর অসীয়্যত ও নিজের উপরোক্ত অভ্যাসের পক্ষে একটি হাদীস দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেছেন। যে হাদীসটি জামিউস সগীর–এর মধ্যে রযীন থেকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, হাদিসটি হলো নিম্নরূপ—

نعم الرجل الفقيه ان احتيج اليه نفع وان استغنى عنه اغنى نفسه

অর্থাত, ঐ ফকীহ ব্যক্তি খুবই ভাল, যদি লোকেরা তার প্রয়োজন অনুভব করে (তার কাছে আসে) তবে সে তাদেরকে উপকার করে। আর লোকেরা যদি তার প্রতি অমুখাপেক্ষীতা প্রদর্শন করে, তবে সেও তাদের প্রতি অমুখাপেক্ষী আচরণ করে।

হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন যে, এ কারণেই আমি বর্তমান সময়ে দারুল উলূম দেওবন্দের পৃষ্ঠপোষক (প্রধান মুরব্বী)–এর পদ

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

থেকে ইস্তেফা দিয়েছি। ঝগড়া–বিবাদ এবং বিভিন্ন প্রশ্ন–উত্তরের মধ্যে লিপ্ত হওয়ার সময় আমার কোথায়? আমার মুরব্বী বুযুর্গানে দ্বীনের নেক নযরের বরকতে আমরা দৃষ্টিভঙ্গী এইরূপ—

خود چہ جای جنگ وجدل نیک وبد   کیں دلم از صلحہا ہم میرمد

অর্থাত, নেক আর বদের ঝগড়া তার নিজ স্থানে থাক। আমার মনের কথাতো মনেই আছে যে, আমি নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশাবাদী।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে ইজতিহাদ

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, ফিকাহ–এর ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার কারণে স্বাভাবিকভাবেই ইজতিহাদ শেষ হয়ে গেছে এবং প্রয়োজনও আর বাকী নেই। কিন্তু ডাক্তারী ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে সেটা শারীরিক হোক কিংবা রূহানী হোক উভয়টি ক্ষেত্রেই ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এখানে ইজতিহাদ ছাড়া কাজই চলে না। যে মুজতাহিদ বা ইজতিহাদের ক্ষমতা সম্পন্ন নয় তার চিকিৎসাও করা উচিত নয়।

একটি আয়াতের তাফসীর ও সংশয় নিরসন

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

অর্থাত, ঐ সকল লোকেরাই আল্লাহ পাকের প্রদত্ত সঠিক পথে রয়েছে এবং তারাই প্রকৃত অর্থে সফলকাম।

উপরের আয়াতে দুটি জিনিস রয়েছে একটি হিদায়াত আর অপরটি হলো সফলতা। এ দুটি বিষয়কে জাঝা বা প্রতিফল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা এর পূর্বে 'ঈমান বিল গাইব' তথা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান গ্রহণ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নের গুণের কথা আলোচনা করা হয়েছে। সে ঈমানের প্রতিফল হিসেবে এই আয়াতে হিদায়াত ও সফলতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে সফলতা আমলের প্রতিফল হওয়ার বিষয়টি তো বুঝা যায়। কারণ 'ফালাহ' অর্থ তো সফলকাম হওয়া

এবং উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া। কিন্তু হিদায়াত তো পথ প্রদর্শনকে বলা হয়। আর কোন কিছুর রাস্তা দেখতে পাওয়া কোন উদ্দেশ্য যেমন নয় তেমনি তা কোন আমলের প্রতিফলও হতে পারে না। এই সংশয়ের নিরসনের জন্য হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, একটি এমন ঘটনা যা আমার জীবনে ঘটেছে, তা এই সংশয়ের অপনোদনকে খুব সহজ ও পরিস্কার করে দিয়েছে। ঘটনাটি নিম্নরূপ—

এক ব্যক্তি মীরাট যাওয়ার গাড়ীতে উঠার আশায় ছিলো। কিন্তু ভুলবশতঃ সে রড়কী যাওয়ার গাড়ীতে উঠে পড়লো। গাড়ী ছেড়ে দেয়ার পর সে তার ভুল বুঝতে পারলো। আমিও সে গাড়ীতেই রড়কী যাচ্ছিলাম। আমি দেখতে পেলাম যে, লোকটি খুবই অস্থির। অথচ আমি আমার জায়গায় নিশ্চিন্ত মনে বসে আছি। আমি তাকে সান্ত্বনা দেয়ারও চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপই করলো না। গাড়ী যতই চলতে থাকলো, তার অস্থিরতাও ততই বাড়তে থাকলো। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, কোন লোকের মাঝে এমন দৃঢ় বিশ্বাস ও জ্ঞান এসে যাওয়া যে, আমি আমার সঠিক গন্তব্যে যাওয়ার সঠিক পথেই চলছি এটাই একটা বিশেষ নি'আমত এবং প্রশান্তির বস্তু। এ কারণে এটাকে আমলের প্রতিফলও বলা যেতে পারে। উপরের আয়াত ঈমানদার লোকদেরকে নিশ্চিন্ততা দান করেছে যে, তোমরা সঠিক পথের উপর চলছো। সুতরাং তোমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকো। এর চাইতে বড় নি'আমত আর কি হতে পারে।

ভ্রান্তলোকদের লিখা পাঠ করা ভয়ানক ক্ষতিকর

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, বাতিল বা ভ্রান্ত লোকদের কথা, কাজ কিংবা অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা কিংবা তাদের এসব বিষয়ে লিখা বইপত্র পাঠ করা, আত্মার জন্য ভয়ানক ক্ষতিকর। মুনাযারা ও বিতর্কের প্রয়োজনে যদি কখনো দেখতে হয়, তবুও প্রয়োজনের বেশী পাঠ না করা উচিত।

একটি হাদীসের মর্ম

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে—

لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

অর্থাত, তোমরা তোমাদের ঘরসমূহকে কবর বানিও না।

এই হাদীসে এই মর্ম তো প্রসিদ্ধ যে, পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত এবং আল্লাহ পাকের যিকির থেকে ঘর খালি থাকাকে কবর বানানোর সাথে তুলনা করে তার নিন্দা করা হয়েছে। কিন্তু এর এক ব্যাখ্যা অনেকে এমনও করেছেন যে, তোমাদের ঘরের মধ্যে তোমরা কবর বানিও না। এমন যাতে না হয় যে, তোমরা তোমাদের ঘর দ্বারাই কবরস্থানের কাজ নিতে শুরু করলে।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) অধম (সংকলক)-এর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, নগদ টাকা ওয়াকফ করা কিংবা ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে অর্জিত নগদ আমদানীর টাকা ওয়াকফের অন্তর্ভুক্ত কিনা এ ব্যাপারে একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমার দ্বিধা সংশয় ছিলো। কারণ নগদ অর্থ নিঃশেষ বা বিনষ্ট করা ছাড়া তা দ্বারা উপকার হাসিল করা যায় না। কিন্তু ওয়াকফের জন্য স্থায়ীত্ব ও ওয়াকফকৃত বস্তু বাকী থাকা শর্ত। এভাবে যখন তার উপর ওয়াকফের সংজ্ঞা সাব্যস্ত হয় না সুতরাং এর দ্বারা এটাই তো আবশ্যকীয়ভাবে প্রমাণিত হয় যে, এই বস্তু ওয়াকফকারীর মালিকানায়ই থেকে যাবে। আর যদি ওয়াকফকারী ব্যক্তি মারা যায়, তবে তা তাঁর ওয়ারিশদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হবে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীর একটি কথার দ্বারা এ মাসআলাটি আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী (মুস্তফায়ী সংস্করণের) কিতাবুল ওয়াকফ, তৃতীয় খণ্ডের ২৪০ পৃষ্ঠায় একাদশ বাবের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে—

ان كان لا يمكن تصحيحه وقفا فيجوز تصحيحه ملكا للمسجد هبة على المسجد

অর্থাত, যদিও নগদ টাকা ওয়াকফ করা হলে, সঠিক অর্থে ওয়াকফ বলা মুশকিল, কিন্তু তাকে এইভাবে শুদ্ধ বলা যেতে পারে যে, সে টাকা মসজিদের মালিকানায় চলে যায় এবং তা মসজিদের জন্য অনুদান হয়ে যায়।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আমার দৃষ্টিতে 'মসজিদের মালিকানা' কথাটি একটি বিশেষ অবস্থার ব্যাখ্যা। যা 'ওয়াকফ' ও 'হেবাহ' বা দানের মাঝামাঝি, তাকে মসজিদের মালিকানা বলে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ! এই কথার দ্বারা এতটুকু বুঝে এসে গেছে যে, ওয়াকফকৃত নগদ টাকা ওয়াকফকারীর মালিকানা থেকে বের হয়ে গেছে। আর তা না হলে সেগুলো আমানত রাখাই কঠিন হয়ে যেতো।

মানুষের দ্বারা বেশী কাজ না নেয়ার কারণ

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আমি মানুষের দ্বারা এজন্য বেশী কাজ নেই না, যেহেতু আমার মাঝে ইহসান ও অন্যের উপকার স্বীকৃতির বিষয়টি খুব প্রবল। কারো কাছ থেকে সামান্য ইহসান গ্রহণ করলেই সকল ক্ষেত্রে তার প্রতি লক্ষ্য নেয়ার বিষয়টি আমার নযরের সামনে থাকে। আর এই লক্ষ্য রাখার ব্যাপারটি ঐ ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর। তবে যার সাথে লৌকিকতামুক্ত অবস্থা বা 'বেতাকাল্লুফী' সৃষ্টি হয়ে যায় তার কথা ভিন্ন।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)-এর কয়েকটি বাণী

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, দারুল উলূম দেওবন্দের সদরুল মুদাররিস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) সকল প্রকার ইলম ও যোগ্যতা এবং যাবতীয় কামাল ও বুযুর্গীর পরিপূর্ণ বাহক ছিলেন। সকল বিষয়েই তিনি পারদর্শী ছিলেন। খানা পাকানো, কাপড় কাটা এবং সেলাই করার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত দক্ষতাপূর্ণ যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। এছাড়া নাত-সঙ্গীত বিদ্যায়ও তিনি পরিপূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন। হযরত মাওলানার মালফূযসমূহ বা কথামালা হতো আশ্চর্য ধরনের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্বলিত। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব (রহঃ)-এর যত মালফূয আমার স্মরণ আছে, সম্ভবতঃ এতটা আর কারো স্মরণ নেই। কারণ হলো, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব (রহঃ)-এর প্রতি মহব্বত ও ভক্তি-শ্রদ্ধা আমার মাঝে সবার থেকে বেশী ছিলো। আর আমি হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব (রহঃ)-এর

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

দরবারে উপস্থিত হলে তাঁর অন্তর আমাকে উপকৃত করার জন্য খুলে যেতো। (নিম্নে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব (রহঃ)-এর কয়েকটি মালফূয উল্লেখ করা হলো)

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব (রহঃ) বলেন, কৃতজ্ঞ ও ওয়াদা রক্ষাকারী নাকেস বা অসম্পূর্ণ ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ ও ওয়াদা ভঙ্গকারী কামেল বা পূর্ণতার অধিকারী ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কারো কাছ থেকে আত্মগোপন করতে চায়, যেমন নির্যাতিত ব্যক্তি যালিম থেকে ভেগে পালাতে চায়, তখন তার কোন কাছাকাছি স্থানেই আত্মগোপন করা উচিত। কারণ যারা কাউকে খুঁজে তারা সাধারণতঃ কাছাকাছি খোঁজ করে না। প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 'সওর' পর্বতের গুহায় আত্মগোপন করা এর পক্ষে প্রমাণ।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব (রহঃ) আরো বলেন, রহস্যকে গোপন রেখে কথা বলার পদ্ধতি তো সকলেই জানে। এর একটি পদ্ধতি এটাও যে, সাধারণ লোকের মজমার মধ্যে অন্যান্য কথার মাঝে মিলিয়ে ঝিলিয়ে আসল রহস্যের কথাটিও বলে দিবে, তবে সেদিকে কারো লক্ষ্যই হবে না। পক্ষান্তরে যাকে বুঝানো উদ্দেশ্য সে বুঝে যাবে।

দারুল উলূম দেওবন্দ সম্পর্কে

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, দারুল উলূম দেওবন্দে বুযুর্গানে দ্বীনের উপস্থিতি একটি স্বতন্ত্র নি'আমত ও দৌলত ছিলো। যা হারিয়ে ফেলার অনিবার্য পরিণতি আজকাল অনুভূত হচ্ছে। তা না হলে মাদরাসাতো বাহ্যিক দৃষ্টিতে উন্নতির দিকেই যাচ্ছে। আয়-ব্যয়, দালান-ইমারতের উন্নতি ছাড়াও ছাত্র-শিক্ষকদের সংখ্যাও বেড়ে গেছে। কিন্তু আহলে বাতেন বুযুর্গানে দ্বীনের স্বল্পতা রয়েছে। আর বাস্তব কথা হলো, ইলমের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও পারদর্শিতা তখনই উপকারী বলে বিবেচিত হয়, যখন বাতেনী অবস্থা এবং আখলাক ও আমল ঠিক হয়।

হযরত আলী (কাঃ ওয়াঃ)

একবার কোন এক নাস্তিক হযরত আলী (রাযিঃ)-এর কাছে বললো,

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

আপনার বিশ্বাস হলো, কোন ব্যক্তি তার নির্ধারিত সময়ের আগে মারা যায় না। হযরত আলী (রাযিঃ) বললেন, হ্যাঁ এটাই আমার বিশ্বাস। তখন ঐ নাস্তিক লোকটি বললো, আচ্ছা আপনি একটি উচু দালানের উপর আরোহণ করে তার উপর থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ুন। হযরত আলী (রাযিঃ) বললেন, আমি যদি এমনটি করি আর আমার মউতের নির্ধারিত সময় যদি না এসে থাকে, তবে একথা নিশ্চিত যে, আমি মারা যাবো না। কিন্তু এমনটি করা যেহেতু আল্লাহ পাকের তাকদীরকে পরীক্ষা করা, যা নিতান্তই গোস্তাখী ও বেয়াদবী এ কারণে আমি তা করতে পারবো না।

মক্কায় জীবন মদীনায় মরণ

হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) বলেন, মক্কা মুকাররমার জীবন যাপন করা ভাল (অর্থাত, সেখানে একে এক লক্ষ গুণ (সওয়াব) হয়) আর মদীনায় মরণ ভাল। কারণ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সাথে হাশরের ময়দানে থাকা এবং শাফাআত লাভের দৃঢ় আশা—এর আবশ্যকীয় প্রভাব প্রতিক্রিয়া। এবং বিভিন্ন রকম হাদীস–এর উপর আমল করারও এটা একটা উত্তম সুযোগ।

আযাদীর ভালমন্দ

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আযাদী বা স্বাধীনতা সর্বক্ষেত্রে প্রশংসনীয় নয়। বরং যদি মন্দ স্বভাব অনিষ্টকর বিষয় থেকে মুক্তি লাভ হয়, তবে সেটা ভাল। কিন্তু যদি ভাল থেকে মুক্ত হয় তবে তা মন্দ। আবার একটি মন্দ বিষয় থেকে মুক্তি লাভ করাও ঐ সময় ভাল মনে করা হবে, যখন তার থেকে বেশী মন্দের ভিতরে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

নেককার লোকদের ইজতিমার বরকত

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) বলেন, আমাদের বুযুর্গীর দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন, রড়কী গুদামের কারিগরদের কারিগরী। ইংরেজরা মেশিনের পার্টস তৈরী করার জন্য 'রড়কী গুদাম' নামে একটি পুরাতন কারখানা (মিল) তৈরী করেছিলো। তার মধ্যে বিভিন্ন মেশিন ফিট করা থাকতো। প্রত্যেক কারিগর এসে নিজ নিজ নির্ধারিত মেশিনে কাজ

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

করতো।

এ কথার সারমর্ম হচ্ছে, এসব কারিগর যখন এই কারখানা থেকে বের হয়ে যেত, তখন আর তাদের কারিগরী চলতো না। কারণ তাদের কারিগরী মেশিনের উপর নির্ভরশীল। আর সে মেশিন তো আর মিলের বাইরে নেই।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, অনুরূপভাবে দারুল উলূমে অনেক আলিম ও বুযুর্গের সমাবেশ রয়েছে। যার বরকতে সকলের মাঝে একটা বিশেষ প্রভাব–প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে তাদের মাঝে নেক আমলের প্রতি আগ্রহ এবং খারাপ আমলের প্রতি একটা ঘৃণা কুদরতীভাবেই সৃষ্টি হয়ে যায়। সে মজমা থেকে বাইরে বের হয়ে সেই মনোভাব ও প্রতিক্রিয়া বাকী রাখা সহজ ব্যাপার নয়।

(অধম সংকলক (মুফতী শফী সাহেব) বলতে চায়) উপরের বক্তব্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বক্তব্য। কারণ মানুষের মাঝে ভাল ও মন্দ সবই তার পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা ও আশপাশ থেকে তৈরী হয়। যার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভাল তার ভাল হয়ে গড়ে উঠা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। অনুরূপ যার পারিপার্শ্বিকতা মন্দ তার খারাপ হয়ে গড়ে উঠাও একটি স্বাভাবিক বিষয়। এজন্য প্রত্যেক মানুষের উচিত হলো, অন্তত নিজের ঘরের পরিবেশকে দ্বীনী পরিবেশ হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখা। পবিত্র কুরআনের আয়াতের দ্বারাও এ কথার পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। ইরশাদ হচ্ছে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

অর্থাত, হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো এবং তোমাদের পরিবারবর্গকেও তা থেকে রক্ষা করো।

এ আয়াতে মুসলমানদের প্রতি হুকুম হচ্ছে, তোমরা নিজেরা যেমন জাহান্নাম থেকে বাঁচবে তেমনি তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবে।

কৃপণতা ও অপব্যয়

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, লোকেরা কৃপণতাকে অপচয় অপব্যয় থেকে বেশী খারাপ মনে করে। আর আমার

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

খেয়াল হলো, বখিলী বা কৃপণতার তুলনায় অপচয় করা বেশী খারাপ। কারণ অপব্যয়ের ফলাফল কৃপণতার চাইতে অনেক বেশী খারাপ। দ্বীনী দিক থেকেও এবং দুনিয়াবী দিক থেকেও। এ কারণেই আমরা কোন বখিল বা কৃপণকে কখনো মুরতাদ হতে দেখি না। পক্ষান্তরে অপব্যয় করে ফকীর হয়েছে এমন অনেককেই আমরা মুরতাদ হতে দেখেছি।

একজন বক্তার ধৃষ্টতা

এক বক্তার ওয়াযের মজলিসে হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এবং হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মঈন (রহঃ) দ্বয় উপস্থিত ছিলেন। বক্তা তার ওয়াযে অনেক ভুল-ভ্রান্তি সহ বেশ কিছু হাদীস ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করলো। এ দুই বুযুর্গ তা শুনে একে অপরের মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন যে, লোকটি এসব কি বলছে?

যখন ওয়ায শেষ হলো, তখন হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) সামনে বাড়লেন, এবং বক্তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)কে চিনেন। বক্তা জবাব দিলো, হাঁ চিনি। ইমাম সাহেব (রহঃ) তাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আমাকে চিনেন? বক্তা জবাবে বললো, না আপনাকে আমি চিনি না। ইমাম সাহেব এবার বললেন, আমিই তো আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)। এবার ঐ বক্তা লোকটি বড়ই ধৃষ্টতা ও বাহাদুরী সহকারে বললো, আপনি খুব আশ্চর্য কথা বললেন, আপনি কি একথা মনে করে বসে আছেন যে, আহমদ ইবনে হাম্বল শুধু আপনি একজনই। আপনার মত আহমদ ইবনে হাম্বল দুনিয়ায় আরো কত আছে তার কোন হিসাব-নিকাশ নেই।

হযরত নানুতবী (রহঃ) ও ইমাম রাযী (রহঃ)

একবার হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতবী (রহঃ) কোন প্রয়োজনে নিজের নিকটবর্তী লোকদের কাউকে ইমাম রাযী (রহঃ)কৃত তাফসীরে কবীর-এর কোন একটা স্থান দেখার জন্য বললেন, সে ঐ স্থানটি বের করে হযরত (রহঃ)কে পাঠ করে শুনালো। তখন হযরত নানুতবী (রহঃ) বললেন, আমার ধারণা ছিলো যে, ইমাম রাযী (রহঃ) খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। কিন্তু এখন বুঝে আসলো যে, তার জ্ঞান ও

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

মেধা দৈর্ঘ্য–প্রস্তে তো চলতে পারে কিন্তু গভীরতার দিক থেকে চলে না। হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ পাক প্রত্যেক সময়ের প্রয়োজন মতে কাজের লোক সৃষ্টি করে দিয়েছেন। অপর সময়ে পূর্বের লোক বেকার হয়ে থাকলেও (সে যুগের যিনি কাজের লোক) তিনি বেকার হন না।

হযরত শাহ আবদুর রহীম দেহলভী (রহঃ)

হযরত শাহ আবদুর রহীম দেহলভী (রহঃ) যিনি হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ)–এর পিতা। এই উভয় বুযুর্গ (পিতা–পুত্র) অধিকাংশ সময়েই হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়ার মাযারে হাযির হতেন। একবার শাহ আবদুর রহীম সাহেব (রহঃ)–এর মাঝে খেয়াল হলো, আমি তো এখানে খুব বেশী বেশী আসি, আমাদের এ আসার খবর হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহঃ) জানেন কিনা তা তো জানিনা। এরপর একবার তিনি হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহঃ)–এর মাযারে গেলেন এবং যখন তিনি মাযারের দিকে মনোনিবেশ করলেন, তখন তিনি তার সামনে সুলতানুল আউলিয়া হযরত নিযামুদ্দীন (রহঃ)–এর হুবহু প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলেন। তিনি শুনতে পেলেন, হযরত নিযামুদ্দীন (রহঃ) নিযামীর শে'র পাঠ করছেন—

مرا زنده پندار چوں خویشتن   من آیم بجان گر تو آئی بہ تن!

অর্থাত, আমাকে তোমার মত জীবিত ধারণা করো না। আমি তোমার কাছে আত্মিকভাবে (রূহানীভাবে) উপস্থিত হই আর তুমি তো উপস্থিত হও স্বশরীরে।

আলোচিত শাহ আবদুর রহীম সাহেব (রহঃ) মীর যাহেদ (রহঃ)–এর শাগরেদ ছিলেন। তিনি ছাত্র জীবনে একদিন হযরত শেখ সাদী (রহঃ)–এর একটি শে'র পড়তে পড়তে যাচ্ছিলেন। চার লাইনের সে শে'রের তিন লাইন তার স্মরণ ছিলো কিন্তু একটি লাইন স্মরণ আসছিলো না। ইতিমধ্যে হঠাৎ বুযুর্গের মত একজন লোক সামনে এলেন এবং তার ভুলে যাওয়া লাইনটি বলে দিলেন। সে লাইনটি ছিলো—

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

অর্থাত, ঐ ইলম যা সত্যপথ দেখায় না, তা মূর্খতারই নামান্তর। লাইনটি বলে দিয়ে ঐ লোকটি সামনে চলতে লাগলেন। শাহ সাহেব (রহঃ) দৌড়ে গিয়ে তার হাত ধরলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার সম্মানিত নামটি কি? তখন তিনি জবাব দিলেন মুসলেহুদ্দীন সীরাযী (যিনি শেখ সাদী নামেই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ)।

হযরত শাহ্ আব্দুর রহীম সাহেব (রহঃ) একবার হযরত সুলতান নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহঃ)–এর মাযারে মোরাকাবা অবস্থায় ছিলেন। এমতাবস্থায় হযরত সুলতানুল আউলিয়া (রহঃ)–এর আত্মিক অবস্থাটা বাহ্যিক আকৃতি ধারণ করে তার সামনে এলো। তখন হযরত শাহ সাহেব (রহঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সেমা' সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি তখন তাকে পাল্টা প্রশ্ন করে বললেন, আপনি শে'রের ব্যাপারে কি বলেন? শাহ্ সাহেব বললেন—

كلام حسنه حسن و قبيحه قبيح

অর্থাত, শে'র তো একটি কথা সুতরাং যে যে শেরের কথা ভাল সেটি ভাল আর যার মধ্যকার কথা খারাপ ঐ শে'রটিও খারাপ।

হযরত নিযামুদ্দীন (রহঃ) তাকে আবার প্রশ্ন করলেন, সুন্দর আওয়ায হওয়াকে আপনি কি মনে করেন? হযরত শাহ্ সাহেব উত্তর দিলেন—

يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ

এর তাফসীর অনেক মুফাসসির 'সুন্দর আওয়ায' দ্বারা করেছেন। হযরত সুলতানুল আউলিয়া (রহঃ) আবার জিজ্ঞাসা করলেন, যদি এই দুটি একত্রিত হয় তবে আপনার মতামত কি? শাহ্ সাহেব জবাব দিলেন—

نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ

অর্থাত, (তবে তা) নূরের উপর নূর (খুবই উত্তম) যাকে আল্লাহ পাক ইচ্ছা করেন নিজ নূরের প্রতি পথ প্রদর্শন করেন।

এরপর হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহঃ) বললেন, এতটুকুই যথেষ্ট। সেমা'–এর হাকীকত এছাড়া ভিন্ন কিছু নয়।

(অধম সংকলকের এখানে কথা হলো) উপরের কথার দ্বারা প্রমাণিত

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হয় যে, হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহঃ) থেকে যে সেমা' প্রমাণিত রয়েছে, তার মধ্যে বাদ্যযন্ত্র বা বাঁশি ছিলো না। শুধু সুন্দর আওয়াযে শে'র পড়ার বিষয়টিই ছিলো।

কারামত দ্বারা নৈকট্য বৃদ্ধি পায় না

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের কাছে কারামতের মর্যাদা মৌখিক যিকির থেকেও কম। কারণ মৌখিক যিকির দ্বারা আল্লাহ পাকের নৈকট্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কারামতের দ্বারা আল্লাহ পাকের নৈকট্যে কোন প্রবৃদ্ধি ঘটে না।

আত্মিক যিকির প্রসঙ্গে

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, 'যিকরে কলবী' বা আত্মিক যিকিরের হাকীকতের মাধ্যমে অন্তরের আল্লাহ্ পাকের দিকে ধাবিত হওয়া এবং দিলের মাঝে এক ধরনের কম্পন সৃষ্টি হওয়া যাকে অধিকাংশ লোক কলব জারী হওয়া মনে করে থাকে এটা শুধুই 'হৃদকম্পন'। এছাড়া অন্যকিছু নয়।

হযরত শাহ আবদুর রহীম দেহলভী (রহঃ)–এর কাছে কেউ বললো, 'আমার অন্তর জারী হয়ে গেছে। তখন তিনি বললেন, হাঁ ভাই হয়তো তাই হয়েছে। যখন লোকটি চলে গেলো, তখন তিনি বললেন, হৃদকম্পন রোগ হয়ে গেছে। সে তাকেই যিকরে কলবী বা আত্মিক যিকির মনে করছে।

(অধম সংকলক (মুফতী শফী সাহেব) বলছে,) অধম হযরত থানবী (রহঃ)–এর কাছ থেকে অপর এক মজলিসে শুনেছি যে, যিকরে কলবীর এটাও একটা প্রকার যে, আল্লাহ্ পাকের কোন নাম তার শব্দ সহকারে মনে মনে খেয়াল করে আদায় করতে থাকবে, তবে মুখ নাড়া চাড়া করবে না।

ঘুমের কারণে নবী (আঃ)গণের উযূ ভঙ্গ হয় না

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, এ মাসআলাহ্তো প্রসিদ্ধ ও সর্বজন স্বীকৃত যে, ঘুমের কারণে নবী (আঃ) গণের উযূ ভঙ্গ হয় না। তিনি বলেন, আমার কাছে এর কারণ এই বুঝে এসেছে যে, নবী

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

(আঃ)গণের ঘুম পরিপূর্ণ অচেতনতা ও গাফলতীর ঘুম নয় বরং তা হয় আমাদের তন্দ্রার মত। তিনি আরো ইরশাদ করেন, এ কথার দ্বারা 'লাইলাতুত তা'রীস' সংক্রান্ত হাদীসের উপর যে প্রশ্ন হয়, তাও দূর হয়ে যায়। লাইলাতুত তা'রীস-এর ঘটনায় সুবহে সাদিকের সময়ও প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চোখ খুলেনি। বরং সূর্য উপরে উঠে যাওয়ার পর চোখ খুলেছে। এখানে এই প্রশ্ন সৃষ্টি হয় এবং তা প্রসিদ্ধও রয়েছে যে, হাদীস শরীফেতো একথা উল্লেখ হয়েছে যে, প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার চোখ ঘুমায় কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না। সুতরাং অন্তর যখন সজাগ ছিলো, তখন নামায কাযা হতে পারলো কিভাবে।

এ প্রশ্নের জবাব হলো, তন্দ্রার মধ্যে যদিও পরিপূর্ণভাবে অচেতনতা ও গাফলতী আসে না তবে সে অবস্থায় সময়ের আন্দাজ বা অনুমান ঠিক থাকে না। অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, এ আলোচনা দ্বারা সকল সংশয়তো ভালভাবেই দূর হয়ে যায়। কিন্তু এ বক্তব্য আমি কোথাও দেখিনি। তাই এ আলোচনা যদি মূলনীতি অনুযায়ী ঠিক থাকে, তবে এটা গ্রহণ করা যেতে পারে অন্যথায় এটা বাতিল করে দিতে হবে।

এরপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আমার নিজের বুঝে যদি এমন কোন কথা এসেও যায়, যা পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীন ও উলামায়ে কিরাম (রহঃ) থেকে বর্ণিত নেই, তবে সেক্ষেত্রে আমি চাই যথাসম্ভব তালাশ করে পূর্ববর্তী কোন বুযুর্গের কথার সাথে তার মিল খুঁজে বের করতে। যদি মিল পাওয়া যায়, তবে বিষয়টি তার দিকেই সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়। বয়ানুল কুরআনের মধ্যে এ বিষয়টি নিয়ে আমি অনেক চেষ্টা-মেহনত করেছি।

ইবাদত ও তাকওয়া অবলম্বন

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, বাস্তব অভিজ্ঞতা এর প্রমাণ যে, ইবাদত মানুষের উপর এত কঠিন নয়, যতটা কঠিন হারাম ও মাকরূহসমূহ থেকে বেঁচে তাকওয়া অবলম্বন করা। এর কারণ হলো, ইবাদত হচ্ছে একটা জিনিসকে অস্তিত্ব দান। যাদের দেখার ক্ষমতা আছে তারা তা দেখতে পায়। যে লোক সে কাজটি করে সে নিজেও তা জানে যে, সে এ কাজটি করেছে। এর দ্বারা তার আত্মতৃপ্তি লাভ হয়। পক্ষান্তরে তাকওয়া বা পরহেজগারী কিছু নিষিদ্ধ বিষয় পরিহার করা—এটা একটা

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

অস্তিত্বহীন বিষয়, হারাম ও মাকরূহসমূহ থেকে বেঁচে থাকার নাম হলো তাকওয়া। এর জন্য কোন কাজ যেমন করতে হয় না তেমনি কেউ কোন কাজও দেখতে পায় না। (১লা মুহাররম, ১৩৯৩ হিজরী, মঙ্গলবার)

ফকীহগণের শ্রেষ্ঠত্ব

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, বাস্তব কথাতো এটাই যে, ইসলামে ফকীহগণের মর্যাদা সবার উপরে। কারণ তাঁরা অর্থ ও মর্মের খাওয়াস বা বৈশিষ্ট্যসমূহকে বুঝেন। কিন্তু হুকামা তথা মানতেকীগণের বিষয়টি এমন নয়। কারণ তাদের নযর শুধু 'আজসাম' বা বস্তুর বাহ্যিক আকৃতিসমূহের খাওয়াস বা বৈশিষ্ট্যের প্রতি সীমাবদ্ধ থাকে।

হযরত শুরাইহ (রহঃ)-এর একটি কথা

হযরত শুরাইহ (রহঃ)-এর বক্তব্য হলো, যখন নিজের কোন প্রয়োজন সামনে আসে তখন তা যুবকদের কাছে চাও। কারণ তারা সে প্রয়োজন পূরণে বিলম্ব করবে না। বৃদ্ধদের কাছে চাইলে তারা দেরী করে ফেলবে এবং টালবাহানার আশ্রয় নিবে। হযরত ইয়াকুব (আঃ) ও হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। যখন ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়েরা তাদের ভুলের কথা স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করলো, তখন হযরত ইউসুফ (আঃ) সাথে সাথে বলে দিলেন—

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ

অর্থাত, আজ আপনাদের প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই।

এবং যখন পিতা ইয়াকুব (আঃ)-এর কাছে ছেলেরা ক্ষমা প্রার্থনা করলো, তখন তিনি তাদেরকে বললেন—

سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىْ

অর্থাত, শীঘ্রই আমি তোমাদের জন্য আমার প্রতিপালক সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করবো।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, 'বৃদ্ধগণ কাজ করতে বিলম্ব করে ফেলেন' এ বিষয়টি যদি বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণ করা হয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু পবিত্র কুরআন দ্বারা এর পক্ষে প্রমাণ বা

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

দলীল পেশ করা সংশয়াবৃত ও অনুচিত। কারণ তাফসীরে দুররুল মানসুরে হাদীসে মারফু উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ) মাগফিরাতের দু'আকে যে বিলম্বিত করার কথা বলেছেন, এর দ্বারা কোনরূপ টালবাহানা বা অহেতুক দেরী করা উদ্দেশ্য ছিলো না, বরং তিনি শেষ রাত পর্যন্ত এজন্য বিলম্বিত করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন যে, রাতের শেষাংশ দু'আ কবুল হওয়ার দিক থেকে উত্তম এবং সে সময়ের দু'আ কবুল হবে বলে অধিক আশা করা যায়।

শুভ ও অশুভ লক্ষণ প্রসঙ্গে

মাওলানা শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) বলেন, নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহের আলোকে কোন কিছুকে শুভ লক্ষণ হিসেবে মনে করা তো জায়েয এবং দুরস্ত আছে। কিন্তু কোন কিছুকে অশুভ লক্ষণ বা 'বদফালী' জ্ঞান করা দুরস্ত নয়। এ দুটির মধ্যে পার্থক্যের কারণ হচ্ছে, কোন ব্যাপারে 'নেকফালী' গ্রহণ করা বা কোন বস্তুকে শুভ লক্ষণ মনে করার সার কথা বেশীর চেয়ে বেশী হলে হয়তো এই হবে যে, নিজের উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে আশা ও আকাংখা শক্তিশালী হবে। আর এ ব্যাপারে তো প্রত্যেক বান্দাকে আদেশ করা হয়েছে যে, তোমরা নিজের দুআ ও আকাংখা কবুল ও পূর্ণ হওয়ার আশা রাখবে। আর নেক ফালীর দ্বারা সেই আশা আরো শক্তিশালী হলো। এজন্য এর মধ্যে শরীয়তের দৃষ্টিতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু বদফালী বা কোন কিছুকে অশুভ লক্ষণ মনে করার বিষয়টি এমন নয়। কারণ বদফালী বা কোন কিছুকে কুলক্ষণে মনে করার ফল দাঁড়ায়—আল্লাহ পাকের প্রতি আশাহত ও নিরাশ হওয়া। আর আল্লাহ পাকের প্রতি নিরাশ হয়ে যাওয়া হারাম। আর যে বিষয় আল্লাহপাকের প্রতি নিরাশ হওয়ার কারণ হয়, তাও নাজায়েয।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, পবিত্র কুরআন থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত রয়েছে যে, যতক্ষণ খারাপ বা মন্দের ক্ষেত্রে কোন প্রমাণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ ভাল ধারণাই পোষণ করতে হবে। বদগুমানী বা কুধারণা পোষণ করা যাবে না।

সারকথা হলো, সুধারণা পোষণ করার জন্য কোন দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। বরং এর বিপরীত কোন প্রমাণ না থাকাই যথেষ্ট। কিন্তু

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

কোন দলীল–প্রমাণ ছাড়া কুধারণা বা বদগুমানী করা জায়েয নয়। ইফকের ঘটনায় পবিত্র কুরআনের বর্ণনা এর পক্ষে প্রমাণ বহন করে। ইরশাদ হচ্ছে—

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ

অর্থাত, তোমরা যখন একথা শুনলে তখন ঈমানদার পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করোনি এবং বলোনি যে, এটা তো স্পষ্ট (মিথ্যা) অপবাদ। (সূরা নূর–১২)

হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)–এর ভবিষ্যদ্বাণী

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে বলতেন, তোমার (হযরত থানবী (রহঃ)–এর) তাফসীর এবং তাসাওউফের সাথে অধিক সম্পর্ক ও মুনাসাবাত সৃষ্টি হবে। একথা বর্ণনা করে হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আলহামদুলিল্লাহ এটা কিছুটা হলেও তো আছে। অতঃপর তিনি বলেন, হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)–এর এই কথা যদিও 'জুমলায়ে খবরিয়া' বা সংবাদবাহী বাক্য ছিলো, কিন্তু আমার খেয়াল হচ্ছে, এটা ছিলো 'জুমলায়ে ইনশাইয়্যাহ' বা একটা দুআ। মহান আল্লাহ হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)–এর এই দুআ কবুল করে নিয়েছেন। অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন যে, আমি তো বুযুর্গানে দ্বীনের 'খবর' (সত্য ও মিথ্যার সম্ভাবনাযুক্ত কথা)কেও 'ইনশা' (যার মধ্যে সত্য–মিথ্যার সম্ভাবনা নেই) মনে করি। আর বর্তমানে লোকদের অবস্থা হচ্ছে, তারা বুযুর্গানে দ্বীনের সন্দেহমুক্ত কথা (ইনশা)কেও সন্দেহযুক্ত কথা (খবর) বানিয়ে ফেলে।

নাবালেগ ছেলের ইমামতীতে তারাবীহ নামায

একবার একটি ইস্তিফতা (ইসলামী বিধান জানার জন্য প্রশ্ন) এসেছিলো। প্রশ্নে হযরত থানবী (রহঃ)–এর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিলো যে, নাবালেগ (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) ছেলের পিছনে তারাবীহ–এর নামায পড়ার ক্ষেত্রে আপনার নিকট কোন বক্তব্যটি অধিক গ্রহণযোগ্য।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, এর জবাবে আমি হিদায়ার উদ্ধৃতি দিয়ে আল্লামা শামীর 'নাবালেগের পিছনে তারাবীহ নামায পড়তে নিষেধ করা'র মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য বলে লিখে দিলাম। এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম—

১. প্রথমতঃ নাবালেগের নামায নফল। আর তারাবী নামায হলো সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ নামায আদায়কারীর পিছনে অধিক গুরুত্বপূর্ণ নামায আদায়কারীর ইকতিদা দুরস্ত নেই (সুতরাং সুন্নাতে মুআক্কাদাহ আদায়কারীদের ইকতিদাও নফল আদায়কারীর পিছনে দুরস্ত হবে না)।

২. এরপরও যদি ধরে নেয়া হয় যে, সকলেই নফল নামায পড়ছে, তবুও নাবালেগের নফলের চাইতে বালেগের নফল অধিক শক্তিশালী। কেননা কোন বালেগ ব্যক্তি নফল নামায শুরু করলে তা ওয়াজিব হয়ে যায়, কিন্তু নাবালেগের তা হয় না।

৩. নাবালেগ বাচ্চারা সাধারণতঃ পবিত্রতার মাসআলাহসমূহের ব্যাপারে অবগত থাকে না এবং এ ব্যাপারে তাদের অলসতাও রয়েছে। এ কারণে নামায ফাসেদ বা ভঙ্গ হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

আশ্চর্যজনক ও বিরল তিন কিতাব

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী (রহঃ) বলেন, তিনটি কিতাব আশ্চর্যজনক ও বিরল (১) কুরআন মাজীদ (২) বুখারী শরীফ (৩) মাসনুভী শরীফ।

হযরত (রহঃ)-এর উপদেশ প্রদান কৌশল

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, কুনুজ নামক এলাকায় একজন গায়রে মুকাল্লিদ (যে মাযহাব মানে না) আমাকে দাওয়াত করলো। আমি সে দাওয়াত মঞ্জুর করে নিলাম। আহলে সুন্নাতের অনুসারী ভাইয়েরা আমাকে ইশারায় দাওয়াত গ্রহণ করতে নিষেধ করলো। তাদের এই আশঙ্কা ছিলো যে, এরা সকলেই গাইরে মুকাল্লিদ এজন্য এরা অন্য কোন মুকাল্লিদ (মাযহাব মেনে চলে এমন লোক)কে দাওয়াত করেনি। সুতরাং হযরত থানবী (রহঃ) সেখানে গেলে আল্লাহ না করুক তাঁকে কোন কষ্ট দিতে পারে। হযরত থানবী (রহঃ)

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

বলেন, কিন্তু আমার মনে কোনই সন্দেহ ছিলো না। এজন্য আমি দাওয়াত কবুল করে নিয়েছি।

এরপর আমি যখন সেখানে পৌছলাম তখন নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেবের একটি কিতাবে তাকলীদের বিরোধী একটা বিষয় এক লোক আমাক দেখালো এবং বললো, এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, নবাব সাহেবের লিখার ব্যাপারে আপনার কোন সংশয় আছে কিনা? সে লোকটি খুবই হুঁশিয়ার ও সচেতন ছিলো। তাই সে আমার উদ্দেশ্য বুঝে নিলো এবং বলতে থাকলো, ব্যাস আমার চিন্তা দূর হয়ে গেছে।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, এরপর আমি তাদেরকে বললাম, আমি যেহেতু এখন আপনাদের নিমক খাবো সুতরাং আমার দায়িত্বে আপনাদের হক এসে গেছে। এ কারণে আমি শুধু আপনাদের ভালাই কামনা করে একটা কথা বলছি। সে কথাটি হলো, তাকলীদ তরক করা তো একটা মাসআলাহ। এর মধ্যে সুযোগ আছে। যদি আপনারা ভাল নিয়্যতে করেন,তবে আমার সে ব্যাপারে বেশী কথা নেই। কিন্তু দুটি বিষয় আপনাদের এখানে খুবই কঠিন এবং নিশ্চিত গুনাহ। তা থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে যত্নবান হোন। তার মধ্যে একটি হলো বদগুমানী অর্থাত মানুষের প্রতি অবাস্তব ও কুধারণা পোষণ করা। আর অপরটি হলো বদযবানী অর্থাত মুখে গীবত, শেকায়াত বা কাউকে গালমন্দ করা।

বদগুমানী তো হলো এই যে, আপনারা মনে করেন, যে মাসআলার পক্ষে দলীল হিসেবে কোন হাদীস সিহাহ সিত্তা (হাদীস শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাব)–এর মধ্যে নেই তার আর কোন দলীল বা প্রমাণ নেই। অথচ আপনারাও একথা জানেন যে, হাদীস শুধু সিহাহ সিত্তার মাঝেই সীমিত নয়। এবং সিহাহ সিত্তার সমস্ত হাদীসও সহীহ নয়।

আর বদযবানী হলো এই যে, আপনারা বড় বড় ইমামগণের ব্যাপারে বেয়াদবী ও গোস্তাখীমূলক আচরণ করে থাকেন। তখন উপস্থিত সকলেই তাদের এই ভুলের কথা স্বীকার করে নিলো এবং তাওবা করলো।

তাফসীরে কুরআন সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আমি কোন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এমনটি কখনো চিন্তা করি না যে, পবিত্র কুরআনে যে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

বিষয়কে যে শিরোনামে বিবৃত করা হয়েছে, তার মধ্যে কি রহস্য। এ ক্ষেত্রে কাশশাফ–এর বক্তব্য আমার খুবই পসন্দনীয়। তাহলো, যে বিষয়টি বুঝানোর জন্য বাক্য বিভিন্ন রকম হতে পারে সে ক্ষেত্রে যে কোন একটি অবলম্বন করে নেয়াই যথেষ্ট। এখানে কোনটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এবং তার কি কারণ তা ব্যাখ্যা করার কোন প্রয়োজন নেই।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আমি একদিন সম্ভবতঃ মাগরিবের পর মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)–এর সাথে কোথাও যাচ্ছিলাম। তিনি তখন বললেন, আমাকে একটি ইলম দান করা হয়েছিলো, যাতে পবিত্র কুরআনের সকল বর্ণনাভঙ্গী ও শিরোনামসমূহের হিকমত ও রহস্য বর্ণনা করে দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু এখন সেটা বাকী নেই।

(হযরত থানবী (রহঃ)–এর কাছ থেকে অন্য এক মজলিসে এ ব্যাপারে একথাও শুনেছিলাম যে, এটা এত ভারী ইলম ছিলো, যা আমার সহ্য সীমার বাইরে ছিলো। এ কারণে তা উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—সংকলক)।

হাদীস পড়ানোর প্রাথমিক অবস্থায়

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, যখন আমি প্রথম অবস্থায় হাদীস পড়াতে শুরু করি, তখন আমার এমন অনুভব হতো যে, আমি আর প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলকুল একীভূত এবং সে সময় আমার প্রতি ইলম ও মাআরিফতের এক আশ্চর্য ধরনের দরোযা উন্মুক্ত হয়ে যেতো।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)–এর কাশফ

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম সাহেব (রহঃ) রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন। তাঁর কষ্ট যখন বাড়তে থাকলো, তখন লোকেরা ঘাবড়ে যেতে লাগলো। তখন মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) বললেন, আপনারা ঘাবড়াবেন না, উনি আরো দশ বৎসর জীবিত থাকবেন। কিন্তু এরপর দেখা গেলো সে রোগেই তিনি ইন্তিকাল করলেন। লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হলো এই ভেবে যে, মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)–এর কাশফ ভুল প্রমাণিত হলো। তখন মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) বললেন যে, কাশফতো আসলে ঠিকই ছিলো।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

কিন্তু আমার বুঝতে ভুল হয়ে গেছে। তাহলো এই যে, আমি কাশফের মাধ্যমে মাওলানার বয়স সম্পর্কিত অবস্থা জিজ্ঞাসা করতে চেষ্টা করলাম। তখন আমার সামনে 'মাহদী' শব্দটি আসলো। এর দ্বারা আমি হরফের সংখ্যা বুঝেছিলাম। অর্থাত, 'মাহদী' শব্দের মধ্যে আরবী যতটা হরফ আছে, তার মান যোগ করে দেখেছি যোগফল হয়েছে ৫৯, মাওলানার বয়স চলছিলো ৪৯ বৎসর। এজন্য আমি বলেছিলাম আরো দশ বৎসর জীবিত থাকবেন। কিন্তু পরে প্রমাণিত হলো যে, 'মাহদী' শব্দ দ্বারা তার হুরুফের সংখ্যা উদ্দেশ্য ছিলো না বরং এর দ্বারা হযরত মাহদীর বয়স উদ্দেশ্য ছিলো। আর তার বয়স হবে ৪৯ বৎসর। আর মাওলানার বয়সও ৪৯ বৎসর পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং সে মতেই তাঁর ইন্তিকাল হয়ে গেছে।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) আরো বলেন যে, আমি এ দুআও করেছিলাম যে, আয় আল্লাহ! তোমার এ বুযুর্গ বান্দা মানুষের জন্য খুবই উপকারী। তাই আমার বয়সের কিছু অংশ তার বয়সের সাথে যোগ করে তাঁর হায়াত বৃদ্ধি করে দাও! কিন্তু এই দু'আ কবুল হয়নি।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, এই দুই বুযুর্গ পরস্পরে কোন উস্তাদ-সাগরেদ বা পীর-মুরীদ ছিলেন না। বরং তারা দু'জন একই মক্তবে একই ক্লাসে একই সময়ে পড়াশুনা করেছেন এবং দু'জন এক যমানারই বুযুর্গ ছিলেন এবং পীর ভাই ছিলেন। সহপাঠী ও সমবয়সীদের ব্যাপারে তাদের আচরণ এরূপ ছিলো, তবে বড়দের ব্যাপারে তাদের আচরণ কেমন হতে পারে (তা এমনিতেই অনুমেয়)।

দারুল উলূম দেওবন্দের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে ইস্তিফা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, (দারুল উলূম থেকে বিদায় নেয়ার সময় সেখানে দেয়া আমার ইস্তিফা নামার সারমর্ম ছিলো নিম্নরূপ) আমি বাধ্য হয়ে ইস্তিফা দিচ্ছি। কেননা লড়াই ঝগড়া করার অভ্যাস আমার নাই। তবে আলহামদুলিল্লাহ মাদরাসার নিয়ম-কানুন থেকে দায়মুক্ত হলেও মাদরাসার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছি না। বরং আশা করি সম্পর্ক আরো বৃদ্ধি পাবে।

তিনি আরো বলেন যে, উম্মতের মাঝে ফিৎনা ও মতানৈক্যের

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

আশঙ্কা দেখা দিলে তখন নিজেকে নিজেই সরিয়ে নেয়ার আদর্শ হযরত হাসান (রাযিঃ) থেকে প্রমাণিত আছে। এবং তার সে আদর্শ ও আমল যে যথার্থ ও সঠিক ছিলো তাও প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। এ মনোবলের কারণে আশা করি যে, মাদরাসা ইনশাআল্লাহ এভাবেই থাকবে। বুযুর্গানে দ্বীনের ইখলাস ও মহব্বতের বরকত এর মাঝে মওজুদ আছে। কবির ভাষায়—

کعبہ را ہر دم تجلی می فزود   این ز اخلاصات ابراہیم بود

অর্থাত, পবিত্র কাবাগৃহে নূরের বিচ্ছুরণ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে, এটা হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর ইখলাসের বরকত।

রামপুরে একটি বিবাহের অনুষ্ঠান

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আজ থেকে কিছুকাল আগের সময়টাও কত মুবারক ও উত্তম ছিলো। আগে তো বড়রাও ছোটদের মানসিকতার প্রতি কিছু লক্ষ্য নিতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি রামপুর এলাকার একটি বিবাহের কথা আলোচনা করলেন। যে বিবাহের অনুষ্ঠানে দেওবন্দ থেকে শাইখুল আরব ওয়াল আযম হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (রহঃ), সাহারানপুর থেকে হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহঃ) এবং থানাভবন থেকে হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ) প্রমুখ বুযুর্গানে দ্বীনকে একত্রিত করা হয়েছিলো। সেখানে পৌছে জানা গেল যে, মেঝবান (যার বাড়ীতে বিবাহ সে) বিবাহ শাদীর ক্ষেত্রে প্রচলিত রসম ও রেওয়াজকে বর্জন করেনি। সে সময়টি ছিলো ঐ সময় যখন হযরত (রহঃ) বিবাহ শাদীতে প্রচলিত ভ্রান্ত রসম ও রেয়াজের বিরুদ্ধে থানাভোন সহ বিভিন্ন এলাকায় বক্তব্য রেখে যাচ্ছিলেন এবং আলহামদুলিল্লাহ এর দ্বারা বেশ ফায়দাও হচ্ছিলো।

হযরত থানবী (রহঃ) ভাবলেন যে, আমি যদি এখন এখানের এই বিবাহে অংশগ্রহণ করি তবে (শুদ্ধির) সমস্ত প্রচেষ্টা বরবাদ হয়ে যাবে। সাথে সাথে এ চিন্তাও করলেন যে, আমার দুই মুরব্বী বুযুর্গ হযরত দেওবন্দী (রহঃ) ও হযরত সাহারানপুরী (রহঃ) এ অনুষ্ঠানে তাশরীফ এনেছেন। তিনি কি করবেন তা নিয়ে খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন। কিন্তু হযরত থানবী (রহঃ)–এর নিজের মুরব্বী পর্যায়ের বুযুর্গগণের প্রতি এই

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

নির্ভরতাও ছিলো যে, তাঁরা আমার অপারগতার বিষয়টি অনুধাবন করবেন। এটাকে তারা খারাপ মনে করবেন না। সুতরাং বাস্তবেও তাই হলো। হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহেব (রহঃ) তো বললেন যে, যখন ফাতাওয়া ও তাকওয়ার মাঝে দ্বন্দ্ব হয়, তখন অধিকাংশ সময়েই এ রকম হয় যে, উনি (অর্থাত হযরত থানবী (রহঃ)) তাকওয়াকে অবলম্বন করেন। আর হযরত মাওলানা দেওবন্দী (রহঃ) বললেন, সাধারণ লোকদের অবস্থা ও ধ্যান–ধারণা এবং তাদের বিভিন্ন ভ্রান্ততা সম্পর্কে উনার (মাওলানা থানবীর) যতটা অবগতি আছে আমাদের তা নেই।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আকাবীর ও মুরব্বীগণতো এভাবে আমাকে স্নেহসিক্ত করলেন অথচ অনেক ছোটদের পক্ষ থেকে বিতর্কমূলক চিঠিপত্র আসে। হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন, প্রকৃতপক্ষে এই জ্ঞান কোন আহকামের জ্ঞান বা ইলমে আহকাম নয় বরং ইলমে ওয়াকি'আত তথা বাস্তবতার জ্ঞান। ইলমে আহকাম বা আহকামের জ্ঞানে তো ঐ সকল বুযুর্গানে দ্বীনই অধিক জ্ঞাত এবং সবার উপরে ছিলেন। কিন্তু সাধারণ লোকদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে হয়তো আমার অবগতি বেশী আছে। আর এর মাঝে কোন গৌরব বা অহংকার করার কিছু নেই। যেমন শেষ পর্যায়ে এসে হুদহুদ পাখির এমন বাস্তব বিষয় বুঝে আসলো যা হযরত সুলাইমান (আঃ)–এর জানা ছিলো না। সুতরাং আমি যেহেতু একজন মুমিন তাই হুদহুদ থেকে তো ছোট নই। আর আমাদের মুরব্বী বুযুর্গানে দ্বীন হযরত সুলাইমান (আঃ) থেকেও উত্তম ও উপরে নন।

হানাফী মাযহাব সূর্যের মত

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগুহী (রহঃ) বলতেন, হাদীসসমূহের মাঝে হানাফী মাযহাব আমার কাছে এমন দৃশ্যমান যেমন সূর্য। হযরত আরো বলেন যে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের দরস দানের পদ্ধতি ছিলো খুবই সরল সহজ। তারা দরসে অনেক কিতাবের উদ্ধৃতি দিতেন না বরং কিতাব বুঝিয়ে দিতেন এবং সামনে চলতেন।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

হযরত গাংগুহী (রহঃ) ও হযরত নানুতবী (রহঃ)

একদিন হযরত গাংগুহী (রহঃ) ও হযরত নানুতবী (রহঃ) একত্রে বসেছিলেন। তখন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী (রহঃ) বলতে লাগলেন, মিয়া আমার মনে তোমার একটি বিষয়ের প্রতি বহুত ঈর্ষা হয়, তাহলো তুমি বহুত বড় ফকীহ কিন্তু এই খোশনসীব আমার নেই। তখন হযরত গাংগুহী (রহঃ) বললেন, জ্বি হাঁ আমার কিছু আংশিক বিষয় মুখস্থ হয়েছে আর তার উপর আপনার ঈর্ষা হতে শুরু করেছে কিন্তু আপনি নিজে যে একজন মুজতাহিদ হয়ে আছেন তার উপর আমাদের কখনো ঈর্ষা হয়নি।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী (রহঃ) বলতেন যে, যদি কোন ব্যক্তি একথার উপর কসম খায় যে, আমি একজন ফকীহকে দেখবো, তবে বর্তমান সময়ে তার কসম পূর্ণ হবে না যতক্ষণ সে মাওলানা গাংগুহী (রহঃ)কে না দেখবে।

সাধারণ লোকদের ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করা

একবার হযরত মাওলানা শাইখ মুহাম্মদ থানবী (রহঃ) এক হিন্দু ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মামলায় জিতে গেলেন। শাইখ মুহাম্মদ (রহঃ)-এর পক্ষে ডিক্রী হলো এবং হিন্দু বেনিয়ার উপর কিছু সূদ হিসেবেও কিছু অতিরিক্ত দেয়ার রায় হলো। আর সে সূদও ছিলো বিরাট অংকের—আটশত টাকা। মাওলানা সূদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। সাবজজ ছিলেন একজন মৌলভী সাহেব। তিনি মাওলানা সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন, দুররুল মুখতারে তো লিখা রয়েছে—

لا ربوا بين المسلم والحربى

অর্থাত, মুসলমান এবং হরবী কাফেরের মাঝে সূদের লেনদেন সূদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। (সুতরাং আপনি কেন আপনার পাওনা টাকা ঐ কাফির বেনিয়াকে ছেড়ে দিবেন।) তখন তিনি বললেন, এই মাসআলা তো আমারও স্মরণ আছে। কিন্তু আমি দুররে মুখতার বোগলে নিয়ে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াবো! সাধারণ লোকের মাঝে তো এই সমালোচনা হতে থাকবে যে, শাইখ মুহাম্মদ সূদ গ্রহণ করেছেন।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

রিয়ার সম্ভাবনা আছে বলে আমল ছেড়ে দিবে না

একবার কোন এক বুযুর্গের কাছে এক লোক এসে অভিযোগ করলো যে, অমুক ব্যক্তি 'রিয়া' অর্থাত লোকদের দেখানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাকের যিকির করে। তখন ঐ বুযুর্গ বললেন, তুমি তো লোকদের দেখানোর জন্যও কখনো যিকির করো না। তার এই লোক দেখানো মনোভাবের যিকিরও কিয়ামতের দিনে মিটমিটে আলোর একটি চেরাগ হয়ে পুলসিরাতে তাকে পথ প্রদর্শন করবে।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, মনে হয় এ বিষয়টি ঐ বুযুর্গের জানা ছিলো যে, ঐ লোকটির আমলের মাঝে রিয়া এবং ইখলাস মিলিতভাবে ছিলো। তা না হলে যে আমল শুধুমাত্র রিয়া বা লোকদের দেখানোর জন্য হয় তার মাঝে কোন নূর থাকে না।

অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) পুনরায় বললেন, আমার পরামর্শতো এই যে, কোন কাজের ক্ষেত্রে যদি অন্তরে রিয়ার সম্ভাবনা আসে তবুও ঐ কাজ কক্ষণো ছাড়বে না। বরং এরূপ ইচ্ছা করবে যে, এ কাজ তো আমি অবশ্যই করবো তবে পরবর্তীতে তাওবা করে নিবো।

মুরীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, সবচে ভাল পন্থা হলো এই যে, যদি কোন আমলে অলসতা বা অসচেতনতা ঘটেছে বলে সন্দেহের সৃষ্টি হয়, তবে তার তাহকীক ও তালাশে না গিয়ে বরং তাকে বাস্তব মনে করে ইস্তিগফার (তাওবা) করে নিবে। যেমন কোন রাস্তায় যদি কাদা থাকে এবং সে রাস্তায় চলার সময় যদি এই সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, হয়ত কাদায় আমার পা নষ্ট হয়ে গেছে। তখন ঐ পথিক ব্যক্তির জন্য এমনটি উচিত নয় যে, কাদা কোথায় লাগলো, কতটুকু লাগলো, সে এই গবেষণায় লেগে যাবে। বরং তার জন্য উচিত হলো যখন কোথাও পানি পাবে পা ধুয়ে নিবে। হাদীস শরীফের শিক্ষা—

ولكن سددوا و قاربوا

অর্থাত, মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো এবং নৈকট্য অর্জন কর। এর সারমর্মও তাই যা উপরে আলোচনা করা হলো।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

তালীমের ক্ষেত্রে সহজতা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, তালীমের ক্ষেত্রে আমি মুস্তাহাবসমূহের প্রতি খুব বেশী জোর দেই না। বর্তমান সময়ের লোকেরা যদি ওয়াজিবসমূহকে ঠিকমত আদায় করে, তবে তাই বিশেষ গনীমত বা মূল্যবান সম্পদ।

(এ কথার অর্থ এই নয় যে, মুস্তাহাবের প্রতি আমল একেবারেই পরিত্যাগ করতে হবে। বরং মানুষের দ্বীনী ব্যাপারে দৈন্যতা লক্ষ্য করেই হযরত থানবী (রহঃ) একথা ইরশাদ করেছেন। কিন্তু যারা আল্লাহ পাকের বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা হতে চায় তাদের মুস্তাহাবসমূহের প্রতিও যত্নবান হওয়া দরকার—অনুবাদক)

যিয়াউল কুলূবে বর্ণিত যিকির-মোরাকাবার শর্ত

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)-এর কাছে যিয়াউল কুলূব সবক সবক করে পাঠ করেছি। তার মধ্যে যিকিরের জন্য যত শর্ত-শরায়েত লিখা হয়েছে সে সবগুলোর ব্যাপারে হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) বলেছেন, এগুলো নিষ্প্রয়োজনীয়। কিছু কিছু লোকের মন-মানসিকতা তো ঐ সকল শর্তসমূহের কারণে খুব অস্থিরতায় পড়ে যায়।

আমল নয় আসল উদ্দেশ্য আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, লোকেরা গোলমাল বাধিয়ে উল্টা বুঝে বসে আছে। তারা আমলকেই আসল উদ্দেশ্য বুঝে নিয়েছে। আর একথা পরিস্কার যে, আমলের ক্ষেত্রে সবল মুমিন এবং দুর্বল মুমিন সমান হতে পারে না। এ কারণে অনেক লোক খুব অস্থির ও চিন্তিত হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মূল উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি। আর এক্ষেত্রে সবল ও দুর্বল নিজ নিজ সাধ্যমত আমল করে সমান হতে পারে। আর তার দৃষ্টান্ত এরূপ—যেমন, সুস্থতা ও শক্তির মাঝে পার্থক্য আছে। শক্তিশালী ব্যক্তি সুস্থ হয়ে অনেক বড় বড় কাজ করতে থাকে। আর দুর্বল ব্যক্তি সুস্থ হওয়া সত্ত্বেও ঐ কাজ করতে পারে না। কিন্তু এ কারণে সে যদি মনে করে যে, আমি সুস্থ নই তবে সেটা ভুল। সারকথা হলো, ডাক্তার সুস্থতার ব্যাপারে যিম্মাদার, শক্তির যিম্মাদার নয়। অনুরূপভাবে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

তরীকতের পথ অতিক্রম করার দ্বারা রূহানী বা আত্মিক সুস্থতা সৃষ্টি হয়ে যায়। কিন্তু শক্তি হলো একটা স্বভাবজাত ও সৃষ্টিগত ব্যাপার। রূহানী সুস্থতার হাকীকত হচ্ছে, যাহেরী এবং বাতেনী সকল আমল ইখলাসের সাথে করতে থাকা।

সুফীর পরিচয়

শাইখ আবদুল ওয়াহহাব শারানী (রহঃ) তার (লিখা অমূল্য গ্রন্থ) 'আল ইয়াওয়াকীত ওয়াল জাওয়াহীর'–এর মধ্যে সুফীর পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন, সুফী হলেন ঐ আলিম যিনি নিজ ইলম মতে আমল করেন। অর্থাত আলেমে বাআমল। আর বাস্তব কথা এটাই যে, আমলকে সহজ করার জন্য যে সকল ব্যবস্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, সে সবের নামই হলো 'সুলূক' ও 'তরীকত'।

পরবর্তী যুগের কিছু সুফীগণের কোন কোন আমল ও ওযীফা যা পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীনের মাঝে প্রসিদ্ধ ছিলো না। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব (রহঃ) সে সবের ব্যাপারে বলেছেন যে, এগুলো বিদআতের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না। তার দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন, কোন ডাক্তার তার চিকিৎসা পত্রে (প্রেসক্রিপশান) 'শরবতে বাযূরী' লিখে দিলো এবং এ শরবত তখন ব্যাপকভাবে বাজারে পাওয়া যেতো। তাই ঐ ব্যবস্থাপত্র ব্যবহারকারীদের কোন কষ্টই করতে হতো না। অতঃপর এমন একটি সময় এলো যে, সে সময় এই শরবত আর বাজারে পাওয়া যেতো না। ধরা যাক এ অবস্থায় কোন হাকীম ব্যবস্থাপত্রে শরবতে বাযুরী লিখলো, ফলে অসুস্থ ব্যক্তির ঐ শরবত তৈরীর যাবতীয় উপকরণ একত্রিত করে শরবত বানানোর ব্যবস্থা করতে হলো। এখন যদি কোন ব্যক্তি তাকে বলে যে, হাকীম সাহেব তো ব্যবস্থাপত্রে শুধু একটি শব্দ 'শরবতে বাযুরী' লিখেছিলো আর এতসব ভিন্ন ভিন্ন ঝক্কিঝামেলা তোমরাই আমদানী করেছো। সুতরাং এটা ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে বাড়াবাড়ি ও বিদআত। এই ব্যক্তির এরূপ কথা বলা যেমন যুক্তি সংগত নয়, অনুরূপভাবে সুফিয়ায়ে কিরামের (রহঃ) নির্ধারিত বিভিন্ন আমল ও মুরাকাবাসমূহ যা কোন কোন বাতেনী রোগের ঔষধ হিসেবে কাজ করে তার অবস্থাও ঠিক অনুরূপ।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হযরত মীর যাহেদ (রহঃ)

হযরত মীর যাহেদ (রহঃ) হযরত শাহ আবদুর রহীম দেহলভী (রহঃ)-এর উস্তাদ ছিলেন। এবং হযরত শাহওয়ালী উল্লাহ (রহঃ) ও মাকুলাতের ক্ষেত্রে নিজের সনদ (সূত্র) মীর যাহেদের সাথে মিলাতেন। বাদশাহ আলমগীর তাকে কাযী নিযুক্ত করেছিলেন। বাদশাহ আলমগীর এমন লোক ছিলেন না যিনি এমন কোন ব্যক্তিকে শরঈ আদালতের কাযী নিযুক্ত করবেন, যে ব্যক্তি শরীয়ত সম্পর্কে পারদর্শী নয়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, মীর যাহেদ (রহঃ)-এর ইলমে বারী (আল্লাহ পাক সম্পর্কে জ্ঞান) ইত্যাদি ব্যাপারে যেসব কথা আপাতদৃষ্টিতে অধিকাংশ আলিমগণের (জমহুরের) মতের পরিপন্থী মনে হয়, তা 'তাশবীহ' বা উপমাস্বরূপ ছিলো। কিংবা তার অন্য কোন সঠিক মর্ম বুঝে নিতে হবে।

হুক্কা পান করার হুকুম

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আমার কাছে পরিষ্কার কথা হলো, এটা একটা ঔষধ। অন্যান্য ঔষধের যে বিধান হুক্কার ক্ষেত্রেও তাই বিধান। অর্থাত মাকরূহ নয় বরং জায়েয। কিন্তু এর মধ্যে দুর্গন্ধ রয়েছে সুতরাং মসজিদে যাওয়ার সময় মুখ পরিষ্কার করে নিবে।

হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহঃ)-এর অসুস্থতা

একবার শাহ আবদুল আযীয (রহঃ) তার কিছু দোস্ত আহবাবদের সাথে সিকান্দারা গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সেখানকার স্থানীয় লোকেরা একজন হাকীমকে ডেকে আনলো। সে হাকীম এক অদ্ভূত পদ্ধতি অবলম্বন করলো। তাহলো, হযরত শাহ সাহেব (রহঃ) একটি অসুবিধার কথা বলতেই সে কয়েকটা ঔষধ লিখে দেয়। এরপর আবার যখন কিছু অসুবিধার কথা জানালেন তখন হাকীম আরো কিছু ঔষধ লিখে দিলো। এমনিভাবে তিনি যে কোন একটি সমস্যার কথা বললেই হাকীম দু'চারটা করে ঔষধ লিখতে থাকলো। এবার দেখা গেলো তার প্রেসক্রিপশান (ব্যবস্থাপত্র) একটি বিরাট দস্তাবেজ হয়ে গেলো। হাকীম সাহেব যখন চলে গেলো, তখন হযরত শাহ সাহেবের সাথীগণ বললেন, এটা কোন ব্যবস্থাপত্র হলো—এটা তো একটা ঔষধের

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

অভিধান। হযরত শাহ সাহেব (রহঃ) বললেন, আমি এই হাকীমের ব্যবস্থাপত্রই গ্রহণ করবো। আল্লাহ পাকের ইচ্ছা, হযরত শাহ সাহেব সে হাকীমের ব্যবস্থামতে ঔষধ খেলেন এবং তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন। ফলে হাকীম সাহেবের সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। আর হযরত শাহ সাহেব (রহঃ)–এর উদ্দেশ্যও এটাই ছিলো, কেননা এই হাকীম সাহেব একজন নেককার মানুষ ছিলেন। চিকিৎসা খুব বেশী ভাল জানতেন না। এজন্য আর্থিক দৈন্যতায় দিন কাটাতেন। এর দ্বারা হাকীম সাহেবের বিরাট উপকার হয়ে গেলো।

হযরত থানবী (রহঃ) বললেন, যেমনিভাবে এই হাকীম প্রত্যেক অবস্থার কথা শুনেই নতুন একটি ঔষধ দিয়ে দিতেন। বর্তমান সময়ে মাশাইখগণ রূহানী চিকিৎসার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিই অবলম্বন করছেন। তারা প্রত্যেক রূহানী বিমারীর জন্য একটি ওযীফা নির্ধারণ করে রেখেছেন। ইবাদতে মন বসে না সেজন্য একটা ওযীফা নির্ধারণ করে রেখেছেন। এরপর সে ওযীফায়ও যদি মন না বসে তবে তার জন্য আরো একটি ওযীফা নির্ধারণ করে দেন। এভাবে চলতে থাকে।

কিন্তু প্রয়োজন হলো অসুস্থতার কারণ ভেবে সে কারণের চিকিৎসা করা। বর্তমানের ইংরেজী ডাক্তারদের নিয়মও এটাই যে, তারা রোগের কারণের প্রতি খুব একটা লক্ষ্য করে না, শুধু রোগ দূর করার ঔষধ লিখে দেয়। সাময়িকভাবে তখন রোগ সেরে যায় ঠিক কিন্তু পরে আবারো সে রোগ দেখা দেয়।

প্রচলিত মুনাযারার প্রতি অনীহা

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, বর্তমানে আমার মুনাযারা বা বিতর্কের প্রতি ঘৃণা হয়। কিন্তু ছাত্র জীবনে আমি অনেক মুনাযারা করতাম। কারণ হলো বর্তমান সময়ে মুনাযারা দ্বারা হক বিষয়টি তাহকীক করার সে উদ্দেশ্য আর বাকী নেই বরং মুনাযারা করতে গিয়ে শুধু কথা কাটাকাটি আর পেচাপেচি করতেই যেন লোকেরা বাধ্য হয়। এ কারণে এর প্রতি আমার ঘৃণা।

হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)–এর কথা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, হযরত হাজী

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহঃ) ইরশাদ করেন, আলহামদুলিল্লাহ চারটি জিনিসের ব্যাপারে আমার সুস্পষ্ট বুঝ রয়েছে। ১. সাহাবা–ই–কিরাম (রাযিঃ)–এর মুশাজারাত বা তাদের পারস্পরিক মতপার্থক্য। ২. রূহ বা আত্মা। ৩. তাকদীর। ৪. ওয়াহদাতুল উজূদ (আল্লাহ পাকের একক সত্তার অস্তিত্ব)–এর মাসআলা।

মির্যা কাদিয়ানীর ব্যাপারে আকাবিরে দেওবন্দ

মির্যা কাদিয়ানীর ব্যাপারে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)–এর মতামততো পূর্ব থেকেই খুব কঠোর ছিলো। তিনি মির্যার কিতাব 'বারাহীনে আহমদ' দেখে বললেন, এর মধ্যে খৃষ্টবাদের গন্ধ আসে। কিন্তু হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগুহী (রহঃ) প্রথমে তাদের ব্যাপারে নরম ছিলেন। মির্যার পক্ষ থেকে কিছু ভাল ব্যাখ্যা তিনি নিজেই ধরে নিতেন এবং লোকদের কাছেও বলতেন। এরপর সে যখন পরিস্কার ভাষায় নবুওয়তের দাবী করলো এবং অন্যান্য কুফরী কর্মকাণ্ড প্রকাশ করলো তখন তিনি বাধ্য হয়ে তাদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করলেন।

সুধারণা ও কুধারণার ব্যাপারে স্থিতিশীলতা

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, মানুষের প্রতি সুধারণা এবং কুধারণা পোষণ সংক্রান্ত ব্যাপারে হযরত শেখ সাদীর দুটি শেরের মর্ম পরস্পর বিরোধী। একটি গুলিস্তার মধ্যে আর অপরটি বোস্তার মধ্যে। গুলিস্তার মধ্যে আছে—

هرکرا جامه پارسا بینی!　　　پارسادان ونیک مرد انگار

আবার বোস্তার মধ্যে আছে—

نگه دارد آن شوخ درکیسه در　　　که داند همه خلق را کیسه بر

(শে'র দুটির মর্ম এ কিতাবে এর আগে বর্ণনা করা হয়েছে।) গুলিস্তার শে'রের মধ্যে সকলের ব্যাপারে সুধারণা পোষণের শিক্ষা এবং বোস্তার শে'রের মধ্যে সকলের ব্যাপারে কুধারণা পোষণ করে সাবধানতা অবলম্বনের শিক্ষার কথা বুঝে আসে।

এ ব্যাপারে হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে,

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

বিশ্বাসগত দিক থেকেতো গুলিস্তার শে'রের উপরই আমল করতে হবে। অর্থাত যার বাহ্যিক অবস্থা ভাল দেখবে তার প্রতি ভাল ধারণা রাখবে। কিন্তু মুআমালার ক্ষেত্রে বোস্তার শে'রের উপর আমল করবে এবং নিজের গোপন কথা ও রহস্য সকলের সামনে প্রকাশ করবে না। বরং এক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করবে।

বুযুর্গদের দু'আ ও আল্লাহ্ পাকের নামের সম্মান

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আমি বুযুর্গানে দ্বীনের অনেক দুআ নিয়েছি। তিনি আরো বলেন যে, আমি আল্লাহ পাকের নাম নেয় এমন বিদআতপন্থী বড় ব্যক্তিকেও অপমানিত করে কোন কথা বলিনি এবং তাদের সাথে কোন কর্কষ আচরণও করিনি।

হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ) সম্পর্কে হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)-এর বক্তব্য

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (শাইখুল হিন্দ রহঃ) যখন পবিত্র মক্কায় হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)-এর খিদমতে হাযির হলেন, তখন হযরত শায়খুল হিন্দ (রহঃ)-এর কাছে হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) কোন একটি প্রশ্ন করলেন। হযরত শায়খুল হিন্দ (রহঃ) তার উত্তর দিলেন। হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) তার জবাবে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, মৌলভী মুহাম্মদ কাসেম তোমাকে শুধু মৌলভীই বানায়নি বরং ফকীর (দরবেশ)ও বানিয়ে দিয়েছে।

রমযানুল মুবারক ১৩৫০ হিজরীর মালফূযাত

মাওলানা ফযলুর রহমান সাহেব–এর কিছু কথা

হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান সাহেব (রহঃ) গঞ্জমুরাদাবাদী হযরত শাহ আবদুল আযীয সাহেব (রহঃ)–এর সাগরেদ এবং বহুত বড় আলিম হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে কিছুটা মাজযূব ও দেওয়ানা ধরনের অবস্থা বিদ্যমান ছিলো। তার কথাবার্তাও হতো আশ্চর্য প্রকৃতির। একবার তিনি বললেন, এক কুষ্ঠরোগী এসেছিলা, আমরা তার সাথে খানা খেয়েছি। সুন্নাতের অনুসরণের বরকতে সে ভাল হয়ে গেছে।

একবার বললেন, একবার আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম এবং তা এত বেশী ছিলো যে, আমার আশঙ্কা হচ্ছিলো যে, মরে যাই কিনা। এবং মরণকে আমি খুবই ভয় পাই। রাতে স্বপ্নযোগে হযরত ফাতিমা (রাযিঃ)–এর সাথে সাক্ষাত হলো। তিনি আমাকে তার সীনার সাথে লাগালেন। এরপর আমি ভাল হয়ে গেলাম।

একটি গুরুত্বপূর্ণ হিদায়াত

একবার অনেক হাকীকত ও মা'রিফতের আলোচনা করার পর হযরত থানবী (রহঃ) বললেন, শেষ কথা হলো, সর্বদা নিজেকে (আত্মিক দিক থেকে) অসুস্থ মনে করবে এবং চিকিৎসা করাতে থাকবে, আর সর্বদা ইস্তিগফার করতে থাকবে। এই চিন্তা কখনো করতে যাবে না যে, এখন কতটুকু ভাল হলাম আর কতটুকু অসুস্থ থাকলাম। বরং চিকিৎসা ও ইস্তিগফার করে যেতে থাকবে। সারাজীবন এভাবেই কাটিয়ে দিবে।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি এই তরীকত (তাসাওউফ)–এর মধ্যে প্রবেশ করলো অথচ তার মধ্যে বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি হলো না, তবে সে এই তরীকতের কিছুই লাভ করতে পারলো না।

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) ইরশাদ করেছেন, যে জিনিস আল্লাহ পাকের মহব্বতের ভিত্তিতে ইখলাসের সাথে আসে, তার মাঝে নূর থাকে। তাই সে জিনিস অবশ্যই ব্যবহার করা উচিত।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

এক বুযুর্গ নিজ শাইখের দরবারে হাযির হলেন। শাইখের দরবারে হাদিয়া হিসেবে নিয়ে যাওয়ার কিছুই তাঁর কাছে ছিলো না। পরিশেষে তিনি রাস্তা থেকে শুকনো লাকড়ী কুড়িয়ে একটি আঁটি বেঁধে তা নিয়ে গেলেন। এবং সে লাকড়ী হাদিয়া হিসেবে পেশ করলেন। সে বুযুর্গ ঐ লাকড়ীর হাদিয়াকে এতই কদর করলেন যে, সে লাকড়ীগুলো তিনি খুব যত্নসহকারে রেখে দিলেন এবং অসীয়্যত করলেন যে, আমার ইন্তিকালের পর আমাকে গোসল করানোর জন্য যে পানি গরম করা হবে তা এই শুকনো লাকড়ী দ্বারা গরম করবে।

অমুসলিমদের সাথে আচরণ

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, হায়দারাবাদ এলাকার টাকশালে একজন ইংরেজ অফিসার ছিলো। একবার সে আমাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে বিস্তারিতভাবে টাকশাল ভ্রমণ করালো। আমি অধিকাংশ সময়ে একথা বলে তার শুকরিয়া আদায় করেছি যে, আপনার আখলাক ও আদর্শ এত ভাল যেমন মুসলমানদের আদর্শ হয়ে থাকে।

অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, একবার এক সফরে এক ইংরেজ সাথী হলো। যখন খানার সময় এলো, তখন আমি আমার খানার প্রতি তার মনোযোগ আকর্ষণ করলাম। কিন্তু তাকে আমার পাত্রে খেতে দিলাম না। ভিন্ন করে তাকে দিয়ে দিলাম। এভাবে আমি পড়শি হিসাবে তার হক আদায় করেছি। কারণ, পবিত্র কুরআনে ঐ ব্যক্তিকেও সাময়িক পড়শি আখ্যায়িত করা হয়েছে যে সফর ইত্যাদিতে সাময়িকভাবে সাথী হয়। পবিত্র কুরআনের আয়াতাংশ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ (পার্শ্বস্থ ব্যক্তি) –এর দ্বারা এ মর্মই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং পড়শি হওয়ার কারণে তার যে হক ছিলো তা তো আমি আদায় করে দিলাম। কিন্তু তার খুব ইযযত ও সম্মান দেখালাম না। আমার নীতি এটাই যে, আমি বিধর্মীদের অপমানিতও করি না আবার খুব ইযযত সম্মানও দেখাই না।

হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন যে, হাদীস শরীফের হুকুম মতে আমি 'যইফ' এর সম্মান তো করি কিন্তু 'সাইফ'–এর সম্মান করি না। 'যইফ' অর্থ হলো 'মেহমান' আর 'সাইফ' অর্থ 'তরবারী'। এর মর্ম হচ্ছে, মেহমানকে মেহমান হিসেবে সমাদর করার ব্যাপারে হাদীস শরীফে গুরুত্ব

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু কেউ প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন হওয়ার কারণে তাকে তা'যীম ও সম্মান করার হুকুম নেই।

হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ (রহঃ)

হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ সাহেব (রহঃ) যখন এই হাদীস শুনলেন যে, প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে যবের আটা না ঝেড়েই পাকানো হতো। তখন তিনি নিজের ঘরে হুকুম দিয়ে দিলেন, সামনে থেকে এই সুন্নাতের উপর আমল করতে হবে। আটা ঝাড়া যাবে না, হুকুম মত তার উপর আমল করা হলো। কিন্তু যেহেতু এভাবে খেতে কেউ অভ্যস্ত ছিলো না, তাই সকলের পেটে ব্যথা এবং কষ্ট হতে লাগলো। তখন তিনি বললেন যে, আমাদের দ্বারা একটা গোস্তাখী হয়ে গেছে। তাহলো, আমরা আমাদেরকে প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তুলনা করেছি। এটা যেন এক ধরনের সমতার দাবী হয়ে গেছে। তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া আমাদের উপর এসে পড়েছে। আমরা কোথায় আর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায়। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থান থেকে নিচে থাকাই আমাদের জন্য মঙ্গলজনক। এরপর তিনি পূর্বের নিয়মমতে আটা ঝেড়ে পাকাতে শুরু করলেন।

একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ তবে এভাবে সুন্নাত আদায় করা ঐ সকল সুন্নাতের ব্যাপার দুরস্ত আছে, যেগুলো শরীয়তের মূল উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়—যেমন, আটাকে ঝাড়া ছাড়াই ব্যবহার করা। কিন্তু শরীয়তের মৌলিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত সুন্নাতসমূহের ক্ষেত্রে প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলের পুরোপুরি অনুকরণ করার চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি অবশ্য কর্তব্য। (মুহাম্মদ শফী)

মাওলানা ফয়যুল হাসান সাহারানপুরী (রহঃ)

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, একবার হযরত মাওলানা ফয়যুল হাসান সাহারানপুরী (রহঃ)-এর কাছে কোন এক লোক ওহাবী এবং বিদ'আতীর সংজ্ঞা জানতে চাইলো। তখন মাওলানা সাহারানপুরী (রহঃ) বললেন, ওহাবী হলো, ঈমানদার বেয়াদব আর বিদ'আতী হলো আদবওয়ালা বেঈমান।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

কোন এক প্রসংগে হযরত থানবী (রহঃ) নিম্নের শে'রগুলো পাঠ করেছিলেন, কোন ক্ষেত্রে কোথায় পড়েছিলেন তা স্মরণ নেই, তবে শে'রগুলো স্মরণ আছে। যেহেতু শে'রগুলো খুবই উপকারী তাই নিম্নে তা লিখে দেয়া হচ্ছে—

تاجر ما جنس درد واز راه دور آورده است

از برائے داغ دل آتش ز طور آورده است

অর্থাত, আমাদের তাজের বা ব্যবসায়ী আমাদের জন্য অনেক দূর থেকে ব্যথা–বেদনা আর যন্ত্রণার সওদা নিয়ে এসেছেন। অন্তরকে জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য তুর পাহাড় থেকে মহব্বতের আগুন নিয়ে এসেছেন।

হযরত গাংগুহী (রহঃ)–এর মাকতুবাতের মধ্যে আছে—

نیست کس را از حقیقت آگہی

جملہ می میرند با دست تہی

অর্থাত, কোন ব্যক্তিরই প্রকৃত হাকীকত সম্পর্কে অবগতি নেই। সবাই রিক্তহস্তেই (খালি হাতে) দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।

হযরত থানবী (রহঃ)–এর নিজের একটি শে'র—

اندریں رہ ہر چہ می آید بدست

حیرت اندر حیرت اندر حیرت ست

অর্থাত, এ তাসাওউফের পথে যা কিছু অর্জিত হয়, তা শুধু অস্থিরতার উপর অস্থিরতা আর শুধুই পেরেশানী।

জীন অধীনস্থ করার আমল প্রসংগে

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, ছোট সময় আমার তাবীয–কবযের ব্যাপারে খুব আগ্রহ ছিলো। একটা খাতায় আমি অনেক তাবিয জমা করে সংরক্ষণ করে রেখেছিলাম। এরপর যখন অনেকদিন হলো, তখন সেগুলো সব জ্বালিয়ে দিয়েছি।

হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন যে, আমি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়া'কুব সাহেব (রহঃ)–এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, এমন কোন আমল আছে কি যার দ্বারা জীন অধীনস্থ ও বাধ্যগত হয়ে যায়? হযরত (রহঃ) জবাবে বললেন, হাঁ আছে এবং তা খুব সহজও কিন্তু তুমি আমাকে একথা বলো যে, তুমি কি খোদা হওয়ার জন্য সৃষ্টি হয়েছো,

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

নাকি গোলাম (বান্দা) হওয়ার জন্য? হযরতের একথার দ্বারা আমার অন্তর্চক্ষু খুলে গেছে এবং ঐ বিষয়ের প্রতি অনীহা এসে গেছে।

মৌলভী গাউস আলী শাহ পানীপতী (রহঃ)

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) মৌলভী গাউস আলী শাহ পানিপতী (রহঃ) সম্পর্কে বলেন, তার ব্যাপারে আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের তাহকীক হলো, তিনি সাদিক (নেককার, সত্যবাদী) তো ছিলেন বটে কিন্তু কামেল (পরিপূর্ণ বুযুর্গ) ছিলেন না।

একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার স্বভাব ও মানসিকতাকে আকল ও জ্ঞানের উপর বিজয়ী হতে দেই না। আর আমার আকলকে শরীয়তের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে দেই না।

উম্মুল মুমিনীন (রাযিঃ)গণের পূর্ণ বৎসরের খোরাক প্রদান প্রসঙ্গ

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন পবিত্রাত্মা বিবিগণের পূর্ণ বৎসরের খোরাক-খরচ একসাথে দিয়ে দেয়ার সুন্নাত জারি করে উম্মতদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। যাতে তারাও সে সুন্নাতের অনুসরণ করতে পারে। অন্যথায় প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পরিবার পরিজনের তাওক্কুল বা ভরসা এতই শক্তিশালী ছিলো যে, এ ব্যবস্থার কোন প্রয়োজন ছিলো না। তার দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন, ছোট বাচ্চাদের সাথে কথা বলার সময় বড় মানুষেরাও ছোট বাচ্চাদের মত একটু তোতলিয়ে কথা বলে যাতে তার জন্য কথা বলা সহজ হয়ে যায়।

উম্মতে মুহাম্মদীর সফলতা

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, উম্মতে মুহাম্মদীর কামাল ও সফলতা এর মাঝেই নিহিত যে, তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি অপরকে নিজের

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

থেকে বড় মনে করবে। এভাবে সকলেই বড় হয়ে যায়। অন্যথায় কেউই বড় থাকে না। (বরং সকলের নযরে সকলে ছোট থাকে।)

পূর্ব যুগের বুযুর্গানে দ্বীনের মামূল

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, সলফে সালেহীন তথা পূর্ব যুগের বুযুর্গানে দ্বীনের তিনটি মা'মুল বা অভ্যাস ছিলো—

১. নামায, ২. তিলাওয়াত, ৩. যিকির। কিন্তু পরবর্তীগণ শুধু যিকিরকে রেখে দিয়েছেন আর বাকীগুলোকে ছেড়ে দিয়েছেন। এ কারণেই তারা অসম্পূর্ণ থাকেন।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

রমযানুল মুবারক ১৩৫৪ হিজরীর মালফূযাত

ইখতিলাফী মাসাইলের ক্ষেত্রে ন্যায়সংগত স্থিতিশীলতা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, একবার কানপুরে একব্যক্তি আমার সামনে বিদ'আতপন্থীদের নিন্দাবাদ করতে শুরু করলো। আমি বিদ'আতপন্থীদের পক্ষ থেকে নিজেই বিভিন্ন ভাল ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলাম। যার কারণে লোকটি মনে করলো আমিও বিদ'আতপন্থী। অতঃপর লোকটি গাইরে মুকাল্লিদ (মাযহাববিরোধী)দের নিন্দাবাদ করতে শুরু করলো। এবারও আমি গাইরে মুকাল্লিদদের পক্ষ হয়ে বিভিন্ন ভাল ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলাম। লোকটি এবার অস্থির হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, তবে আপনার মাযহাব বা মতবাদ কোন্‌টি? আমি জবাব দিলাম আমার মাযহাব হলো পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়। প্রথম আয়াত হলো—

كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ

অর্থাত, তোমরা আল্লাহ পাকের জন্য ন্যায় সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাও। যদিও সেই সাক্ষ্য তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধেও হয়।

আর দ্বিতীয় আয়াত হলো—

لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَنْ لَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

অর্থাত, কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তোমাদের গোশ্বা যেন তোমাদেরকে বেইনসাফী করার প্রতি প্ররোচিত না করে। বরং সর্বাবস্থায় তোমাদের ইনসাফ ও ন্যায়সংগত আচরণই করা উচিত। আর এমনটিই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।

আল্লামা জামী (রহঃ) কতই না সুন্দর বলেছেন—

ز ہفتاد و دو ملت کرد جامی رو بعشق تو

بلے عاشق ندارد مذہبے جز ترک مذہبہا

অর্থাত, শুধু তোমার ইশকের কারণে জামী বাহাত্তর ফিরকার সবই বর্জন করেছে। আর আশেকের তো কোন ফেরকা বা মাযহাব নেই। বরং সকল মাযহাব পরিত্যাগ করাই হলো তার মাযহাব।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সাধকের সৃষ্ট পরিস্থিতির উপর সন্তুষ্ট থাকা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বর্ণনা করেন, একবার হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)–এর মজলিস চলছিলো। বিভিন্ন হাকীকত ও মা'রিফাতের কথা হচ্ছিলো। ইতিমধ্যে হঠাৎ একজন লোক আসলো। সে এসেই একটি তাবীয চাইলো। হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) বয়ান বন্ধ করে তাকে তাবিয লিখে দিলেন। উপস্থিত লোকেরা সে লোকটির উপর খুব ক্রুদ্ধ হয়েছিলো যে, বেটা কেমন অসময়ে তাবীয চেয়ে মজলিসের স্বাদটাই নষ্ট করে দিলো। তখন হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) বললেন যে, নিজ বান্দাদের কিসে মঙ্গল হবে তা আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। কোন কোন সময় একটা ভাল কাজের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকার মাঝে আবার কোন খারাবী সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেয়। যেমন অহংকার ইত্যাদি। ফলে আল্লাহ পাক সে ভাল কাজকে বন্ধ করিয়ে দেন। যা আপাতদৃষ্টিতে ঐ লোকদের কাছে অপসন্দনীয় মনে হয়, কিন্তু তার মাঝেই তাদের জন্য গোপনীয়ভাবে মঙ্গল নিহিত থাকে। এজন্য মানুষের 'ইবনুল ওয়াক্ত' (সময়ের বেটা) হওয়া উচিত। আর এই 'ইবনুল ওয়াক্ত' ঐ ব্যক্তি যে 'আবুল ওয়াক্ত' (সময়ের পিতা)–এর বিরোধী বা প্রতিদ্বন্দ্বী নয় বরং এই অর্থের হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তিরই ইবনুল ওয়াক্ত হওয়া আবশ্যক। এ কথাকেই এভাবে বলা হয়েছে—

صوفی ابن الوقت باشد اے رفیق

অর্থাত, ওহে বন্ধু! সুফীগণই হয়ে থাকেন ইবনুল ওয়াক্ত বা সময়ের বেটা।

হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন, কোন কোন সময় একটি কাজ আমাদের নযরে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। কিন্তু তা আল্লাহ পাকের নযরে কিছুই নয়। আল্লাহ পাক তখন নিজ অনুগ্রহে সে কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রকৃত অর্থে গুরুত্বপূর্ণ কাজে লিপ্ত করে দেন।

প্রকৃত স্বপ্নে একটা নূর থাকে

হযরত (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, আমাদের স্বপ্ন তো সাধারণতঃ অবাস্তব ও বাজে স্বপ্নই হয়ে থাকে। আর যথার্থ ও সত্য খাবের মধ্যে একটা নূর থাকে। সেসব খাব বর্ণনা করার সাথে সাথেই তার তা'বীর ও ব্যাখ্যা বুঝে আসতে থাকে।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

একটি গুরুত্বপূর্ণ নসীহত

খাজা আযীযুল হাসান মাযযূব (রহঃ) 'আশরাফুস সাওয়ানেহ' (হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)–এর জীবনী) লিখার জন্য দীর্ঘ দিনের ছুটি নিয়ে থানাভোনে অবস্থান করছিলেন। ছুটি প্রায় শেষ হয়ে এলো অথচ কাজ তখনো অনেক বাকী ছিলো। হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আমি সব সময় তাকে বলে আসছিলাম যে, সংক্ষিপ্তাকারে দু'চারটি বিষয় যা সামনে আসে তাই লিখে নাও। এরপর যা স্মরণ আসতে থাকবে সারাজীবন আস্তে আস্তে তার সাথে বাড়াতে থাকবে। কাজ এভাবেই হয়। কিন্তু বুড়ার কথা কেউ মানে না। তরুণ ও জওয়ান বয়সের তারুণ্য ও জোশ নিয়ে যখন কোন কাজে বসে তখন সে মনে করে সবকিছুই করে ফেলবো। যার ফলাফল এই হয় যে, কিছুই হয় না। কবির ভাষায়—

نصیحت گوش کن جانان کہ از جان دوست پر دارند!

جوانان سعادت مند پند پیر دانا را

অর্থাত, ওহে আদরের প্রিয়তম ! তোমার জীবনের প্রতি যদি তোমার দরদ থাকে তবে উপদেশ মনোযোগ দিয়ে শোন (এবং আমল কর)। ওহে নওজোয়ান সম্প্রদায় তোমরা বৃদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তিদের উপদেশকে সৌভাগ্যের বিষয় মনে করো।

সর্বদা অন্তরের নেগরানী করা উচিত

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, তাসাওউফের তথা এই তরীকতের মধ্যে কলবের অবস্থা এমন যেমন লজ্জাবতী গাছ। সর্বদা নেগরানী করে তাকে সকল প্রকার অনিষ্টতা থেকে বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন।

একবার হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ)কে দেখা গেলো, তিনি পানির মশকীযাহ (পানি রাখার চর্ম নির্মিত পাত্র) কাঁধে বহন করে যাচ্ছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, অন্য রাষ্ট্র থেকে প্রতিনিধি এসেছিলো, সে সময় দরবারে খুব শান–শওকত সৃষ্টি হয়েছিলো। তাই আমার এ আশংকা সৃষ্টি হয়েছে যে, মনের মধ্যে কোন গরীমা ও অহংকার সৃষ্টি হয়ে যায় কিনা। তার চিকিৎসা করার জন্যই আমি এমনটি করছি।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)-এর অসুস্থতা

১২ই রবিউস সানী ১৩৫৪ সনের রাতে হযরত থানবী (রহঃ) তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য উঠলেন। হযরত যখন পেশাব করতে বসলেন, তখন তাঁর মাথায় এমন এক চক্কর আসলো যে, হযরত থানবী (রহঃ) মাটিতে পড়ে গেলেন। এবং প্রায় অচেতন হয়ে গেলেন। কনুই এবং পাঁজরে আঘাত লাগলো। উঠতে চাইলেন কিন্তু উঠতে পারলেন না। বাধ্য হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লেন। এরপর অনেক কষ্টে নামাযের চৌকি পর্যন্ত পৌছলেন। এ সময় পর্যন্তও তিনি কষ্ট হবে মনে করে ঘরের কাউকে জাগালেন না। কিছুক্ষণ পর ঘরের লোকেরা জেগে উঠলো। সকালবেলা ডাক্তার ও হাকীম দ্বারা চিকিৎসা শুরু হলো। সকলের পরামর্শ এই হলো যে, হযরত কিছুদিন পরিপূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করবেন। কোন চিঠিও লিখবেন না এবং কারো সাথে সাক্ষাৎও করবেন না। এজন্য ভাই জনাব শিব্বীর আলী সাহেবকে দায়িত্ব দেয়া হলো। যাতে তিনি কাউকে হযরত থানবী (রহঃ)-এর কাছে যেতে না দেন বরং বাহির থেকেই অবস্থা জানিয়ে বিদায় করে দেন।

অধমের (সংকলক) দেওবন্দে থাকা অবস্থায় যখন এ সংবাদ পেলাম, তখন অধম এ উদ্দেশ্যে থানাভোন হাযির হলাম যাতে কাছে থেকে সব সময়ের সংবাদ ও অবস্থা জানতে পারি। সাক্ষাতের ব্যাপারে তো পূর্বেই জানতে পেরেছি যে, ডাক্তারগণ সাক্ষাৎ করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। এজন্য অধমের ইচ্ছা এই ছিলো যে, আমি এসেছি এ সংবাদও হযরত (রহঃ)-এর কাছে পৌছাবো না। কিন্তু ব্যাপার এই ঘটলো যে, আমি রাতের বেলা থানাভোন পৌছেছিলাম, সকালে হাউযে যখন উযূ করছিলাম তখন হযরত মাওলানা যুফার আহমদ সাহেবের ছোট ছেলে পাশেই এসে উযূ করতে লাগলো। সে আমাকে চিনতো, সে আমাকে কিছু না বলেই ঘরে গিয়ে আমার আসার কথা হযরত থানবী (রহঃ)-এর কাছে জানিয়ে দিলো।

হযরত থানবী (রহঃ) আমার প্রতি চূড়ান্ত স্নেহ-মমতা হেতু ইচ্ছা করলেন যে, এমনভাবে আমাকে সামান্য সময়ের জন্য কাছে ডাকবেন, যাতে ভাই শিব্বীর আলী সাহেব জানতে না পারেন। কারণ, তিনি তো সর্বরকম সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে দায়িত্বে ছিলেন। এজন্য তিনি নিজ খাদেম সুলাইমানকে বললেন, মৌলভী শফীকে আমার কাছে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

পাঠিয়ে দাও। সুলাইমানেরও একথা জানা ছিলো যে, এখন হযরত থানবী (রহঃ)—ভাই শিব্বীর আলী সাহেব ছাড়া অন্য কাউকে ডাকেন না। সে মতে সে আমার নামের শীন হরফ শুনে মনে করেছে যে, হযরত থানবী (রহঃ) ভাই শিব্বীর আলীকে ডেকেছেন। তাই সে গিয়ে ভাই শিব্বীর আলীকে সংবাদ দিলে তিনি এসে হাযির হলেন। হযরত থানবী (রহঃ) তখন মুচকি হেসে বললেন, আমি তো আপনার কাছ থেকে চুরি করে একটা কাজ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আল্লাহ পাক বিষয়টি মঞ্জুর করেননি, তাই চুরি ফাঁস হয়ে গেছে। আমি মৌলভী শফীকে ডাকতে চেয়েছিলাম।

ভাই শিব্বীর আলী মনে করেছেন যে, আমি নিজেই হয়তো হযরতের (রহঃ) সাথে সাক্ষাতের দরখাস্ত করেছিলাম তা না হলেও অন্ততঃ আমার আসার খবরটা হযরত (রহঃ)কে জানিয়েছিলাম। এজন্য তিনি আমার উপর গোশ্বা হয়ে আমার কাছে এলেন এবং বললেন, আপনাদের অন্তরে হযরত (রহঃ)–এর আরাম ও সুস্থতার কোন পরওয়া নেই। আপনারা শুধু নিজের সাক্ষাতের চিন্তাতেই থাকেন। আমি তাকে বিনয়ের সাথে বললাম, আমার তো মোটেও জানা নেই যে, হযরত (রহঃ)–এর কাছে আমার আসার সংবাদ পৌঁছে গেছে। আমি তো কারো কাছে বলিনি।

সারকথা হলো এই যে, ভাই শিব্বীর আলী সাহেব আমাকে হযরত (রহঃ)–এর পারিবারিক বিশ্রামগাহে যেখানে হযরত (রহঃ) অবস্থান করছিলেন সেখানে পৌঁছে দিলেন এবং খুব তাকীদ সহকারে বলে দিলেন যে, কয়েক মিনিটের বেশী যাতে ওখানে বসে না থাকি। সেমতে অধম সংক্ষিপ্ত সাক্ষাত ও অবস্থা জিজ্ঞাসা করার পর চলে আসতে চাইলাম। কিন্তু হযরত (রহঃ) আমাকে আসতে বারণ করলেন এবং বেশ কিছু সময় পর্যন্ত আমার সাথে কথা বলতে থাকলেন। অতঃপর হযরত (রহঃ) আমাকে বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে (এবার যেতে পারেন) এখন আমার অন্তর ভরে গেছে। আমি বিদায় হয়ে এলাম।

আমার মত একজন অধম, নাচীজ ও অপদার্থের প্রতি নযর করুন এবং লক্ষ্য করুন হযরত (রহঃ)–এর সুউচ্চ মর্যাদার বিষয়টি, শুধু কি তাই? তিনি তখন অসুস্থ দুর্বল আর এ কারণে ডাক্তারদের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা লংঘনের বিষয়টিও ভেবে দেখুন। এরপর হযরত (রহঃ)–এর ঐ আচরণের বিষয়টি লক্ষ্য করুন। কবি বলেন—

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

خاشاک ہیں کہ بر دل دریا گذر کند

অর্থাত, আবর্জনার দিকে তাকিয়ে দেখ, দরিয়ার বিশাল বক্ষের উপর দিয়ে সেটাও অতিক্রম করে যাচ্ছে।

এসব কিছুর সাথে এখানে হযরত (রহঃ)–এর এ বিষয়টির প্রতিও লক্ষ্য রাখা যাতে ভাই শিব্বীর আলী সাহেবের ব্যবস্থাপনায়ও কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় ফলে যাতে তার মধ্যে কোন অসহ্য বা বিরক্তির ভাব সৃষ্টি হতে না পারে। এই সংক্ষিপ্ত ঘটনায় হযরত থানবী (রহঃ) কত দিকে লক্ষ্য রেখেছেন। আর প্রকৃতপক্ষে দ্বীনের সারবস্তুই হচ্ছে, বিভিন্ন হক ও শরীয়তের সীমাকে যথাযথভাবে লক্ষ্য রাখা।

হযরত থানবী (রহঃ)–এর প্রতি জিন্নাহ সাহেবের চিঠি

১৩৫৭ হিজরীর রমযান শরীফের কথা। হযরত থানবী (রহঃ)–এর কাছে এ সংবাদ এলো যে, মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মাঝে একটা সমঝোতার জন্য পরস্পর আলোচনা হচ্ছে। আর এ ব্যাপারে মিষ্টার জিন্নাহ কথাবার্তা বলছেন। তখন হযরত থানবী (রহঃ)–এর মাথায় এই ফিকির আসলো যে, মিষ্টার জিন্নাহতো শরীয়তের আহকাম সম্পর্কে অবগত নন। ঐ সমঝোতা ও সামঞ্জস্যতায় শরীয়তের পরিপন্থী কোন শর্ত মেনে নিয়ে আবার সে সমঝোতা চুক্তি সম্পন্ন করে ফেলেন কিনা? যদি এমন হয় তবে তা মুসলমানদের জন্য খুবই কঠিন ও মুশকিল হয়ে যাবে। এ আশঙ্কায় হযরত থানবী (রহঃ) মিষ্টার জিন্নার বরাবরে এই মর্মে একটি চিঠি লিখলেন যে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদির ব্যাপারেতো আপনাকে কিছু বলে দেয়ার প্রয়োজন নেই, তবে ধর্মীয় ব্যাপারে তাদের সাথে আপনার ঐ সময় পর্যন্ত সমঝোতা করার অধিকার নেই যতক্ষণ আপনি আপনার চুক্তির খসড়া অভিজ্ঞ উলামায়ে কিরামকে দেখিয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করে না নিবেন। এমন যাতে না হয় যে, শরীয়ত পরিপন্থী কোন বিষয় সিদ্ধান্তে এসে গেলো এবং পরে তা নিয়ে বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি হলো। হযরত থানবী (রহঃ)–এর এই পত্রের জবাবে মিষ্টার জিন্নাহ সাহেবের পক্ষ থেকে ইংরেজী ভাষায় একটি চিঠি এলো, যার অনুবাদ নিম্নরূপ—

“হযরত মাওলানা মাযহারুদ্দীন সাহেব ও নবাবযাদাহ লিয়াকত

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

আলী সাহেবের সাথে আমার কথা বলার সুযোগ হয়েছে। আর আমি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি এ কারণে যে, অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর প্রতি আপনার পরিপূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে। আপনার চিঠি আমার এখানে আরো আগেই পৌঁছেছে। কিন্তু বর্তমান সময়ের বেশ কিছু প্রয়োজনীয় কাজে লিপ্ত থাকা এবং আমি বোম্বাইতে উপস্থিত না থাকার কারণে আপনার চিঠির উত্তর আরো আগে দিতে পারিনি।

কয়েকটি সূক্ষ্ম বিষয় যা আমার সামনে পেশ করা হয়েছে তা আমি গুরুত্ব সহকারে লিখে রেখেছি এবং এ ব্যাপারে আপনাকে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, যখন সময় আসবে আমি সেগুলোর ব্যাপারে অবশ্যই আপনার সাথে পরামর্শ করবো।

আপনার অনুগ্রহের জন্য শুকরিয়া।”

শাইখের প্রতি হৃদ্যতা ও আকর্ষণ

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ)–এর নিজ শাইখের সাথে এতই হৃদ্যতা ও আন্তরিক টান ছিলো যে, তিনি নিজের সমস্ত কাজের নামকরণ করেছেন আপন শাইখের নামে। নিজ খানকার নাম খানকায়ে ইমদাদিয়া, মাদরাসার নাম ইমদাদুল উলূম মাদরাসা, আবার হযরত (রহঃ)এর সংকলিত ফাতাওয়া গ্রন্থের নাম রাখলেন, ইমদাদুল ফাতাওয়া।

অতঃপর মাওলানা যুফার আহমদ সাহেব (রহঃ) সেখানে ফাতাওয়ার কাজ শুরু করলেন। তার নাম দেয়া হলো ‘ইমদাদুল আহকাম’। এরপর মুফতী আবদুল করীম সাহেব থানাভোনে ফাতাওয়ার কাজ শুরু করেন। তার নাম দেয়া হলো, ‘ইমদাদুল মাসাইল’। অতঃপর ১৩৪৯ হিজরীতে অধমের (সংকলকের) উপর দারুল উলূম দেওবন্দের ফাতাওয়ার খেদমত অর্পণ করা হলো। তখন হযরত থানবী (রহঃ) আমার ফাতাওয়ার নাম রাখলেন ‘ইমদাদুল মুফতীঈন’।

পরবর্তীতে কিছু মাসআলার মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলো। তখন তার নাম রাখলেন ‘ইখতিয়ারুস সাওয়াব ফী মুখতালিফিল আবওয়াব’। (এ নামের অর্থ হলো, বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়সমূহের মধ্য থেকে কোন কোন বিষয়ে সংশোধনী এনে সঠিকটি গ্রহণ।) (রমযানুল মুবারক ১৩৫৮ হিজরী)

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হযরত থানবী (রহঃ)-এর একটি কারামত

হযরত থানবী (রহঃ)-এর একজন খাস সাগরেদ ও প্রিয়জন যিনি একজন অভিজ্ঞ আলেমও ছিলেন। তিনি নিজে বর্ণনা করেছেন, আমার মন যৌবনের প্রথম দিকে সুন্দর চেহারার দিকে খুব ঝুঁকে পড়তো। আমি হযরত থানবী (রহঃ)-এর কাছে এ বিষয়টি জানালাম। হযরত থানবী (রহঃ) বললেন, আচ্ছা ! আপনি আজ রাত তিনটায় তাহাজ্জুদের সময় আমার ঘরে আসবেন। যথাসময়ে আমি উপস্থিত হলাম। তখন প্রথমে হযরত থানবী (রহঃ) আমাকে বসিয়ে বললেন, হে আমার প্রিয় সাগরেদ ! আকর্ষণ তো একটি সৃষ্টিগত বিষয়। তাই সেটা তো কোন ইসলাহ এবং তদবীর করার দ্বারা দূর হবে না। আর বস্তুগত দিক থেকে সেটা কোন নিন্দনীয় বিষয়ও নয়। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত তা নিন্দনীয় স্থানে ব্যয় হতে না থাকে ততক্ষণ তা নিয়ে কোন চিন্তা ফিকির করারও প্রয়োজন নেই।

তবে আমি এমন ব্যবস্থা করছি যার দ্বারা তোমার ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা দূর হয়ে যাবে। এই বলে হযরত থানবী (রহঃ) আমাকে তাঁর সিনার সাথে লাগিয়ে নিলেন এবং প্রায় আধা ঘন্টা পর্যন্ত লাগিয়ে রাখলেন। এরপর ছেড়ে দিলেন। সেদিন থেকে আজকের দিন পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ ! আমি সেই সমস্যায় আর কখনো আক্রান্ত হইনি।

(২৪ রমযান ১৩৫৮ হিজরী)

আরেফ ব্যক্তির ইবাদত

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) বলেছিলেন, কোন আরেফ (আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন পুণ্যবান ব্যক্তি)-এর দুই রাকাআত নামায গাইরে আরেফ (যে আরেফ নয় এমন) ব্যক্তির এক লক্ষ রাকাআত নামাযের সমান।

(অধম সংকলক বলতে চায় যে, উপরোক্ত কথার সত্যতার পক্ষে ঐ হাদীসগুলো শক্তি ও প্রমাণ যোগায় যেখানে হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)-এর আল্লাহর পথে এক মুদ (দুই রিতল বা একসের পরিমাণ) খরচ করাকে অন্যদের উহুদ পাহাড় পরিমাণ খরচ করার থেকেও উত্তম বলা হয়েছে।)

সকল ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করা

১৩৫৭ হিজরী সনের পবিত্র রমযানে ডাক্তারদের পরামর্শে আসরের

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

পর হযরত (রহঃ) শহরের বাইরে কোথাও যাওয়ার নিয়ম করে নিয়েছিলেন। খানকায় উপস্থিতদের কয়েকজন হযরত থানবী (রহঃ)এর সাথে যাওয়ার জন্য অনুমতি নিয়ে নিয়েছিলো। তাদের মধ্যে অধম (সংকলক)ও শামিল ছিলাম।

আসরের পর ঘোরাফেরার জন্য হযরত থানবী (রহঃ) যে নিয়ম বানিয়ে রেখেছিলেন তাহলো, তিনি নালার রেলওয়ে পুলের কাছে চলে যেতেন এবং সেখান থেকে আবার ফিরে আসতেন। নিয়ম নীতির অনুসরণ করে চলা হযরত থানবী (রহঃ)–এর একটি সহজাত স্বভাবে পরিণত হয়েছিলো। কোন একদিন স্বাস্থ্য খানিকটা খারাপ লাগছিলো। তাই হাঁটতে ইচ্ছা হচ্ছিলো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নিয়মিত আমলটিকে বাদ দিলেন না। এভাবেই তিনি সদাসর্বদা নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করে চলতেন।

একদিন চলার সময় শেষ প্রান্ত অর্থাৎ রেলওয়ে পুলের কাছে যাওয়ার আগেই ষাড়–গাভী ও অন্যান্য প্রাণীর একটি বিরাট পাল সামনে পড়লো। ফলে ধুলোবালির কারণে সে রাস্তায় চলা কঠিন হয়ে গেলো। নিয়মানুসারে যতটুকু যাওয়ার কথা তা থেকে হয়তো পঞ্চাশ কদম কম হয়েছে। কিন্তু হযরত থানবী (রহঃ) এখান থেকেই ফিরে এলেন না। বরং রাস্তা পরিবর্তন করে অন্য পথে চলে যে কয় কদম বাকী ছিলো তা পূর্ণ করে এরপর ফিরে এলেন।

এ সকল নিয়ম নীতি এমন কাজের সাথে সম্পৃক্ত যা মৌলিক বিষয় নয়। বরং যাওয়ায়েদ বা অতিরিক্ত ও সহায়ক বিষয়। এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে, মৌলিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে হযরত থানবী (রহঃ)–এর নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করা আরো কত সতর্কতা ও গুরুত্ব সহকারে হতে পারে।

একদিন সে ভ্রমণের মাঝে বললেন, যেসব মা'মুল বা নিয়মিত আমলের সম্পর্ক অন্য কারো সাথে রয়েছে, সেটার প্রতি খুব গুরুত্ব দিয়ে নিয়মিত আমল করি। কিন্তু যেগুলো শুধু আমার নিজের সাথে সম্পৃক্ত সেক্ষেত্রে খুব স্বাধীন থাকি। দুপুরের আরাম কখনো করি আবার কখনো করি না। এভাবেই অন্যান্য বিষয়গুলোও।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

আসরের পরের ভ্রমণের মধ্যে কিতাবের দরস

এই সময় আমার সাথে আমার ছেলে মুহাম্মদ যকীও ছিলো, যার বয়স তখন খুবই কম ছিলো। ফার্সী পড়তো। হযরত থানবী (রহঃ) ছোট বাচ্চাদেরকে খুব স্নেহ করতেন। এই বাচ্চা হযরত থানবী (রহঃ)–এর খিদমতে যা মনে চাইতো তাই চেয়ে নিতো। সে একদিন হযরত থানবী (রহঃ)–এর কাছে দরখাস্ত করলো, আমাকে পান্দেনামাহ আত্তার পড়িয়ে দিন। বাচ্চাদের দরখাস্ত উপেক্ষা করা হযরত থানবী (রহঃ) পসন্দ করলেন না। সেমতে তিনি ইরশাদ করলেন যে, অন্য কোন সময় তো আর অবসর নেই আসরের পর যখন আমি ভ্রমণের জন্য মাঠের দিকে যাই তখন পথে পথে পড়ে নিবে। সেমতে ঐ নিয়মে দরস শুরু হয়ে গেলো। এরপর খানকায় অবস্থানরত আলেমগণের অনেকেই সেই দরসে অংশগ্রহণের অনুমতি নিয়ে নিলেন। অধম (সংকলক)ও সেখানে উপস্থিত থাকতাম।

সেই দরসের একটি মালফূয আমার স্মরণ আছে। মালফূযটি হলো, বাদশার কাছে যাওয়া বা তার সংশ্রব গ্রহণের ব্যাপারে পান্দেনামায় যে নিন্দাবাদ করা হয়েছে, সে সবকে এসে হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, বাদশার নৈকট্যের মধ্যে তো সর্বদাই দুনিয়ার ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। সামান্য দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হলেই বিপদ সামনে খাঁড়া। এছাড়া বড় রকমের দ্বীনী ক্ষতির আশঙ্কা তো আছেই। তার একটি হলো তার সামনে হক কথা বলা বড়ই মুশকিল। আর তা বিশেষতঃ এ কারণেও যে, খোদ শরীয়তও তাদের আদব রক্ষা করার প্রতি লক্ষ্য রাখার হুকুম দিয়েছে।

(১৪ই রবিউস সানী ১৩৫৮ হিজরী)

মহিলাদের হজ্জ সফর প্রসঙ্গে

একবার বাইরে থেকে একটি প্রশ্ন এলো যে, এক ব্যক্তি হজ্জে যাচ্ছে, তার সাথে তার খালাও হজ্জে যাবে। এছাড়া অন্য আরেকজন বয়স্ক মহিলা যে তার মাহরাম নয়, সেও তার খালার সাথে হজ্জ সফরে যেতে চায়, এটা জায়েয হবে কিনা? হযরত থানবী (রহঃ) তার জবাবে লিখলেন—

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ!

হানাফী মাযহাবে তো এ পরিস্থিতিতেও অনুমতি নেই। কিন্তু শাফী মাযহাবে যদি বিশ্বস্ত দ্বীনদার মহিলাগণ সাথে থাকেন, তবে অনুমতি

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

আছে। আর হানাফী মাযহাবের অনুসারী লোকদের জন্য কোন বিশেষ মাসআলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনবশতঃ শাফী মাযহাবের অনুসরণ করা জায়েয আছে। (সত্যিকারেই এমনটি করা আপনার জন্য বা ঐ মহিলার জন্য) প্রয়োজন কিনা সে ব্যাপারে ফায়সালা (এতদূর থেকে) আমি করতে পারবো না।

(আশরাফ আলী,
রমযানুল মুবারক, ১৩৫৭ হিজরী)

হযরত হাসান (রহঃ)-এর একটি শে'র

সুলতানুল আউলিয়া হযরত নিজামুদ্দীন (রহঃ)-এর একজন খলীফা ছিলেন হযরত হাসান (রহঃ)। যিনি প্রথম থেকেই হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহঃ)-এর পায়ে এসে পড়েন এবং আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণতা লাভ করে আধ্যাত্মিক খেলাফত লাভ করেন। তার একটি শে'র আছে। শে'রটি নিম্নরূপ—

اے حسن تو یہ آنگہے کردی! کہ ترا طاقت گنہ نماند

অর্থাত, ওহে হাসান! তুমি কি এটা কখনো অনুভব করেছো (জানতে পেরেছো) যে তোমার গুনাহ করার ক্ষমতা বাকী নেই।

অধম (মুফতী শফী সাহেব রহঃ) উপরোক্ত শে'রের সাথে মিল রেখে ঐ ওজন ও ছন্দে কয়েকটি শে'র লিখে ছিলাম (যা নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে)—

بس شمردم گناہ زید و عمر چوں زعیب خود انتباہ نماند
چوں نظر بر گناہ خود افتاد گنہ ہیچ کس گناہ نماند
بر درت آنگہے رسیدہ شفیع کہ در دیگرش پناہ نماند
عجبے تے زراہ درماندن! لیک کس چون من تباہ نماند
درچنیں جود فیض محروے ہمچوں ایں ننگ خانقاہ نماند
مددے ایک نگاہ پیر مغان غیر آں بہر بندہ راہ نماند

হযরত খাজা আযীযুল হাসান মাজযূব (রহঃ)-এর একটি শে'র

فقر میں بھی سر بستہ کبر و غرور و ناز ہوں

کس کا نیاز مند ہوں سب سے جو بےنیاز ہوں

অর্থাত, দুস্থতার মাঝেও আমি তাকাব্বুরী, অহংকার ও গৌরবের শীর্ষে অবস্থান করছি। শুধুমাত্র একজনের কাছে আমি মুখাপেক্ষী আর সকলের কাছে বেনিয়ায ও মুখাপেক্ষীহীন।

খসড়া থেকে বাছাইকৃত
মুহাম্মদ শফী
৩ মহররম, ১৩৯৩ হিজরী

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

রবিউল আউয়াল ১৩৫৮ হিজরীর মালফূযাত

১৩৫৮ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে অধম অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। সে সময় দীর্ঘদিন অসুস্থতায় ভুগলাম। তখন আমি দারুল উলূম থেকে কিছুদিনের জন্য ছুটি নিলাম। অসুস্থতার এই সুযোগটা থানাভোনে কাটানোর উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়ে হাযির হলাম। ৫ই রবিউস সানী থেকে ১৮ই জমাদাল উলা ১৩৫৮ হিজরী পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ দিন অবস্থান করে 'আশরাফুল মাজালিস' (হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)–এর উচ্চতর মজলিস) থেকে অসুস্থতা সত্ত্বেও যেসব মূল্যবান বিষয়সমূহ অর্জন করেছি তার কিছু অংশ এখানে লিখা হচ্ছে।

'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' ইসমে যাতের যিকির

কোন কোন আলেম শুধু 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' ইসমে যাতের যিকির সম্পর্কে বলে থাকেন যে, এটা হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত ও বর্ণিত নয়। আর এ কারণে কোন কোন আলেম এ যিকিরকে বিদ'আত বলেও আখ্যায়িত করেছেন।

এ ব্যাপারে হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, পবিত্র কুরআন শরীফে আছে—

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا

অর্থাত, তোমরা সকালে এবং সন্ধ্যায় নিজ প্রভুর নাম স্মরণ কর।

এখানে 'ইসম' (নাম) শব্দটিকে অনেক মুফাসসিরীনে কিরাম অতিরিক্ত বলে মত পেশ করেছেন। এবং তারা বলেছেন যে, উদ্দেশ্য হচ্ছে, তোমরা নিজ প্রভুকে স্মরণ করো। কিন্তু এ সম্ভাবনাকেও একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, ইসম শব্দটি এখানে অতিরিক্ত নয়। তখন আয়াতের মর্ম এই দাঁড়ায় যে, নিজ প্রভুর নাম স্মরণ করো (তার নামের যিকির কর।) আর একথা পরিষ্কার যে, প্রভুর নাম হলো, 'আল্লাহ্'। এর দ্বারা ইসমে যাত (আল্লাহ্, আল্লাহ্)–এর যিকির পবিত্র কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত হয়ে যায়।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

অধম (সংকলক) বলছে যে, কাযী সানাউল্লাহ পানীপতী (রহঃ)ও কিছু কিছু এমন আয়াতের ব্যাখ্যায় যেখানে 'ইসমে রব্বিকা' (তোমার প্রভুর নাম) কথাটি এসেছে সেখানে এই মর্ম উদ্দেশ্য করেই তিনি 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' ইসমে যাতের যিকিরকে পবিত্র কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত বলে বর্ণনা করেছেন। (সর্ব ব্যাপারে আল্লাহ পাকই ভাল জানেন।)

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, প্রথম আয়াত—

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلاً

এটি তাসাওউফের হক তরীকতের প্রাথমিক পর্যায়ের সাধকদের সম্পর্কে বিবৃত হয়েছে। কারণ প্রাথমিক পর্যায়ের লোকদের প্রথম কাজ হলো, নাম উচ্চারণের অভ্যাস করা। এরপর দ্বিতীয় আয়াতে যা বলা হয়েছে তাহলো—

وَ تَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلاً

অর্থাত, আল্লাহ পাকের দিকে পরিপূর্ণভাবে ঝুঁকে পড় (তার সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন কর)।

এটা তরীকতের লাইনের চূড়ান্ত পর্যায়ের সাধকদের জন্য বলা হয়েছে এবং এটাই হবে তাদের অবস্থা। কেননা এ তরীকতের সূচনা হয় অধিক পরিমাণে আল্লাহ্ পাকের যিকির করার মাধ্যমে। আর এর শেষ হলো, সমস্ত মাখলূক ও সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু মাত্র আল্লাহ্ পাকের জন্য হয়ে থাকা।

নিজের বিনয় ও মুরীদের মঙ্গল

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, একবার এক লোক হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)-এর মজলিসে এসে তার ফয়েয-বরকত যা সর্বদা তার কাছে দৃশ্যমান হচ্ছিলো, তা বর্ণনা করলো। তখন হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) বললেন, আমার মধ্যে আর কি আছে। সবই তোমাদের মাঝে নিহিত আছে। আমার মাধ্যমে শুধু তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে।

অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, তোমরা কখনো এমন মনে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

করো না। সুবহানাল্লাহ! এটাই হলো 'তারবীয়্যত' বা রুহানী প্রশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য। নিজের বিনয় ও নম্রতা এবং মুরীদের মঙ্গল উভয়টিকেই এখানে একত্রে জমা করা হলো।

উম্মতের লাভ ও ক্ষতি

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, সুফিয়ায়ে কিরামের দ্বারা উম্মতের এত বেশী লাভ হয়েছে যা অন্য কারো মাধ্যমে হয়নি। পক্ষান্তরে তাসাওউফের দাবীদার গোমরাহ ও ভণ্ডদের দ্বারা উম্মতের ক্ষতিও এত বেশী হয়েছে, যতটা ক্ষতি কোন কাফেরের দ্বারাও হয়নি।

হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন যে, মাযাহেরে হক–এর লেখক নবাব কুতুবুদ্দীন (রহঃ) খুব সম্ভব হযরত ইমাম মালেক (রহঃ)–এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন—

من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق و من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق و من جمع بينهما فقد تحقق

অর্থাত, যে ব্যক্তি ফকীহ হলো, কিন্তু (তাসাওউফ অর্জন করে) সূফী হলো না সে শুকনা, কোন উন্নত অবস্থা বা কোন নূর তার মধ্যে থাকে না। আর যে ব্যক্তি সূফী হয়ে গেলো কিন্তু ফকীহ হলো না সে যিন্দিক এবং নাস্তিক হয়ে গেলো। আর যে ব্যক্তি এ দুটিকে একত্রিত করলো (অর্থাত উভয়টি অর্জন করলো) সে একজন মুহাক্কিক ব্যক্তি হিসাবে গড়ে উঠলো।

শাইখ ইরাকী (রহঃ) ও আল্লামা শামস তাবরীয (রহঃ)

শাইখ ইরাকী (রহঃ) এবং আল্লামা শামস তাবরীয (রহঃ) এই উভয় বুযুর্গ সুফিয়ায়ে কিরামের মাঝে খুব খ্যাতি সম্পন্ন ও প্রসিদ্ধ। বড় কামাল ও বুযুর্গীর অধিকারী ব্যক্তিত্ব। তারা দু'জন অপর এক বুযুর্গের কাছ থেকে বাতেনী ফায়েয হাসিল করার জন্য তার খিদমতে যাতায়াত করতেন। শাইখ ইরাকী একদিকে যেমন ছিলেন বহুত বড় আলেম। অপরদিকে তিনি একজন উচ্চাঙ্গের শায়ের ও কবি ছিলেন। তিনি নিজের অবস্থা কবিতা আকারে লিখে নিজের শাইখের খেদমতে পেশ করতেন। আল্লামা শামস তাবরীয (রহঃ) লেখাপড়ায় খুব অভ্যস্ত ছিলেন না। সহজ সরল

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

স্বাভাবিক ভাষায় নিজের অবস্থা লিখতেন এবং শাইখের খেদমতে পেশ করতেন।

একদিন শাইখ—আল্লামা তাবরীয (রহঃ)কে বললেন, আপনি ইরাকীর মত আপনার অবস্থা কাব্যাকারে এবং সাহিত্যপূর্ণ ভাষায় কেন লিখেন না? হযরত শামস তাবরীয (রহঃ) এ কথায় খুব মর্মাহত হয়ে আরয করলেন, আমার মাঝে সে যোগ্যতা নেই। শাইখ তখন তার জবাবে বললেন, কোন চিন্তা করবেন না। আল্লাহ পাক আপনাকে এমন একটি ভাষা দিবেন যার মাধ্যমে আপনার ইলম ও ফায়েয সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে।

সে বুযুর্গের ভবিষ্যদ্বাণী মাওলানা রুমীর সুরত ধরে বাস্তবায়িত হয়েছে। মাওলানা রুমী (রহঃ) হযরত শামস তাবরীয (রহঃ)–এর হাতে মুরীদ হলেন। এবং তার কাছ থেকে বাতেনী ফায়েয হাসিল করলেন। এরপর তিনি নিজের লিখা মসনভী'র মাধ্যমে তা বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহ সেটাকে এমনভাবেই কবুল করলেন যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সারা দুনিয়ার প্রতিটি অঞ্চলে আজো তা পঠিত হয়ে থাকে। তার মধ্যকার গদ্য ও পদ্য বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

বাস্তব কথা এটাই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের জন্য হয়ে যায়, তার মাঝে যেসব সল্পতা এবং অভাব থাকে তাকে আল্লাহ তাআলা বিভিন্নভাবে পূর্ণ করে দেন। শামস তাবরীয (রহঃ)–এর মত একজন ভাষাহীন বুযুর্গকে আল্লাহ পাক এমন ভাষাই দান করলেন, যার দ্বারা ধারণা ও যুক্তির বাইরে তার থেকে অনেক বেশী ফায়েয ও বরকত আল্লাহ পাক দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিলেন।

হযরত থানবী (রহঃ) এ ঘটনা বর্ণনা করার পর ইরশাদ করেন যে, আমাদের হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) ইলমের ক্ষেত্রে খুব প্রসিদ্ধ এবং লেখার যোগ্যতা সম্পন্ন ছিলেন না। কিন্তু মহান আল্লাহ তার ইখলাস ও ইবাদতের বরকতে হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ) এবং ফকীহুল আছর (যুগের ফকীহ) হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ)দ্বয়কে তাঁর যবান বানিয়ে দিয়েছেন। তাদের মাধ্যমে ইলম ও মা'রিফাতের অসংখ্য প্রস্রবণ দুনিয়াতে প্রবাহিত হয়েছে এবং তার ফায়েয ও বরকত দুনিয়ার আনাচে কানাচে পৌছে গেছে।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সংকলক বলতে চায় যে, এছাড়া স্বয়ং আমাদের সরদার হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ)-এর দ্বীনী এবং তাবলীগী ও তাসনীফী (লিখার মাধ্যমে) খিদমত এত অধিক যে, শেষ যমানায় তার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। হযরত থানবী (রহঃ) বলতেন যে, এ সবই হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)-এর বরকতে লাভ হয়েছে।

হরফ ও কালেমার আদব

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহঃ) একবার বাথরুমে প্রবেশ করলেন। অতঃপর সাথে সাথেই অস্থির হয়ে ফিরে এলেন এবং কলমের মাথা দিয়ে নখের উপর দেয়া একটা নোকতা ছিলো সেটাকে ধুয়ে এরপর পুনরায় বাথরুমে প্রবেশ করলেন। এই ছিলো ঐ সকল বুযুর্গানে দ্বীনের আদব, যার বরকতে মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের সুউচ্চ মর্যাদা দান করেছিলেন। বর্তমানে তো বিভিন্ন বইপত্র ও সংবাদপত্রের প্রচুর পৃষ্ঠা ও টুকরা যার মধ্যে পবিত্র কুরআনের আয়াত, বিভিন্ন হাদীস এবং আল্লাহ পাকের নাম থাকা সত্ত্বেও রাস্তা-ঘাটে, ওলি-গলিতে এবং বিভিন্ন ময়লা আবর্জনার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। নাউযুবিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।

মনে হয় বর্তমান বিশ্বের লোকেরা যে বিশাল অস্থিরতায় নিমজ্জিত আছে পবিত্র কুরআন, হাদীস ও আল্লাহ পাকের নামের সাথে এই বেয়াদবী তার বিশেষ ও অন্যতম কারণ।

মোল্লা দো পেয়াযে

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, মোল্লা দোপেয়াযা হযরত শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ)-এর সাগরেদ এবং বুঝা যায় যে, তিনি একজন বুযুর্গও বটে। বড় বড় লোক এবং বাদশাদের মাঝে দ্বীনী তাবলীগ করার জন্য তিনি এমন বেশ-ভুষা ও সুরত অবলম্বন করে থাকতেন, যা লোকদের জন্য ঠাট্টা ও হাসির খোরাক হতো, যে পোশাক সাধারণতঃ কৌতুকী এবং ভাড় লোকেরা অবলম্বন করতো। এছাড়া আরো অনেক বুযুর্গই এমন করেছেন।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

পোশাক ভাল হওয়া কোন দোষ নয়

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি আমার এখানে এসেছিলো, সে আমার মধ্যে দুটি দোষের কথা প্রকাশ করেছে। কিন্তু আমার প্রকৃত দোষের খবর তো তার জানা ছিলো না। সে যে দুটি দোষের কথা বলেছে তাহলো—১. খুব ভাল পোশাক ব্যবহার। ২. লতীফাসমূহের মশক না করানো।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আমি বলি প্রথমতঃ ভাল পোশাক হওয়া তো কোন দোষের কথা নয়। যদি আল্লাহ তা'আলা কাউকে সম্পদ দান করেন আর সে যদি ভাল কাপড় পরিধান করে তবে তাতে ক্ষতির কি আছে। দ্বিতীয়তঃ আমি নিজে তো ভাল পোষাকের ব্যাপারে কখনোই খুব যত্নবান নই। আমার স্মরণ নেই যে, আমি কখনো উন্নতমানের চিকেন (একপ্রকার ফুলতোলা কাপড়) কাপড় খরিদ করে জামা পরেছি কিনা। বরং যখন নিজে জামা কাপড় বানাই তখন সাদা 'মলমল' ধরনের কাপড় দিয়েই বানাই। আমার মনে তো চাইতো মোটা খদ্দর ব্যবহার করবো কিন্তু একবার খদ্দরের জামা বানিয়ে পরার কারণে আমার সারা গায়ে মরিচের ন্যায় জ্বলতে আরম্ভ করলো। তখন আমি বুঝলাম এ ধরনের পোশাক ব্যবহারের শক্তি আমার মধ্যে নেই।

হাঁ তবে অন্যরা যেসব পোশাক আমার জন্য তৈরী করে পাঠায়, সেক্ষেত্রে বানানোর পূর্বে যদি আমার সাথে পরামর্শ করে তবে আমি লৌকিকতাপূর্ণ কাপড় বানাতে নিষেধ করে দেই। কিন্তু যদি আমার সাথে আলোচনা না করেই বানিয়ে নিয়ে আসে, তবে দেখি সেটা কেমন। যদি আমার অবস্থান থেকেও অনেক বেশী উন্নত হয়, তবে আমি তা পরিধান করি না। কিন্তু যদি স্বাভাবিক ধরনের উন্নত কাপড় হয় তবে তা পরিধান করি।

বুযুর্গানে দ্বীনের মাঝে মর্যাদার পার্থক্য নিরূপণ

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, অনেকে বুযুর্গানে দ্বীনের পরস্পরের মধ্যে কে বড় কে ছোট, কার মর্যাদা বেশী, কার কম এ নিয়ে আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে নিজের খেয়াল দ্বারা ঐ বুযুর্গানে দ্বীনের মর্যাদার পার্থক্য অনুধাবন করতে পারা অত্যন্ত কঠিন বিষয়। বরং এর জন্য সঠিক পদ্ধতি হলো, ঐ বুযুর্গগণের

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সমসাময়িক ও সমবয়স্ক আলেম ও বিচক্ষণ বুযুর্গানে দ্বীনের আচরণ লক্ষ্য করতে হবে যে তারা এসব বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে কিরূপ আচরণ করেন। তারা যাকে উত্তম বা মর্যাদাবান মনে করেন, তিনিই উত্তম ও অধিক মর্যাদাবান হবেন। আর তারা যাকে তুলনামূলক কম মর্যাদার অধিকারী মনে করেন তিনি কিছুটা কম মর্যাদাশীল বলে বুঝাতে হবে। এ ভিত্তিতেই একবার হযরত মাওলানা শাহ আবদুল আযীয (রহঃ) এবং শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর মাঝে কে বেশী মর্যাদার অধিকারী, এ ব্যাপারে আলাপ আলোচনার সময় আমাদের পূর্বসূরী বুযুর্গগণের কেউ কেউ বললেন, আমরা বুযুর্গানে দ্বীনকে দেখেছি যে, তারা হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর তুলনায় শাহ আবদুল আযীয (রহঃ)কে বেশী আযমত ও সম্মান করতেন।

একটি শে'র এর জবাব

একবার এক ব্যক্তি নিজের চিঠিতে হযরত থানবী (রহঃ)-এর খিদমতে বেশ কিছু ফরমায়েশের কথা লিখলো এবং সে সাথে নিম্নোক্ত শে'রটিও লিখলো—

عاشق کے دل کو توڑو لیکن ذرا سنبھل کر   لاتقنطوا کو دیکھو یہ کس کی گفتگو ہے

অর্থাত, আশেকের দিল ভেঙ্গে দিলে একটু বুঝে শুনে ভাংগবে। আর পবিত্র কুরআনের কথা 'তোমরা নিরাশ হয়ো না' এর প্রতি তাকিয়ে দেখ এটা কার কথা।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) স্বাভাবিকভাবেই তার জবাবে নিম্নের শে'রটি লিখে দিলেন—

عاجز کے دل کو توڑو لیکن ذرا سنبھل کر   لاتظلموا کو دیکھو یہ کس کی گفتگو ہے

অর্থাত, কোন নম্র ও বিনয়ী লোকের মনকে ভেঙ্গে দিলে একটু ভেবে চিন্তে (ধীরেস্থিরে) ভেঙ্গো। আর পবিত্র কুরআনের আয়াত 'তোমরা যুলুম করো না' এর দিকে নযর করো এটা কার কথা।

এর সাথে হযরত থানবী (রহঃ) এ কথাও লিখলেন যে, আমি আপনার ঐসব ফরমায়েশ পূর্ণ করতে সক্ষম নই। আর অক্ষম ব্যক্তিকে বাধ্য করা যুলুম।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হযরত থানবী (রহঃ) একদিকে যেমন শে'র কবিতাকে পসন্দ করতেন না, তেমনি তিনি নিজেও এর মধ্যে লিপ্ত হতেন না। কিন্তু সৃষ্টিগত মেধা ও সুস্থ বিবেক হেতু মানসিক ভগ্নতা ও চোটের থেকে যখন কখনো কোন শে'র বলতেন, তখন তা খুব বুদ্ধিবৃত্তিক ও গাম্ভীর্যপূর্ণ হতো।

একবার হযরত থানবী (রহঃ) তাঁর একটি শে'র যা হক তাসাওউফ ও তরীকত সংক্রান্ত ব্যাপারে হযরত নিজেই রচনা করেন, আমাদের শোনালেন শেরটি হলো—

اندریں رہ آنچہ می آید بدست حیرت اندر حیرت اندر حیرت است

অর্থাত, এই (তরীকতের) পথে যা কিছুই হাতে আসে তা কেবল অস্থিরতার মাঝে অস্থিরতা আর শুধুই অস্থিরতা।

এই সূক্ষ্ম সাধ ও আগ্রহের একটা আশ্চর্য ঘটনা আছে। ঘটনাটি হলো, হযরত গাংগুহী (রহঃ)–এর মুরীদদের মধ্যে খোরজা এলাকার এক মুরীদ ছিলো যার নাম ছিলো মুহাম্মদ ইউসুফ। সে সর্বদা যিকির–শোগলে লিপ্ত থাকতো ঠিক এবং কিছুটা উন্নত হালতের অধিকারীও ছিলো, তবে লোকটি ছিলো একটু মাজযূব ও দেওয়ানা প্রকৃতির।

একবার সে থানাভোন এলো। সেখান থেকে আবার জালালাবাদ গেলো। যেখানে আমাদের শাইখুল মাশাইখ হযরত মিয়াজী নূর মুহাম্মদ সাহেব (রহঃ)–এর কিয়ামগাহ ছিলো। তিনি সেখানে অবস্থান করতেন। অনেক দিন হয়ে গেছে তিনি ইন্তিকাল করেছেন। মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব সেখানে গিয়ে এ বিষয়টির ব্যাপারে খোঁজখবর নিলেন যে, হযরত মিয়াজী সাহেব (রহঃ)কে দেখেছে এমন কেউ এখনো বাকী আছে কিনা। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে, এক হিন্দু বৃদ্ধ ব্যবসায়ী এখনো সেখানে আছে যে হযরত মিয়াজী (রহঃ)কে দেখেছে। মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব তার কাছে গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনি কি হযরত মিয়াজী সাহেব (রহঃ)কে দেখেছেন। সে লোকটি জবাব দিলো হাঁ শুধু যে দেখেছি তাই নয়, আমি তার মক্তবে পড়াশুনাও করেছি। তখন মুহাম্মদ ইউসুফ খোরজুয়ী বললেন, যখন আপনি তার কাছে পড়েছেন তখন হয়তো কখনো তিনি আপনাকে মেরেও থাকবেন। লোকটি বললো হাঁ কয়েকবার মেরেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কোন জায়গায় মেরেছিলেন? লোকটি তার গ্রীবাদেশের দিকে দেখিয়ে বললো, এখানে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

মেরেছেন।

ইউসুফ সাহেব আশিক লোক এবং বুযুর্গানে দ্বীনের মহব্বতে কাতর ছিলেন, তিনি লোকটির গ্রীবাদেশে চুমু খেতে লাগলেন। হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)কে লোকেরা যখন এই ঘটনা শুনালো তখন তিনি তাৎক্ষণিক নিম্নোক্ত শেরটি পাঠ করলেন—

عشق را نازم کہ یوسف را بازار آورد   ہمچوں صنعا زاہدے را زیر زنار آورد

অর্থাত, ইশককে আমি মুবারকবাদ জানাই যেহেতু সে ইউসুফ (আঃ)এর মত মানুষকেও বাজারে নিয়ে আসতে পারে যেমন সে একজন দুনিয়াত্যাগী যাহেদকে হিন্দুর পৈতার নিচে আনতে পারে।

এই শেরটি অনেক পূর্বের কোন বুযুর্গের রচিত কিন্তু শেরটির আসল উদ্দেশ্যের চাইতেও বেশী সামঞ্জস্যতা সৃষ্টি হয়ে গেছে এই ঘটনাটির সাথে।

মাঝে মাঝে মুরীদ থেকে শাইখের এবং সাগরেদ থেকে উস্তাদের ফায়েয লাভ হয়

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, আমার এক সময়ের অভিজ্ঞতা হলো, কিতাব পড়ানোর সময় যখন মুতালা'আ (দরস দানের পূর্বে নিজে পাঠ) করলাম তখন কয়েকটি স্থানে প্রশ্ন সৃষ্টি হলো। তার কোন জবাব বুঝে আসলো না। যখন তা পড়ানোর জন্য বসেছি সব বুঝে এসে গেছে। এটা নিঃসন্দেহে ছাত্রদের বরকত ছিলো। অনুরূপভাবে কোন কোন সময় কোন মুখলিস ও নিষ্ঠাবান মুরীদের বরকতে মহান আল্লাহ শাইখের সামনে মুশকিল স্থানগুলো সহজ করে দেন। এজন্য কোন শাইখ ও মুসলেহ (পীর)–এর এ বলে গর্ব করা উচিত নয় যে, আমি লোকদের ফায়দা পৌছিয়ে থাকি।

বাস্তব কথা হলো, মহান আল্লাহ যার প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং যার দ্বারা মানুষের ইসলাহ বা শুদ্ধির কাজ নেন, তার সে খিদমতের বরকতেই তাকে ইলম ও মারিফাত এবং উচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়ে থাকে। যদি সে সেই খিদমতকে ছেড়ে দেয়, তবে সে সর্বপ্রকার উচ্চস্তর ও উন্নত মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। যে কূপ থেকে পানি উত্তোলনকারীদের সংখ্যা কমে যায় কিংবা মোটেই কোন পানি উত্তোলনকারী থাকে না। সে কূপের পানির স্রোতধারাও বন্ধ হয়ে যায়।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন যে, শাইখ হলেন 'মুসেল' অর্থাত যিনি পৌছে দেন। মহান আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে দেয়ার পর তিনিও পৃথক হয়ে যান। ব্যাস, তখন শুধু থাকে মুরীদ আর থাকেন মহান প্রভু আল্লাহ। তার দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন পরিচারিকা ও দুলহান। দুলহান বা নববধূকে সাজিয়ে পরিচারিকা দুলার নির্জন কক্ষে পৌছে দিয়ে সে বিদায় হয়ে যায়। মাওলানা রুমী (রহঃ) বলেন—

جلوہ بیند شاہ و غیر شاہ نیز　　　وقت خلوت نیست جز شاہ عزیز

অর্থাত, লোক সমাগমে বাদশাহকে যেমন দেখা যায় সাথে দেখা যায় বাদশাহ ছাড়া আরো অনেককে। কিন্তু বাদশাহর খাস কক্ষে থাকেন শুধু বাদশাহ আর থাকে তার প্রিয়জন। (সেখানে অন্য কারো স্থান হয় না।)

কিন্তু এর পরেও একথা থেকে যায় যে, যদি কেউ শাইখের বিরোধিতা করে তবে তার সকল অর্জিত মাকাম ও মর্যাদা নিঃশেষিত হয়ে যায়। কারণ এমনটি করা হচ্ছে নাশুকরী।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) থেকে শোনা মুহ্তারাম পিতার একটি ঘটনা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ)-এর নিজ উস্তাদগণের মাঝে সবচাইতে বেশী গভীর সম্পর্ক ছিলো হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)-এর সাথে। আর আমার সম্মানিত পিতা মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসীন সাহেব (রহঃ) হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)-এর পড়ার সাথী এবং হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)-এর সাগরেদ ছিলেন। এবং অন্যান্য সাগরেদদের তুলনায় একটু বেশী ঘনিষ্ঠ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিলেন। আমার সে মুহতারাম পিতা তার নিজের একটি ঘটনা শুনিয়েছিলেন। যে ঘটনাটি হযরত থানবী (রহঃ)ও বারবার নিজ আলোচনার মজলিসে বর্ণনা করেছেন।

ঘটনাটি হলো, একবার হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আলাপ আলোচনায় লিপ্ত থাকেন। সে সময় মুহতারাম আব্বাজান অতীত বুযুর্গানে দ্বীনের জীবন নিয়ে পড়াশুনা করতেন। একথা সকলের মাঝেই প্রসিদ্ধ ছিলো যে, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) অত্যন্ত জালালী ও গরম মানসিকতার

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

বুযুর্গ ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি আব্বা মুহতারামকে বিশেষ স্নেহ ও মমতা প্রদর্শন করতেন বিধায় তিনি স্বাভাবিকভাবেই হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)–এর কাছে একটি প্রশ্ন করে বসলেন। প্রশ্ন হলো, পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীনের মাঝে এ বিষয়টির খুবই গুরুত্ব ছিলো যে, কথা যাতে কম বলা হয়। তারা বেশী কথা বলতে বারণ করতেন। এর সীমা কতটুকু এবং মর্মই বা কি?

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) অত্যন্ত স্নেহ ও মায়ার সাথে বললেন, আসল উদ্দেশ্য তো নাজায়েয কথা থেকে বেঁচে থাকা। কিন্তু কোন কোন সময় নাজায়েয থেকে বেঁচে থাকার জন্য চিকিৎসা স্বরূপ জায়েয এবং মোবাহ কথাকেও পরিত্যাগ করতে হয়। কারণ এমনটি করা না হলে নিজ প্রবৃত্তি শুধুমাত্র জায়েয কথার উপর ক্ষ্যান্ত হবে না। বরং ধীরে ধীরে হারাম ও নাজায়েয–এর মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়বে। এ সময় আমার মুহতারম আব্বাজান তার হাতে একটা কিতাব রেখেছিলেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব (রহঃ) সে কিতাবটি নিজ হাতে নিয়ে তার একটি পাতা ভাঁজ করে (মুড়িয়ে) পুনরায় কিতাবটি মুহতারাম আব্বাজানকে দিয়ে বললেন 'এই মোড়ানো পাতাটা সোজা কর'। আমার আব্বা সেটা সোজা করে দিলেন। কিন্তু সে পৃষ্ঠাটি সোজা হয়ে না থেকে আবার মুড়িয়ে গেলো। বারবার এভাবে সোজা করার পরও সে পাতাটা সোজা হলো না, বরং মুড়িয়েই থাকলো। এবার হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব পুনরায় কিতাবটি তার হাতে নিয়ে ঐ মোড়ানো পাতাটিকে উল্টা দিকে মুড়িয়ে দিলেন এবং পুনরায় আমার আব্বা মুহতারামের হাতে দিয়ে বললেন, এবার সোজা কর। আমার আব্বা সেটাকে সোজা করলেন। এবার সহজেই পাতাটি সোজা হয়ে গেলো। এবং সোজা হয়েই থাকলো (মুড়িয়ে গেলো না)। এই বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখানোর পর তিনি বললেন, সুফিয়ায়ে কিরাম যেসব সাধনা মুজাহাদা করিয়ে থাকেন তার দৃষ্টান্ত এরূপই যে, আসল উদ্দেশ্য তো হয় স্বাভাবিক মধ্যম পন্থায় স্থিতিশীল থাকা। কিন্তু বাঁকা হয়ে যাওয়া প্রবৃত্তি ঐসময় পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে একেবারে উল্টো দিকে মুড়িয়ে দেয়া না হয়। অর্থাত অনেক মুবাহ ও জায়েয কাজও তার জন্য নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়, তখন সেটা স্বাভাবিক (মধ্যম) অবস্থায় ফিরে আসে। অর্থাত নাজায়েয থেকে বেঁচে থাকতে শুরু করে।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

মুজাহাদাসমূহ মূলতঃ কোন উদ্দেশ্য হয় না। বরং এগুলো হয় ঔষধ। যে ব্যক্তি এই হাকীকতকে চিন্তা করে না সে সুফিয়ায়ে কিরামের প্রতি বিভিন্ন প্রশ্ন করতে শুরু করে যে, হালাল বিষয় থেকেও কেন বারণ করা হয়। অথচ তার এই বারণ করা তো এরূপ যেমন কোন চিকিৎসক হাকীম নিজের রুগীকে কোন পাক–পবিত্র হালাল ও উত্তম জিনিস খেতে নিষেধ করেন এজন্য যেহেতু সে জিনিসগুলো তার মানসিকতার মাঝে অসুস্থতা সৃষ্টি করে দিবে (বা অসুস্থতা বাড়িয়ে দিবে) এর অর্থ কোনদিনও এই নয় যে, ঐ হাকীম আল্লাহ পাকের হালাল করা জিনিসকে হারাম করে দিলেন।

একটি আয়াতের তাফসীর

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) থেকে একটি আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করে হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, হযরত নূহ (আঃ)–এর ঘটনার মধ্যে পবিত্র কুরআনে যে আয়াত বর্ণিত হয়েছে—আয়াতটি হলো—

لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ

এ আয়াতের তাফসীরে অধিকাংশ মুফাসসিরীন বলেছেন, এখানে 'আসেম' শব্দ দ্বারা 'মাসুম' (অর্থাৎ মুক্তি ও নাজাতপ্রাপ্ত) উদ্দেশ্য। হযরত (রহঃ) বলেন, এ তাফসীরের মাঝে কিছুটা 'তাকাললুফ' তথা লৌকিকতা আছে। আর সর্বরকম লৌকিকতামুক্ত তাফসীর হলো, এখানের মূলতঃ দুটি বাক্য ছিলো, একটি হলো—

لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ إِلَّا اللّٰهَ

অর্থাত, আজ আল্লাহ ছাড়া আর কোন রক্ষাকারী নেই।

আর অপর বাক্য হলো—

لَا مَعْصُوْمَ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ

অর্থাত, আজ কেউই মুক্তি লাভকারী বা নাজাতপ্রাপ্ত হবে না সেই ব্যক্তি ছাড়া যার প্রতি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ করা হয়।

এ দুটি বাক্যের মর্মকেই একত্রে মিলিয়ে এক বাক্যে আদায় করা

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হয়েছে এভাবে—

لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ

মাওলানা জামী (রহঃ)-এর একটি শে'র

হযরত মাওলানা জামী (রহঃ) মাওলানা রুমী (রহঃ)-এর মসনবী সম্পর্কে বলেছেন—

مثنوی مولوی معنوی   ہست قرآن درزبان پہلوی

অর্থাত, (বাহ্যিকভাবে এর অর্থ হয়) মসনবী নিজেই যেন মর্মের দিক থেকে এক গোপন মৌলভী, এ যেন নিজ ভাষায় (ফার্সী ভাষায়) এক কুরআন শরীফ।

উক্ত শে'রের শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া হলে তা যে শুদ্ধ নয় তা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়। আর এখানে শায়ের বা কবিসুলভ অতিরঞ্জন হিসেবে ধরা হলে তাও পবিত্র কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে মাওলানা জামী (রহঃ)-এর ক্ষেত্রে এরূপ অতিরঞ্জন অসম্ভব ও অকল্পনীয়। (সুতরাং শে'রটি সঠিক অর্থ ও মর্ম কিভাবে উদ্ধার করা যায়) এ বিষয়ে হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আমাদের হাজী সাহেব (রহঃ) উক্ত শে'রের ব্যাখ্যা এভাবে করতেন যে, এখানে 'কুরআন' শব্দ দ্বারা প্রসিদ্ধ কুরআন উদ্দেশ্য নয়। বরং কুরআন শব্দের অর্থ এখানে কালামে ইলাহী বা আল্লাহ পাকের কালাম। যা আল্লাহ পাকের সকল প্রকার কথাকেই শামিল করে। যা ওহী হিসেবে 'মাতলু' বা পঠিত হয়েছে (যেমন পবিত্র কুরআন শরীফ) তাও শামিল এবং যা ওহী হিসেবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে অবতীর্ণ হয়নি (যেমন হাদীস) তাও শামিল। এ ব্যাখ্যা নেয়া হলে আর কোন প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকে না। কেননা মসনবীর বিষয়বস্তু পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফের বাইরে কিছু নয়।

ভূত-প্রেতের প্রতিক্রিয়া দূর করার জন্য জীন হাযির করা

একবার এক ব্যক্তি চিঠির মাধ্যমে হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ)-এর কাছে প্রশ্ন করলো, ভূত-প্রেতের চিকিৎসা করার জন্য কিছু কিছু লোক জীন হাযির করার আমল করে থাকে। তার মধ্যে শরীয়ত

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

বিরোধী কিছু কাজও করা হয়ে থাকে। এটাকে যদি ঔষধ বা চিকিৎসা হিসেবে করা হয় তবে তাতে অপরাধের কি আছে। কারণ ফকীহগণের মতে তো ঔষধ হিসেবে চিকিৎসার স্বার্থে কিছু কিছু হারাম বস্তুর ব্যবহার ও জায়েয হিসেবে ফাতাওয়া বর্ণিত আছে।

হযরত থানবী (রহঃ) এর জবাবে লিখলেন, ঐ সকল লোক যারা এ কথা বলে যে, ঐ ব্যবস্থা দ্বারা ভূত–প্রেতের আছর বা প্রতিক্রিয়া দূর হয়ে যায়, বিশেষজ্ঞ ও মুহাক্কিক ব্যক্তিবর্গের মতে এটা বিলকুল গলত এবং ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়।

অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বললেন যে, আমার নিজের এ ব্যাপারে খুব তাহকীক ও অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, এটা শুধুমাত্র একটা খেয়াল বা ধ্যানের ফলাফল মাত্র। যদি মজলিসে কোন ব্যক্তি তার ব্যতিক্রম চিন্তা ও ধ্যান করে বসে থাকে, তবে আর কিছুই দেখা যায় না। (অর্থাত জীন ভূত কিছুই হাযির হয় না।) এরপর হযরত থানবী (রহঃ) বেশ কয়েকটি ঘটনাও বর্ণনা করেন। যার দ্বারা এই জীন হাযির করার আমল ম্যাসম্যারিজম (ভেল্কীবাজী)–এর একটি প্রকার হওয়ার বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝে আসে। (৭ রবিউস সানী, ১৩৫৮ হিজরী, বাদ যোহর)

দুনিয়ার কারো সাথে সম্পর্কের উপর ভরসা করা বোকামী

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, দুনিয়ায় এমনভাবে থাকা উচিত যেন তার কেউ নাই সে একেবারে একা। অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, এ অবস্থা তো আমার নসীব হয়নি, তবে আকাংখা তো অবশ্যই আছে। এরপর হযরত (রহঃ) নিম্নোক্ত শে'রটি পাঠ করেন—

زیر بارند درختاں کہ ثمرہا دارند　　اے خوشا سرو کہ از بند غم آزاد آمد

অর্থাত, যে গাছে ফল আছে, ফলের ভারে সে নুয়ে থাকে পক্ষান্তরে ফলহীন গাছ ফলের বোঝা তার নেই তাই সে অহংকার ভরে উঁচু হয়ে দাঁড়ায়। (বুঝানো হচ্ছে, যার মাঝে গুণ আছে তার স্বভাব হয় বিনয়ী। পক্ষান্তরে গুণহীন ব্যক্তি হয় অহংকারী।) (৮ রবিউস সানী ৫৮ হিজরী)

অধম সংকলক (মুফতী শফী সাহেব) বলতে চায়, এর কিছুদিন পর হযরত থানবী (রহঃ) একবার একা একা অধমকে বলেছেন যে, আলহামদুলিল্লাহ আমি আমাকে একা ভাবতে পারি। সকল সম্পর্ক ও

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সংশ্লিষ্টতা সকলের সাথে আছে এবং সকলের হকও আদায় করে থাকি। এর পরেও আমি নিজেকে নিজে সকল সম্পর্কমুক্ত করে একা ভাবতে পারি এবং মনে করতে পারি যে আমার দুনিয়ায় আর কেউ নাই।

می دہد یزدان مراد متقین   تو چناں خواہی خدا خواہد چنیں

অর্থাত, আল্লাহভীরু, মুত্তাকী লোকদের মনোবাঞ্ছা আল্লাহ পাক পূর্ণ করে থাকেন। (ওহে মুত্তাকী !) তুমি যেমনটি কামনা কর আল্লাহ পাকও (তা পূরণের জন্য) তেমনটিই কামনা করেন।

উলামাগণের মতপার্থক্যের মুহূর্তে হযরত থানবী (রহঃ)-এর স্থিতিশীলতা

আহমদ হাসানের ঘটনা ঃ হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ)-এর খিদমতে একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত একজন আলেম থাকতেন। ভাল আলেম হওয়ার কারণে হযরত থানবী (রহঃ) একটি কিতাব লিখার জন্যও তাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। যেজন্য তাকে মাসিক ওযীফাও দিতেন। ঐ মৌলভী সাহেব (রহঃ) শুকনো ধরনের কিতাবী তাকওয়ার খুব আশেক ছিলেন। সে হযরত (রহঃ)-এর উপর এ ধরনের মন্তব্যের দুঃসাহসও দেখাতো যে, তার মধ্যে তাকওয়া নেই। হযরত থানবী (রহঃ) যখন তার একথা শুনতেন তখন তিনি বলতেন, সে তো ঠিকই বলেছে। আমি আবার কোন জায়গার মুত্তাকী? এ কথার কারণে ঐ ব্যক্তির প্রতি আমার কোনই অসন্তুষ্টি আসে না।

ঘটনাক্রমে সে সময়েই খেলাফত আন্দোলন শুরু হলো। যে আন্দোলনে কংগ্রেসের হিন্দুরাও অংশগ্রহণ করলো। হিন্দু মুসলিম ঐক্যের ভিত্তিতে সূচিত হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা আন্দোলন শেষ পর্যন্ত এই খেলাফত আন্দোলন-এর জায়গা নিয়ে নিলো। হিন্দু মুসলিম সমন্বিত এই পদ্ধতির ফলে কোন কোন স্থানে শরীয়ত পরিপন্থী কর্মকাণ্ডও প্রচলিত হয়ে গেলো। কোন কোন বিশিষ্ট আলেম আসল উদ্দেশ্য অর্থাত হিন্দুস্থান থেকে ইংরেজ বিতাড়িত করে হিন্দুস্থানকে স্বাধীন করার বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ ভেবে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের এ বিষয়টি সমর্থন করলেন। এবং ঐক্যবদ্ধ পদ্ধতির কারণে যেখানে শরীয়ত পরিপন্থী কাজ হতে দেখতেন তারা সেখানে বাধাও প্রদান করতেন। কিন্তু আন্দোলন তখন সাধারণ জনতার

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

আন্দোলনে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো এবং ইসলাম ও উলামায়ে কিরামের ধ্যান ধারণা ও চিন্তা ভাবনার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া নিতান্তই সীমিত পরিসরে আবদ্ধ হয়ে গেলো। ফলে সাধারণ মুসলমানগণ ভুল পথে গিয়ে ইসলাম ও কুফরের পার্থক্য হারিয়ে ফেলতে বসেছিলো।

হযরত থানবী (রহঃ) এভাবে হিন্দু-মুসলিম একত্রিত হওয়ার বিষয়টিকে শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয যেমন মনে করতেন না তেমনি এ অবস্থাটাকে তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কোন সুফল বয়ে আনতে পারে বলেও মনে করতেন না। (পরবর্তী ঘটনাবলী এর সত্যতাকেই প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছে।) কিন্তু যেসব আলেম এটাকে জায়েয বলে মনে করেছিলেন তাদের প্রতি হযরত থানবী (রহঃ)-এর সম্মান ও আদব সর্বদাই যথাযথ ছিলো এবং যারা তাদের মতের উপর কাজ করেছে তাদের সাথেও হযরত থানবী (রহঃ)-এর আচরণ অনুরূপই ছিলো যা ইজতিহাদী মাসাইলসমূহের ইখতিলাফের ক্ষেত্রে থাকা উচিত।

হযরত থানবী (রহঃ)-এর দরবারের সেই মৌলভী সাহেব উপরোক্ত ব্যাপারেও হযরত থানবী (রহঃ)-এর মতের বিরুদ্ধে কংগ্রেসী উলামায়ে কিরামের সাথে একমত ছিলেন। এ পর্যন্ত হযরত থানবী (রহঃ)-এর তার প্রতি কোন অনীহা বা অপসন্দতা ছিলো না। কিন্তু সে আরো ঔদ্ধত্য দেখিয়ে খানকায়ে ইমদাদিয়ায় (হযরত (রহঃ)-এর খানকায়) থাকাকালীন অবস্থায় হযরত থানবী (রহঃ)-এর ফাতাওয়ার বিরোধী ফাতাওয়া প্রচার করলো। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে ভাষণ বক্তৃতাও দিতে লাগলো। খানকায় আগন্তুকদেরকে নিজের মতাবলম্বী করার জন্য জোর প্রচেষ্টা শুরু করলো। তখন হযরত থানবী (রহঃ) তাকে বললেন—

"আমি আপনাকে আপনার মতাবলম্বনে বাধা দিচ্ছি না। কারণ এটা একটা ইজতিহাদী মাসআলাহ। কিন্তু একই স্থানে থেকে পরস্পরে বিরোধিতা করা উচিত মনে করি না। এজন্য এখন এটাই ভাল যে, আপনি আপনার এলাকায় চলে যান এবং এখানে কিতাব লেখার যে কাজ আপনাকে দেয়া হয়েছিলো তা আপনি সেখানে গিয়েই করুন। এখানে থেকে কাজ করলে যে ওযীফা আপনি পেতেন, ওখানে বসে কাজ করলেও আপনি একই ওযীফা পাবেন। এরপর সেখানে বসে আপনি প্রাণ খুলে খেলাফত ও কংগ্রেসের সাথে ঐক্যমত পোষণ করে ফাতাওয়া দিন এবং বক্তৃতা করুন তাতে আমার কোন অসুবিধা হবে না। এরপর যখন

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

এ আন্দোলন একটা পর্যায়ে চলে আসবে, তখন আপনি আবার আমার এখানে চলে আসবেন।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, 'কিন্তু আল্লাহর বান্দা কোন কথাই মানলো না'। মৌলভী সাহেব নিজে তাকওয়ার খুব দাবীদার ছিলেন। হায়দারাবাদ ইত্যাদি রাজ্য থেকে যে ওযীফা মাদরাসা ও উলামায়ে কিরামকে দেয়া হতো, সে সবকেই মৌলভী সাহেব হারাম বলতেন। কারণ এই ছিলো যে, তার তাকওয়া শুধুমাত্র কিতাবী ছিলো, কোন বুযুর্গের দরবারে আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে সে কখনো থাকেনি। আর শুধুমাত্র কিতাব ও অধ্যয়নের উপর যারা নির্ভর করে তারা সাধারণতঃ এ ধরনের বালাতেই লিপ্ত হয়ে পড়ে।

নি'আমত ও ইস্তিদরাজ-এর পার্থক্য

অনেক ফাসেক বদকার এমনকি কাফেরকেও দুনিয়ায় অনেক নিআমত, ধনসম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে দেয়া হয়ে থাকে। যা তাদের জন্য শেষ পর্যায়ে আরো বেশী অলসতা অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যের কারণ হয়ে পরকালে কঠোর আযাবে পরিণত হয়। এই বাহ্যিক নি'আমত প্রকৃতপক্ষে শাস্তি হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এই ধরনের নিআমতকে 'ইস্তিদরাজ' (সুযোগদান) বলা হয়ে থাকে।

হযরত থানবী (রহঃ) একবার এক মজলিসে ঐ সকল নি'আমতের আলোচনা করলেন যা মহান আল্লাহ তাঁকে দান করেছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, ভয় হয় এসব আবার আমার জন্য 'ইস্তিদরাজ' কিনা? তবে একটি বিষয়ের কারণে আমি এ ব্যাপারে আশাবাদী যে, এগুলো 'ইস্তিদরাজ' নয়। সে বিষয়টি হলো, আমার মনে ইস্তিদরাজের চিন্তা ও ভয় লেগেই থাকে। আর যে ব্যক্তির নি'আমত আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ইস্তিদরাজ হিসেবে আসে, তার মনে কখনো এই চিন্তা-ফিকির আসে না। বরং নি'আমত তার যতই বাড়তে থাকে তার গাফলতি ও অবাধ্যতা ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

একটি কৌতুক

হযরত থানবী (রহঃ)-এর মামার নাম ছিলো, ইমদাদ আলী। তিনি

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

খুব দরবেশ মানুষ ছিলেন। কিন্তু কিছুটা বিদ'আতে লিপ্ত থাকার কারণে হযরত থানবী (রহঃ)–এর সাথে তার বনাবনি ছিলো না। তিনি নিজের খানকার নাম রেখেছিলেন খানকায়ে ইমদাদ আলী। আর থানাভোনের প্রসিদ্ধ যে খানকাহ, রুহানী কাফেলার সরদার হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ (রহঃ)–এর নামে নামকরণ করা হয়েছিল, সে খানকাকে খানকায়ে ইমদাদুল্লাহ বলা হতো।

একবার হযরত থানবী (রহঃ) কৌতুকচ্ছলে বললেন, খানকায়ে ইমদাদুল্লাহ এবং খানকায়ে ইমদাদ আলীর মধ্যে ঐরূপই পার্থক্য যেরূপ পার্থক্য স্বয়ং আল্লাহ পাক এবং হযরত আলী (রাযিঃ)–এর মাঝে।

এক কংগ্রেসী মাওলানা সাহেবের ঘটনা

এক কংগ্রেসী মাওলানা সাহেব যিনি কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি হযরত থানবী (রহঃ)–এর বরাবরে এই মর্মে পত্র লিখলেন যে, আমি আপনার খিদমতে হাযির হওয়ার ইচ্ছা রাখি, কিন্তু আমি শুনেছি, আপনি নাকি কংগ্রেস সমর্থকদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে থাকেন। হযরত (রহঃ)–এর জবাবে লিখলেন, আমার কাছে এই অপবাদের তো কোন চিকিৎসা নেই। কিন্তু আমি শুনেছি, আপনার মাঝে নাকি গোশ্বা ও জালাল খুব বেশী। আর আমিও কিছুটা এ ধরনেরই। সুতরাং আপনি বলুন এই জালালাইন (দুই জালাল গোস্বা)–এর সবক কে পড়াবে। হযরত থানবী (রহঃ)–এর এঁই চিঠি পেয়ে সে হযরত থানবী (রহঃ)–এর দরবারে হাযির হওয়ার জন্য আরো বেশী আগ্রহী হয়ে উঠলো এবং হযরত থানবী (রহঃ)–এর দরবারে হাযির হয়েও গেলো। দীর্ঘক্ষণ আনন্দদায়ক সাক্ষাত হলো, এরপর সে যাওয়ার সময় একথা বলে গেলো যে, ঐ ব্যক্তি বড়ই জালিম যে আপনাকে কঠিন ও কঠোরতাকারী বলে আখ্যায়িত করে।

বাতেনী রোগের চিকিৎসা ঃ আল্লাহ পাকের দেয়া যোগ্যতা

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আধ্যাত্মিক লাইনের ছাত্রদের মধ্যে একজন চিঠিতে লিখলো, আমার মধ্যে অহংকার খুব বেশী। হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, বিষয়টি আমারও গোচরীভূত হয়েছে যে, আসলেই লোকটির মাঝে অহংকার বেশী। সুতরাং তার অনুভূতি ভুল নয়। আমি তার জন্য এ চিকিৎসা সিদ্ধান্ত করলাম যে, তোমার এই রোগের কথা

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

চিঠিতে লিখে তা আমার কাছে পাঠিয়ে দিবে। এরূপ পাঁচবার লিখে আমার কাছে পাঠাবে। হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, আলহামদুলিল্লাহ পাঁচবার লিখে পাঠানোর আগেই তার এ রোগ দূর হয়ে গেলো।

তরীকতের মাশাইখগণ যাদেরকে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে উম্মতের ইসলাহ বা সংশোধনের খিদমতের দায়িত্ব দান করা হয়ে থাকে। তাদেরকে প্রত্যেক ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য তার উপযোগী নতুন নতুন ব্যবস্থাও আল্লাহ পাক শিখিয়ে দিয়ে থাকেন। যা স্থান, কাল, পাত্র ও তার স্বভাব এবং মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রেখে উপরোক্ত হযরতগণ সিদ্ধান্ত করে থাকেন। এবং তার লাভও দৃশ্যমান হতে থাকে। এটা কোন সাধারণ নিয়ম নয় যে, পাঁচবার রোগের কথা লিখে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিলেই রোগ ভাল হয়ে যাবে। সম্ভবতঃ এ ব্যবস্থা করার পিছনে দু'টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য নেয়া হয়েছে। প্রথমতঃ অসুস্থ ব্যক্তির অসুস্থতার পূর্ণ অনুভূতি অন্ততঃ চল্লিশ দিন যাতে তার মাথায় থাকে ফলে যাতে সে নিজেই তার থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা ও চিন্তায় লিপ্ত হয়। আর ডাকবিভাগের মাধ্যমে পাঁচবার চিঠি আসা যাওয়া করতে প্রায় চল্লিশ দিন খরচ হয়েই যায়। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক বার চিঠিপ্রাপ্তির সাথে হযরত (রহঃ)–এর দু'আ ও নেক দৃষ্টিও তার লাভ হতে থাকবে। আল্লাহ পাকই সর্ব ব্যাপারে ভাল জানেন।

একটি আয়াতের সংশয় নিরসন

পবিত্র কুরআনে কয়েকবার এ কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে—

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

অর্থাত, আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য সুতরাং কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?

এ কথার উপর সাধারণভাবেই এই প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, পবিত্র কুরআনে ইলম ও মারিফাত তো এত ব্যাপক যে, বড় বড় আলেম এবং জ্ঞানী ব্যক্তিগণ নিজেদের পূর্ণ জীবন ব্যয় করেও তা পূর্ণাংগভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। এরপরেও কুরআনকে সহজ বলার কারণ কি?

হযরত থানবী (রহঃ) এ ব্যাপারে ইরশাদ করেন, এই যে সহজ বলা হয়েছে তা মাসাইলের মধ্যে, দলীলসমূহের মধ্যে নয়। অর্থাত, পবিত্র

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

কুরআন যেসব আহকাম ও বিধান দিয়েছে তা বুঝার ক্ষেত্রে কোন জটিলতা নেই। তবে তার দলীল প্রমাণ হিকমত-রহস্য বিভিন্ন সৃষ্ট সংশয়ের জবাব ইত্যাদিকে সহজ বলা হয়নি। বরং এগুলোর প্রত্যেকটির জন্য তার নিজ নিজ স্থানে মেহনত-শ্রম ও চিন্তা-গবেষণা অবশ্যই প্রয়োজন আছে।

প্রত্যেক মানুষের সৃষ্টিগত মৌলিক জ্ঞান

একদিন হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, আজ রাতে বিরাট একটি ইলম আল্লাহ পাক দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। তাহলো এই যে, যে ব্যক্তি কাফেরের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে এবং তাদের মাঝেই লালিত পালিত হয়েছে। তার মনে এ ধরনের চিন্তা ক্ষণিকের জন্যও স্থান পায়নি যে, আমি যে কাজ করছি কিংবা আল্লাহ পাকের ব্যাপারে আমার যে আকীদা-বিশ্বাস রয়েছে তা সম্ভবতঃ সঠিক নয়, বরং ভুলও হতে পারে, অনুরূপ অন্য কোন ভ্রান্ত কাজের মধ্যে যে ব্যক্তি এভাবে লিপ্ত রয়েছে যে, হক ও সত্যের সামান্য চিন্তাও তার মাথায় কখনো আসেনি, এরূপ ব্যক্তির ব্যাপারে আমার মনে সর্বদাই এই সংশয় থাকতো যে, এই ব্যক্তিকে তো মা'যূর ও অক্ষম মনে করা উচিত। সে কারণে লোকটির জাহান্নামের স্থায়ী আযাবে নিপতিত হওয়ার বিষয়টি বুঝে আসতেছিলো না। কারণ এরূপ অপরাধী ব্যক্তি যার সে অপরাধের পরিপন্থী ভাল কাজের সামান্য খেয়াল কিংবা কল্পনা পর্যন্ত মনে এলো না। যদি এমন কোন সন্দেহ তার মনে হতো যে, আমি যা করছি তা হয়তো ভুলও হতে পারে, তবে সে বিষয়টি নিয়ে তাহকীক ও চিন্তা ভাবনা করে সঠিক বিষয়টি জানতে পারতো। তখন যদি সে তাহকীক বা চিন্তা ফিকির না করতো তবে তা তার জন্য অপরাধ মনে করা যেত। কিন্তু সে ধরনের সংশয় তো তার মনে আসেনি। সুতরাং তার কোনরূপ চিন্তা ফিকির বা তাহকীক না করা কোন অপরাধ বলা যায় না।

কিন্তু আজ জানতে পারলাম যে, প্রয়োজনীয় হক ও সত্যের বুঝ আল্লাহ পাক ঐ সকল লোকদেরকে প্রথম থেকেই দান করে থাকেন যাদেরকে আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চলার জন্য আদেশপ্রাপ্ত করা হয়েছে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকতার আধিক্যের কারণে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে না। অন্যথায় প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিগত ও আবশ্যকীয়ভাবে মহান আল্লাহ প্রত্যেক মুকাল্লাফ (আল্লাহ পাকের বিধান

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

পালনের নির্দেশপ্রাপ্ত) ব্যক্তিকেই এতটুকু বুঝ ও জ্ঞান দান করে দিয়েছেন যে, সে যদি মুক্ত ও ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা–ভাবনা করে, তবে তার আবশ্যকীয় সত্যের জ্ঞান অবশ্যই লাভ হবে। (অর্থাত তার অন্ততঃ এতটুকু বুঝ অবশ্যই লাভ হবে যে, আমি নিজে এবং এই সারা দুনিয়া এমনিতেই সৃষ্টি হয়ে যায়নি। নিশ্চয়ই এর একজন স্রষ্টা আছেন। এবং এটাও সে বুঝতে পারবে যে, এত বড় বিশাল পৃথিবীর যিনি স্রষ্টা তিনি সমস্ত দুনিয়ার সবচাইতে বেশী জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী, আর তিনি একজনই হতে পারেন। এবং এ কথাও সে বুঝতে পারবে যে, যিনি আমাদেরকে এবং সারা দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছেন এবং সর্বদা তার পক্ষ থেকে আমরা বিভিন্ন প্রকার নি'আমতসমূহ লাভ করে আসছি বিধায় আমাদের উপর ফরয বা করণীয় হচ্ছে, তার পসন্দ ও অপসন্দ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে অপসন্দনীয় বিষয়গুলোকে বর্জন করা, এবং তার পসন্দনীয় কাজগুলো করে যাওয়া। এতটুকু বুঝ এসে যাওয়ার পর মানুষের কর্তব্য হয়ে যায়, আল্লাহ পাকের পসন্দ ও অপসন্দ সম্পর্কে তাহকীক করে সে সম্পর্কে অবগতি লাভ করা। এরপর সামান্য তাহকীক করলেও এ কথা জানা যাবে যে, আল্লাহ পাক দুনিয়ায় নিজ পয়গম্বরদের যুগে যুগে প্রেরণ করেছেন তাদের মাধ্যমে নিজের কিতাব দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন যে কিতাবে আল্লাহ পাকের পসন্দনীয় কাজ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এবং অপসন্দনীয় কাজ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে হিদায়াত দেয়া হয়েছে। ব্যাস এটাই হলো পরিপূর্ণ ঈমান এবং হক সম্পর্কে অবগতি) সারকথা হলো আল্লাহ পাক হককে বুঝার জন্য অনেক পথ রেখে দিয়েছেন। এবং সকল সমস্যার সমাধানও রেখেছেন। কবির ভাষায়—

در فیض است منشین نا امید ایں جا   برنگ دانہ از ہر قفل می روید کلید اینجا

অর্থাত, এ স্থানটি হলো একটি ফায়েয লাভের প্রশস্ত প্রস্রবণ, এখানে কেউ নিরাশ হয়ে বসো না। এখানকার চাবির দাঁত প্রত্যেক তালাতেই সমানভাবে প্রযোজ্য। (অর্থাত, প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থানমতে এখান থেকে উপকৃত হতে পারে, তাই এটা নিরাশার স্থান নয়।)

'সূফী' কাকে বলে?

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আমার কাছে সূফীর অর্থ হলো, এমন

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

আলেম যিনি আমলও করেন। (লোকেরা এর মধ্যে নাজানি কত রকম শর্ত ও গুণাবলীর কথা সংযুক্ত করে নিয়েছে যা তার মূল পরিচয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তা হলো তার আমলের ফলাফল ও বরকত। যা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য পৃথক পৃথক হয়ে থাকে।)

একটি হাদীসের ব্যাখ্যা

'মাকাসিদে হাসানাহ' নামক গ্রন্থে আল্লামা সাখাভী (রহঃ) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হলো—

اطلبوا الخير عند حسان الوجوه

অর্থাত, যে সব লোক বাহ্যিক সুরত–শেকেল ও অবয়বের দিক থেকে ভাল তাদের কাছ থেকে ভাল ও মঙ্গলের আশা পোষণ কর।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) বলতেন, মহান আল্লাহ সূরত (বাহ্যিক অবয়ব)কে সীরাত (আদর্শ)–এর জন্য নিদর্শন হিসেবে তৈরী করে দিয়েছেন। যাকে আল্লাহ তা'আলা সুন্দর অবয়ব দান করেছেন, তা তার সুন্দর আদর্শের প্রমাণ। অনুরূপ যে ব্যক্তির বাহ্যিক অবয়বে কোন ত্রুটি আছে তা তার ভিতরকার আসল অবস্থা তথা বাতেনী ত্রুটি (স্বভাবগত ত্রুটি)–এর প্রমাণ। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে কোন বিশেষ কারণে বা কোন অন্তরায়ের দরূন এর ব্যতিক্রমও হয়ে থাকে। এমনটি স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী হলেও তা অসম্ভব নয়। হযরত শেখ সাদী (রহঃ) এ বিষয়টিকেই এভাবে বর্ণনা করেছেন—

گنہ عفو کرد آل یعقوب را　　　　که معنے بود صورت خوب را!

অর্থাত, আল্লাহ পাক হযরত ইয়াকুব (আঃ)–এর সন্তানদের অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন যা মূলতঃ তাদের সুন্দর সুরত ও অবয়বেরই অর্থ ও দাবী ছিলো।

হযরত ইমাম বাকের (রহঃ)–এর ঘটনায় বলা হয়েছে—

چشم ازرق موئے گون رنگ زرد　　　　ایں چنیں کس با کسے نیکی نکرد!

অর্থাত, ঘোলাটে চোখ, আর শরাব রংগের কোকড়ানো চুল আর হলুদ বর্ণ এই যাদের অবস্থা এরূপ লোক মানুষের সাথে কখনো ভাল আচরণ করে না।

www.banglakitab.weebly.com　www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

উলামা-মাশাইখগণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অসীয়্যত

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, যেমনিভাবে কোন ডাক্তার বা চিকিৎসক যদি অসুস্থ হয়ে যায় তবে নিজের চিকিৎসা নিজে করে না। বরং অন্য চিকিৎসকের শরনাপন্ন হয়। অনুরূপভাবে সময়ের শ্রেষ্ঠ মাশায়েখগণ কিংবা অনুসরণযোগ্য ব্যক্তিবর্গের প্রবৃত্তির মাঝে যদি কোন রূহানী রোগ অনুভূত হয়, তখন তার জন্য উচিত তার চাইতে বড় কারো শরণাপন্ন হওয়া। যদিও সে তাসাওউফের লাইনে নিজের সিলসিলার নাও হয়, তবে দেখতে হবে, সে আহলে হক (হকপন্থী) এবং সুন্নাতের অনুসারী কিনা। আর যদি নিয়মতান্ত্রিক বিচারে নিজের থেকে বড় কেউ না থাকে (নিয়মতান্ত্রিক বিচারে কথাটা এইজন্য বলা হলো যেহেতু প্রকৃত অর্থে কে বড় তা তো কেবল আল্লাহপাকই জানেন) তখন তার জন্য উচিত হলো নিজের ছোটদের মধ্যেই কয়েকজনের সামনে নিজের অবস্থা প্রকাশ করে পরামর্শ নেয়া। এর দ্বারা আশা করা যায় সঠিক চিকিৎসা বুঝে এসে যাবে।

ঐক্য ও অনৈক্যের মূল কারণ

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আমাদের হযরত মুর্শিদ (রহঃ) বলতেন, ঐক্যের ভিত্তি হলো, বিনয় ও নম্রতার উপর প্রতিষ্ঠিত। অনুরূপভাবে পারস্পরিক বিচ্ছেদ ও বিবাদের ভিত্তি হলো, 'কিবর' বা অহংকার। (ইজতিহাদী মাসায়েলের মাঝে মতপার্থক্য ভিন্ন জিনিস। তাকে কখনো পরস্পর বিচ্ছেদ ও বিবাদ বলে অভিহিত করা যায় না।)

অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আলহামদুলিল্লাহ খানকার লোকদের মাঝে পরস্পর কোন মতপার্থক্য বা ঝগড়া বিবাদ নেই। এর কারণ হলো, খানকার লোকদের সকলের মাঝেই বিনয় ও নম্রতা রয়েছে। এদের প্রত্যেকেই অপরকে নিজের থেকে বড় এবং উত্তম মনে করে।

একটি ভুল ধারণার অবসান

মাওলানা মুহাম্মদ সিদ্দীক সাহেব গাংগুহী (রহঃ) আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ আহমদ খান সাহেব (রহঃ)-এর কাছ থেকে নিজে শুনেছেন যে, তিনি বলতেছিলেন, লোকেরা হযরত শাহ

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

ইসহাক সাহেব মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ)কে কঠোরতা প্রদর্শনকারী বলে থাকে। কিন্তু একথা একেবারেই ভুল। আমি নিজে তার আচার–আচরণ দেখেছি। তিনি নিজের ব্যাপারে ঠিকই কঠোরতা করতেন। 'খেলাফে আউলা' বা উন্নত ধ্যান ধারণা পরিপন্থী কোন কাজকেও তিনি নিজের ব্যাপারে বরদাশত করে নিতেন না। কিন্তু সাধারণ লোকদের ব্যাপারে তিনি খুবই নরম ছিলেন।

অতঃপর তিনি বলেন যে, আমি শুনেছি মাওলানা রশীদ আহমদ সাহেব গাংগুহী (রহঃ)ও এরূপ ছিলেন। তার কঠোরতাও ছিলো নিজের ব্যাপারে সীমিত।

অধম সংকলক বলছে যে, আমি আমাদের হযরত হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ)কেও এ রকমই পেয়েছি। নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে তিনি খুব কঠিন ছিলেন। কিছু কিছু এমন বিষয় যে ব্যাপারে লোকদেরকে জায়েয বলে ফাতাওয়া দিতেন। কিন্তু তার মধ্যে যদি সামান্যতম কোন সন্দেহ হতো, তবে তিনি তা থেকে বেঁচে থাকতেন। এ ধরনের অনেক ঘটনা অধমের (মুফতী শফী সাহেব) সামনে ঘটেছে। বরং একটি ব্যাপারে তো হযরত (রহঃ) আমার দ্বারাই একটি ফিকহী প্রশ্নের উত্তর লিখিয়েছেন এবং সে জবাবকে তিনি সঠিক বলেও মত দিয়েছেন এবং সে মতে সকলকে ফাতাওয়া দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তার মধ্যে একটি বিষয় ছিলো, হযরত থানবী (রহঃ)–এর নিজস্ব সে ক্ষেত্রে তিনি উক্ত ফতওয়ার উপর আমল করেননি। বরং সেখানে তিনি সাবধানতার দিকটিই অবলম্বন করেছেন।

বিষয়টি ছিলো, কিছুটা বংশগত হক ও মীরাস বন্টন সংক্রান্ত। যার জন্য সাবধানতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে গিয়ে হযরত (রহঃ) হাজার হাজার টাকা এমন প্রিয়জনদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছেন যাদের কিছুটা হক আছে বলে তিনি মনে করতেন।

ইংরেজদের তৈরী করা কালি যা লিখতে কাজে লাগতো, তার মধ্যে 'স্প্রিট' ব্যবহার করা হতো। হযরত থানবী (রহঃ) যখন একথা জানতে পারলেন এবং এও জানলেন যে, কিছু কিছু স্প্রিট হারাম হওয়ার পাশাপাশি সেগুলো নাপাকও ছিলো। একথা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি যে, কালির মধ্যে কোন প্রকারের স্প্রিট ব্যবহার করা হয়। এ কারণে প্রথমে হযরত থানবী (রহঃ) সে কালি দিয়ে লিখতে নিষেধ করতেন এবং

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

এ ধরনের কালি দ্বারা লিখা কাগজ পকেটে রেখে নামায পড়তেও বারণ করতেন। এরপর কিছু লোক বিষয়টি তাহকীক করে এসে জানালো যে, কালির মধ্যে ব্যবহৃত স্প্রিট ঐ প্রকারের স্প্রিট নয় যা নাপাক (অর্থাত যা খেজুর এবং আঙ্গুর থেকে তৈরী করা হয়)। তারা অপর বিষয়টি এই জানালো যে, বর্তমানে এই স্প্রিট থেকে কোন জিনিসই মুক্ত নয়। প্রেসে ছাপার কাজে যে কালি ব্যবহার হয়ে থাকে তার মধ্যেও স্প্রিট আছে, যা দ্বারা কুরআন শরীফও ছাপা হয়ে থাকে। জিলদ ও বাধাইয়ের উপর যে রং থাকে তার মধ্যেও স্প্রিট আছে। এমনিভাবে সাধারণ ব্যবহার্য জিনিসপত্রের মধ্যে কোন না কোনভাবে স্প্রিট মিশানো আছে।

এ কারণে হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) অন্যান্য লোকদের জন্য এসব জিনিস ব্যবহার করা জায়েয বলে ফতওয়া দিলেন ঠিক কিন্তু নিজে পূর্ণ জীবনে এ কালি যেমন কখনো ব্যবহার করেননি তেমনি রংগের ব্যবহারও বর্জন করেছেন। এসব কালি দ্বারা লিখা কোন কাগজ পকেটে নিয়ে তিনি কখনো নামাযও পড়েননি।

একবার হযরত থানবী (রহঃ) একটি কাগজ কাউকে দেয়ার জন্য আমাকে দিলেন যা এ জাতীয় কালি দ্বারা লিখা ছিলো। আমি হযরত থানবী (রহঃ)–এর সামনেই কাগজটি পকেটে ঢুকিয়ে নিলাম। হযরত থানবী (রহঃ) তখন খানকা থেকে নিজের ঘরে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে স্মরণ হলো যে, আমি সে কাগজ পকেটে রেখেছি তখন সেখান থেকেই লোক পাঠিয়ে আমাকে সতর্ক করলেন যে, ঐ কাগজ পকেটে নিয়ে যেন নামায না পড়ি। কিন্তু হযরত (রহঃ)–এর এসবই ছিলো নিজের ব্যক্তিগত আমল। অন্যদের জন্য তিনি জায়েয বলে ফতওয়া দিতেন। কোনরূপ বাধা প্রতিবন্ধকতা ছিলো না।

একজন ইংরেজী শিক্ষিত লোকের চিঠির জবাব

একবার এক ইংরেজী শিক্ষিত লোক চিঠিতে লিখলো যে, আমি শরীয়তের আহকাম সম্পর্কে কিছুটা অবগত আছি। এবং যতটুকু অবগত আছি তার উপর আমলও করি। কিন্তু আমি ঐ বিষয় সম্পর্কে অবগত নই যা বুযুর্গানে দ্বীনের সংস্পর্শে থেকে অর্জন করা হয়।

হযরত থানবী (রহঃ) তার জবাবে লিখলেন, বুযুর্গানে দ্বীনের সংস্পর্শে থেকে যা অর্জন করা হয় সে জিনিস হলো, 'তাআল্লুক

মা'আল্লাহ' অর্থাত আল্লাহ পাকের সাথে মহব্বত ও আনুগত্যের গভীর সম্পর্ক (যার কারণে শরীয়তের আহকামের উপর আমল করা সহজ হয়ে যায় এবং তার বিপরীত শরীয়ত পরিপন্থী কাজ করা মুশকিল মনে হতে থাকে।)

সে লোকটি আরো একটি কথা লিখেছিলো তাহলো, আমি চাচ্ছি যাতে ইবাদতের আত্মিক আগ্রহ আমার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায়। হযরত (রহঃ) তার জবাবে লিখলেন এটা মানুষের ইচ্ছাধীন নয় সুতরাং এর পিছনে পড়বেন না।

ইলমে দ্বীনের অতুলনীয় আদব

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহঃ) একবার বাথরুমে (পায়খানায়) প্রবেশ করলেন। ভিতরে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, আঙ্গুলের নখের উপর একটি কালির নোকতা লাগানো রয়েছে। লেখার সময় সাধারণতঃ কলম পরীক্ষা করে দেখার জন্য যা লাগানো হয়ে থাকে। সাথে সাথে তিনি অস্থির হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। এবং সেটা ধুয়ে পুনরায় প্রবেশ করলেন। এবং বললেন যে, এই নোকতাটিরও ইলমের সাথে একধরনের মিল ও সম্পর্ক রয়েছে। তাই সেটা নিয়ে বাইতুল খালায় (বাথরুমে) প্রবেশ করা আমার কাছে বেয়াদবী মনে হয়েছে।

যারা সর্বদা নিজের অন্তরকে খারাপ জিনিস থেকে পবিত্র রাখতে এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনে সর্বদা সচেষ্ট ও সচেতন থাকেন তাদের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। তারা সাধারণ ত্রুটি ও অলসতা থেকেও বেঁচে থাকেন এবং সামান্য নেকের কাজকেও ছেড়ে দেন না। কারণ, কখনো সাধারণ জিনিসও প্রকৃত মাহবুব বা প্রেমাস্পদ আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহের দৃষ্টি লাভের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কবির ভাষায়—

فراق دوست اگراندک ست اندک نیست　　درون دیدہ اگر نیم سوست بسیار است

অর্থাত, বন্ধুর সাথে বিচ্ছেদ যদি অল্প সময়েরও হয় তবে তা অল্প নয়। দীর্ঘদিন পরে যার সাক্ষাত লাভ হয় তা সামান্য হলেও অনেক কিছু।

এটা ইশকের ফলাফল ও বরকত।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

মসনবীর একটি শে'রের সঠিক ব্যাখ্যা

আল্লামা রুমী (রহঃ)-এর মাসনুভীর একটি শে'র নিম্নরূপ—

زان طرف کہ عشق می افزود درد
بوحنیفہؒ شافعیؒ درسے نکرد

এ শে'রের আপাতদৃষ্টিতে এই অর্থই হয় যে, হযরত আবু হানীফা ও শাফী (রহঃ) আল্লাহ পাকের ইশক থেকে খালি ছিলেন। এ জন্যই তাদের শিক্ষার মধ্যে ইশকের কোন বিষয় নেই। আর এ অর্থ বাস্তবতা পরিপন্থী। কেননা যত আইম্মায়ে মুজতাহিদীন অতীত হয়েছেন তাদের মধ্যে কেউই এমন ছিলেন না, যার মাঝে আল্লাহ পাকের ইশকের পর্যায়ের মহব্বত ছিলো না।

হযরত ইমাম গাযযালী (রহঃ) নিজের কিতাব 'ফাতিহাতুল উলূম' এর মধ্যে চার ইমামের এমন এমন ঘটনাবলী লিখেছেন যার দ্বারা তাদের 'সাহেবে দিল' তথা উত্তম দিলের অধিকারী ও আল্লাহ পাকের আশেক হওয়া প্রমাণিত হয়। এজন্য বাহ্যিক দৃষ্টিতে মাওলানা রুমীর এই শে'র বাস্তবতা পরিপন্থী মনে হয়।

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, আমাদের হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) ঐ শে'রের ব্যাখ্যায় শুধু একটি শব্দ বৃদ্ধি করে সকল সংশয় দূর করে দিতেন। সে শব্দটি ছিলো, 'হে উলামায়ে যাহের' অর্থাত এখানে আবু হানীফা ও শাফী নাম দ্বারা তাদের ব্যক্তি উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যাহেরী আলেমগণ। যেমন একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে—

لکل فرعون موسی

যার শাব্দিক অর্থ হলো, প্রত্যেক ফেরাউনের সাথেই মুসা (আঃ) আছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে মূসা (আঃ) ও ফেরাউনের নাম বা তাদের ব্যক্তিসত্তা উদ্দেশ্য নয়। বরং এখানে পথপ্রদর্শক ও পথভ্রষ্ট উদ্দেশ্য। আর হযরত আবু হানীফা (রহঃ) ও শাফী (রহঃ)কে যাহেরী আলেম বলাটাও সাধারণ লোকদের সরল পরিভাষার ভিত্তিতে। তা না হলে এসব বুযুর্গানে দ্বীন একদিকে যেমন যাহেরী আলেম ছিলেন অন্যদিকে তারা বাতেনী আলেমও ছিলেন।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

মাহে শা'বান ১৩৫০ হিজরীর মালফূযাত

কিতাব লেখকদের প্রতি বিশেষ হিদায়াত

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আমি যখন কিতাব লিখার কাজ করতাম তখন আমার অভ্যাস এই ছিলো সর্বদা কাগজ আর পেন্সিল আমার সাথে থাকতো। চলতে–ফিরতে, উঠতে–বসতে যদি কোন বিষয় স্মরণ এসে যেতো, তবে সাথে সাথে তা লিখে নিতাম। অর্ধরাত্রেও যদি কোন বিষয় স্মরণ হতো, তবে উঠে তা লিখে পরে আবার ঘুমাতে যেতাম। কেননা অনেক সময় বিষয়বস্তু স্মরণ থেকে ছুটে যায়। চিন্তা করলেও স্মরণে আসে না।

অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বললেন, এখন তো আমি সবকিছু থেকে মুক্ত হয়ে গেছি। কবির ভাষায়—

فارغ از دغدغه دست وگریبان کردی!   اے جنوں گردتو گردم کہ چہ احسان کردی

অর্থাত, আশংকা ও ভয় (বিভিন্ন চিন্তা–ভাবনা) থেকে আমার হাত ও আস্তিন এখন মুক্ত (আমি দায়িত্বমুক্ত)। ওহে আল্লাহ পাকের জন্য সৃষ্ট পাগলামী আমি তোমার আশেপাশেই ঘুরে বেড়াই যে তুমি কিরূপ ইহসান ও অনুগ্রহ করো।

শরীয়তের মূলনীতির সাথে মানুষের মানসিকতাও লক্ষণীয়

তা'লীম, তাবলীগ এবং ভাল কাজে দাওয়াতের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনে নবী (আঃ)গণকে প্রথমে হিকমত এবং এরপর 'মাওয়ায়েযে হাসানা' অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে—

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

অর্থাত,আপনি (লোকদেরকে) নিজ প্রতিপালকের পথে আহবান করুন হিকমত এবং মাওয়ায়েযে হাসানার মাধ্যমে।

বাস্তব অভিজ্ঞতা এর প্রমাণ যে, হকের দাওয়াতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার ব্যাপারে এ বিষয়টি বড়ই কার্যকর। আর যেখানে দাওয়াতের ভাল

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

ফল বা প্রতিক্রিয়া হয় না বা তুলনামূলক কম হয়, সে ক্ষেত্রে যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখা হয়, তবে দেখা যাবে আল্লাহ পাকের বাতলে দেয়া এই পদ্ধতির ক্ষেত্রে অলসতা বা অসচেতনতাই তার কারণ হয়। মহান আল্লাহ হযরত থানবী (রহঃ)কে ইলমী আমলী এবং যাহেরী বাতেনী সর্বদিক থেকে যে ধরনের পূর্ণতা দান করেছিলেন তেমনি নবী (আঃ)গণের দাওয়াত নীতির বিষয়টিও সর্বদা তার সামনে থাকতো।

মুরীদদের মধ্যে আহলে ইলমগণ যাদের আছর ও প্রতিক্রিয়া সাধারণ লোকদের উপর পড়ে থাকে তাদের মধ্যে কারো দ্বারা যদি কোন ত্রুটি হয়ে যেতো, তবে তার ক্ষমার জন্য শর্ত থাকতো এরূপ যে, যে ভুল সে প্রকাশ্যে করেছে তার তাওবাও প্রকাশ্যে হতে হবে। যাতে সাধারণ লোকের মাঝে যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিলো, তা দূর হয়ে যেতে পারে। এজন্য ঘোষণা করা ও প্রচার করার শর্ত দেয়া হতো, অনেক আহলে ইলম (আলিম) হযরত থানবী (রহঃ)-এর ইশারায় এ জাতীয় ঘোষণা ও ইলান ছাপিয়েও প্রচার করেছেন।

এ সংক্রান্ত ব্যাপারে একজন খুব বড় ও প্রসিদ্ধ আলিমের ঘটনা আছে। যে আলিমের কোন কাজে হযরত থানবী (রহঃ)-এর কষ্ট হয়েছে ফলে সে আলিমের সাথে হযরত থানবী (রহঃ)-এর বিশেষ সম্পর্ক তিনি বাতিল করে দিয়েছিলেন। এই আলিম ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষেই একজন খাঁটি আলিম এবং সত্যসন্ধানী ছিলেন। হযরত থানবী (রহঃ)-এর সম্পর্ক বাতিল ও ছিন্ন করার কারণে তার মধ্যে বড় ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিলো। তিনি সে ব্যাপারটির ক্ষতিপূরণ ও ক্ষমা লাভের চেষ্টা করলেন। সেমতে সাধারণ নিয়মেই ভুল স্বীকার করার বিষয়টি ঘোষণা করে দেয়ার হুকুম হলো। কিন্তু ঐ প্রসিদ্ধ আলিমের ইলমী মর্যাদা ও প্রসিদ্ধির কারণে এমনটি অনুভব করছিলেন যে, তার ঘোষণার মধ্যে ভুলের পুরোপুরি স্বীকৃতি তো থাকতেই হবে। তবে তা এমনভাবে যাতে তার ইলমী মর্যাদা এর দ্বারা ক্ষুন্ন না হয়। কারণ এরূপ হলে উলামায়ে কিরাম-এর কাছ থেকে সাধারণ লোকদের উপকৃত হওয়া যা মূলতঃ উলামায়ে কিরামের সাথেই সম্পৃক্ত তার মাঝে কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়।

এসব কিছু লক্ষ্য রেখে একটা ব্যাপক কথা প্রস্তুত করা স্বয়ং সে আলিম সাহেবের জন্যও খুব কঠিন হচ্ছিলো। হযরত থানবী (রহঃ)

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

অধমের সামনেই বললেন যে, নিয়ে এসো ভাই এটা তাকে দ্বারা বানানো সম্ভব হবে না আমি নিজেই তার পক্ষ থেকে লিখে দিচ্ছি। সেমতে তিনি নিম্নের বর্ণনা অনুযায়ী একটি বিষয়বস্তু প্রস্তুত করলেন। যার শিরোনাম ও ভুল স্বীকার কিংবা এ জাতীয় কিছু না দিয়ে দেয়া হলো 'শুকরে নিআমত' যাতে তার ইলমী মর্যাদা ও অবস্থানে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে না পারে। তার মধ্যে হযরত থানবী (রহঃ)-এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ঐ বুযুর্গ আলিম নিজে কিছু বাক্য বাড়ালেন। এ বিষয়বস্তুটি হযরত (রহঃ)-এর ইশারায় দেওবন্দের মাসিক পত্রিকা 'কাসেমুল উলূম'-এর ১৩৫৩ হিজরী সনের শাওয়াল সংখ্যায় পরিশিষ্ট আকারে প্রকাশিত হয়েছে, সে বিষয়বস্তুটি ছিলো এরূপ—

শুকরে নি'আমত

কয়েক বৎসর পূর্বে দারুল উলূম দেওবন্দের শুদ্ধি ও সংশোধনের নিয়্যতে যে আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিলো, সকলেই অবগত যে সেই আন্দোলনে এ অধমও অংশগ্রহণ করেছিলো। ঘটনার ধারাবাহিকতায় স্বাভাবিক গতিতে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিলো, নিঃসন্দেহে তা দারুল উলূমের মর্যাদা ও হিতকর অবস্থানকে আহত করেছিলো। যে কারণে দারুল উলূমের সকল হিতাকাংখীদের ন্যায় এ অধমেরও চূড়ান্ত পর্যায়ের ব্যথা ও অনুশোচনা ছিলো। বিশেষতঃ আমার মুনিব ও অনুসৃত মহান ব্যক্তিত্ব হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা থানবী (মাঃ যিঃ)-এর সম্মানিত অন্তরে এর প্রতিক্রিয়া খুব বেশী ছিলো। এ সময় সবচাইতে নিকৃষ্ট জিনিস যা বিশেষতঃ আমার অন্তরকে অস্থির ও ব্যথিত করেছিলো তাহলো হযরত থানবী (রহঃ)-এর অনুগ্রহ—এর দামান ও মেহেরবানীর ছায়া থেকে একধরনের বাহ্যিক বিচ্ছেদ এবং হযরত কাসেমুল উলূম ওয়াল খাইরাত (ইলম ও মঙ্গলের বিতরণকারী) নানুতবী (রহঃ)-এর কাফেলা ও পরিবার থেকে এক ধরনের সম্পর্কহীনতা ছিলো।

মহান আল্লাহ্ পাকের শোকর। কিছু মঙ্গলকামী লোকদের উত্তম প্রচেষ্টার দ্বারা এই অবস্থার অবসান ঘটেছে। এবং হযরত মাওলানা থানবী মুদ্দাযিল্লুহুমুল আলীয়াহ-এর দীর্ঘ দিনের স্নেহ-মমতা আমার আকাংখা এবং চাহিদার ভিত্তিতে পুনরায় বাস্তবতায় ফিরে এসেছে। এবং কাসেমী পরিবারের সাথেও আমার পূর্ব স্থাপিত সম্পর্ক পুনরায় সজীব

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার মহান নি'আমত যে, আমার মুরুব্বী বুযুর্গ আমার নিয়্যতের দিক থেকে নিশ্চিন্ত এবং তিনি আমার ত্রুটিসমূহকে দৃষ্টির আড়াল করছেন। আমি অত্যন্ত নিষ্ঠাপূর্ণ অন্তরে মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহু–এর নি'আমত ও ইহসানসমূহের এবং নিজ বুযুর্গানে কিরামের অনুদান ও মূল্যায়নের শোকর আদায় করছি। এবং দয়ালু প্রভুর খিদমতে নেক আমলের তাওফীক প্রার্থনা করছি। একমাত্র তিনিই সাহায্য ও অনুগ্রহ দানকারী। (وَهُوَ الْمُعِيْنُ الْمُسْتَعَانُ)

.... আফাল্লাহু আনহু
১২ শাওয়াল, ১৩৫৩ হিজরী

একত্রে কয়েকজনের ইসালে সওয়াব

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, যদি কয়েকজন লোককে একত্রিত করে ইসালে সওয়াব (সওয়াব বখশিশ) করা হয়, তবে সে ক্ষেত্রে হযরত গাংগুহী (রহঃ)–এর বক্তব্য ছিলো, সওয়াব বিভক্ত হয়ে সকলের উপর আনুপাতিক হারে তার এক এক ভাগ পৌঁছবে। কিন্তু পরবর্তীতে কয়েক রেওয়ায়েতের উপর ভিত্তি করে আমার খেয়াল এরূপ হয়েছে যে, সকলেরই সমান সওয়াব লাভ হবে। এর যথাযথ তাহকীক ও বিশ্লেষণ ইমদাদুল ফতওয়ার মধ্যে বিস্তারিতভাবে লিখে দেয়া হয়েছে।

অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, এমনটি অসম্ভবের কি, আল্লাহ পাকের শান ও মর্যাদা তো অনেক ঊর্ধ্বে। একটি বাতি থেকে হাজারো বাতি জ্বালানো হয়। কিন্তু সেই বাতি বা চেরাগের আলো তো একটুও কমে যায় না।

শয়তান ফেরেশতাদের শিক্ষক কিনা?

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, এ কথাটা খুবই প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, শয়তান নাকি ফেরেশতাগণের শিক্ষক ছিলো, কিন্তু হাদীস শরীফের কোন বর্ণনা দ্বারা এর সত্যতা প্রমাণিত হতে দেখিনি এবং বাস্তব বিচারেও কথাটা বুঝে আসে না। একান্তই যদি হয়, তবে এর এই ব্যাখ্যা হতে পারে যে, সে হয়তো ঐ পর্যায়ের বড় আলিম ছিলো যে পর্যায়ের

সূচীপত্র

আলিম হলে ফেরেশতাগণের শিক্ষক হওয়া যায়। শায়েরগণ সাধারণতঃ এ কথাটিকেই গ্রহণ করেছেন। এমন কি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব খাকানীও নিজের শে'র (কবিতা)-এর মধ্যে তাই লিখেছেন। খাকানী বহুত বড় মানুষ ছিলেন ঠিক কিন্তু তিনি খুব বড় মুহাক্কিক বা গবেষক ব্যক্তি ছিলেন না।

কারো প্রতি কুধারণা সৃষ্টি করে দেয়ার রহস্য

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, কোন কোন সময় আল্লাহ্ পাক নিজের কোন মাকবুল বান্দার ব্যাপারে কিছু লোকের মনে কুধারণা সৃষ্টি করে দিয়ে থাকেন। তারা ঐ বিশেষ বান্দার দোষ চর্চা করতে থাকে। এতে ঐ বিশেষ বান্দার এই লাভ হয় যে, আল্লাহ্ পাকের প্রতি মনোনিবেশ ও একাগ্রতা আরো বেড়ে যায়। মাওলানা রুমী (রহঃ) বলেছেন—

خلق را با تو چنیں بدخو کنند　　تا ترا نا چار رو آنسو کنند!

অর্থাত, মাখলুক তথা মানুষকে তোমার সাথে এমন দুরাচারী করে দেয়া হয়েছে, যাতে করে ঐ দুর্ব্যবহার তোমাকে অসহায় করে তোলে এবং তোমার চোখ দ্বারা বেশী বেশী অশ্রু প্রবাহিত করতে অভ্যস্ত করে তোলে।

দুনিয়ার চাইতে আখিরাতের চিন্তার অগ্রগণ্যতা

দুনিয়ার চিন্তা ফিকিরের চাইতে আখিরাত তথা পরকালের চিন্তা-ফিকিরকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। এ ব্যাপারে হযরত থানবী (রহঃ) মাওলানা রুমী (রহঃ)-এর এই শে'রটি পাঠ করেন—

خواب ناید مر ترا از بیم دلق　　خواب چوں آید ترا با بیم خلق

অর্থাত, যদি কোন স্থানে তোমার নিজের কাপড় চুরি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে রাতে তোমার ঘুম আসে না। কিন্তু যে কাজে জীবন ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সে কাজ করা সত্ত্বেও তা নিয়ে তোমার কিভাবে ঘুম এসে যায়।

এ বিষয়টিকেই একজন বুযুর্গ আরবী শে'রের মাধ্যমে এভাবে বলেছেন—

وكيف تنام العين وهي قريرة　　ولم تدر في اي المحلين تنزل

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

অর্থাত, মানুষের চোখ শীতল হয়ে আরামে কিভাবে ঘুমাতে পারে, যতক্ষণ জান্নাত ও দোযখের দুটি স্থানের কোনটিতে তার ঠিকানা হবে তা সে জানতে না পারে।

কষ্টের আকারে মেহেরবানী

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, হালী (রহঃ)–এর শে'রের একটি পংক্তি এ রকম আছে—

مہربانی کرتے ہیں نا مہربانوں کی طرح

অর্থাত, তিনি মেহেরবানী করেন তবে আপাতদৃষ্টিতে (তার কোন কোনটা) মেহেরবানদের কাজের মত দেখায় না।

কোন কোন সময় কোন মানুষকে একটি কষ্টের মধ্যে নিপতিত করা হয়। এই কষ্ট মূলতঃ এর চাইতেও বড় কোন কষ্টকে বদলে দেয় (অর্থাৎ দূর করে দেয়)। বান্দাহ যেহেতু হাকীকত সম্পর্কে অবগত নয়। এ কারণে সে শোরগোল করে এবং অস্থিরতা প্রকাশ করে।

একটি আয়াতের উপর প্রশ্ন ও তার জবাব

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, পবিত্র কুরআনে আছে—

لَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّ هُمْ مُّعْرِضُوْنَ

অর্থাত, মহান আল্লাহ যদি তাদেরকে ভাল কথা শোনানো মঙ্গল জ্ঞান করতেন তবে তিনি অবশ্যই তা তাদেরকে শোনাতেন (তাদেরকে হক কথা শোনালে কোন ফায়দা হবে না জেনেও) যদি তাদেরকে তা শোনাতেন তবে তারা তা থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ভাগতো।

মানতেকীদের নিয়মানুসারে এটা কেয়াস–এর শেকলে আউয়াল, যার নুতীজা বা ফলাফল এই দাঁড়ায়—

لَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّتَوَلَّوْا وَّ هُمْ مُّعْرِضُوْنَ

অর্থাত, আল্লাহ পাক যদি তাদের মাঝে কোন মঙ্গল জ্ঞান করতেন তবে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ভাগতো।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

অথচ যারা আলিম তারা জানেন যে, এই নতীজা বা ফলাফল কোন মতেই শুদ্ধ হতে পারে না।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, এর জবাব হলো, শেকলে আউয়ালের ফলাফল তখনই সঠিকভাবে বের হয়ে আসতে পারে, যখন 'হদ্দে আউসাত' মুকাররার অর্থাত দুইবার আলোচিত হয়। এখানে 'হদ্দে আউসাত' দুইবার আলোচিত হয়নি। কারণ أَسْمَعَهُمْ শব্দটি যা আপাতদৃষ্টিতে দুইবার এসেছে বলে মনে হয় তা মূলতঃ দুইবার আসেনি। কেননা এখানে দুটি শব্দের অর্থ ভিন্ন। কারণ, প্রথম বাক্যের মধ্যে أَسْمَعَهُمْ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ ধরনের سَمَاعٌ যা মঙ্গল জ্ঞান করার সাথে একত্রিত হয়। অর্থাৎ এমনভাবে শোনানো যা শ্রোতা গ্রহণ করে এবং তার মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। আর দ্বিতীয় বাক্যের মধ্যকার সিমা' বা শ্রবণ দ্বারা ঐ শ্রবণ উদ্দেশ্য যা মঙ্গল জ্ঞান করার সাথে একত্রিত হয় না। অর্থাত, শুধু কান দ্বারা শোনা এবং অন্তরে তার কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হওয়া। এজন্য দ্বিতীয় বাক্যের মধ্যে নিহিত গোপন বাক্য হলো এরূপ—

وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ مَعَ عَدَمِ عِلْمِ الْخَيْرِ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ

অর্থাত, আল্লাহ পাক যদি তাদেরকে হক কথা শোনালে কোন ফায়দা হবে না এটা জানার পরেও তাদেরকে হক কথা শোনান তবে তারা তা শোনা সত্ত্বেও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ভাগবে।

কিন্তু অন্যত্র পবিত্র কুরআন শরীফে এসেছে—

لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا أَشْرَكْنَا

অর্থাত, যদি আল্লাহর মঞ্জুর হইত, তবে আমরাও শিরক করিতাম না। (সূরা আনআম ১৪৮)

এ কথাটি জাহান্নামবাসীরা 'উযর' ও অপারগতা প্রকাশ করার জন্য বলবে। তাদের একথা শুদ্ধ হবে না বরং ভুল হবে।

ঠিক প্রায় একই রকম বাক্য কুরআন শরীফের অন্যত্র আল্লাহ পাকের কথা হিসেবে আলোচিত হয়েছে তাহলো—

لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا أَشْرَكُوا

অর্থাত, আল্লাহ পাক যদি ইচ্ছা করতেন যে, তারা শিরক করতে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

পারবে না তবে তারা (আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে) তা করতে পারতো না।

এ কথাটি সঠিক। এর কারণ হচ্ছে প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যে যে شَاءَ اللّٰهُ শব্দ দু'বার এসেছে তার অর্থ দুই বাক্যে দুই রকম। প্রথম বাক্য যা কাফেররা বলবে, সেখানে شَاءَ اللّٰهُ –এর অর্থ হলো—আল্লাহ্ পাকের রাযী ও সন্তুষ্ট থাকা। অর্থাত, জাহান্নামের অধিবাসীরা একথা বলে অপারগতা ও উযর পেশ করবে যে, যদি আল্লাহ্ পাক আমাদের শিরক ও কুফরীর উপর রাযী ও সন্তুষ্ট না থাকতেন, তবে আমরা শিরক করতেই পারতাম না।

আর দ্বিতীয় বাক্যে شَاءَ اللّٰهُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা বা এরাদা। অর্থাত, আল্লাহ্ পাকের যদি ইচ্ছা এমন হতো যে, লোকেরা শিরক করবে না তবে তাদের শিরক করার শক্তিই হতো না। কারণ, আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছার উপর অন্য কারো ইচ্ছা প্রবল হতে পারে না। এবং আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা ছাড়া দুনিয়াতে কোন ভাল কাজ যেমন হতে পারে না, তেমনি কোন খারাপ কাজও হতে পারে না। তবে আল্লাহ্ পাকের রাযী ও সন্তুষ্টি শুধু ভাল কাজের ব্যাপারেই হয়ে থাকে। খারাপ কাজের সাথে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি সম্পৃক্ত হয় না। বরং খারাপ কাজে আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন।

বিজ্ঞজনোচিত উত্তর

একবার এক লোক হযরত থানবী (রহঃ)–এর কাছে 'সূরা তাব্বাত ইয়াদা–আবী লাহাব' এর মধ্যে কিছু সংশয়ের কথা পেশ করলো। এ লোকটি শিক্ষিত ছিলো ঠিকই কিন্তু দ্বীনী জ্ঞান ও শিক্ষা থেকে সে বেখবর (অজ্ঞ) ছিলো। তার প্রশ্নগুলোও ছিলো একেবারে বেকার।

হযরত থানবী (রহঃ) তাকে জবাব দিলেন, 'এটা আপনি বুঝবেন না।' লোকটি বলে কি 'যে সঠিক কথা বুঝাতে না পারে সে আবার কেমন আলেম হলো।'

এবার হযরত থানবী (রহঃ) তাকে বললেন, আপনি 'উকলীদাস' (উচ্চাঙ্গের জ্যামিতি গ্রন্থ) তো নিশ্চয়ই পড়েছেন?' সে বললো, হাঁ পড়েছি। হযরত থানবী (রহঃ) তাকে বললেন, আপনার মূর্খ চাকর যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে, উকলীদাস গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূত্রের প্রামাণ্যতা আপনি এমন করে বর্ণনা করুন যাতে আমি বুঝতে পারি। তখন আপনি তার সামনে যে বক্তব্য পেশ করবেন, তা শুনতে আমারও খুব আগ্রহ হচ্ছে। তখন আপনার কাছে কি একথা ছাড়া আর কোন কথা থাকবে যে, তার প্রামাণ্যতা অনেক মূলনীতি ও অনেক জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা জানার উপর নির্ভরশীল। যতক্ষণ তুমি সেগুলো না বুঝবে ততক্ষণ এটাকেও বুঝতে পারবে না।

আকীদা-ই-তাকদীর এর হিকমত

পবিত্র কুরআনে তাকদীরের মাসআলার হিকমত এই বলে বর্ণনা করেছে—

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَا اٰتَاكُمْ

অর্থাত, আল্লাহ পাকের তাকদীরকে বিশ্বাস করার উপকারিতা হলো এই যে, যদি তোমাদের কোন উদ্দেশ্য হাতছাড়া হয়ে যায় তবে তোমরা খুব বেশী আফসোস এবং দুঃখ ও চিন্তায় লিপ্ত হবে না। আবার যদি তোমাদের কোন উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়, তবে সে কারণে এত বেশী খুশি ও আনন্দে লিপ্ত হয়ে যেওনা, যা অহংকার ও আত্মগরিমা পর্যন্ত পৌছে দেয়। বাস্তব কথা হলো এই যে, যে ব্যক্তি দুনিয়ার সকল ঘটনাবলী ও অবস্থার খালেক ও মালেক আল্লাহ তা'আলাকেই মনে করে এবং তার আকীদা যদি এই হয় যে, যা কিছু দুনিয়াতে সংঘটিত হয় তা আল্লাহ পাকের নির্ধারিত তাকদীরের ভিত্তিতেই হয় এবং তা হওয়া অবশ্যভাবী। কারো কোন শক্তি তাকে ফিরাতে পারে না। সে ব্যক্তি শান্তি ও বিপদে, সুখ ও দুঃখে সকল পরিস্থিতিতে একটি স্থিতিশীল অবস্থায় থাকে।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, তার পরিস্কার উপমা হলো, দু'জন ব্যক্তি একজন তাকদীর বিশ্বাস করে অন্যজন করে না, বরং সে তাকদীরকে অস্বীকার করে। দু'জনেরই দু'জন সন্তান আছে, দুই সন্তানই দু'জনের একমাত্র সন্তান। এই দুই সন্তান একই সময়ে যদি একই রোগে আক্রান্ত হয়ে যায় এবং বিভিন্ন চিকিৎসা ইত্যাদির পরেও উভয় সন্তানই যদি মারা যায় এবং পরে দুইজনের ব্যাপারেই যদি একথা প্রমাণিত হয় যে, চিকিৎসা ভুল করা হয়েছে।

এবার উভয়ের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করুন। যে ব্যক্তি তাকদীর বিশ্বাস

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

করে না, একারণে তার আজীবন একটা অস্থিরতা ও দুর্ভাবনা থেকেই যাবে। তার মধ্যে কখনো স্থিরতা আসবে না। পক্ষান্তরে যে তাকদীরকে বিশ্বাস করে তার মাঝে এ ধরনের অস্থিরতা আসবে না। কারণ সে বুঝবে যে, এই ভুল চিকিৎসাও আমার ছেলের তাকদীরে ছিলো। সুতরাং তা তো অবশ্যই ঘটবে।

দুনিয়াকে মহান আল্লাহ একটা উসীলার জগত হিসেবে বানিয়েছেন। তাই এখানে যা কিছু হয় একটা উসীলার উপর দিয়েই হয়। তাই প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা ঐ উসীলার পর্দার মাঝেই আটকে থাকে। কিন্তু যাদের হাকীকত ও প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগতি আছে এবং তারা একথা জানে যে, দুনিয়ার উসীলাসমূহ সব পর্দা মাত্র। আসল কাজের কর্তা তো আল্লাহ পাকের কুদরত। হাফেয সীরাজী (রহঃ) কত সুন্দর বলেছেন—

ایں ہمہ مستی و بیہوشی نہ حد بادہ بود   بر حریفان آنچہ کرد آن نرگس مستانہ کرد

অর্থাত, এসব মাতলামী আর বেহুঁশ শরাব বা মদের দ্বারা সৃষ্টি হয়নি বরং মহান আল্লাহর দয়া অনুগ্রহ ও বদান্যতা পেয়েই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

নার্গিসে মাস্তানাহ বলে এখানে আল্লাহ পাকের অনুগ্রহকে বুঝানো হয়েছে।

দ্বীনী মাদরাসাসমূহের চাঁদা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, দারুল উলূম দেওবন্দের সাবেক নায়েবে মুহতামিম মাওলানা মুবারক আলীর (রহঃ) কাছ থেকে আমার কাছে এ বর্ণনা পৌছেছে যে, হযরত শাইখুল আরব ওয়াল আযম শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহঃ)–এর সামনে কোন এক লোক এ অভিযোগের কথা পেশ করলো যে, দ্বীনী মাদরাসাসমূহের জন্য চাঁদা কালেকশান করার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা ও অপসন্দনীয় বিষয় সামনে আসে। লোকদের মাঝে ইলম ও উলামাগণের ব্যাপারে হীন ধারণার সৃষ্টি হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। আর যদি চাঁদা সংগ্রহ করা না হয় তবে এ সকল মাদরাসার কাজ চলবে কিভাবে?

এ কথার জবাবে হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ) বললেন, চাঁদা সংগ্রহ করো তবে তা গরীবদের কাছ থেকে কর।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) এ কথা বর্ণনা করে বললেন, এটা বিলকুল সহীহ ব্যবস্থা। কারণ হলো, গরীব লোকেরা চাঁদা সংগ্রহকারী আলেমগণকে হীন ও ছোট মনে করে না। যা দেয় অত্যন্ত সম্মানের সাথেই তা পেশ করে এবং (তারা যা কিছু দেয় তার প্রেক্ষিতে তারা খুব খাতির–সম্মান পাওয়ার আশায়ও থাকে না।) এ ব্যাপারে তাদের মনে কোন অসন্তুষ্টিও থাকে না বরং সন্তুষ্টচিত্তে দান করে থাকে। যার মধ্যে শুধু বরকত পরিপূর্ণ থাকে।

কিন্তু এখানে এই প্রশ্ন সৃষ্টি হবে যে, গরীব লোকদের কাছ থেকে কত টাকাই বা চাঁদা পাওয়া যাবে? এর দ্বারা চাঁদার পরিমাণ কমে যাবে। কিন্তু এই ধারণা প্রথমতঃ এমনিতেই ভুল। যেহেতু দুনিয়ায় সর্বদাই গরীবদের সংখ্যা বেশী থাকে। ধনীদের সংখ্যা থাকে কম। যদি সকল গরীব মানুষেরা এক আনা করে দিতে থাকে। তবে লক্ষ লক্ষ টাকা জমা হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় কথা হলো এই যে, বাস্তবেই যদি চাঁদা কম উঠে, তবে কাজও সে পরিমাণেই করো খুব বেশী বাড়িওনা নিজের শক্তি ও ক্ষমতার চাইতে বেশী বোঝা বহন করার কি প্রয়োজন।

মামূনুর রশীদের একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, এক ব্যক্তি খলীফা হারুনুর রশীদের সাহেবজাদা মামূনুর রশীদের কাছে এলো এবং হজ্জ আদায় করার জন্য তার কাছে টাকা চাইলো। তখন মামুনূর রশীদ বললেন, যদি তুমি সম্পদশালী হও, (যে কারণে তোমার হজ্জ করতে হবে) তবে আর আমার কাছে টাকা চাইছো কেন? আর যদি তুমি সম্পদশালী নাই হয়ে থাকো, তবে তো তোমার উপর হজ্জ করাই ফরয নয়।

এবার লোকটি বললো, আমি আপনাকে একজন বাদশাহ মনে করে এসেছি। মুফতী মনে করে আসিনি। আপনার চাইতে অনেক ভাল মুফতীও তো শহরে আছেন। সুতরাং আপনার আমাকে ফতওয়া শোনানোর কোন দরকার নেই। আপনি যা দিতে পারেন আমাকে দিয়ে দেন আর তা না হলে নিষেধ করে দিন। মামূনুর রশীদের তার কথা শুনে হাসি এসে গেলো এবং তিনি তাকে পূর্ণ হজ্জের টাকা দিয়ে দিলেন।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

শাহ ইসহাক সাহেব (রহঃ)-এর একটি আশ্চর্য ঘটনা

হযরত আমীর শাহ খান সাহেব (রহঃ) যিনি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী (রহঃ)-এর বিশেষ ও খাস মুরীদ ছিলেন। তিনি দিল্লীর বুযুর্গানে দ্বীনের ঘটনাবলী সনদসহ বর্ণনা করতেন। তিনি বলেছেন যে, হযরত শাহ ইসহাক সাহেব (রহঃ) নিজ বংশে মেধাবী নয় বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কারণ সে বংশ ছিলো সব বড় বড় উলামায়ে কিরামের বংশ। একজনের থেকে আরেকজন বড় ছিলো যদিও সেই বুযুর্গের যিনি ঐ বংশের মেধাবী নয় বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন তার একটি ঘটনা শুনলে বড়ই আশ্চর্য হতে হয়, ঘটনাটি হলো—

একদিন একজন তালেবে ইলমকে অস্থির অবস্থায় দেখে শাহ সাহেব তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু প্রথমে সে অহংকারীসুলভ ভঙ্গীতে চোখ ও ঠোট দিয়ে একটু ইশারা করে বুঝালো যে, কিছুই হয়নি। এরপর তাকে বারবার জিজ্ঞাসা করায় সে বললো, 'শামসে বাযেগা' (দর্শন শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ দরসী কিতাব)-এর একটি জায়গা বুঝে আসছে না। এবং সে ব্যাপারে আমার উস্তাদের সাথে আমার মতবিরোধ হয়ে গেছে। তিন দিন যাবৎ আমি সেটা নিয়েই আটকে আছি।

হযরত শাহ সাহেব স্নেহ ও শফকতের দৃষ্টিতে বললেন, জায়গাটি আমাকে একটু দেখাও না। ঐ তালেবে ইলম ভাবলো, ইনি হলেন একজন মুহাদ্দিস। তিনি ইলমে হাদীসের ব্যাপারে হয়তো অভিজ্ঞ হবেন। দর্শনের কিতাবের সাথে তার সম্পর্কই বা কি আছে। এই ভেবে সে অত্যন্ত অনিহা ও অনাগ্রহ সহকারে কিতাবখানা শুধু তার সামনে রেখে দিলেন। হযরত শাহ সাহেব (রহঃ) সে জায়গাটি মুতালাআ করে তার এমন পরিস্কার মর্ম বয়ান করে দিলেন যার ফলে সে তালেবে ইলমের সংশয় দূরীভূত হয়ে গেলো।

এবার এই তালেবে ইলম তো হযরত শাহ সাহেব (রহঃ)-এর পায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। হযরত শাহ সাহেব তখন বললেন, মিয়া আমরা সবই পড়েছি, তবে এগুলো (দর্শন ও মানতিক)কে নিস্প্রয়োজনীয় ও বেহুদা মনে করে ছেড়ে রেখেছি।

'ফিকাহ' সবচাইতে বেশী কঠিন

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, আমার কাছে তো সমস্ত ইলম ও বিষয়সমূহের মধ্যে ফিকাহ সবচাইতে বেশী কঠিন বলে মনে হয়।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

কখনো হযরত থানবী (রহঃ) বিনয় প্রকাশ করে এ কথাও বলেছেন যে, আমার তো এ বিষয়টির সাথে তেমন মুনাসাবাত ও সম্পর্ক নেই তাই মাঝে মধ্যে বিলকুল অপারগ হয়ে যাই।

মোল্লা খালেদ নকশবন্দী তুরকী (রহঃ)

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, যার উপর ফিকাহ্ এবং ফতওয়ার রং প্রবল থাকে, তার ফতওয়ার অবস্থাই ভিন্ন হয়ে থাকে। তার বিভিন্ন যুয বা শাখা প্রশাখার মধ্যে কঠোরতা করার স্বভাব থাকে। আবার যার উপর হাদীসের রং প্রবল থাকে, তার ফতওয়ার রংও হয় তার থেকে ভিন্নতর। তার ফতওয়ার মাঝে কিছু সুযোগ থাকে। মোল্লা খালেদ নকশবন্দী (রহঃ) তুরকী বুযুর্গ ছিলেন। আর তুরকীদের মাঝে সাধারণতঃ ফিকাহ এবং উসূলে ফিকাহ্–এর রং প্রবল থাকে। তাই তার অবস্থাও ছিলো অনুরূপ। দিল্লী পৌছে তিনি বাজার থেকে অন্য কাউকে দ্বারা সওদা খরিদ করাতেন না। বরং তিনি নিজে গিয়েই সওদা খরিদ করতেন এবং বলতেন, বাজারসমূহে ব্যাপকভাবে ফাসেদ ক্রয়–বিক্রয় প্রচলিত আছে। এ কারণে অন্য কারো উপর নির্ভর করতে পারি না।

দিল্লীর কোন বুযুর্গের প্রতিই তার আস্থা ছিলো না। তিনি বলতেন, এরা মুত্তাকী নয়। দিল্লীর তৎকালীন বড় বড় আলিমগণের ব্যাপারে তাঁর তখন এরূপ তাহকীক ছিলো যে, তিনি বলতেন 'আবদুল আযীয একজন ভাল মানুষ। আর আবদুল কাদের একজন মুসলমান, আর রফীউদ্দীন অন্যায়ভাবে নিজের ইলমের উপর গর্ব করে' এরপর তিনি হযরত শাহ গোলাম আলী কাদ্দাসাল্লাহু সিররাহু–এর খিদমতে হাজির হওয়ার সুযোগ পেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি এক আশ্চর্য রং দেখতে পেলেন। ফলে তিনি সেখানেই রয়ে গেলেন। তার হাতে বাই'আত হলেন। বিভিন্ন মুজাহাদা করলেন এবং শেষে তার খলীফা হয়ে গেলেন। এরপর থেকে তার নিজের তাকওয়ার সকল দাবী তার থেকে বিদায় নিলো।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

১৯ রবিউস সানী ১৩৫৮ হিজরীর মালফূযাত

আকাবীরে দেওবন্দের ন্যায়পরায়ণতা ও স্থিতিশীলতা

ঠাসকা নামক অঞ্চলে একজন বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন তার নাম ছিলো বাহাদুর আলী শাহ সাহেব, তিনি সেমা' শুনতেন কিন্তু তিনি যিকির শোগলকারী ও ইবাদতগুযার বান্দা ছিলেন। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলও ছিলেন। একবার পীরানেকালীর শরীফের গদীনাসীন পীর হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহঃ)–এর কাছে বাই'আত হওয়ার দরখাস্ত করলো। তখন হযরত গাংগুহী (রহঃ) তাকে পরামর্শ দিলেন, সে যেন বাহাদুর আলী শাহ সাহেব–এর হাতে বাই'আত হয়ে যায়। মসলক বা তরীকার মাঝে ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও বাহাদুর আলী সাহেবের দিকে লোকটিকে পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজে আপাতদৃষ্টিতে এজন্যই বাই'আত করলেন না যেহেতু গদীনাসীনকে অনেক রসম ও রিওয়াজে অংশগ্রহণ করা জরুরী হয়ে থাকে যা ছিলো হযরত গাংগুহী (রহঃ)–এর রুচির পরিপন্থী।

'মাদহে সাহাবা' সমাবেশ প্রসঙ্গে কথা

রাফেযী তথা শিয়া সম্প্রদায় কর্তৃক সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)–এর দোষ চর্চা ও সমালোচনার মোকাবেলায় লক্ষ্ণৌর কিছু আলেম 'মাদহে সাহাবা' সমাবেশ তথা সাহাবায়ে কিরামের (রাযিঃ) প্রশংসা সমাবেশ চালু করে দিয়েছিলেন। যার ফলাফলে শিয়াদের দোষচর্চার বদঅভ্যাস ও সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)গণকে অভিশম্পাত করার নাপাক ধ্যান–ধারণা যেন আরো উথলে উঠলো এবং তা আরো বেড়ে গেলো। এ ব্যাপারে কেউ কেউ হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ)–এর খিদমতে প্রশ্ন করলো। তখন হযরত থানবী (রহঃ) তার জবাব লিখলেন। সে জবাবের সারমর্ম স্মরণ রাখার জন্য একটা কাগজে লিখা ছিলো। যা নিম্নরূপ—

জওয়াব ঃ

روى البخارى بسنده عن ابن عباس رضـ فى قوله تعالے وَلَاتَجْهَرْ

بِصَلٰوتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا قال نزلت و رسول الله صلى الله عليه و سلم مختف بمكة كان اذا صلى باصحابه رفع صوته بالقران فاذا سمع المشركون سبو القران و من انزله و من جاء به فقال الله تعالےلنبيه صلى الله عليه و سلم وَلَا تَجْهَرْ بِصَلٰوتِكَ اى بقرائتك فيسمع المشركون فيسبوا القران وَلَا تُخَافِتْ بِهَا مِنْ اَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيْلًا.

অর্থাত, ইমাম বুখারী (রহঃ) তার নিজ সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন, পবিত্র কুরআনের আয়াত "হে নবী! আপনি নামাযে তিলাওয়াত খুব উচ্চ আওয়াযেও করবেন না আবার একেবারে নিম্ন আওয়াযেও তিলাওয়াত করবেন না।" (এ আয়াত সম্পর্কে বলেন,) এ আয়াত ঐ সময় অবতীর্ণ হয়েছে যখন প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র মক্কায় এই আশঙ্কা করছিলেন যে, তিনি যখন সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)কে নিয়ে নামায পড়বেন এবং উচ্চ আওয়াযে তিলাওয়াত করবেন এবং যখন তা মুশরিক সম্প্রদায় শুনবে তারা পবিত্র কুরআনকে এবং তা যিনি অবতীর্ণ করেছেন তাকে এবং যার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তাঁকে গালমন্দ করবে। তখন আল্লাহ তাআলা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আপনি নামাযে উচ্চ আওয়াযে তিলাওয়াত করবেন না অর্থাত আপনি জোরে কিরাআত পড়বেন না। যাতে তা মুশরিকরা শুনে কুরআন শরীফকে গালি দিতে পারে। এবং তিলাওয়াত এত আস্তেও করবেন না যা সাহাবায়ে কিরামও শুনতে না পায়। আপনি এ দুয়ের মাঝামাঝি একটা পন্থা গ্রহণ করুন।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেলো, স্বয়ং কুরআন শরীফকে উচু আওয়াযে পাঠ করা এবং তাও জামাআতে নামায পড়ার সময় যখন উচ্চ আওয়াযে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা ইমামের জন্য ওয়াজিব, সে উচ্চ তিলাওয়াতও যদি পবিত্র কুরআনকে গালমন্দ করার কারণ হয়ে যায়, তবে সে সময়ও এতটুকু উচ্চ আওয়াযে তিলাওয়াত করা নিষেধ

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

যতটুকু উচ্চ আওয়াযে তিলাওয়াত করলে গাল–মন্দকারীদের কান পর্যন্ত আওয়ায পৌছে যেতে পারে।

সেমতে সাহাবায়ে কিরামের (রাযিঃ) মাদাহ বা প্রশংসা উচ্চ আওয়াযে ঘোষণার মত করা যদি সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)কে গাল–মন্দ করার কারণ হয়ে যায়, তবে তা কিভাবে নিষিদ্ধ না হয়ে পারে। অথচ উচ্চ আওয়াযে সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)–এর প্রশংসা করা কোন ওয়াজিব বিষয় নয়। তাই এমনটি যদি সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)কে গাল–মন্দ করার কারণ হয় তবে সময়ে তা এতটুকু উচ্চ আওয়াযে করা যাতে তা গাল–মন্দকারীদের কান পর্যন্ত পৌছে যায়, কিভাবে নিষিদ্ধ না হয়ে পারে।

পবিত্র কুরআনের আয়াত—

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ – الايه

অর্থাত, তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাদের উপাসনা করে তাদের তোমরা গালি দিও না।

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে যা বলা হয়েছে তা উপরোক্ত বক্তব্যকেই আরো শক্তিশালী করে এবং এর উপর আরোপিত বিভিন্ন প্রশ্ন ও সংশয়কে দূরীভূত করে।

واستدل بالاية على ان الطاعة اذا ادت الى معصية رائجة وجب تركها فان ما يودى الى الشر شر وهذا بخلاف الطاعة فى موضع فيه معصية لا يمكن دفعها و كثيرا ما يشتبهان ولذالم يحضر ابن سيرين جنازة اجتمع فيها الرجال والنساء و خالفه الحسن قائلا لو تركنا الطاعة لاجل المعصية لاسرع ذالك فى ديننا للفرق بينهما و نقل الشهاب عن المقد سى فى الصحيح عند فقها ئنا انه لايشرك ما يطلب لمقارنة بدعة كترك اجابة دعوة لما فيها من الملا هى وصلوة الجنازة لنا ئحة فان قدر على المنع منع والا صبر و هذا

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

اذا لم يقتد به والا لا يقعد لان فيه شين الدين - (روح المعانى)

অর্থাত, এ আয়াত দ্বারা এ বিষয়টির উপর প্রমাণ পেশ করা হয়েছে যে, যখন কোন ইবাদত—প্রচলিত কোন গুনাহের কারণ হয়ে যায়, তখন সে ভাল কাজ ও ইবাদতকেও ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা যে জিনিস কোন খারাপ কাজ সংঘটিত হওয়ার কারণ হয় সেটাও খারাপ হিসেবে গণ্য হয়। কোন এমন স্থানে যেখানে গুনাহের কাজ হচ্ছে এবং তা প্রতিহত করার যদি কোন ক্ষমতা না থাকে, সেখানে যদি কোন ইবাদত ও ভাল কাজ আদায় করা হয় তবে সেটা ভিন্ন কথা। এবং কোন কোন সময়ে লোকদের কাছে উভয় প্রকারের কাজ (গুনাহ ও ইবাদত) মিলেঝুলে যায়। উভয়টিকে তারা একই রকম বলে বুঝে নেয়।

উপরোক্ত কারণেই ইবনে সীরীন (রহঃ) ঐ জানাযায় অংশগ্রহণ করেননি যেখানে মহিলা পুরুষ একই সাথে অংশগ্রহণ করে থাকে। এবং হযরত হাসান (রহঃ) এ নীতির বিরোধিতা করেছেন এবং বলেছেন, যদি আমরা গুনাহের কাজ চলতে থাকার কারণে ইবাদতকে ছেড়ে দেই, তবে আমরা অনেক ইবাদত ও নেকের কাজ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবো। আর এটা আমাদের দ্বীন বরবাদ হয়ে যাওয়ার একটা সহজ পথ হয়ে যাবে। এবং শিহাব মুকাদ্দাসী থেকে বর্ণনা করেছেন, আমাদের ফকীহগণের কাছে এটাই সঠিক যে কোন কাংখিত ইবাদত কোন বিদআতের সংমিশ্রণের কারণে ছাড়া যেতে পারে না। যেমন এ কারণে কোন ওলীমার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা যে, সেখানে অহেতুক কাজ হবে কিংবা জানাযায় এ কারণে অংশগ্রহণ না করা যে সেখানে বিলাপকারী কোন মহিলা আছে। বরং সেখানে এমনটি হওয়াই উচিত যে, ওলীমা ও জানাযায় অংশগ্রহণ করবে এবং যে গুনাহের কাজ সেখানে হচ্ছে, তা প্রতিহত করবে। যদি প্রতিহত করার ক্ষমতা থাকে আর তা নাহলে ধৈর্য ধারণ করবে। আর এমনটি তখন করবে যখন সে কোন বিশিষ্ট ও অনুসরণীয় লোক না হয়। কিন্তু সে যদি কোন অনুসরণীয় ব্যক্তি হয় তবে অংশগ্রহণ করাই উচিত নয়।

আল্লামা শামী (রহঃ)–এর বক্তব্যও উপরের বিষয়টির পক্ষে শক্তি যোগায় এবং সমর্থন করে যা তিনি জানাযায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছেন—

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

قول الله المختار (ولا يترك اتباعها لا جلها) اى لا جل النائحة لان السنة لا تترك باقتران البدعة ولا يردالوليمة حيث يترك حضورها ببدعة فيها للطارق بانهم لو تركوا المشئ مع الجنازة -لزم عدم انتظامها ولا كذالك الوليمه لوجود من ياكل الطعام (شامى جلد اول ٩٢٢)

অর্থাত, এ কারণে জানাযার অনুসরণ করা (পিছনে চলা) ছেড়ে দিবে না যে, সেখানে কোন বিলাপকারিণী মহিলা রয়েছে। কেননা বিদআত যুক্ত হওয়ার কারণে আসল সুন্নাতকে ছেড়ে দেয়া যায় না। এবং এই সন্দেহ করা যাবে না যে, কোন বিদআতের সংমিশ্রণ থাকলে ওলীমায় অংশগ্রহণ পরিত্যাগ করা হয়। কেননা যদি বিলাপকারিণীর কারণে জানাযায় অংশগ্রহণকে পরিত্যাগ করা হয় তাহলে জানাযার ব্যবস্থাপনা ঠিক থাকবে না। ওলীমার ব্যাপারটি–এর ব্যতিক্রম। কারণ সেখানে একজনে না খেলেও খাওয়ার অন্য লোক আছে।

একটি আয়াতের সংশয় ও তার জবাব

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

يُفْسِدُ فِيْهَا وَ يَسْفِكُ الدِّمَاءَ

অর্থাত, তারা (মানুষ) দুনিয়ায় অরাজকতা সৃষ্টি করবে এবং পরস্পর রক্তারক্তি করবে।

এ আয়াতে আপাতদৃষ্টিতে এই সংশয় সৃষ্টি হতে পারে যে, সেই অরাজকতা ও খুনাখুনির কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে তা স্বয়ং হযরত আদম (আঃ) থেকেই প্রকাশ পাবে। অথচ তিনি হলেন নিষ্পাপ নবী।

এর জবাব অন্যান্য মুফাসসিরগণ তো এই দিয়েছেন যে, এর দ্বারা স্বয়ং আদম (আঃ)–এর ব্যক্তিসত্তা উদ্দেশ্য নয়। বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো, বনী আদম বা আদম সন্তান। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) এখানে এক আশ্চর্য জবাব দিয়েছেন। তা হলো, এখানে অরাজকতা ও রক্তারক্তির পারিভাষিক অর্থই উদ্দেশ্য নয়। বরং এখানে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য। কেননা মানুষ জানোয়ার জবাই করে করে খাবে এবং শিকার করবে। আভিধানিক অর্থের দিক থেকে এটাও দুনিয়ায় অরাজকতা ও ফ্যাসাদ সৃষ্টির একটা পদ্ধতি।

হাকীমুল উম্মত থানবী (রহঃ)-এর বিশেষ বিনয়

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ পাক যার দ্বারা ইচ্ছা করেন নিজ দ্বীনের কাজ তার দ্বারা নেন। এমনটি আবশ্যকীয় নয় যে, যাকে দ্বারা আল্লাহ পাক দ্বীনের কাজ নিবেন সে লোকটিও আল্লাহ পাকের কাছে মকবুল হতে হবে। যেমন চামার বা নীচু শ্রেণীর মানুষকে লোকেরা কাজে খাটায়। এর কারণে চামারের মর্যাদা বেড়ে যায় না, বরং সে চামারই থেকে যায়। আমাদের অবস্থাও ঠিক অনুরূপ। আল্লাহ পাক তার বান্দাদের কিছু খেদমত আমাদের দ্বারা নেন। কিন্তু আমাদের অবস্থা তো আমরা নিজেরা জানি যে, আমরা কি? আল্লাহ পাকের কাছে মর্যাদা তো শুধু ঐ আলিমের যে তার ইলম অনুপাতে আমল করে।

দ্বিতীয় খলীফার জামায় একুশ তালি

শাইখ দাহলান (রহঃ) তার লিখা কিতাব 'ফুতুহাতে ইসলামিয়া'য় বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী (রাযিঃ) ইরশাদ করেছেন, আমি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ)কে তার খেলাফতকালে এমন অবস্থায় বাইতুল্লাহ শরীফ তওয়াফ করতে দেখেছি, যখন তার জামায় একুশটি তালি (জোড়া) লাগানো ছিলো। যার মধ্যে কোন কোন তালি এমনও ছিলো যা কাপড় দিয়ে লাগানো হয়নি (অন্য কিছু দ্বারা তালি লাগানো হয়েছে)।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, হযরত শাহ আবদুল কুদ্দুস গাংগুহী (রহঃ)-এর জুব্বা যা এখনও তার বংশের লোকদের কাছে সংরক্ষিত আছে এবং প্রতি বৎসরই তা মানুষকে দেখানো হয়, সেটাও ঐ ঘটনাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। আর এর আসল কারণ হলো, হযরত শাইখ (রহঃ)কে এই জামাটি তার শাইখ দান করেছিলেন। এজন্য পূর্ণ জীবন তিনি সেটি নিজের শরীর থেকে পৃথক করেননি। যখন ময়লা হতো ধুয়ে নিতেন। যখন কোন জায়গা ছিড়ে বা ফেটে যেতো, তখন যে রং এবং যে ধরনের কাপড় কাছে পেতেন তা দিয়েই তালি লাগিয়ে নিতেন। এই

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

ছিলো সেই জুব্বার আসল হাকীকত। বর্তমান সময়ের আত্মসজ্জিত দরবেশরা (যারা নিজেরাই দরবেশ সাজে তারা) এ বিষয়টিকে এক আশ্চর্য পন্থায় প্রচলন বানিয়ে নিয়েছে। তাহলো, তারা বিভিন্ন রংগের লৌকিকতাপূর্ণ কাপড়কে এক বিশেষ পদ্ধতিতে জোড়া লাগায় এবং তাকেই দরবেশী লেবাস বলে মনে করা হয়।

বুযুর্গানে দ্বীনের সন্তুষ্টি অর্জন

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাকের হাজার হাজার নি'আমত আমার উপর রয়েছে, তার মধ্যে এটাও একটা যে, আমি কখনো আমার কোন বুযুর্গকে অসন্তুষ্ট করিনি এবং তাদের কারো সাথে কখনো কোন বেয়াদবীও করিনি। তাদের কারো পক্ষ থেকে যদি কখনো কোন বাড়াবাড়ি বা অতিরঞ্জিত কিছু ঘটেছে, তবে আমি এই বলে তা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছি যে, তাদের দ্বারা আল্লাহ পাক আমাকে ইলমের এমন মহান সম্পদ দান করেছেন সে ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে যদি আমার কিছু কষ্টও হয় তাতে আর কিইবা ক্ষতি। কবির ভাষায়—

آنرا کہ بجائی تست ہردم کرمے   عذرش بنہ ار کند بعمرے ستمے!

অর্থাত, তোমার প্রতি যার পক্ষ থেকে সর্বদাই অনুগ্রহ ও মেহেরবানী আরোপিত হয় তার পক্ষ থেকে যদি তোমার জীবনে কখনো দু' একটু কষ্ট আসে তবে সে ব্যাপারে তাকে অপারগ ও মাযূর মনে কর।

এ প্রসঙ্গে হযরত লোকমান–এর ঘটনা স্মরণ হলো। ঘটনাটি হলো, তার মনিব কাঁকড় বুনলেন। যখন কাঁকড়ের ফলন হলো, তখন তিনি তা নিজের কাছে চাইলেন এবং তা থেকে প্রথমে কিছু হযরত লোকমানকে খেতে দিলেন। তিনি তা খেয়ে নিলেন এবং কিছুই বললেন না। এরপর তার মনিব নিজেও খেলেন। তিনি খেয়ে দেখলেন তা মারাত্মক তিক্ত। তিনি হযরত লোকমানকে বললেন, লোকমান! তুমি এই তিক্ত কাঁকড় খেলে অথচ কিছুই বললে না? হযরত লোকমান তখন বললেন, যার হাতে আমি প্রতিদিন হাজারো প্রকারের মিঠা জিনিস খেয়ে আসছি, যদি একদিন তার হাত থেকে কিছু তিক্ত জিনিস আসে তবে আমার মুখটি কি একেবারেই এমন যে, আমি তার তিক্ততার কথা বলে দিবো।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

তাকওয়ার উপর গর্ব করার নিন্দা

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, আমরাই বা কেন এমন ইচ্ছা করে বসে থাকবো যে, আমরা সবাই আল্লাহ পাকের সামনে জুনাইদ হয়ে উপস্থিত হবো। যদি হাজ্জাজ হয়েও আল্লাহ পাকের সামনে হাযির হই আর বলি 'ইয়া আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন' তবে এটাও যথেষ্ট। কিন্তু যদি জুনাইদ হয়ে তার উপর গর্ব বোধ হতে থাকে তবে তার চাইতে হয়তো হাজ্জাজ হওয়াই উত্তম। কবির ভাষায়—

نازتقوی سے تو بہتر ہے نیازمندی   جاہ زاہد سے بھرا چھی مری رسوائی ہے

অর্থাত, তাকওয়ার উপর গর্ব ও অহংকার করার চাইতে মুখাপেক্ষীতাই উত্তম। দুনিয়া ত্যাগীর সম্মানের চাইতে অপরাধীর অপমানই উত্তম।

একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো, নিজ এলাকার লোকদের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা পাওয়ার আশা খুবই কম থাকে। এ কারণে যদি কোন চাকর বা কর্মচারী রাখার প্রয়োজন হয় তবে নিজ এলাকার বাইরের কোন লোককে চাকর রাখবে।

হযরত আলী (রাযিঃ)-এর দুটি শে'র

ای یومین من الموت افر – یوم لا یقدر او یوم قدر یوم لا یقدر لا

یاتی القضاء – یوم یقدر لا یغنی الحذر

অর্থাত, কেউ যদি মউত থেকে ভাগতে চায় তবে তা দুটি অবস্থার যে কোন একটি অবস্থা অবশ্যই হবে। হয়তো সেই দিন তার জন্য মউত নির্ধারিত নেই কিংবা নির্ধারিত আছে। প্রথম অবস্থায় তো তার মউত আসতেই পারবে না, সুতরাং তার থেকে আর ভাগবে কিভাবে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় তো তার মউত অবশ্যই আসবে। সুতরাং তার থেকেই বা ভাগবে কোথায়? এ কথাটিই কোন ফার্সী শা'য়ের (কবি) খুব সুন্দর করে বলেছেন, শেরটি হলো—

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

دو روز حذر کردن از موت خطاست روز یکہ قضاء نباشد و روزے کہ قضاست

অর্থাত, দুই দিন মউত থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা অপরাধ ও ভুল। একদিন হলো ঐ দিন যেদিন তার মউত অবধারিত নয়। আর অপরদিন হলো ঐ দিন যেদিন তার মউত নিশ্চিত ও অবধারিত হয়ে আছে।

"ضاد" (যোয়াদ) হরফটি উচ্চারণ প্রসঙ্গে

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, দারুল উলূম দেওবন্দের তাজভীদের উস্তাদ কারী আবদুল ওয়াহিদ সাহেব একবার আমার কাছে লিখলেন যে, আমার তাহকীক ও জানামতে আরবী ض হরফটি ظ হরফের প্রায় কাছাকাছি। কিন্তু আমি যদি সেভাবে উচ্চারণ করি তবে লোকেরা প্রশ্ন তোলে যে, আমি নাকি বুযুর্গানে দ্বীনের পদ্ধতির উল্টা পড়ি। হযরত থানবী (রহঃ) তার জবাবে লিখলেন, তুমি যদি লোকদেরকে রিযিকদাতা মনে করো তবে তাদের অনুসরণ করো অন্যথায় সঠিক উচ্চারণের উপর স্থির থাকো।

অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বললেন, এটা একটা ভুল কথা যে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের পদ্ধতি ছিলো ضاد হরফকে دال এর মত পড়া। কেননা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)-এর পিছনে আমি শত শত ওয়াক্ত নামায পড়েছি। তিনি অত্যন্ত শুদ্ধ করে ضاد উচ্চারণ করতেন। তিনি কারী আবদুর রহমান সাহেবের কাছ থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে মশক করে নিয়েছিলেন।

এছাড়া হযরত গাংগুহী (রহঃ)-এর ضاد উচ্চারণের ব্যাপারে কারী এনায়েতুল্লাহ গাংগুহী (রহঃ)-এর কাছে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দিলেন যে, তিনি বিলকুল সঠিক তিলাওয়াত ও উচ্চারণ করেন। তিনি আরো বলেন যে, আমি হযরত (রহঃ)-এর সাথে দুইবার পূর্ণ কুরআন শরীফ দাউর করেছি। তাঁর হরফের উচ্চারণসমূহকে অবিকল কায়দা ও নিয়ম মাফিক শুদ্ধ পেয়েছি। হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, কারী ইনায়েতুল্লাহ সাহেব (রহঃ) গাংগুহী কিছুটা বিদ'আতের মধ্যে লিপ্ত ছিলেন। আর হযরত গাংগুহী (রহঃ)-এর বিদ'আতের প্রতি ছিলো কঠোর অনীহা। কিন্তু তৎকালীন সময়ে কোন অভদ্রতা বা অসৌজন্যমূলক

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

বাড়াবাড়ি ছিলো না। ইখতিলাফ তার নির্ধারিত স্থানে সীমাবদ্ধ থাকতো। এমনকি দু'জন পরস্পর বিরোধী মতাবলম্বী লোকের মাঝে পবিত্র কুরআন শরীফের দাউরও করা হতো।

মুনাযারা ও বিতর্ক

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, মুনাযারা ও বিতর্কের সাথে যেন খানিকটা অনিষ্ট ও ঔদ্ধত্য আবশ্যকীয় বিষয়ের মতই হয়ে গেছে। আগে আমারও মুনাযারা করার খুব আগ্রহ ছিলো। তখন আমার কথায়ও কিছুটা ঔদ্ধত্য ও লৌকিকতা বিদ্যমান থাকতো। কিন্তু বর্তমানে আমার মনে মুনাযারা ও বিতর্কের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়ে গেছে। বর্তমান সময়ে আমার চাহিদা ও আগ্রহ হলো নিম্নরূপ—

تو بر سر قدر خویشتن باش و وقار   بازی و ظرافت بندیمان بگذار

অর্থাত, (উপরের শেরটির মর্মার্থ হলো) তুমি তোমার মর্যাদা অনুপাতে নিজের অবস্থানেই থাকো। অহেতুক (কথা কাজে) লৌকিকতার আশ্রয় নিয়ে নিজের মূল্য ও মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করো না।

হযরত মাওলানা শাইখ মুহাম্মদ সাহেব (রহঃ)-এর মুনাযারা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, হযরত মাওলানা শাইখ মুহাম্মদ সাহেব থানবী (রহঃ)-এর আলিমসুলভ লিখিত মুনাযারা বা বিতর্ক হতো মাওলানা আবদুল হক খয়রাবাদী প্রমুখ বিশিষ্ট আলিমগণের সঙ্গে। তারা ছিলেন তিনজন তারা তিনজনে মিলে একটি লিখিত বক্তব্য প্রেরণ করতেন। এদিক থেকে মাওলানা শাইখ মুহাম্মদ সাহেব একাই তার জবাব লিখে পাঠাতেন। কিন্তু সে মুনাযারা বা বিতর্ক হতো অত্যন্ত গাম্ভীর্যতাপূর্ণ। একবার কোন এক লিখায় প্রতিপক্ষের দিক থেকে একটিমাত্র উপহাসমূলক বাক্য এসে গিয়েছিলো। হযরত মাওলানা তার জবাব লিখার পরিবর্তে লিখে পাঠালেন—

الا ستهزاء ينبت المراء كما ينبت الماء الكلاء

অর্থাত, উপহাস পারস্পরিক ঝগড়া-ঝাটিকে এমনভাবে উৎপন্ন করে যেমন পানির দ্বারা ঘাস উৎপন্ন হয়ে থাকে।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

এ কারণে আপনাদের লিখার উত্তর দেয়া থেকে বিরত থাকলাম। ভবিষ্যতে বিষয়টির ব্যাপারে আরো সতর্কতা ও সচেতনতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, এভাবে যদি মুনাযারা বা বিতর্ক হয় তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই।

উলামায়ে রব্বানীর ধৈর্য ও অনুগ্রহ

হযরত মাওলানা আহমদ আলী সাহেব মুহাদ্দিসে সাহারানপুরী একবার হাদীস শরীফের দরস দিচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি এসে কিছু বেয়াদবীমূলক কথা বললো। তা শুনে ছাত্রবৃন্দের মাঝে উত্তেজনার সৃষ্টি হলো এবং তারা এর প্রতিশোধ নিতে চাইলো। কিন্তু হযরত মাওলানা নিষেধ করলেন এবং বললেন যে, ভাই! কিছু বিষয় তো সে সত্যই বলেছে, সব তো আর মিথ্যা বলেনি। এজন্য তাকে ক্ষমা করে দেয়াই উচিত।

আল্লাহ পাক পর্যন্ত পৌঁছার দুটি তরীকা

আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যে পৌছার জন্য দুটি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হলো তরীকায়ে সুলূক অর্থাত নিজের ইচ্ছাধীন (এখতিয়ারভুক্ত) নেক আমলসমূহ করা (এর মাধ্যমে আল্লাহকে পাওয়ার চেষ্টা করা) আর দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হলো, তরীকায়ে জযব অর্থাত তার কোনরূপ চেষ্টা সাধনা ছাড়াই স্বয়ং আল্লাহ পাক তাকে নিজের বানিয়ে নেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

اَللّٰهُ يَجْتَبِىۡۤ اِلَيۡهِ مَنۡ يَّشَآءُ وَيَهۡدِىۡۤ اِلَيۡهِ مَنۡ يُّنِيۡبُ

অর্থাত, আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং যে তার অভিমুখী হয় তাকে পথপ্রদর্শন করেন।

এ আয়াতে উপরে বর্ণিত উভয় পদ্ধতির দিকে ইশারা করা হয়েছে। 'ইজতিবা' দ্বারা ঐ পদ্ধতিটি উদ্দেশ্য যাকে 'জযব' বলা হয়। আর 'হিদায়াত' ও 'ইনাব' দ্বারা তরীকায়ে সুলূককে বুঝানো হয়েছে—আর প্রকৃত কথা হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত এই উভয় বস্তু একত্রিত না হবে ততক্ষণ আল্লাহ পাক পর্যন্ত পৌছা হবে না। বান্দা যখন নিজের ইচ্ছা ও শক্তিকে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

আল্লাহ পাকের পথে খরচ করে এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালায় তখন আল্লাহপাকের রহমত তার প্রতি ধাবিত হয় এবং সে নিজেই এ বান্দাকে তার দিকে আকর্ষণ করে নেয়। যার কারণে সে আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। অন্যথায় শুধুমাত্র 'সুলূক' তথা নিজের চেষ্টা সাধনা মহান আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার জন্য যথেষ্ট হয় না।

تو مگراز طرف خویشتن بمن نزدیکی! ورنہ من از طرف خویش بغایت دورم

অর্থাত, তুমি নিজের চেষ্টায় আমার কাছে পৌছুতে সক্ষম হবে না (যদি আমি তোমাকে কাছে না নেই) কারণ আমি অবস্থান করি তোমা হতে অনেক অনেক দূরে।

হযরত মাওলানা সিদ্দীক আহমদ সাহেব আম্ভুটবী (রহঃ) কত সুন্দর কথা বলেছেন যে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের তরীকায় খুব দ্রুত আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে যাওয়া যায় অথচ তারা খুব বেশী মুজাহাদাও করান না। তার কারণ হলো, আল্লাহ পাক পর্যন্ত পৌছার জন্য 'সুলূক' (নিজের সাধনা) ও 'জযব' (আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আকর্ষণ) উভয়টিরই প্রয়োজন রয়েছে। সুলূক দ্বারা শুরু হয়। অর্থাত বান্দাহ আল্লাহ পাক পর্যন্ত পৌছার জন্য নিজের সাধ্যমত সর্ব রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ পাক পর্যন্ত পৌছার জন্য এই প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয়। মহান আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার তাওফীক যার হয় তা মূলতঃ 'জযব' বা আকর্ষণের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। অর্থাত বান্দা যখন আমল শুরু করে দেয় তখন আল্লাহ পাকের রহমত তার প্রতি ঝুঁকে পড়ে তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে (টেনে) নেয়। এভাবেই 'উসূল' তথা আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যে পৌছে যাওয়া হয়। মহান আল্লাহ পাকের রহমত কোন বান্দার প্রতি ধাবিত হওয়ার বিষয়টি ঐ বান্দার কর্মকাণ্ড সন্তোষজনক ও পসন্দনীয় হওয়ার উপর নির্ভরশীল। যে আমল সুন্নাত অনুসারে হয় মহান মাওলার রহমত তার প্রতি অনেক বেশী এবং খুব দ্রুত ধাবিত হয়ে যায়। আর যার মধ্যে সুন্নাতের অনুসরণের প্রতি গাফলতী বা এ ব্যাপারে নমনীয়তা রয়েছে তার প্রতি আল্লাহ পাকের রহমত দ্রুত ধাবিত হয় না। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের তরীকা যেহেতু অবিকল সুন্নাতের মুতাবিক এজন্য এ পদ্ধতিতে 'জযব' বা আকর্ষণ দ্রুত হয়ে থাকে। ফলে আল্লাহ পাক পর্যন্ত পৌছাটাও দ্রুত হতে পারে।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) একথা বলেছেন, যে ব্যক্তির আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যে পৌছার সুযোগ হয়ে যায় সে আর কখনো বিতাড়িত হয় না। বুযুর্গানে দ্বীনের এ ব্যাপারে একটি প্রবাদ প্রসিদ্ধ রয়েছে তা হলো, الواصل لايرجع অর্থাত, যে আল্লাহ পাক পর্যন্ত পৌছে যায় সে আর ফিরে আসে না। অবার কেউ কেউ বলেছেন, الفانى لايرد অর্থাত, আল্লাহ পাকের জন্য যে উৎসর্গিত ও নিবেদিতপ্রাণ হয়ে যায় তাকে ফিরিয়ে দেয়া হয় না। এবং এমন কিছু ঘটনা যা আমাদের মাঝে প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, আল্লাহ পাকের কোন কোন ওলী পরবর্তীতে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছেন (নাঊযুবিল্লাহ) এক্ষেত্রে মূলতঃ উসূল ইলাল্লাহ অর্থাত আল্লাহ পাক পর্যন্ত পৌছাই হয়নি। এবং বেলায়াত তথা ওলীত্বের মর্যাদাই লাভ হয়নি। বরং সে ধোঁকার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলো। অন্যথায় প্রকৃতপক্ষে যে মহান আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে গিয়ে আল্লাহ পাকের ওলী হয়ে যায়, সে তথা হতে আর ফিরে আসে না এবং এরূপ ব্যক্তির আর কখনো গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

এক ব্যক্তির স্বপ্ন ও হযরত থানবী (রহঃ)-এর উপদেশ

এক ব্যক্তি তার দেখা একটি স্বপ্নের তাবীরের জন্য হযরত থানবী (রহঃ)-এর কাছে লিখে পাঠালো। স্বপ্নটি ছিলো এই, লোকটি দেখলো—এক আলিম সাহেবের একদল মুরীদ তার কাছে এসেছে। তারা এসে ঐ আলিম সাহেবের পক্ষ থেকে তাকে কিছু উপঢৌকন দিলো যার মধ্যে একটি কাপড়ে আবৃত অবস্থায় ঐ বুযুর্গের ব্যবহৃত সেলাই করা একটি কাপড়ও আছে। অনুরূপ আরো একটি কাপড় তাকে দেয়া হলো। ঠিক তেমনিভাবে তৃতীয় আরেকটি কাপড়ও তাকে দেয়া হলো যেটি ছিলো কয়েকজন বুযুর্গের ব্যবহৃত কাপড়ের টুকরা দ্বারা তালি লাগানো। বরকতের জন্য বুযুর্গগণের কাপড় দিয়ে সেলাই করে নেয়া হয়েছে। কাপড়গুলো হাদিয়া দেয়ার পর তাকে বলা হলো যে, এর মধ্যে জওহরলাল নেহেরু এবং গান্ধীর ব্যবহৃত কাপড়ও রয়েছে। একথা শুনে যে লোকটি খাব দেখেছে সে খাবের মধ্যেই রেগে গেলো এবং বলতে লাগলো, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ পাকের ওলীগণের কাপড়ের সাথে আল্লাহ তা'আলার দুশমনদের কাপড়কে একত্রিত করা হয়েছে। আমি তো দুশমনদের ঐ কাপড়গুলোকে শুধু এস্তেঞ্জা করার জন্যই ব্যবহার করতে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

পারি। একথা শুনে আগন্তুক লোকেরা খুব রাগান্বিত হয়ে গেলো। তখন খাব দ্রষ্টা ব্যক্তি খাবের মধ্যেই কোন একজন আলিমকে বললেন, তিনি যেন এই লোকদেরকে বিষয়টি বুঝিয়ে দেন। তখন ঐ আলিম ব্যক্তি একটি খাটের উপর দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিতে শুরু করলেন। ঠিক এমন সময় সে ঘুম থেকে উঠে যায়।

যে লোকটি স্বপ্ন দেখেছে সে চিঠিতে একথাও লিখেছিলো যে, এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা সে সবধরনের আলিমগণের কাছেই জিজ্ঞাসা করেছে।

হযরত থানবী (রহঃ) তার চিঠির জবাবে লিখলেন—

আসসালামু আলাইকুম।

প্রথম কথা হলো আমাদের খাবই বা কি একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। এর পরও যদি কিছুটা গুরুত্ব থাকে তবে তা এত অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় নয় যাকে তাবীর বা ব্যাখ্যা করার জন্য বিশেষভাবে যত্ন নিতে হবে। কেননা খাব বা স্বপ্ন যেমন শরীয়তের কোন দলীল নয়, তেমনি তার তাবীরও কোন দলীল-প্রমাণ নয়। এর পরেও যদি তাবীর করানোর ক্ষেত্রে কিছুটা যত্ন নেয়া হয় তবে তা যে কোন একজন তাবীরকারক থেকে তাবীর করিয়ে নেয়াই তো যথেষ্ট। (অনেকের কাছে জিজ্ঞাসা করার কি প্রয়োজন)। এমন একজন ব্যাখ্যাতা যার প্রতি আপনার ভক্তি-বিশ্বাস রয়েছে তার কাছ থেকে খাবের ব্যাখ্যা জেনে নিলেই তো হয়। এক্ষেত্রে যাকে নিয়ে খাব দেখা হয়েছে তার প্রতি যদি ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং আত্মবিশ্বাস থাকে, তবে সকলের উপর তাকেই প্রাধান্য দেয়া উচিত।

হযরত থানবী (রহঃ)কে হত্যার হুমকি

একবার কোন এক লোক একটি বেনামী চিঠি হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ)-এর ব্যাপারে লিখে প্রচার করে দিলো। যার মধ্যে হযরত থানবী (রহঃ)কে হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছিলো। ফতেহপুরের লোকেরা এ চিঠির কারণে প্রভাবিত হয়ে একটি চিঠি পাঠালো। যে চিঠিতে ঐ হুমকিমূলক চিঠির প্রতি অসন্তুষ্টি এবং হযরত থানবী (রহঃ)-এর প্রতি মহববত ও ভক্তি-শ্রদ্ধার কথা প্রকাশ করা হয়েছে। সে চিঠির শেষে অনেক লোকের স্বাক্ষর ছিলো। হযরত থানবী (রহঃ) সে পত্রের জবাবে লিখলেন—

মুহতারাম,

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

আসসালামু আলাইকুম।

আমার প্রতি আপনাদের মহব্বতের কারণে আমি আপনাদের শোকর আদায় করছি। তবে এর সাথে সাথে আমি আপনাদেরকে মঙ্গলকামিতার সঙ্গে মহব্বতের ব্যাপারে স্থিতিশীলতা ও মধ্যমপন্থা অবলম্বনের পরামর্শ দিচ্ছি। আর সে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের পদ্ধতি হচ্ছে, আমার জন্য দুআ করতে থাকুন। আর যদি খুব বেশী জোশ ভিতরে থেকে থাকে, তবে আলাদাভাবেই তা প্রকাশ করে দেয়া যায়। অন্যান্য লোকদের স্বাক্ষর গ্রহণ এবং এত দীর্ঘ চিঠি সম্ভবতঃ সুন্নাত তরীকা পরিত্যাগ করার শামিল। তবে যার উপর মহব্বতের প্রাবল্য এসে যায় সে মা'যূর বা অপারগ। আর এ কথা স্বীকৃত যে, কোন মা'যূর ব্যক্তির চাইতে মুহাক্কিক ব্যক্তিই ভাল।

—ওয়াসসালাম।

এ চিঠি লিখা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই একজন পুলিশ সাব–ইন্সপেক্টর এসে হাযির হলো এবং সে বললো, আযমগড় জিলার কালেক্টরের পক্ষ থেকে চিঠি এসেছে তিনি জানতে চেয়েছেন যে, আপনাকে হত্যার হুমকি সম্বলিত যে চিঠি প্রচার করা হয়েছে আপনি সে ব্যাপারে কিছু করতে চান কিনা? (সম্ভবতঃ সে চিঠিটি আযমগড় জিলা থেকেই লিখা হয়েছিলো।)

হযরত থানবী (রহঃ) এর জবাবে পুলিশ সাব–ইন্সপেক্টরকে বলে দিলেন, আমি কিছুই করতে চাই না। কোন সাহায্যও চাই না কোন তদন্তও চাই না। হযরত থানবী (রহঃ) বললেন, হত্যার হুমকি সম্বলিত চিঠিটি আমার বড়ই উপকার করেছে। যেসব লোকেরা আমার কাছে বিভিন্ন হক পাওনা ছিলো আমি সেসব আদায় করে দায়িত্বমুক্ত হয়েছি। এভাবে দায়িত্বমুক্ত হওয়ার বিষয়টি আমার অন্তরে এমন প্রভাব সৃষ্টি করেছে যেমনটি আর কখনো হয়নি। (৯ রবিউস সানী ১৩৫৮ হিজরী)

কুরআন শরীফের তাজভীদ প্রসঙ্গে

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীন পবিত্র কুরআনের হরফসমূহের তাজভীদের এতটা গুরুত্ব দেননি, যতটা গুরুত্ব বর্তমান সময়ের লোকদের মাঝে রয়েছে। যার কারণ দুটি—প্রথমতঃ তারা আরবী ছিলেন, তাই তাদের তাজভীদের তেমন প্রয়োজন ছিলো না। স্বভাবগতভাবেই তাদের মুখে সঠিকভাবে হরফ উচ্চারিত

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হতো। আর যারা অনারব ছিলেন তারা ঐ আরবী নেককার বুযুর্গানে দ্বীনের সংস্পর্শে থেকে তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের কারণে তারা বেশী ভুল করতেন না। আর দ্বিতীয়তঃ তারা কোন কাজের ক্ষেত্রেই খুব বেশী লৌকিকতা পসন্দ করতেন না। বর্তমানে যার আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। যে লোক ঐ তাজভীদ নিয়ে চর্চা শুরু করে, সে অন্য আর সব যরুরী কাজ থেকে বেখবর ও অলস হয়ে যায়।

অপরদিকে কিছু লোক এমনও আছে, যারা হরফের তাজভীদের কোন প্রয়োজনই অনুভব করে না। বিষয়টি সামঞ্জস্যপূর্ণ মধ্যম পন্থায় হওয়া উচিত।

পানিপতী এবং মিসরী পদ্ধতি

কোন এক মজলিসে পানিপতী এবং মিসরী পদ্ধতিতে কুরআন শরীফ তিলাওয়াতকারী উভয় প্রকারের ক্বারী সাহেবগণ উপস্থিত ছিলেন। এবং তাদের মাঝে পরস্পরে এ বিতর্ক প্রসিদ্ধ ছিলো যে, পানিপতী পদ্ধতিতে তিলাওয়াতকারী ক্বারী সাহেবগণ মিসরী পদ্ধতিতে তিলাওয়াতকারী ক্বারী সাহেবদের প্রতি এ অপবাদ দিয়ে থাকেন যে, তারা গানের মত সুরে কুরআন শরীফ পড়ে থাকেন। আর মিসরী কারী সাহেবগণ পানিপতীদের বলতেন যে, তারা এমনভাবে কুরআন শরীফ পড়েন যেমন কেউ কাঁদে। হযরত থানবী (রহঃ) এ বিষয়ে এ ফায়সালা করলেন, যেমনিভাবে কোন শে'রের ওযনের সাথে কোন আয়াতের মিল হলেই আয়াতকে শে'র বলা যায় না, অনুরূপভাবে কারো অনিচ্ছায় যদি তার তিলাওয়াত খানিকটা সংগীতের নিয়ম–কানূনের সাথে মিলেও যায়, তা সত্ত্বেও তাকে গান বলা যাবে না। তবে কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে সংগীতের নিয়ম কানূনের সাথে মিল করে তিলাওয়াত করে তবে তা গানের অন্তর্ভুক্ত হবে।

কুরআন শরীফে ওয়াকফ করা ও না করা

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, কুরআন শরীফে ওয়াকফ করা (থেমে পড়া) ও না করা (না থেমে পড়ে যাওয়া)–এর ব্যাপারে আসল তাহকীক হলো, ওয়াকফ কোন স্থানেই নিষিদ্ধ ও নাজায়েয নয়। আবার কোন স্থানেই ওয়াকফ করা এমন লাযেম ও আবশ্যকীয় নয় যে, সে ওয়াকফ না করলে নামাযই হবে না বা তিলাওয়াত গলত হয়ে যাবে।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আয়াত এক জিনিস আর ওয়াকফ হলো অন্য জিনিস। আয়াত হলো মানকূল বা বর্ণিত বিষয়ের অনুসরণ করা। এখানে এমনটি আবশ্যকীয় নয় যে, প্রত্যেক আয়াতে এসেই বিষয়বস্তু শেষ হতে হবে। আর তার দৃষ্টান্ত হলো এরূপ—যেমন কবিতার ছন্দের মিলে দুটি শে'রে একটি বিষয় পূর্ণ হয়ে থাকে। তারপরেও তাকে দুটি শেরই বলা হয় (বিষয় একটি হওয়ার কারণে তাকে একটি শে'র বলা হয় না) অনুরূপ কোন কোন ক্ষেত্রে দুটি অথবা তার অধিক আয়াত মিলে বিষয়বস্তু পূর্ণ হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও সে দুই আয়াত ভিন্ন ভিন্নই থাকে। আর ওয়াকফসমূহ হচ্ছে তাফসীর বা ব্যাখ্যার অধীন। আর এ কারণেই এর মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। গায়রে মুকাল্লিদদের মত হলো, প্রত্যেক আয়াতে ওয়াকফ করা আবশ্যক। আর যেখানে আয়াত শেষ হওয়ার চিহ্ন নেই সেখানে ওয়াকফ করাও জায়েয নয়।

আখবার ও আহবাবের প্রতি নির্ভরতা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, 'আখবার' তথা সংবাদপত্র বা সংবাদের উপর তো পূর্ব থেকেই নির্ভরতা ছিলো না। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, বর্তমানে 'আহবার' তথা শিক্ষিত লোকদের উপর নির্ভর করাও মুশকিল হয়ে গেছে।

প্রত্যেক কাজে সীমা সংরক্ষণ

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, মহান আল্লাহ তাআলা নেককার বান্দাদের অনেক প্রশংসা একত্রে করেছেন সূরায়ে তাওবার একটি আয়াতে। যে আয়াতটি শুরু হয়েছে اَلتَّائِبُوْنَ - اَلْحَامِدُوْنَ অর্থাত, 'তওবাকারী, আল্লাহ পাকের প্রশংসাকারী' দ্বারা। এভাবে অনেকগুলো ভাল গুণের কথা আলোচনা করার পর আল্লাহ পাক বলেছেন— وَالْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ অর্থাত — এবং আল্লাহ পাকের দেয়া সীমাকে যারা সংরক্ষণ করে। এর দ্বারা বুঝা গেলো যে, সকল প্রশংসনীয় গুণাবলী তখনই প্রশংসনীয় হবে, যতক্ষণ তা মহান আল্লাহ পাকের নির্ধারিত সীমার ভিতরে থেকে করা হবে। তার মাঝে কোনরূপ বেশী-কম কিংবা কোন বাড়াবাড়ি হয়ে গেলে তা আর কোন প্রশংসনীয় গুণ থাকবে না। প্রত্যেকটি কাজ সে সময়েই সঠিক ও মকবুল হবে, যখন তা নির্ধারিত সীমা সংরক্ষণ করে সম্পাদন করা হবে।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

একটি অভিজ্ঞতার কথা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, মুবাহ বা জায়েয বিষয়সমূহ থেকে অন্তরকে খালি করার ব্যাপারে খুব গুরুত্বারোপ করা ক্ষতিকর। বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা জেনেছি যে, মুবাহ বিষয়সমূহে লিপ্ত হওয়া মানুষের জন্য গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। এ কারণে কিছু কিছু মুবাহ বা জায়েয বিষয়ে লিপ্ততা রাখা ভাল। তবে সেটা যাতে এ পর্যায়ের না হয় যার কারণে অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি কখনো কিছুটা অস্থিরতা এসেও যায় তবে তাতেও কোন ক্ষতি নেই।

ইলমী ব্যাপারে অধঃপতন

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আগের যুগেও কিছু ছাত্র এমন ছিলো, যাদের মাঝে 'ইস্তি'দাদ' বা যোগ্যতা সৃষ্টি হতো না, কিন্তু তাই বলে তারা ফাসেদ ইস্তি'দাদ বা ভ্রান্ত যোগ্যতার অধিকারী ছিলো না। কিন্তু বর্তমানের ছাত্ররা এমন ফাসেদ বা ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার হয়ে তৈরী হয় যে, কোনরূপ শিক্ষা-দীক্ষাই তাদের ব্যাপারে কোন কাজে আসে না।

দ্বীনী মযবুতী ও বাহ্যিক হিকমত

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, কৃষ্ণপ্রসাদ ছিলেন হায়দারাবাদ রাজ্যের একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। তার মেয়েরা ছিলো মুসলমান। একবার এখানে এসে আমাদের ঘরেই তারা অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। সে সময় তার একটি মেয়ে এই মর্মে আবেদন জানালো যে, আমি হযরত থানবী (রহঃ)-এর সামনে যেতে চাই। হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, সে আবেদনের এ জবাব পূর্ব থেকেই আমার কাছে নির্ধারিত ছিলো যে, সামনে আসার অনুমতি নেই। কিন্তু আমি ভাবতেছিলাম কোন্ শব্দে তাকে কথাটা বলা যায় যাতে তার মনটা না ভাঙ্গে। আল্লাহ তা'আলা মনে দিয়ে দিলেন। তখন আমি তাদের এই প্রশ্ন করলাম যে, সে কি শুধু সামনেই আসতে চায় নাকি কিছু কথাও বলতে চায়? তখন তারা জবাব দিলেন যে, কিছু কথাও বলতে চায়। তখন আমি তাকে বলে দিলাম যে, আমার মানসিক অবস্থা হচ্ছে, কোন অপরিচিত মহিলা সামনে এলে আমি তার সাথে কথা বলতে পারি না।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

আমার এ কথা শোনার পর স্বেচ্ছায়ই তারা পর্দার আড়াল থেকে আমার সাথে কথা বলার পথ গ্রহণ করলো। এ ব্যাপারে হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, যে লোক নিজে মযবূত হয় কিংবা অন্ততঃ মযবূত লোকদের সাদৃশ্য হয় ইনশাআল্লাহ দুনিয়াতেও তার কখনো লজ্জিত হতে হবে না।

তাকওয়া পরহেযগারীর ক্ষেত্রে শরীয়তের সীমার সাথে মানুষের মনের প্রতিও লক্ষ্য রাখা উচিত

মাওলানা মুযাফফর হুসাইন সাহেব কান্ধলভী (রহঃ) যিনি তাকওয়ার ক্ষেত্রে একজন প্রসিদ্ধ বুযুর্গ আলিম ছিলেন। একবার তিনি দিল্লী থেকে নিজ বাড়ী কান্ধলায় আসতেছিলেন। তখনো সে পথে রেল চালু হয়নি। গরুর গাড়ীতে সফর করতে হতো। মাওলানা সাহেব দিল্লী থেকে একটি গরুর গাড়ী ভাড়া করলেন। রাস্তায় চলতে চলতে সৌজন্যমূলকভাবে গরুর গাড়ী চালকের সাথে বিভিন্ন আলাপ– আলোচনা করছিলেন।

এক পর্যায়ে তিনি বললেন, তোমার গাড়ীটাতো খুব ভাল, কোথা থেকে কিনেছো? গাড়ীর চালক জবাব দিলো, এটা অমুক নর্তকীর গাড়ী, ভাড়ায় চলে, আমি তাদের কর্মচারী। একথা শুনে তিনি মনে মনে তো এ সিদ্ধান্ত করেই নিয়েছেন যে, এ গাড়ীতে আর তিনি চড়বেন না, কিন্তু তা প্রকাশ করলে গাড়ী চালকের মনে কষ্ট আসবে ভেবে তিনি একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। পেশাব করার কৌশল অবলম্বন করে তিনি গাড়ী থেকে নেমে গেলেন এবং পেসাব করার পরে তিনি পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন। গরুর গাড়ীর চালক বললো, হুযূর! গাড়ীতে উঠে বসুন। তখন তিনি বললেন, বসতে বসতে অস্বস্তি এসে গেছে তাই একটু হাঁটছি। কিছুক্ষণ পরে আবার চালক উঠে বসতে বললে তিনি একই জবাব দিলেন। এভাবে কয়েকবার একই জবাব দেয়ার পর চালক বিষয়টি অনুভব করতে পেরে বললো, হযরত! আমি এখন বুঝতে পেরেছি যে, আপনি যখন একথা জানতে পেরেছেন যে, গাড়ীটি একজন নর্তকীর সুতরাং আপনি আর এ গাড়ীতে চড়তে ইচ্ছুক নন। যদি আপনার সিদ্ধান্ত এটাই হয়ে থাকে তবে আমাকে আপনি অনুমতি দিন আমি দিল্লী ফিরে যাই। তখন হযরত মাওলানা মুযাফফর হুসাইন সাহেব বললেন, বিষয়টি তো আসলে তাই। কিন্তু আমি তোমার বা তোমার মালিকের কোন ক্ষতিও মেনে নিতে পারবো না। এ কারণে কান্ধলাহ গিয়ে তোমার ভাড়া এবং

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

অন্যান্য পাওনা আদায় করে দেয়ার পর তোমাকে ছেড়ে দিবো। এরপর বাস্তবেও তিনি তাই করলেন।

হযরত থানবী (রহঃ) এ ঘটনা বর্ণনা করার পর বললেন, শুকনো তাকওয়া তো খুব সহজ। কিন্তু এসব বুযুর্গানে দ্বীনের তাকওয়া বড়ই কঠিন ছিলো। যাঁরা শরীয়তের সীমা সংরক্ষণের পাশাপাশি মানুষের অন্তরের প্রতি লক্ষ্য রাখার বিষয়টিরও সমন্বয় সাধন করেছিলেন।

হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)-এর প্রতি হযরত মাওলানা মুযাফফর হুসাইন সাহেব (রহঃ)-এর ভক্তি

মাওলানা মুযাফফর হুসাইন সাহেব (রহঃ) হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব (রহঃ)–এর ব্যাপারে বলতেন যে, হযরত হাজী সাহেব বর্তমান সময়ের বুযুর্গ নন। বরং তিনি হলেন, হযরত জুনাইদ ও হযরত শিবলী (রহঃ)–এর পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব।

(হযরত মাওলানা মুযাফফর হুসাইন সাহেব (রহঃ)–এর এ কথাটি সংক্ষিপ্ত হলেও এর মর্ম অনেক ব্যাপক। এ সংক্ষিপ্ত কথার দ্বারা তিনি অনেক কিছুই বুঝিয়ে দিয়েছেন। সম্মানিত পাঠক বিষয়টি ভেবে দেখলে হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)–এর সুউচ্চ মকাম ও মর্যাদা অনুধাবন করতে পারবেন—অনুবাদক)

ইসলাহ ও হিদায়াত লাভের জন্য নিজের ইচ্ছা থাকা আবশ্যক

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, যতক্ষণ কোন ব্যক্তি নিজেই তার শুদ্ধি ও ইসলাহ–এর ব্যাপারে ইচ্ছা না করে ততক্ষণ কোন উস্তাদ বা মুর্শিদের কোন শিক্ষা–দীক্ষাই কোন কাজে আসে না। এবং স্বাভাবিকভাবে এমন ক্ষেত্রে কারো দু'আও কাজে আসে না। আপনারা দেখুন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর চাইতে বড় শিক্ষক কে? এবং তার চাইতে বড় মুর্শিদ এবং অধিক দু'আ কবুলের লোকটি কেইবা হতে পারে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর চাচা আবু তালিব হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর প্রতি ভক্তি–বিশ্বাস রাখতেন। এমনকি তিনি প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

আশিকও ছিলেন। এবং হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর মনেও তাঁর প্রতি এক বিশেষ টান ছিলো। তিনি চাইতেন কোনভাবে যাতে আবু তালিব ঈমান গ্রহণ করে নেন এবং শেষ সময় পর্যন্ত হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেজন্য চেষ্টাও করে গেছেন। কিন্তু আবু তালিব নিজে যেহেতু সেজন্য ইচ্ছা করেননি তাই কোন ব্যবস্থা ও কৌশল কাজে আসলো না।

এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের আয়াত—

إِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ

অর্থাত, হে নবী! একথা নিশ্চিত জানুন যে, আপনি ইচ্ছা করলেই কাউকে হিদায়াত দিতে পারবেন না, কিন্তু আল্লাহ পাক যার ব্যাপারে ইচ্ছা করেন তাকে তিনি হিদায়াত দিয়ে থাকেন।

এ আয়াতের তাফসীরে প্রসিদ্ধ কথা তো এটাই যে, يَشَاءُ (চাওয়া) –এর ফায়েল বা কর্তা হলেন আল্লাহ পাক। এবং এটাই শুদ্ধ। কিন্তু একটি ভিন্ন ব্যাখ্যা এখানে এটাও হতে পারে যে, يَشَاءُ শব্দের মাঝে যে যমীর (সর্বনাম) রয়েছে তার মারজা বা লক্ষ্যস্থল হলো مَنْ তথা ঐ ব্যক্তিটি। তখন আয়াতের মর্ম হবে এই যে, আল্লাহ পাক তাকেই হিদায়াত দিয়ে থাকেন, যে নিজে নিজের হিদায়াতের অন্বেষণকারী এবং কামনাকারী হয়। এ মর্ম পবিত্র কুরআনের অপর একটি আয়াত দ্বারাও শক্তিলাভ করে। তা হলো, ইরশাদ হচ্ছে—

مَنْ أَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَ سَعٰى لَهَا سَعْيَهَا

অর্থাত, যে ব্যক্তি পরকালকে কামনা করে এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় চেষ্টা–শ্রম ব্যয় করে।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত একটি কথা

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, আমি এমন একটি বাক্য বলছি যা শত শত বৎসরের তাহকীক ও গবেষণার সারমর্ম এবং তাসাওউফ ও তরীকতের পূর্ণ হাকীকত ও নির্যাস এবং সকল প্রকার গোমরাহী ও ভ্রান্তি ও অস্থিরতা থেকে মুক্তিলাভের পথ।

কথাটি হলো, 'ইনফিআল' বা স্বাভাবিকভাবে সংঘটিত (মানুষের

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

ক্ষমতা বহির্ভূত) বিষয়াদি মানুষের ইচ্ছাধীন নয় কিন্তু 'আফআল' (মানুষের ক্ষমতাধীন) বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্মকাণ্ড মানুষের ইচ্ছাধীন বিষয়। তরীকতের লাইনে আফআল (মানুষের ক্ষমতাধীন) বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্মকাণ্ডই উদ্দেশ্য। 'ইনফিআল' (মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত) বা স্বাভাবিকভাবে সংঘটিত বিষয়াদি উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং যা উদ্দেশ্য নয় তার চিন্তায় লিপ্ত হওয়ার অর্থ হলো, নিজেই নিজের জন্য অস্থিরতা খরিদ করা।

দুনিয়ার হাকীকত

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, দুনিয়া একটি উপস্থিত অবস্থা মাত্র, এর দুটি প্রকার রয়েছে। এক প্রকার হলো, দ্বীনের ব্যাপারে সহায়ক আর অপর প্রকার হলো দ্বীনের ব্যাপারে অন্তরায়। দুনিয়ার প্রথম প্রকারটি প্রশংসনীয়। আর দ্বিতীয় প্রকার নিন্দনীয়। নিয়ম মতে দুনিয়ার আরো একটি প্রকার হতে পারে তা হলো যা দ্বীনের জন্য সহায়কও নয় আবার দ্বীনের পথে অন্তরায়ও নয়। কিন্তু এ তৃতীয় প্রকারটিও মূলতঃ দ্বিতীয় প্রকার যা নিন্দনীয় তারই অন্তর্ভুক্ত। কারণ এ জাতীয় কাজ একটি নিরর্থক ও অহেতুক কাজের মধ্যে শামিল। এ জাতীয় কাজ মানুষকে অন্ততঃ এ সময়টির নেকী ও বরকত থেকে তো বঞ্চিত করে দেয়। এ কারণে এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ জাতীয় কাজও দ্বীনের পথে অন্তরায়েরই শামিল হয়ে গেলো।

এ ব্যাপারে মাওলানা আহমদ হাসান সাহেব আমরুহী (রহঃ) খুব সুন্দর একটি বাক্য বলেছেন, তাহলো, 'দুনিয়া' শব্দটি একদিকে তো দ্বীনের মোকাবেলায় বা বিরুদ্ধে বলা হয় আর তা তো স্বাভাবিকভাবেই নিন্দনীয় আবার কখনো এই 'দুনিয়া' শব্দটি আখিরাতের মোকাবেলায়ও বলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যাখ্যা হলো, যে দুনিয়া শুধু দুনিয়া হিসেবেই কাম্য হয় আখিরাতের জন্য কাম্য না হয় সেটা নিন্দনীয়। আর যে দুনিয়া পরকাল বা আখিরাতের স্বার্থে কাম্য হয়, অর্থাত যা অর্জন করার দ্বারা দ্বীন ও দ্বীনী বিষয়াদিই উদ্দেশ্য হয় তা প্রশংসনীয়।

তিনি বলেন, দুনিয়ার ব্যাপারে জনৈক বুযুর্গ কয়েকটি শে'রের মধ্যে খুব সুন্দর বলেছেন—

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

عارفے خواب رفت در فکرے   دید دنیا بصورت بکرے
کرد از وے سوال کے دلبر   بکر چونی بایں ہمہ شوہر
گفت یک حرف با تو گویم راست   کہ مرا ہر کہ بود مرد نخواست
وانکہ نامرد بود خواست مرا   زین بکارت ہمیں بجاست مرا

উপরের চারটি শে'রের সারমর্ম হচ্ছে, কোন আরেফ ব্যক্তি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দুনিয়াকে এক যুবতী কুমারীর আকৃতিতে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলো, তোমার এত স্বামী (প্রার্থী) থাকার পরও তুমি কুমারী থাকলে কিভাবে? সে উত্তর দিলো, আমি আপনাকে একটি সত্য কথা বলবো, আর তাহলো প্রকৃত পৌরুষত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিরা আসলে আমাকে কামনা করে না। আর যাদের পৌরুষত্ব নেই তারাই আমাকে কামনা করে। এ কারণেই আমি আমার এত স্বামী (প্রার্থী) থাকা সত্ত্বেও কুমারীই থেকে গেছি।

সারমাদ মাজযূব (রহঃ)–এর কয়েকটি শে'র নিম্নরূপ—

منعم کہ کباب می خوردی گذرد   ورنہ بادہ ناب می خوردی گذرد
سرمد کہ بکاسہ گدائی نان را   تر کردہ بآب می خوردی گذرد!
سرمد غم عشق بوالہوس رامد ہند   سوز دل پروانہ مگس رانہ دہند
عمرے باید کہ یار آید بکنار   ایں دولت سرمد ہمہ کس رانہ دہند

উপরের শে'রগুলোর মর্ম হচ্ছে, শায়ের বলতে চান, যারা প্রকৃতপক্ষে তলব বা কামনা করে না, ইশকের ন্যায় মূল্যবান সম্পদ তাদেরকে দান করা হয় না। আর ঐ ভ্রমর যে শুধুই উড়ে বেড়ায় সেও প্রেমের সুধা পান করতে পারে না। বরং এক দীর্ঘ সময়ের চেষ্টা সাধনার পরেই এটা লাভ করা সম্ভব হয়।

নফসানী এবং রূহানী হালাত

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, তাসাওউফের

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সাধকগণের এ তরীকতের পথে যেসব অবস্থা সামনে আসে তা দু' প্রকার। একটি রূহানী অবস্থা আরেকটা হলো নফসানী তথা প্রবৃত্তিগত অবস্থা। রূহানী অবস্থা রূহ বা আত্মার এমন গুণের নাম, যা ইন্তিকাল ও শারীরিক বিচ্ছিন্নতার পরেও বাকী থাকে। যেমন, ইচ্ছাশক্তি, মহব্বত, তাওয়াক্কুল, সবর, শোকর, ইখলাস এবং সত্যবাদিতা ইত্যাদি। এসব অবস্থা শরীরের দুর্বলতার সাথে সাথে দুর্বল হয়ে যায় না। এবং শারীরিক বিচ্ছিন্নতা ঘটলেও অর্থাত শরীর থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও এগুলো বাকী থাকে। আর আলোড়ন, জোশ ও জযবা ইত্যাদি হচ্ছে নফসানী বা প্রবৃত্তিগত অবস্থা। যা শারীরিক দুর্বলতার সাথে সাথে দুর্বল হয়ে যায় এবং এগুলো মউতের পরে এবং দেহ থেকে আত্মার বিচ্ছিন্নতার সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়, বাকী থাকে না।

নাফসানী হালতসমূহ বেশীর ভাগই স্বল্পবুদ্ধির লোকদের হয়ে থাকে। পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী লোকদের মাঝে এসব অবস্থা খুবই কম হয়ে থাকে। এ কারণেই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ কাফেলা অর্থাত হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)–এর কখনো নাফসানী হালত হয়নি। কারণ তারা সকলেই ছিলেন যথেষ্ট ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। দ্বিতীয়তঃ এ অবস্থা সাধারণতঃ শক্তি ও যৌবন কালেই হয়ে থাকে। দুর্বলতা ও বার্ধক্যের অবস্থায় কমে যায়।

তবে নফসানী হালাত ও অবস্থার মধ্যে কিছু সূক্ষ্ম অবস্থা এমনও আছে যা কামেল আকল তথা পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদেরও হতে পারে, যেমন কান্নাকাটি করা। যা হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) থেকে খুব বেশী বেশী হওয়ার কথা বর্ণিত ও প্রমাণিত রয়েছে।

হযরত গাংগুহী (রহঃ)–এর একজন দেওয়ানা ধরনের মুরীদ একবার খুব আওয়ায করে অট্টহাসি হাসতে ছিলেন। তার অবস্থা দেখে লোকেরা হযরত গাংগুহী (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন, তার উপর 'হাল গালেব' অর্থাত, সে কিছুটা দেওয়ানা ও পাগল প্রকৃতির। এবং এরূপ অবস্থা কখনো কখনো সালেক বা সাধকের সামনে পেশ হয়ে থাকে। এরপর পুনরায় লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, আপনার নিজেরও কি কখনো এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো? হযরত গাংগুহী (রহঃ) এর জবাবে বললেন, আমি কি কোন বেয়াকুফ ছিলাম যে, আমার সে অবস্থার সৃষ্টি হবে? হযরত গাংগুহী (রহঃ)–এর একথাটিও উপরের বক্তব্যের পক্ষে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

শক্তি যোগায় যে, এ জাতীয় অবস্থা বিজ্ঞ ও পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের হয় না।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) এ জাতীয় নফসানী হালাত সম্পর্কে বলেছেন—

تلك الخيالات تربى بها اطفال الطريقة

অর্থাত, এগুলো এমন 'খেয়ালাত' বা ধ্যান–ধারণা যার দ্বারা তরীকতের নাবালেগ বাচ্চাদের শিক্ষা–দীক্ষা দান করা হয়ে থাকে। আমলের মাঝে স্বাদ ও জোশ–জযবার মুসলিহাত ও মঙ্গলজনক দিক এটাই যে, দুর্বল প্রকৃতির লোকদের এর দ্বারা আমল করা সহজ হয়ে যাবে। বুযুর্গানে দ্বীন এসব অবস্থার আসা–যাওয়ার কোন পরওয়াই করতেন না। হযরত মাওলানা বলেন—

روزہا گر رفت گو رو باک نیست　　تو بمان اے آنکہ چون تو پاک نیست

অর্থাত, বিভিন্ন অবস্থার আগমন ঘটে কিন্তু মূলতঃ তা কোন কাম্য নয়। আবার তা চলে গেলেও তাতে কোন ক্ষতি নেই। আমার মাহবুব বা প্রেমাস্পদ! আমি শুধু তোমাকেই কামনা করি। তোমার কারণে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় হোক তাতে আমার কোন পরওয়া নেই।

হাল ও মাকাম–এর মধ্যে পার্থক্য

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, রুহানী হালাত বা অবস্থার মাঝে কোন মযবুতী আসে না। তাই মযবুতী আসার পূর্ব পর্যন্ত তাকে হালত বলা হয়। কিন্তু যখন তার মাঝে মযবুতী লাভ হয়ে যায় তখন তাকে তাসাওউফের মাকাম বলা হয়। আল্লাহ্ পাকই ভালো জানেন যে, লোকেরা এর মাঝে কতটা গড়বড় করে রেখেছে। হাকীকত ও প্রকৃত অবস্থা এর চাইতে অধিক কিছুই নয় যে, বাতেনী সুদৃঢ় ও মযবুত অবস্থার নাম হচ্ছে মাকাম।

হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)–এর মারপিট

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, মৌলভী আহমাদুদ্দীন সাহেব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)–এর শাগরেদ ছিলেন। কিন্তু

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

তিনি নিজের স্ত্রীর প্রতি খুবই কঠোরতা প্রদর্শন করতেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব (রহঃ) যখন জানতে পারলেন তখন তিনি মজমার মধ্যেই তাকে খুব পিটালেন এবং বললেন যে, আমাকে তোমার স্ত্রীর তালাকের উকীল বানিয়ে দাও। মৌলভী সাহেবের উত্তম বৈশিষ্ট্য হলো—তিনি বসে বসে মার খেলেন। কোনদিকে সামান্যতমও নড়াচড়া করলেন না এবং সাথে সাথে হযরত (রহঃ)কে তালাকের জন্য উকীল বানিয়ে দিলেন। অতঃপর হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব (রহঃ) তার অবস্থা ও আচার-আচরণের তাহকীক করলেন। তখন এ কথাই জানা গেলো যে, বাড়াবাড়ি বাস্তবে মৌলভী আহমদ সাহেবের পক্ষ থেকেই ছিলো। এ কারণে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) মৌলভী সাহেবের স্ত্রীকে নিজে তালাকের উকীল হিসেবে মৌলভী আহমদ সাহেবের পক্ষ থেকে তালাক দিয়ে দিলেন।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, তার এ বাধ্যগত হওয়ার ও অনুসরণ করার ফলাফল এই হয়েছে যে, একটা দীর্ঘ সময় পরে তার সাথে ছুনারী নামক অঞ্চলে সাক্ষাত হলে আমি দেখলাম তার আকার-আকৃতি, চলাফেরা, কথাবার্তা সব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)-এর মত হয়ে গেছে। এমনকি প্রথম অবস্থায় তো আমি তাকে চিনতেই পারছিলাম না।

আল্লাহ পাকের একটি বড় পুরস্কার

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, এটা মহান আল্লাহ পাকের একটি বড় নিআমত যে, তিনি তার কাছে প্রার্থনা করার জন্য এবং তাকে ডাকার জন্য 'ইয়া আল্লাহ' 'ইয়া এলাহী' ইত্যাদির মত সরল সহজ শব্দ ও বাক্যকে ব্যবহার করা জায়েয রেখেছেন। ব্যাপক গুণাবলী ও উপাধীসমূহের বহর শুরুতে লাগানো আবশ্যকীয় করেননি। অথচ দুনিয়ার সাধারণ নেতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তি ও তার সামনে কোন আবেদন নিবেদন পেশ করার ক্ষেত্রে তার নামের সাথে বিশেষ বিশেষ উপাধি না লাগালে খুশী হতে পারে না।

শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ)

হযরত শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) ইরশাদ করেন,

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

যে ব্যক্তি নিজের বার্ধক্য নিরাপদে কাটাতে চায় তার জন্য উচিত হবে হুসনে সূরত (সুন্দর আকৃতি) ও হুসনে সওত (সুললিত কণ্ঠ ও সুর) থেকে সর্বদা বেঁচে থাকা।

একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, যার জাগ্রত অবস্থা দুরস্ত ও শরীয়ত মুতাবিক থাকে সে ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় নিজের অবস্থা যতই খারাপ দেখুক যেমন সে যদি স্বপ্ন দেখে যে, সে শূকরের গোশত খাচ্ছে কিংবা স্বপ্ন দেখে নাঊযুবিল্লাহ সে কুফরী শব্দ মুখে উচ্চারণ করছে এমনি আরো যত খারাপ বস্তুই দেখুক না কেন আল্লাহ পাকের শপথ এর দ্বারা একটি সরিষা দানা পরিমাণ প্রভাবিত হওয়াও তার জন্য জায়েয নয়। তার উচিত নিজের কাজের মধ্যে লেগে থাকা। এ কারণে যদি মানসিকভাবে খুব বেশী অস্থিরতা অনুভব হতে থাকে তবে সে ক্ষেত্রে حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ পড়ে নেয়াই যথেষ্ট।

একজন গাইরে মুকাল্লিদ হযরত থানবী (রহঃ)-এর দরবারে

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, খাজা আযীযুল হাসান মাজযূব সাহেব (রহঃ)-এর প্রিয়জনদের মাঝে একজন লোক ছিলো গায়রে মুকাল্লিদ। লক্ষ্ণৌতে একবার আমার ওয়ায হলো, সে ওয়াযে সে শরীক হলো। এবং আমার বয়ান শুনে সে খুবই প্রভাবিত হলো। ফলে সে মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরীর কাছে এই বলে অনুমতি চাইলো যে, আমি অমুক আলিমের ওয়াযে শরীক হয়েছিলাম, আমার কাছে তা খুবই লাভজনক মনে হয়েছে। আমার মনে চায় কিছু দিনের জন্য তার কাছে গিয়ে তার সংশ্রবে থাকতে। হযরত অমৃতসরী (রহঃ) জবাব দিলেন, অবশ্যই তার দরবারে থাকুন। তার সংশ্রবে বরকত আছে। ফলে সে লোক আমার এখানে এসে কিছুদিন থাকলো। এরপর আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার সময় সে বললো, আমি এখানে হাদীসের পরিপন্থী কিছুই পাইনি মনে হয়েছে, তাহলো সুফিয়ায়ে কিরাম-এর খান্দানকে চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া ইত্যাদি চার ভাগে ভাগ করাটা আমার কাছে সুন্নাতের পরিপন্থী মনে হচ্ছে। হযরত থানবী (রহঃ) এ প্রেক্ষিতে বললেন, প্রথমতঃ এ ভাগ কোন শরঈ ভাগ নয় বরং এটা একটা পরিভাষা মাত্র। এ কারণে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

এটাকে বিদআত বলা যাবে না। দ্বিতীয়তঃ এই ভাগ কারো কাছেই কোন আবশ্যকীয় কিছু নয়, আপনারও পরিপূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে এ ব্যাপারে যে, আপনি ঐ চার প্রকারের কোন এক প্রকারের দিকেও নিজেকে সম্পৃক্ত না করুন তাতে কোনই দোষ নেই।

তরীকতপন্থীদের জন্য একটি পরীক্ষিত মূল্যবান ব্যবস্থা

তাসাওউফ ও তরীকতপন্থী সালেকীন তথা সাধকগণ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন সে ব্যাপারে হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বিভিন্ন ওয়াসওয়াসায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। বড় বড় ওয়াসওয়াসা তার অন্তরে আসতে থাকে এবং সে তার কারণে অস্থিরতা পোহাতে থাকে। তার চিকিৎসা স্বরূপ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করার যে ব্যবস্থাটি আমি বাতলে দিয়ে থাকি লোকেরা সেটাকে তেমন মূল্যায়ন করে না। কেউ যদি এর গুরুত্ব সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তবে আমি তাকে বলবো, অনেক চেষ্টা সাধনার পরে এই অমূল্য রত্নতুল্য ব্যবস্থা আমি লাভ করেছি। যে সময় আমার মাঝে বাতেনী কষ্ট অনুভূত হচ্ছিলো এবং আত্মিক উপদ্রব ও দ্বিধা সংশয় বেড়ে গিয়েছিলো তখন হযরত গাংগুহী (রহঃ) আমাকে এ ব্যবস্থাই দিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এ ব্যবস্থাই থাকলো। অতঃপর এর দ্বারাই প্রশান্তি লাভ হলো। হাদীস শরীফে ওয়াসওয়াসা সম্পর্কে প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইরশাদ فلينته অর্থাত তার সামনে থেমে যাওয়া উচিত বলে যা বর্ণিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা উলামায়ে কিরাম এটাই করেছেন যে, ঐসব ওয়াসওয়াসার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা ছেড়ে দিতে হবে।

নাজাত ও মুক্তির দুটি উপায়

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, পবিত্র কুরআনের আয়াত—

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْ اَصْحَابِ السَّعِيْرِ

এটা হলো জাহান্নামবাসীদের কথা যা তারা জাহান্নামে প্রবেশের সময় বলবে। যার সারমর্ম এই যে, যদি আমরা দুটি গুণের কোন একটিও অর্জন করতাম তবে আজ আমাদের জাহান্নামে যেতে হতো না। সে দুটি গুণ হলো, হয়তো আমরা দ্বীনের আলিমগণের কথা শ্রবণ করতাম এবং

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

তা পালন করতাম নয়তো আমরা নিজেরাই যদি আমাদের জ্ঞান দ্বারা দ্বীনের আহকামকে বুঝে নিতাম। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, নাজাত ও মুক্তি এই দুই পদ্ধতির মাঝেই সীমাবদ্ধ।

হযরত গাংগুহী (রহঃ)-এর একটি উপদেশ

হযরত থানবী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত গাংগুহী (রহঃ) বলেছেন, সাধনা ও মুজাহাদাসমূহের আসল উদ্দেশ্য হলো, মানুষের ফিরিশতাদের মতো হওয়া অথবা তাদের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া। আর তা মানুষের জন্য তখনই অর্জিত হতে পারে যখন তার ক্ষুধার কষ্টও থাকবে না এবং অধিক খাওয়ার দ্বারা যে অলসতা আসে তাও আসবে না। কেননা পেটভর্তি করার কারণে সৃষ্ট অলসতা যেমনিভাবে কলবকে অস্থির করে দিয়ে ফিরিশতাদের সাথে দূরত্ব সৃষ্টির কারণ হয় ঠিক তেমনিভাবে ক্ষুধার কষ্টও যা মানুষের অন্তরকে অস্থির করে দেয়, তাও ফিরিশতা সাদৃশ্যতা লাভের অন্তরায়।

হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) বলেছিলেন যে, এ তরীকতের পথে আসল বস্তু হলো, একাগ্রচিত্ততা। তাই অস্থিরতা সৃষ্টির উপকরণসমূহ থেকে কঠোরভাবে বেঁচে থাকতে হবে। কামেল লোকদের ক্ষেত্রে অনেক বড় বড় জিনিসও একাগ্রচিত্ততার মাঝে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ের সাধকদের জন্য এবং দুর্বল প্রকৃতির লোকদের জন্য ছোট খাটো ও সাধারণ ব্যতিক্রমী বিষয়ও অন্তরের অস্থিরতার কারণ হয়ে একাগ্রতাকে বিদায় করে দেয়।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আমিতো এ কারণেই দুর্বল প্রকৃতির লোকদের পরামর্শ দিয়ে থাকি যে, জীবন ধারণ ও জীবিকা উপার্জনের এ পরিমাণ ব্যবস্থা করে নিবে, যাতে অস্থিরতা থেকে মুক্তিলাভ করা যায় কোন প্রকার পেরেশানী না হয়।

আসল কথা হলো, মানুষের মন-মানসিকতা ও চাহিদা বিভিন্ন রকম। কারো কারো উপকরণ থাকার কারণে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়, আবার কারো উপকরণ না থাকার কারণে অস্থিরতা আসে। এজন্য প্রত্যেকের জন্য ব্যবস্থাও ভিন্ন ভিন্ন। আর আল্লাহ পাকের ওলীগণের মাঝে উভয় প্রকারের দৃষ্টান্তই বিদ্যমান রয়েছে।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, তরীকতের সাধক তথা সালেকের জন্য উচিত হলো, সর্বদা নিজের শাইখের শিক্ষা ও উপদেশাবলী অনুসরণ করে চলা। এ বিষয়ের কিতাব দেখে নিজে নিজে আমল করা ভুল। হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন, তাসাওউফ বিষয়ক কিতাব তরীকতের প্রাথমিক পর্যায়ের লোকদের জন্য নয়। বরং এ লাইনে যারা চূড়ান্ত পর্যায়ের সাধক এবং কামেল ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তাদের জন্য হলো কিতাব। আর প্রাথমিক পর্যায়ের ব্যক্তিদের জন্য কিতাব হচ্ছে তার শাইখ। সে তার শাইখকে দেখবে, তার কাছে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবে জানবে এবং তার উপর আমল করবে। যেমন হাকীমী ও ডাক্তারী বইসমূহ হলো, হাকীম ও ডাক্তাদের জন্য। তারাই শুধু এসব বই দেখে ফায়দা হাসিল করতে পারে। পক্ষান্তরে অসুস্থ ব্যক্তি নিজেই যদি ডাক্তারী বইপত্র পড়ে ঔষধ খেতে যায় তবে তা তার জীবনের জন্য হবে আশঙ্কাজনক।

প্রত্যেকের উচিত তার বড়কে অনুসরণ করা

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উচিত হলো, নিজের বড়কে অনুসরণ করা, তার পরামর্শ মেনে চলা। কখনো খোদরায়ী বা স্বেচ্ছাচারিতা করা উচিত নয়। হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন যে, কোন ব্যক্তি যদি এমন অবস্থায় থাকে যে, নিয়মতান্ত্রিক হিসাবে তার চাইতে বড় কেউ নেই, তবে সে কি করবে? এরূপ ব্যক্তির ব্যাপারেও আল্লাহ পাক আমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান দান করেছেন। তা হলো এই যে, এরূপ ব্যক্তি নিজের ছোটদেরকেই একত্রিত করে পরামর্শ করবে। সকলের মতামত শুনে যার মতের উপর তার মন সায় দিবে বা যার মত অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মন গ্রহণ করে নিবে তার উপর আমল করবে। এ পদ্ধতিতে একদিকে খোদরায়ী তথা স্বেচ্ছাচারিতার বিপদ থেকেও রক্ষা পাবে অপরদিকে পরামর্শের বরকতে আল্লাহ পাক তাকে মঙ্গলের দিকে হিদায়াত ও পথপ্রদর্শন করবেন।

হযরত খিযির (আঃ) কি জীবিত?

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, এ বিষয়টি নিয়ে প্রসিদ্ধ

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

মতপার্থক্য রয়েছে যে, হযরত খিযির (আঃ) কি জীবিত নাকি তার ইন্তিকাল হয়েছে? হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) জীবিত থাকার কথাটাকেই গ্রহণ ও অবলম্বন করেছেন এবং তিনি একথাও বলেছেন যে, প্রত্যেক একশত বৎসর পর পর তার যৌবন ফিরে আসে। এজন্য তিনি দুর্বলও হন না।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহঃ)–এর মতে হযরত খিযির (আঃ)–এর ইন্তিকাল হয়ে গেছে। কাশফের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ তার যেসব কর্মকাণ্ড দুনিয়ায় প্রত্যক্ষ করে থাকেন সেটা তার রূহানী বা আত্মিক বিষয় যা মানুষের ইন্তিকালের পরেও বলবৎ থাকে।

পোশাকে লৌকিকতা বেকারত্বের লক্ষণ

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আমি যখন কাউকে দেখি যে সে লেবাস–পোশাকে লৌকিকতার ব্যাপারে খুব যত্নবান, তবে আমি সেটাকে তার দুটি বিষয়ের পক্ষে প্রমাণ বলে মনে করি। প্রথমতঃ এ লোকটি হলো অকর্মা ও বেকার। দ্বিতীয়তঃ লোকটি খুব সংকীর্ণমনা। কারণ লোকটি যদি কাজের হতো এবং কোন বড় উদ্দেশ্যের প্রতি তার নযর থাকতো তবে সে এ কাজে সময় ব্যয় করতো না। কবির ভাষায়—

نباشند اہل باطن در پے آرائش ظاہر

অর্থাত, বাতেনপন্থীগণ বাহ্যিক অবস্থাকে সুসজ্জিত করার পিছনে পড়েন না।

বুযুর্গানে দেওবন্দের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণ

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আমাদের বুযুর্গানে দেওবন্দের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা হচ্ছে এটাই যে, তাদের মধ্যে কোন বিশেষ লৌকিকতা ও বৈশিষ্ট্যতার প্রদর্শনী নেই। তারা সাধারণ লোকদের সাথে তাদের মতই মিলেমিশে থাকেন।

কুরআন শরীফের শিক্ষক গাংগুহ–এর এক হাফেয

হাফেয হুসাইন আলী সাহেব গাংগুহের একজন মুত্তাকী বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তথাকার লাল মসজিদে ইমামতি করতেন এবং মসজিদের

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

মকতবে ছোট বাচ্চাদের পড়াতেন। একবার তার কাছে গ্রামের কিছু লোক এলো এবং তাঁকে তাদের এলাকায় নিয়ে যেতে চাইলো। তিনি জবাব দিলেন, ভাই আমি হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ সাহেব গাংগুহী (রহঃ)–এর খাদেম। আমি আমার কোন কাজের ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছাকে প্রয়োগ করি না। তাই আপনারা হযরতের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিন তবেই আমি চলে যাবো।

এবার সে লোকেরা হযরত গাংগুহী (রহঃ)–এর কাছে গিয়ে আরয করলো। তখন হযরত গাংগুহী (রহঃ) তাদেরকে বললেন, 'গাংগুহতে তো ঐ একজনই মুসলমান আছে তাকেও আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিবো।' হাফেয সাহেবের অবস্থা তো এই ছিলো যে, বাচ্চাদের পড়াতে গিয়ে কখনো তাদেরকে হালকা মারপিট করতে হতো। পরে তার মনে আবার এই ভয় সৃষ্টি হতো যে, হয়তো আমার পক্ষ থেকে কিছুটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। তাই তিনি যাকে মারতেন তাকে কাছে ডেকে বলতেন, ভাই! আমি তোমাকে মেরেছি তাই তুমিও আমাকে মারো। কোন কোন অসভ্য ছাত্র হাফেয সাহেবের কথামত তাকে মারার জন্য লাঠি হাতে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে যেতো এবং তাকে মারতো।

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, আমি যখন একথা জানতে পারলাম, তখন আমি বললাম, তাঁর ঐ কাজের উদ্দেশ্যতো খুব ভাল কিন্তু ছেলেদের শিক্ষা–দীক্ষার ক্ষেত্রে একাজ উপযোগিতার পরিপন্থী। এর দ্বারা বাচ্চারা কিইবা বুঝবে। এক্ষেত্রে ভাল পদ্ধতি হচ্ছে, পরবর্তীতে তাদের সাথে এমন আচরণ করা যার দ্বারা সে খুশি হয়ে যায়।

হযরত থানবী (রহঃ)–এর পসন্দনীয় একটি শে'র

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) একটি শে'র বিশেষভাবে পসন্দ করতেন। শে'রটি নিম্নরূপ— تصدق اپنے خدا کے جاؤں یہ مجھ کو آتا ہی پیار انشاء

ادھر سے ایسے گناہ پیہم ادھر سے یہ دمبدم عنایت

অর্থাত, আমার প্রভুর জন্য আমি কুরবান হয়ে যাব, এটাই আমার মনের প্রিয় বাসনা। কারণ আমার পক্ষ থেকে অবিরাম পাপ আর অপরাধ সত্ত্বেও মহান প্রভুর পক্ষ থেকে প্রতিনিয়ত নেমে আসছে অবিরাম দয়া–অনুগ্রহ।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

ইরাক বিজয়ের মুহূর্তে হযরত ফারূক-ই-আযম (রাযিঃ)-এর দু'আ

ঐতিহাসিক ইরাক বিজয়ের মুহূর্তে সেখানকার সরকারী ধনভাণ্ডার যখন হযরত ফারূক-ই-আযম (রাযিঃ)-এর খিদমতে পেশ করা হলো তখন তা দেখে তিনি এই দু'আ করলেন—

اللهم كثرت رعيتى ووهنت قوتي فاقبضنى اليك غير مفتون

অর্থাত, আয় আল্লাহ! আমার প্রজার সংখ্যা অনেক হয়ে গেছে এবং আমার নিজ শক্তি দুর্বল হয়ে গেছে। সুতরাং এখন আপনি আমাকে আপনার দিকে এমনভাবে উঠিয়ে নিন যখন আমি সর্বরকম ফিতনা থেকে নিরাপদ রয়েছি (অর্থাত কোনরূপ ফিৎনা ফ্যাসাদে নিপতিত হওয়ার পূর্বেই আমাকে ইহলোক থেকে উঠিয়ে নিন।) তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে আরো ফরিয়াদ করলেন যে, পবিত্র কুরআনের আয়াত—

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ

অর্থাত, মানবকুলকে (বিভিন্ন আকর্ষণীয় বস্তুর মোহে) মোহগ্রস্থ করা হয়েছে।

এ আয়াতের বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, ঐ সকল বস্তুর মহব্বত সৃষ্টিগতভাবেই আপনি মানুষের মধ্যে দিয়েছেন। এজন্য আমি এরূপ প্রার্থনা করি না যে, আপনি মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব পাল্টে দিন। বরং আমি এই প্রার্থনা করছি যে, ঐ সকল জিনিসের মহব্বত যাতে আপনার পথে চলার ক্ষেত্রে আমাদের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। আপনার পথে অন্তরায় বা আমাদের জন্য কোনরূপ ক্ষতিকারক যাতে না হয়।

হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ) এ দু'আটির কথা বর্ণনা করে বলেন যে, বস! এটাই হলো সাফ এবং সরল-সহজ তাসাউউফ এবং সুলূক। এটাকেই হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) এভাবে বলেছেন যে, এ তরীকতের পথে নিন্দনীয় গুণাবলীকে একেবারে বিদূরীত করা উদ্দেশ্য নয়। বরং সে গুণাবলী ও স্বভাবকে দ্বীনের প্রতি ধাবিত করা এবং তার দৃষ্টি দ্বীনের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হলো উদ্দেশ্য। বিশিষ্ট আরেফ আল্লামা রূমী (রহঃ) খুব চমৎকার বলেছেন—

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

شہوت دنیا مثال گلخن ست   کہ ازو حمام تقوی روشن ست

অর্থাত, দুনিয়ার প্রতি আসক্তি চুলার মত কারণ এ আসক্তির কারণেই তাকওয়ার পরিধি গরম বা আলোকময় হয়ে থাকে (কেননা এ দুনিয়ার আসক্তি আছে বলেই তা বর্জন করে মানুষ মুত্তাকী হতে পারে।)

শাহ সুজা কিরমানী (রহঃ)-এর মেয়ে

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ)-এর বাদশাহী পরিত্যাগ করে দরবেশী অবলম্বন করার ঘটনা যেমন সর্বজনবিদিত ও প্রসিদ্ধ রয়েছে, অনুরূপভাবে আরো একজন বুযুর্গ বাদশাহ হযরত শাহ সুজা কিরমানী (রহঃ)-এর ঘটনাও প্রসিদ্ধ। তিনিও বাদশাহী ছেড়ে দিয়ে দরবেশ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার ইয্যত-সম্মান রাজা-বাদশাহ এবং উলামা ও নেক লোকদের কাছে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান ছিলো।

শাহ সুজা কিরমানী (রহঃ)-এর একজন যুবতী মেয়ে ছিলো। তিনি চাইতেন কোন নেককার দ্বীনদার ছেলের সাথে তার বিয়ে দিয়ে দিতে। সে সময় কেউ দ্বীনদার কিনা তা জানবার সবচাইতে বড় নিদর্শন ছিলো নামাযের মধ্যে ইহসান। অর্থাত নামাযের পরিপূর্ণ আদব ও আহকাম এবং একাগ্রতা সহকারে এমনভাবে তা আদায় করা যেন সে আল্লাহ পাককে দেখতে পাচ্ছে কিংবা আল্লাহ পাক তাকে দেখতে পাচ্ছেন। এ ভাবনা অন্তরে জাগ্রত থাকা।

শাহ সুজা (রহঃ) নেককার ও দ্বীনদার লোকের তালাশ করছিলেন। একদিন তিনি মসজিদে একজন যুবককে দেখতে পেলেন। সে খুব উত্তমভাবে একাগ্রচিত্তে নামায পড়ছিলো। তাকে দেখেই তিনি মনে মনে ইচ্ছা করলেন, এ যুবকের সাথেই তিনি তার মেয়েকে বিয়ে দিবেন। যখন সে যুবকের নামায শেষ হলো, তখন তিনি তার কাছে গিয়ে তাকে সালাম দিলেন এবং তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোথায় থাকেন? কোন্ বংশের লোক? আপনাকে দেখে তো ভদ্রলোক বলেই মনে হচ্ছে। তবে মনে হয় আপনি গরীব ও দুঃস্থ।

শাহ সুজা (রহঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি কোথাও বিবাহ শাদী করে ফেলেছেন? নাকি এখনো বিবাহ করেননি? যুবক জবাব

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

দিলো, জনাব আমি খুব গরীব ও দুঃস্থ একজন মানুষ, আমার কাছে কে তার আদরের কন্যা বিবাহ দিবে! শাহ সুজা (রহঃ) বললেন, আপনি নিরাশ হচ্ছেন কেন? আপনি কি কোথাও কোন পয়গাম (প্রস্তাব) পাঠিয়েছিলেন? যুবক জবাব দিলো, আমার যখন জানা আছে যে, আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হবে তারপরেও অযথা পয়গাম দিয়ে নিজে অপমানিত হব কেন? এরপর তিনি বললেন, আচ্ছা আপনি কি এ কথার উপর রাযী আছেন যে, শাহ সুজা কিরমানীর কন্যার বিয়ে আপনার সাথে হবে?

যুবক জবাব দিলো, হযরত! আপনি অযথা আমার সাথে কেন উপহাস করছেন? কোথায় আমি আর কোথায় শাহ সুজা কিরমানী। আমি তার নাম নিলেওতো মার খেতে হবে। এবার তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমিই শাহ সুজা কিরমানী। আমি আমার মেয়েকে আপনার সাথে বিবাহ দিতে চাই। এবার যুবক জিজ্ঞাসা করলো, আপনি রাযী থাকলেই কি যথেষ্ট নাকি আপনার মেয়ের মতামতেরও প্রয়োজন রয়েছে? তিনি জবাব দিলেন, আমি আমার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেছি, সে এ বিবাহে সম্মত আছে।

এবার সে যুবক এই বলে আল্লাহ পাকের দরবারে শোকর আদায় করলো যে, আমি কি কখনো তার স্বামী হওয়ার উপযোগী ছিলাম। এরপর শাহ সুজা (রহঃ) সেই সময়ই ঐ যুবকের সাথে তার মেয়ের বিবাহ দিয়ে দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ বোরকা পরিয়ে কিংবা কোন চাদর আবৃত করে নিজের মেয়েকে সেই যুবকের ঘরে নিয়ে গেলেন। সে ঘরটি ছিলো একেবারেই জীর্ণ-শীর্ণ একটি কুটির। কোন সামানপত্রের নামগন্ধও সেখানে ছিলো না। শাহ সুজা (রহঃ)-এর কন্যা সে ঘরের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে অবস্থা দেখে নিজের পিতাকে বললো, আব্বাজান! আপনি আমাকে কোথায় এনে ডুবালেন? একথা শুনে সে যুবক শাহ সাহেবকে বললো, দেখুন আমি তো আগেই বলেছি যে, আপনার মেয়ে আমার এই অসহায়ত্ব ও দুঃস্থতা সত্ত্বেও সে কিভাবে আমার সাথে বিবাহে সম্মত থাকতে পারে?

এবার সে কন্যা নিজেই বললো, আপনি আমার কথার মর্ম ভুল বুঝেছেন। আমি আমার পিতার কাছে আপনার দুঃস্থতার অভিযোগ করিনি বরং কথা হলো, আমার পিতা আমাকে বলেছিলেন যে, আমি

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

তোমাকে একজন যাহেদ (দুনিয়াত্যাগী) পাত্রের সাথে বিবাহ দিতে চাই। আমি তার সে কথার উপর তার প্রস্তাবে রাযী হয়ে গেছি। কিন্তু আমি যখন আপনার ঘরে প্রবেশ করলাম তখন একটি পাত্রে বাসী রুটি রাখা দেখতে পেলাম এবং এটাকে আমি একজন যাহেদ বা দুনিয়াত্যাগী মানুষের স্বভাব পরিপন্থী কাজ মনে করেছি। কারণ কোন দুনিয়াত্যাগী ব্যক্তি আবার পরে খাওয়ার আশায় বাসী রুটি ঘরে জমা করে রাখবে কেন? এ কারণে আমি আমার মুহতারাম পিতার কাছে অভিযোগ করেছি যে, আপনি আমাকে কোথায় এনে ডুবালেন? যার সাথে আমার বিবাহ দিলেন সে তো কোন যাহেদ ব্যক্তি নয়, কারণ সে বাসী রুটি ঘরে জমা করে রাখে।

একথা শুনে ঐ যুবক বললো, আমি আজ রোযা রেখেছি। আমার এই রুটি রেখে দেয়ার পিছনে উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, যাতে সন্ধ্যার সময় ইফতার করতে কোন বাড়তি কষ্ট পোহাতে না হয়। এবার মেয়েটি বললো, আমার দৃষ্টিতে এটাই তো দুনিয়াত্যাগী মানসিকতা ও তাওক্কুল পরিপন্থী কাজ। কারণ, যার জন্য আপনি রোযা রাখলেন, তার প্রতি এতটুকু আস্থা ও ভরসা আপনার নেই যে, তিনি ইফতারীর ব্যবস্থা করতে পারবেন। সুবহানাল্লাহ।

উপরোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করে হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, এটি মহিলাদের শোনানোর মত একটি ঘটনা ঠিক কিন্তু এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, তাদের সাথে বাস্তবেও এ ধরনের আচরণই করতে হবে। তবে এ ঘটনা শোনার দ্বারা তারা আল্লাহ পাকের নিআমতসমূহ প্রত্যক্ষ করতে পারবে। আমি বলে থাকি যে, এক্ষেত্রে জ্ঞান দ্বারা কোন কাজ হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত বাতেনী দৌলত লাভ না হবে, ততক্ষণ কারো মাঝে এ ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে না। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ার সম্পদের তুলনায় আরো বড় কোন সম্পদ সামনে না থাকে ততক্ষণতো বাহ্যিক আকল দ্বারা একথা অনুধাবন করা যায় না।

তাদের দুনিয়াত্যাগী মনোভাব ও তাকওয়ার এই উচ্চতর অবস্থার বিবরণ দেয়ার পর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, এবার আমি শেষ কথা বলছি যে, বর্তমান সময় হলো দুর্বলতার সময়। তাই সাধক বা সালেকগণের জন্য সাধনার বিষয়কে যথাসাধ্য সহজ করে পেশ করার ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার সময় হলো বর্তমান সময়। এ কারণে প্রয়োজন

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

পরিমাণ সামানের ব্যবস্থা করে নেয়া যাহেদ হওয়া বা দুনিয়াত্যাগী হওয়ার পরিপন্থী কোন বিষয় নয়। তবে সে উত্তম দুনিয়াত্যাগী আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দাদের সাথে অন্ততঃপক্ষে মহব্বত ও ভক্তি-শ্রদ্ধাটুকু তো অবশ্যই রাখবে। তাদেরকে নীচ বা হীন মনে করা যাবে না।

আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে মাল খরচ করা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, আমার খাস ও বিশেষ লোকদের মাঝে একজন মরহুম ব্যক্তি কোন কারণে নিজের উপর একটি বিশেষ পরিমাণের টাকা জরিমানা হিসেবে এবং সাজা স্বরূপ লাযেম করে নিলো। আমি তাকে এই বলে নিষেধ করে দিলাম যে, তোমার এক্ষেত্রে একটি পয়সা খরচ করারও অনুমতি নেই। কারণ আমার একথা জানা ছিলো যে, সে যদি এ টাকা জরিমানা হিসেবে খরচ করে দেয়, তবে সে কারণে তার কঠিন অস্থিরতার শিকার হতে হবে। একথার দ্বারা বুঝা গেলো যে, নফস বা প্রবৃত্তির চিকিৎসা কখনো মাল খরচ করার দ্বারা হয় আবার কখনো খরচ না করার দ্বারা হয়।

একজন তুর্কী দরবেশ খলীল পাশা

হযরত থানবী (রহঃ) বর্ণনা করেন, মক্কা শরীফে খলীল পাশা নামে একজন তুর্কী বুযুর্গ ছিলেন। আগে তিনি 'ইয়ামবু' নামক স্থানের গভর্ণর ছিলেন। এরপর তিনি সে পদ ছেড়ে দিয়ে দরবেশী অবলম্বন করে নিয়েছিলেন। তার দরবেশীর পিছনেও একটি ঘটনা আছে, তাহলো, তার পিতা ছিলেন একজন বড় দরবেশ। এবং সে সময়ের সর্বজন শ্রদ্ধেয় শাইখ। তিনি হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)-এর দরবারে আসা-যাওয়া করতেন। একবার তিনি হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)-এর খিদমতে আফসূস সহকারে বললেন যে, বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমার ছেলে খলীল দুনিয়াদার হয়ে গেছে। হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) বললেন, কোন চিন্তা করো না, সেও তোমার মতই হয়ে যাবে। সে মতে অল্পদিনের ব্যবধানেই তার মনের মধ্যে এক বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি হলো এবং সরকারী পদ ছেড়ে দিয়ে তিনি দরবেশ হয়ে গেলেন।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আমি কখনো তার সাথে (খলীল পাশা) সাক্ষাৎ করিনি। একবার আমি খাবে দেখলাম যে, কোন একজন

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

বুযুর্গ ব্যক্তি আমাকে বলছেন, তুমি খলীল পাশার সাথে সাক্ষাৎ করো না কেন? আমি জবাবে বললাম, কোন প্রয়োজন মনে করিনি এবং আমি তার সামনে এই উদাহরণও পেশ করলাম যে, যার বাইতুল্লাহ শরীফে যাওয়া প্রয়োজন সে যদি একটি রাস্তা ধরে একটি দরজা দিয়ে বাইতুল্লাহ শরীফ পৌঁছে গিয়ে থাকে, তবে তার জন্য এমনটির কি প্রয়োজন যে, সে তথা হতে ফিরে এসে আরেক রাস্তা ধরে অন্য দরজা দিয়ে পুনরায় বাইতুল্লাহ শরীফে যাবে।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আমার এ কথার পর সে বুযুর্গ চুপ হয়ে গেলেন। আমি সকালে এই খাবের কথা হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)–এর কাছে বর্ণনা করলাম। তখন হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) আমাকে বললেন, তার সাথে তুমি অবশ্যই সাক্ষাৎ করো। এরপর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এবার যেহেতু হযরতের হুকুম হয়েছে তাই হযরতের হুকুমে আমি তার সাথে সাক্ষাত করতে যাবো। সেমতে আমি সেখানে গিয়ে হাযির হলে জনাব খলীল পাশা আমাকে বললেন, আমি তিনটি ভাষা জানি তাহলো— তুর্কী, আরবী ও ফার্সী। আমি আপনার সাথে কোন্ ভাষায় কথা বলবো? আমি বললাম, তুর্কী ভাষা তো আমি বুঝি না এবং বলতেও পারি না। আরবী বললে বুঝতে পারি তবে নিজে পুরোপুরি বলতে পারি না। ফার্সী ভাষা আমি নিজেও বলতে পারি এবং কেউ বললেও বুঝতে পারি। আপনি আমার সাথে ফার্সী ভাষাতেই কথা বলুন।

খলীল পাশা অনেক কথাই বললেন, তার মধ্যে একটি কথা এটিও ছিলো যে, তিনি বলছিলেন, বিভিন্ন দেশের উলামায়ে কিরামকে আমি দেখেছি কিন্তু হিন্দুস্থানের আলিমগণের চাইতে ভাল আর কোন এলাকার আলিমগণকে পাইনি। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি তাদের মাঝে এমন কি বৈশিষ্ট্য দেখলেন? তিনি জবাব দিলেন, তারা দুনিয়ার মহব্বতকারী নয়।

দেওবন্দের বুযুর্গানে দ্বীনের আসল বৈশিষ্ট্য

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, আমি আমার যেসব বুযুর্গানে দ্বীনের অনুসারী তা এ হিসাবে নয় যে, তারা দুনিয়ার সবচাইতে বড় আলেম। কেননা এ সম্ভাবনা আমার মনে অবশ্যই রয়েছে যে, বর্তমান সময়ে কিছু আলেম তাদের থেকেও হয়ত বড় আছেন। যদিও আমাদের

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

জানা নেই। বরং আমার অনুসরণ ও ভক্তি–শ্রদ্ধা এই ভিত্তিতে যে, এ সকল বুযুর্গানে দ্বীন আল্লাহওয়ালা ছিলেন। তারা দুনিয়াদার ছিলেন না। তারা দুনিয়ায় বাস করতেন ঠিক কিন্তু দুনিয়ার সাথে তাদের আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়নি। তাদের যত কাজ ছিলো তার সবটাই ছিলো দ্বীনী চাহিদার ভিত্তিতে। এতে নিজের দুনিয়াবী স্বার্থ সব নষ্ট হয়ে গেলেও তার প্রতি তাদের কোন লক্ষ্য ছিলো না।

অধম সংকলক (মুফতী শফী সাহেব) বলছে, খাযা আযীযুল হাসান মাজযূব (রহঃ) ঐ সকল বুযুর্গানে দ্বীনের অবস্থা নিম্নোক্ত শে'রটির মধ্যে বর্ণনা করেছেন—

دنیا میں ہوں دنیا کا پرستار نہیں ہوں   بازار سے گذرا ہوں خریدار نہیں ہوں

অর্থাত, দুনিয়াতে থেকেও আমি দুনিয়ার পূজারী নই, বাজারের মধ্য দিয়ে আমার যেতে হচ্ছে ঠিক কিন্তু আমি কোন খরিদদার নই।

ইমাম গাযযালী (রহঃ)–এর একটি কথা ও তার ব্যাখ্যা

হযরত ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেন যে, কোন ব্যক্তি যদি কাউকে এই মনে করে কোন হাদিয়া দেয় যে, লোকটি নেককার এবং বুযুর্গ তবে সে লোকটি যদি বাস্তবে নেককার না হয় সে ক্ষেত্রে তার সে হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েয হবে না।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ)–এর সাগরেদ মৌলভী রশীদ আহমদ সাহেব কানপুরী একথার উপর একটি সংশয়ের কথা বর্ণনা করলো এই যে, এ কথার ভিত্তিতেতো কোন অবস্থাতে কারো জন্যই হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েয হবে না। কারণ সে যদি নিজেকে নিজে নেককার বুযুর্গ মনে করে, তবে তো সে আর প্রকৃতপক্ষে নেককার থাকলো না। কেননা এমনটি করার দ্বারা সে নিজেই নিজের প্রবৃত্তিকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র বলে দাবী করলো। অর্থাত তাকে সর্বরকম গুনাহ থেকে পাক–সাফ বলে স্থির করে দিলো যা করতে পবিত্র কুরআনে নিষেধ করা হয়েছে, ইরশাদ হচ্ছে— فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ

অর্থাত, তোমরা তোমাদের প্রবৃত্তিকে অপরাধ ও গুনাহ থেকে পাক–পবিত্র স্থির করে পরিশুদ্ধ বলে প্রকাশ করো না।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

সারকথা হচ্ছে, নিজেকে নিজেই নেককার মনে করা আত্মগরিমা ও প্রবৃত্তির অপরিশুদ্ধতা বিধায় এমনটি প্রকৃতপক্ষে নেককার হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক। এ কারণে হাদিয়া গ্রহণ করা তার জন্য নাজায়েয। আর যদি সে ব্যক্তি নিজেকে নেককার মনে না করে তবে তার জন্য তো হাদিয়া গ্রহণ করা ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর কথা দ্বারাই নাজায়েয প্রমাণিত হয়ে গেছে।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর উপরোক্ত কথার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজে ইচ্ছাকৃতভাবে কারো অন্তরে নিজের নেককার ও বুযুর্গ হওয়ার ধারণা সৃষ্টি করে দেয় এবং সে কারণে যদি কেউ প্রভাবিত হয়ে তাকে হাদিয়া দেয়, তবে তা গ্রহণ করা তার জন্য নাজায়েয।

প্রত্যেক যুগেই কামেল লোকের সংখ্যা কম ছিলো

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, প্রত্যেক যমানাতেই কামেল লোকদের সংখ্যা অন্যান্যদের তুলনায় অল্পই থেকেছে। কিন্তু আমাদের সামনে যেহেতু চৌদ্দশত বৎসরের ইতিহাস বিদ্যমান রয়েছে তাই সামগ্রিক দৃষ্টিতে আমরা অনেক কামেল লোক দেখি। নতুবা বর্তমান সময়েও কামেল লোক সে অনুপাতেই (অর্থাত, অনেক কম) রয়েছেন। (যদিও বর্তমান সময়ের কামেল লোকগণের দরজা ও মর্যাদা পূর্বের যুগের কামেল লোকদের তুলনায় কম।)

মাওলানা আবদুল খালেক সাহেব (রহঃ)

দেওবন্দের ওয়ায়েয, বুযুর্গ হযরত মাওলানা আবদুল খালেক সাহেব (রহঃ) দেওবন্দের প্রথম যুগের লোকদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি দেওবন্দের একজন বড় খতীব এবং প্রসিদ্ধ বক্তা ছিলেন। আনসারী বংশের সাথে তিনি সম্পৃক্ত। দেওবন্দে তার বংশই আনসারী বংশ হিসাবে প্রসিদ্ধ। হযরত মোল্লা মাহমূদ সাহেব (রহঃ) দেওবন্দী যিনি দারুল উলূম দেওবন্দের সর্বপ্রথম শিক্ষক ছিলেন। মাওলানা আবদুল খালেক সাহেব তার সাগরেদ ছিলেন। হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আমি নিজে মোল্লা মাহমূদ সাহেব (রহঃ)-এর কাছ থেকে শুনেছি যে, মাওলানা আবদুল খালেক সাহেব প্রথম জীবন থেকেই মুত্তাকী ব্যক্তি ছিলেন।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

নিআমত শুকরিয়ার সাথে ব্যবহার করা

হযরত মির্যা মাযহার জানে জাঁনা (রহঃ)–এর কাছে এক দরবেশের ব্যাপারে এরূপ সংবাদ পৌছলো যে, তার কাছে যদি কখনো কোন মজাদার খানা আসে, তবে তিনি তার মধ্যে পানি ইত্যাদি ঢেলে দিয়ে তার মজা নষ্ট করে পরে তা খেয়ে থাকেন। এ প্রসঙ্গে হযরত মির্যা সাহেব বললেন, সে বেয়াদব আল্লাহ্‌পাকের নেয়ামতের মূল্যায়ন করে না।

(অধম সংকলক (মুফতী শফী সাহেব) বলছে, যদি এমনটি প্রাথমিক পর্যায়ের কোন সাধক নিজের শাইখের পরামর্শক্রমে চিকিৎসা বা এলাজ স্বরূপ কিছুদিনের জন্য অবলম্বন করে, তবে এরূপ ব্যক্তি অপবাদ বা তিরস্কারযোগ্য নয়।)

আত্মশুদ্ধিতে চিন্তা ও অস্থিরতার ভূমিকা

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, অস্থিরতা ও চিন্তার অবস্থাটা আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে খুব বেশী কার্যকর। কিন্তু কিছু কিছু লোকের ধারণা হলো, কার্যকর শুধু সেই ধরনের চিন্তা ও অস্থিরতা যা আখিরাতের সাথে সম্পৃক্ত. কিন্তু আমি বলি চাই তা আখিরাতের সাথে হোক কিংবা দুনিয়ায় কোন বিপদ ও কষ্টের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে এর দ্বারা একটা বিশেষ আছর লাভ করা যায়।

হযরত থানবী (রহঃ)–এর নিজের একটি শে'র

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, নিচের এই শে'রটির মাঝে তরীকতের পূর্ণ হাকীকত বাতলে দেয়া হয়েছে। শে'রটি হলো—

اندریں رہ آنچہ می آید بدست　　حیرت اندر حیرت اندر حیرت ست

অর্থাত, তরীকতের এ পথে যা কিছুই হাতে আসে, তা শুধু অস্থিরতার মাঝে অস্থিরতা আর কেবলই অস্থিরতা।

শুকর ও নাশুকরীর ভিত্তি

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, নিজের প্রার্থিত বস্তুর প্রতি নযর রাখা এবং অর্জিত বস্তুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করাই হলো নাশুকরীর ভিত্তি। আর শুকরের ভিত্তি হলো, অর্জিত বস্তুর প্রতি

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

নযর রাখা এবং হাতছাড়া হয়ে যাওয়া বস্তুর উপর থেকে নযর সরিয়ে নেয়া এবং সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করা।

এর অর্থ হলো, মানুষের অন্তরে নাশুকরী এভাবে সৃষ্টি হয় যে, মানুষ আল্লাহ পাকের দেয়া উপস্থিত ও অর্জিত নিআমতসমূহের উপর নযর না রেখে বরং যে বস্তু হাসিল হয়নি তার আশায় চেয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যে লোক অর্জিত ও উপস্থিত নিআমতসমূহের প্রতি সর্বদা নযর রাখে এবং যা অর্জিত হয়নি বা উপস্থিত নেই তার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রাখে তবে স্বভাবগতভাবে তার মাঝে একধরনের শুকরিয়ার মনোভাব সৃষ্টি হয়। হাদীস শরীফের এক বর্ণনায় প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)কে উপদেশ দিয়ে বলেছেন—

جالس المساكين و قربيهم

অর্থাত, মিসকিনদের সাথে বস এবং তাদেরকে নিজের কাছাকাছি করে নাও।

এ উপদেশ বাণীর লাভ ও স্বার্থকতা কোন কোন মুহাদ্দিস এটাই বর্ণনা করেছেন যে, তাদের সংস্পর্শে থাকা হলে নিজের কাছে তাদের তুলনায় অনেক বেশী সামানপত্র দেখতে পাবে। তবে নিজের অন্তরে তার মূল্যায়ন হবে এবং তার কারণে শুকরিয়া আদায় করার তাওফীক হবে।

অসুস্থতার কারণে আহ! উহ! করা

একবার লোকেরা হযরত ফারূক-ই-আযম (রাযিঃ)কে দেখতে পেলো যে, তিনি একটি রোগের কারণে অস্থির হয়ে আছেন এবং আহ! উহ! করে কোকাচ্ছেন। লোকেরা আরয করলো, আমীরুল মুমিনীন! আপনিও রোগ যন্ত্রণায় কোকাচ্ছেন? এটা তো সবর ও ধৈর্যের পরিপন্থী কাজ।

হযরত আমীরুল মুমিনীন তখন বললেন, সুবহানাল্লাহ! (আপনারা একি বলছেন) আল্লাহ পাক তো আমাকে অসুস্থ করেছেন আমার অপারগতা ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করার জন্য। আমি কি তার পরিবর্তে আমার শক্তি ও তাকতের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবো। হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, নিঃসন্দেহে আরেফগণের অবস্থা এরূপই হয়ে থাকে যেমন কোন শায়ের বলেছেন—

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

چونکہ بر میخت بہ بندد بستہ باش   چوں کشاید چابک و برجستہ باش

অর্থাত, যখন আল্লাহ পাক তোমাকে বন্দী ও আবদ্ধ রাখতে চান তখন তুমি আবদ্ধ হয়ে থাকো। আর যখন কিছুটা রুখসাত ও অবকাশ দিয়ে মুক্ত ও খোলা রাখতে চান তখন তুমি মুক্ত ও খোলা থাক।

শাইখ নির্বাচনের মাপকাঠি

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, তাসাওউফ ও সুলূকে তরীকতের জন্য একজন শাইখ ও মুরব্বীর প্রয়োজনীয়তা তো সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু সে মুরব্বী ও শাইখ নির্বাচনের পদ্ধতি ও মাপকাঠি সম্পর্কে লোকেরা অবগত নয়। আর এ কারণেই তারা গলত ও ভ্রান্ত পথের পথিক হয়ে যায়। হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, শাইখ নির্বাচনের ক্ষেত্রে মাপকাঠি এই হওয়া উচিত যথা—

১. সে ব্যক্তি শরীয়তের আহকাম সম্পর্কে অবগত হবেন এক্ষেত্রে অবশ্য তার খুব বড় ধরনের কোন আলিম হওয়া শর্ত নয়।

২. সুলুক ও তাসাওউফ সম্পর্কে অবগত হতে হবে, যদিও সে কাশফ এ কারামতের অধিকারী না হয় এবং বড় ধরনের ইশক ও হাল–এর অধিকারী না হয়।

৩. তার কোন শাইখে কামেলের দরবারে নির্ভরযোগ্য একটা সময় কাটাতে হবে।

৪. তার মজলিসে বসলে সাধারণভাবে এই ফায়দা ও প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাবে যে, দুনিয়ার মহব্বত অন্তর থেকে কমে যাচ্ছে এবং আখিরাতের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হচ্ছে। গুনাহের প্রতি ভয় ও ইবাদতের প্রতি আগ্রহ পয়দা হবে। অজদ ও হাল সৃষ্টি হোক কিংবা না হোক।

যদি শাইখে কামেল হওয়া সত্ত্বেও তার সংস্পর্শে থাকার দ্বারা কোন লাভ ও উপকার অনুভব না করে, তবে বুঝতে হবে, আমার তার সাথে 'মুনাসাবাত' সামঞ্জস্য নেই এজন্য তখন তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন শাইখের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। কিন্তু তার ব্যাপারে কোন বেয়াদবীমূলক কথা বা আচরণ প্রকাশ করবে না। যেমন কারো যদি একজন ডাক্তারের চিকিৎসায় কাজ না হয়, তবে সে অন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হয় কিন্তু

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

কোন জ্ঞানী ব্যক্তি পূর্বের ডাক্তার বা হাকীমের প্রতি অপমান বা নিন্দামূলক কথা বলে না।

পরিচিত কোন মানুষের আকৃতিতে আল্লাহ্ পাকের গায়েবী সাহায্য

হযরত থানবী (রহঃ)–এর খাদেমদের মধ্যে একজন ছিলো ব্যবসায়ী। আলীগড়ের প্রদর্শনীতে সে কিছু ব্যবসায়ী সামগ্রী নিয়ে গিয়েছিলো। সে সময় হঠাৎ সেখানে আগুন লেগে গেলো। তখন হযরত থানবী (রহঃ) এর সে খাদেম নিজের চোখে দেখতে পেলো যে, হযরত থানবী (রহঃ) সেখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং তার ব্যবসায়ী সামানপত্রের বাক্সটি নিজের হাতে এক পার্শ্ব ধরলেন এবং অপর পার্শ্বে তাকে ধরতে বললেন। এরপর সেটাকে আগুনের মধ্য থেকে উদ্ধার করে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গেলেন। পরবর্তীতে ঐ খাদেম এসে যখন হযরত থানবী (রহঃ)–এর কাছে এ কাহিনী বয়ান করলো তখন হযরত থানবী (রহঃ) বললেন, প্রথমতঃ এ কাহিনী আমার অন্তর কবুল করছে না। এরপরেও যদি এ কাহিনী সঠিক হয়, তবে এর মধ্যে আমার সামান্যতম কোন দখল নেই। বরং আল্লাহ পাক অনেক সময় সাহায্য গায়েবী ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে করেন এবং তাকে এমন এক আকৃতিতে প্রেরণ করেন, যে তার কাছে পরিচিত ও পসন্দনীয়।

হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন, সূরায়ে ইউসুফের আয়াত لَوْلَا اَنْ رَّاٰى بُرْهَانَ رَبِّهٖ (যদি সে আল্লাহ পাকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ না করতো)–এর প্রসিদ্ধ তাফসীর হলো, যে সময় জুলায়খা ঘরের সকল দরজা বন্ধ করে হযরত ইউসুফ (আঃ)কে গুনাহের কাজের প্রতি আহবান করলো তখন ঘরের এক কোণে তিনি হযরত ইয়াকুব (আঃ)কে দেখতে পেলেন। এর ব্যাখ্যা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) এভাবে করেছেন যে, সেখানে হযরত ইয়াকুব (আঃ) যদি নিজের ইচ্ছা ও অবগতির ভিত্তিতে পৌঁছতেন তবে তিনি হযরত ইউসুফ (আঃ)–এর কারণে অস্থির ছিলেন কেন এবং তাকে তালাশ করার হুকুম দেয়ার প্রয়োজনই বা কি ছিলো। বরং এ থেকে এটাই মনে হয় যে, কোন গায়েবী সাহায্য হযরত ইয়াকুব (আঃ)–এর আকৃতিতে তার সামনে এসেছে–এর সাথে হযরত ইয়াকুব (আঃ)–এর কোন সম্পর্ক ছিলো না।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

এ ধরনের একটি ঘটনা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)–এর নিজের ব্যাপারেও সংঘটিত হয়েছে। তা হলো এই যে, কোন একটি কাজের ব্যাপারে তিনি সংশয়াভিভূত ছিলেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ তিনি নিজের মাথায় হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)–এর একটি আওয়ায অনুভব করলেন যে, 'এভাবে করো।' মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) সেভাবে কাজ করলেন এবং কাজে বরকতও হলো। কিন্তু মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) নিজেই বলেছেন যে, আমি জানি হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) এ বিষয়টির খবরও জানেন না।

(২৮শে রবিঃ সানী ১৩৫৮ হিজরীর মালফূযাতের খসড়া থেকে পরিস্কার করে লিখা হলো, আশুরা দিবস ১৩৯৩ হিজরী—সংকলক)

অধিক কষ্ট করে অধিক সওয়াব লাভ প্রসঙ্গে

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, কিছু কিছু লোকের ধারণা যে, আমলের মধ্যে কষ্ট যত বেশী হবে সওয়াবও ততই বেশী হবে। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে এখানে একটু কথা আছে, তাহলো, 'আমালে মাকসূদ' তথা মৌলিক আমলসমূহের ক্ষেত্রেতো একথা ঠিক আছে যেমন নামায, রোযা, উযূ, পবিত্রতা ইত্যাদি এসব মৌলিক আমলগুলোর মধ্যে ঠাণ্ডার সময় বা রোগের অবস্থায় উযূর সওয়াব বেশী হয়। গরমের মৌসুমে রোযার সওয়াবও বেশী হয়। নামাযের মধ্যে দাঁড়ানো বা অন্যান্য ক্ষেত্রে অধিক কষ্ট করা সওয়াব লাভের কারণ হয়। কিন্তু যে সকল আমল মৌলিক বা 'মাকসূদাহ' নয় বরং সেটা অন্য একটা আমলের জন্য উসীলা বা মাধ্যম মাত্র তার মধ্যে অহেতুক বেশী কষ্ট করার দ্বারা অধিক সওয়াব লাভ হয় না। যেমন ধরুন উযূর পানি কাছেই আছে, তা সত্ত্বেও তা বাদ দিয়ে তিন মাইল দূর থেকে পানি এনে উযূ করলে এ কারণে বেশী সওয়াব পাওয়া যাবে না। পবিত্র কুরআনের ইরশাদ—

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

অর্থাত, আল্লাহ পাক দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা আরোপ করেননি।

হাদীস শরীফের ইরশাদ— اَلدِّيْنُ يُسْرٌ অর্থাত, দ্বীন অত্যন্ত সহজ ইত্যাদি জানা থাকার পরেও যে ব্যক্তি বেশী কষ্ট করাকে দ্বীনের অংশ মনে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

করে তার এ ধারণাটা হবে উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসের বিরোধিতা। আল্লাহ পাক এ থেকে সকলকে হেফাযত করুন।

সুন্নাত তরীকার আমল কষ্টকর নয়

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, যত আমল সুন্নাত হিসেবে প্রসিদ্ধ রয়েছে, সে আমল কষ্টকর নয়। এর মাঝে একটি বিরাট ফায়দা নিহিত রয়েছে। তাহলো, যে ব্যক্তি কোন কষ্টসাধ্য আমল সমাধা করে সে মানসিকভাবে বড় ধরনের কোন ফলাফল লাভের অপেক্ষায় থাকে। এবং অনেক ক্ষেত্রে যখন সে তা অনুভব করতে পায় না তখন তার মুখ থেকে নাশুকরী ও অকৃতজ্ঞতার শব্দ বের হয়ে আসতে থাকে।

পক্ষান্তরে যদি সুন্নাত তরীকায় সংক্ষিপ্ত আমল করে, তবে সর্বদা আল্লাহপাকের নি'আমতসমূহকে নিজের আমলের তুলনায় বেশী দেখতে পাবে। ফলে সর্বদা তার অন্তর শুকরিয়ায় পরিপূর্ণ থাকবে।

আল্লাহ পাকের নি'আমত উপেক্ষা করা বড় বেয়াদবী

কিছু কিছু অজ্ঞ সূফী এমন আছে যারা আল্লাহ পাকের দেয়া নি'আমতসমূহকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে পাশ কেটে চলে এবং সংকোচ বোধ করে। এমনটি কোন ভাল কাজ নয়। মানুষ আল্লাহ পাকের কয়টা নি'আমত থেকে পাশ কেটে চলতে পারে। খানাপিনা ও পরিধান করার কিছু বস্তু হতে না হয় কিছুটা পাশ কাটালো কিন্তু তার শরীরের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ যেমন হাত, পা, চোখ, নাক, কান ইত্যাদিও তো আল্লাহ পাকের দেয়া নি'আমত। সেসব থেকে কেন পাশ কাটা নীতি অবলম্বন করা হয় না।

জান্নাতে কোন আকাংখা থাকবে না
থাকবে শুধু তৃপ্তি আর শান্তি

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, 'শওক' বা আগ্রহ ঐ অবস্থা ও উদ্দীপনার নাম যা কোন অনর্জিত প্রার্থিত বস্তু অর্জন করার জন্য হয়ে থাকে। আর অর্জিত কাংখিত বস্তুর দ্বারা যে স্বাদ ও আরাম হয় তার নাম 'উনস' বা তৃপ্তি। জান্নাতে যেহেতু মানুষের প্রত্যেক আকাংখা ও স্বাদ সে লাভ করবে তাই সেখানে কোন বস্তুর প্রতি 'শওক'

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

বা আকাংখা হবে না। কেননা শওক বা আকাংখার মাঝেও এক ধরনের কষ্ট আছে আর জান্নাতে কোন কষ্টের নাম নিশানাও থাকবে না। সেখানে শুধু শান্তি আর শান্তি। স্বাদ আর মযা (যার নাম 'উনস' বা তৃপ্তি)।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, জান্নাতের সবচাইতে বড় নিআমত হলো, মহান আল্লাহ পাকের দর্শন লাভ। আর কথাও জানা আছে যে, সেটা আল্লাহ পাকের যাত (সত্তা) ও গুণাবলীর হাকীকতের সাথে হবে না। সুতরাং যে প্রকারের সাক্ষাৎ বা দর্শন লাভ হবে, সে প্রকারের দর্শন লাভের সাথে বান্দার 'উনস' বা তৃপ্তি আসা তো ঠিক আছে, কিন্তু আল্লাহপাকের জামাল–এর যে পর্যায়ের সাক্ষাৎ তাদের সেখানে লাভ হবে না তার প্রতি তো 'শওক' বা আকাংখা হওয়া উচিত।

হযরত থানবী (রহঃ) এর জবাবে বলেন, 'শওক' বা আকাংখার সম্পর্ক থাকে ঐ অনর্জিত বস্তুর সাথে যার অর্জন মানুষের শক্তিতে সম্ভব এবং যা অর্জন করার আশা ও বিশ্বাস থাকে। পক্ষান্তরে যে বস্তু অর্জন করা মানুষের শক্তি ও যোগ্যতার বাইরে তার সাথে 'শওক' বা আকাংখা সম্পৃক্ত নয়। যেমন দুনিয়ায় কোন মানুষের জীবিত অবস্থায় আসমানের ভিতরে প্রবেশ করা এবং তথা হতে পুনরায় জীবিত ফিরে আসার আকাংখা হয় না। অনুরূপ জান্নাতে আল্লাহ পাকের জামাল সৌন্দর্যের যে পর্যায়ের মুশাহাদা বা দর্শন মানুষের শক্তি ও সামর্থের আওতায় রয়েছে সেটাতো তারা লাভ করবে। আর যেটা লাভ হবে না সেটা তাদের শক্তি ও যোগ্যতা বহির্ভূত হবে। এ কারণে তার প্রতি তাদের কোন 'শওক' বা আকাংখাও হবে না।

বেহুদা ও অহেতুক প্রশ্ন ও তাহকীক

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, সালেক বা আধ্যাত্মিক সাধক নিজের প্রয়োজনীয় কাজে লিপ্ত না থেকে অহেতুক ও বেহুদা তাহকীক ও গবেষণার পিছনে পড়লে এমনটি তার ব্যাপারে একথারই প্রমাণ বহন করে যে, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাককে অনুসন্ধানকারী নয়। যেমন কোন ব্যক্তির সামনে যদি খানা হাযির করা হয় আর সে ব্যক্তি যদি সে খানা খেতে শুরু করার পরিবর্তে এ জাতীয় প্রশ্ন ও তাহকীক করতে লেগে যায় যে, এগুলো কোন্ বাজার থেকে ক্রয় করা হয়েছে? বাজার থেকে কে এনেছে? কে পাক করেছে? কিভাবে পাকানো হয়েছে? কোন্ ধরনের

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

মসলা এতে ব্যবহার করা হয়েছে? তবে এটা একথারই প্রমাণ হবে যে, তার খানার প্রয়োজন এবং ক্ষুধা নেই।

সম্পদশালী লোকদের থেকে আলিমগণকে অমুখাপেক্ষী থাকতে হবে

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, মালদার ব্যক্তিদের থেকে উলামায়ে কিরাম এবং নেককার ব্যক্তিবর্গের মুখাপেক্ষীহীনতা প্রকাশ করা দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় বিষয়। এমনটি না থাকার কারণে সাধারণ লোকদের মাঝে উলামায়ে কিরামের কথার যেমন কোন মূল্য থাকে না, তেমনি তারা আলেমগণের কাছ থেকে উপকৃতও হতে পারে না। এ কারণে কোন ব্যক্তির অন্তরে যদি ইখলাস নাও থাকে শুধুমাত্র লোকদেরকে দেখানো ও শুনানোর জন্য ধনী ব্যক্তিদের থেকে মুখাপেক্ষীহীনতা প্রকাশ করে তাও ফায়দা থেকে খালি নয় (বরং এর মধ্যেও ফায়দা আছে।) কেননা লোক দেখানো মনোভাব থাকার কারণে যদিও সে আমলের কোন সওয়াব সে লাভ করবে না কিন্তু তার এ কাজটাও দ্বীনের মাহাত্ম্য ও সম্মান বৃদ্ধির ওসীলা এবং কারণ হবে। ফলে সে কিছু সওয়াব লাভ করবে। কেননা কারো নিয়্যত ছাড়া বা গলত নিয়্যত সত্ত্বেও যদি তার কোন কাজ অন্য কোন ভাল কাজের জন্য মাধ্যম হয়ে যায়, তবে এ ভাল কাজের ওসীলা হওয়ার সওয়াব নষ্ট হয় না। বরং তা সে ঠিকই লাভ করে।

হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি কোন ফলদার বৃক্ষ রোপণ করে এরপর তার ফল যদি জানোয়ারেও খায় তবে তার সওয়াবও ঐ গাছ রোপণকারী লাভ করবে অথচ একথা পরিষ্কার যে, ফলের গাছ লাগানোর সময় তার এ নিয়্যত মোটেও ছিলো না যে, এ গাছের ফল জানোয়ারে খাবে বরং এর উল্টো নিয়্যত এই ছিলো যে, কোন জানোয়ার যদি ফল খেতে আসে তবে তাকে পিটিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হবে। কিন্তু যেহেতু যে কোন ভাবেই হোক লোকটি যখন জানোয়ারের উপকারের জন্য ওসীলা হয়ে গেছে সুতরাং সে তার সওয়াব লাভ করবে। অনুরূপভাবে লোক দেখানো মনোভাব নিয়েও কেউ যদি ধনীদের প্রতি মুখাপেক্ষীহীনতা প্রকাশ করে তবে তা দ্বীনের মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হওয়ার ফলে সে তার সওয়াব লাভ করবে।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

একটি বিজ্ঞজনোচিত উপদেশ

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) উলামায়ে কিরাম, সুফিয়ায়ে কিরাম এবং ও ছাত্রদের সকলকে একটি ওসীয়্যত করতেন তাহলো, যে যেই কাজে লেগে আছো সেটা ইবাদত, নামায, দুআ হোক কিংবা কিতাব পাঠ, দরস বা পাঠদান ওয়ায-নসীহত যাই হোক সবকিছুর মাঝেই এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সে কাজটির প্রতি যে পরিমাণ ইচ্ছা ও আগ্রহ অন্তরে আছে সেটা একেবারে শেষ করে ফেলবে না। বরং কিছু ইচ্ছা ও আগ্রহ বাকী থাকতেই কাজটি ছেড়ে দিবে। তার প্রতিক্রিয়া এই হবে যে, পুনরায় দ্রুত তোমার মাঝে সে কাজের উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে। এর দ্বারা কাজ বেশী হবে। কিন্তু যদি উৎসাহ ও আগ্রহ শেষ হয়ে বিরক্তি আসার পর কাজ ছাড়া হয়, তবে দ্বিতীয়বার সে কাজ করার আগ্রহ সৃষ্টি হবে অনেক দেরীতে। এভাবে কাজের মধ্যেও ক্ষতি হবে।

যেমন ডাক্তারদের সর্বসম্মত পরামর্শ হলো, যখন ক্ষুধার্ত অবস্থায় খানা খাবে, তখন কিছু ক্ষুধা থাকা অবস্থাতেই খানা খাওয়া বন্ধ করে দিবে। কেননা এমনটি করার দ্বারা পরবর্তীতে আবার তাড়াতাড়ি ক্ষুধা লাগবে। কিন্তু যদি প্রথমবারেই এমনভাবে পেটপুরে খাওয়া হয় যাতে মোটেও কোন ক্ষুধা বাকী না থাকে এবং খানার প্রতি কোন চাহিদা মোটেই না থাকে, তবে দ্বিতীয় ওয়াক্তের খানা খাওয়ার সময় হয়তো ক্ষুধাই লাগবে না। যদিও লাগে তবে তা পুরোপুরি ক্ষুধা হবে না।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) এ উপদেশকে একটি বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে এভাবে প্রমাণ করেছেন যেমন, ছোট বাচ্চাদের খেলনার চাক্কী যার সাথে একটি রশিও বাঁধা থাকে, রশিটি ঐ চাকার সাথে পেঁচিয়ে ওটা নিচের দিকে ছেড়ে দেয়া হয় এবং পরে আবার টান মেরে উপর দিকে উঠিয়ে আনা হয়। চাকাটি পুনরায় ঐ রশির সাথে পেঁচাতে পেঁচাতে হাতে চলে আসে। এমনটি তখনই ঠিকভাবে হতে থাকে যখন ঐ চাক্কীর গায়ের রশির প্যাঁচগুলো সব খুলে যাওয়ার পূর্বে দু'এক প্যাচ বাকী থাকতেই সেটাকে আবার উপর দিকে আকর্ষণ করা হয়। কিন্তু যদি চাক্কীর প্যাচ সব খুলে যায় তবে আবার সেটাকে নিজের হাতে ফিরিয়ে আনতে বেশ সময় লাগে।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

দ্বীনী মাদরাসাসমূহে কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রসঙ্গে

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) বলেছেন, বর্তমান সময়ের কিছু জ্ঞানী লোক এবং ইসলাম ও মুসলমানদের হিতাকাংখী আমার কাছে বলে থাকেন যে, মাদরাসার বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি থেকে ফারেগ শিক্ষাপ্রাপ্তদের উপার্জনের কোন ব্যবস্থা হয় না। এজন্য বর্তমান সময়ের মাদরাসাগুলো শুধু তাদের জন্যই উপকারী যারা আখিরাতের পাগল এবং পরকালের জন্য সবকিছু বিসর্জন দিয়ে থাকে। যদি মাদরাসাগুলোতে কিছু ইংরেজী পড়ানো হতো কিংবা কোন কারিগরী শিক্ষা দেয়া হতো, তবে এ শিক্ষা সকল মুসলমানের জন্য উপকারী হয়ে যেতে পারে।

এর জবাবে হযরত মাওলানা বললেন, আমাদের দ্বারা যা কিছু করা সম্ভব ছিলো অর্থাত দ্বীন ও আখিরাতের অন্বেষণকারীদের জন্য একটা ব্যবস্থা করে দেয়া তা আমরা করে দিয়েছি। এখন আল্লাহর যে বান্দার সামর্থ আছে সে তাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করে দিক। এরপর তিনি বললেন, বাস্তব ঘটনাবলী এর প্রমাণ যে, নগদ এবং বাকী দুটিই যখন একত্রিত হয় তখন সবাই নগদকেই গ্রহণ করে। সেক্ষেত্রে বাকীর উপর কেউই রাযী হয় না। এখন বুঝে নিন যে, দ্বীনী ইলম এবং আখিরাতের শিক্ষা বাকীর মত। আর দুনিয়ার অন্যান্য বিষয়সমূহ ও কারিগরী বিদ্যা নগদের মত। যখন এ উভয়টিই একত্রিত হয়ে যাবে তখন লোকেরা বেশীর ভাগ নগদের প্রতিই ঝুঁকে পড়বে। সুতরাং দ্বীনী ও আখিরাতের শিক্ষা পিছনে পড়ে থাকবে। শুধু তাই নয় বরং সেটা একটা উদ্দেশ্যহীন বস্তু হিসেবে পড়ে থাকবে।

হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ) বলেন, সুবহানাল্লাহ কত শক্তিশালী এবং পরিণামদর্শীসুলভ জবাব। এটা শুধু ঈমানের সে নূরের প্রভাব প্রতিক্রিয়া যা বুযুর্গানে দ্বীনের সংস্পর্শের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাঁর অন্তরে ঢেলে দিয়েছিলেন। তা না হলে ঐ সকল বুযুর্গানে দ্বীনের দুনিয়ার ব্যাপারে তেমন বেশী অভিজ্ঞতা ছিলো না।

দুনিয়ার হাজারো ঝামেলার মধ্যেও কামেল লোকেরা থাকেন শান্ত ও স্থির

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, একবার

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

দেওবন্দ মাদরাসায় একটি জলসা হতে যাচ্ছিলো। যার ব্যবস্থাপনার কাজে মাদরাসার সকল শিক্ষক-কর্মচারী ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু আমি দেওবন্দের তৎকালীন মুহতামিম মাওলানা রফিউদ্দীন সাহেবকে দেখলাম তিনি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে নিজের নিয়মিত কার্যক্রমে লিপ্ত আছেন। আমি তাঁকে বললাম, উপস্থিত জলসার ব্যবস্থাপনা ও তার বিভিন্ন বিষয়াদির কোন প্রভাব হযরতের উপর অনুভব করা যাচ্ছে না, যা সাধারণ লোকদের স্বভাব ও অভ্যাস বিরোধী।

মাদরাসার মুহতামিম হযরত মাওলানা রফিউদ্দীন সাহেব তখন বললেন, এটা আর কি কঠিন ব্যবস্থাপনা? যদি রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্বও আমাকে দেয়া হয় তবে তাও এভাবে নিশ্চিন্তমনে সঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারবো ইনশাআল্লাহ তা'আলা।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, প্রকৃত তাসাওউফ হলো, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুসরণ অর্থাত সকলের সকল হকসমূহ এবং সম্পর্ক যথাযথভাবে রক্ষা ও আদায় করা। যেমন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘরে থাকতেন, তখন তিনি সাধারণ লোকদের মতই ঘরের কাজকর্মে লেগে থাকতেন। কিন্তু যখনই আযানের আওয়ায শুনতেন তখন তিনি সবকিছু বাদ দিয়ে এমনভাবে উঠে যেতেন যেন তিনি আমাদের কাউকেও চিনেন না।

অধম সংকলক (মুফতী শফী সাহেব) বলছে, খোলাফায়ে রাশেদীন এবং সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)-এর দায়িত্বে যখন দুনিয়ার খেলাফত ও বাদশাহীর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তখন তারা যেভাবে নিশ্চিন্ত মনে (শান্তভাবে) সে দায়িত্ব পালন করেছেন, সারা দুনিয়ার মানুষ সে ব্যাপারে অবগত আছে। এর হাকীকত এটাই যে, ঐ সকল কামেল ব্যক্তিবর্গ মহান আল্লাহর সাথে যাদের সম্পর্ক ও যোগাযোগ সুদৃঢ় ও বদ্ধমূল হয়ে যায় দুনিয়ার হাজারো ব্যবস্থাপনার ঝামেলা এবং অস্থিরতার বিষয়াবলীও তাদের স্থিরতা ও মনের একাগ্রতাকে বিনষ্ট করতে পারে না।

(২রা জুমাদাল উলা, ১৩৫৮ হিজরী)

ইয়া মুহাম্মদ (সাঃ) ইয়া রাসূল (সাঃ) বলে ডাকা প্রসঙ্গে

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, একবার হায়দারাবাদে আমার একটি

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

মাহফিল হলো। আলোচনা প্রসঙ্গে এক পর্যায়ে এ মাসআলাটি এসে গেলো যে, ইয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইত্যাদি শব্দে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাকা কিরূপ। তখন আমি বললাম, পবিত্র কুরআনের সূরা হুজরাতের মধ্যে সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)কে এমনটি করতে বারণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাহ্যিক হায়াতে বা জীবদ্দশাতে যখন তিনি নিজের ঘরে থাকতেন, তখন বাহির থেকে তাঁকে যেন এভাবে ডাকা না হয়। কেননা এমনটি করা বেয়াদবী। তাহলে যে লোক হিন্দুস্থান বা বাংলাদেশে বসে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে ডাকবে সেটা কিভাবে বেয়াদবী না হয়ে পারে।

একটি আশ্চর্য ঘটনা

হযরত থানবী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার একজন কাশফের অধিকারী বুযুর্গ কোন এক এলাকায় গেলেন। এলাকার লোকেরা তাকে বললো, এখানে এমন একটি কলস আছে যার মধ্যকার পানি কোন মৌসুমের কোন সময়েই ঠাণ্ডা হয় না। বরং সর্বাবস্থাতেই তা গরম থাকে। আমাদের বুঝে আসে না যে, এমনটি কি করে হয়। ঐ বুযুর্গ তখন বললেন যে, আজ রাতে কলসটি আমার কাছে রেখে দাও। (তার কথামত তাই করা হলো) অতঃপর সকালবেলা লোকেরা যখন আসলো তখন কলসটি তিনি তাদের কাছে দিয়ে দিলেন এবং বললেন, এখন দেখো এর পানি ঠাণ্ডা না গরম। দেখা গেলো তার মধ্যকার পানি ঠাণ্ডা। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলো, তখন সে বুযুর্গ বললেন, এ কলসটি একটি মুর্দার ব্যক্তির মাটি দ্বারা তৈরী করা হয়েছে এবং আলমে বরযখে সে মুর্দার লোকটির আযাব হচ্ছিলো। তার সে আযাবের তাপের প্রতিক্রিয়া এ কলসের মাঝেও বিদ্যমান ছিলো। যখন আমি এ বিষয়টি জানতে পারলাম, তখন আমি সে মুর্দা ব্যক্তির জন্য মাগফিরাতের দু'আ করলাম। আল্লাহ পাক দয়া করে তাকে মাফ করে দিলেন। ফলে এ কলস থেকেও সে আযাবের প্রতিক্রিয়া দূর হয়ে গেছে।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, কখনো কখনো আলমে বরযখের আযাবের প্রতিক্রিয়া ও নিদর্শন কোন রহস্য ও হিকমতের

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

কারণে এই দুনিয়ায়ও প্রকাশ করে দেন। যেমন উপরোক্ত ঘটনায় রহস্য ও হিকমত এটাই ছিলো বলে মনে হয়। যে কারণে ঐ মুর্দা ব্যক্তি এ উসীলায় উক্ত বুযুর্গের দু'আর দ্বারা মাগফিরাত ও ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে উপকৃত হয়ে গেলো।

'তাকলীদ' ও 'ইজতিহাদ' সম্পর্কে আলোচনা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, একজন গাইরে মুকাল্লিদ আলিম যিনি গাইরে মুকাল্লিদ হলেও গোড়া বা চরমপন্থী নন। তিনি আমার এখানে এসেছিলেন। আমি তাকে বললাম, তাকলীদের ভিত্তি সুধারণার উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ প্রবল ধারণা হয় যে, সে দ্বীনের ব্যাপারে কোন কথা শরীয়তসম্মত প্রমাণ ছাড়া বলে না, তার অনুসরণ করা হয় যদিও সে শরীয়তের কোন একটি মাসআলার দলীলও বর্ণনা না করে। আর এরই নাম হলো তাকলীদ। আর যে ব্যক্তি সম্পর্কে এ বিশ্বাস না হয় সে যদি দলীল প্রমাণও পেশ করে তবুও তার ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যায়। যেমন দেখুন, হাফেয ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) নিজের ফাতাওয়ার মধ্যে এবং কোন কোন কিতাবে যেমন 'মাযালিম' নামক কিতাব ইত্যাদিতে শুধু বিধান লিখে দিয়েছেন। সাথে কোন দলীল প্রমাণ পেশ করেননি। কিন্তু গাইরে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা যেহেতু তার প্রতি এ বিশ্বাস রাখেন যে, তিনি দলীল ছাড়া কথা বলেন না। এজন্য তার কথা তারা মানেন। সুতরাং হানাফী মাযহাবের অনুসারীদেরও এ অধিকার আছে যে, তারা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)–এর বর্ণনা করা মাসআলাহসমূহকে এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে মেনে নিবে এবং সেমতে আমল করবে যে, তিনি কোন কথাই দলীল ছাড়া বলেন না।

অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, এতক্ষণ আলোচনা ছিলো তুলনামূলক অর্থাত গাইরে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা যখন ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ)–এর কথা দলীল–প্রমাণ ছাড়াও মেনে নেন, তবে হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের এ অধিকার কেন থাকবে না যে, তারা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)–এর কথাও দলীল ছাড়া শুধু সুধারণার ভিত্তিতে মেনে নিবেন। কিন্তু এবার আমি সামনে বাড়তে চাচ্ছি এবং একটি উদাহরণ দ্বারা এ বিষয়টি পরিস্কার করতে চাচ্ছি যে, ইবনে তাইমিয়্যাহ

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

(রহঃ)–এর ইজতিহাদ এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)–এর ইজতিহাদ বরং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)–এর সাগরেদ যে সাগরেদগণের সাগরেদদের মাঝে যারা মুজতাহিদ হয়েছেন তাদের ইজতিহাদের মাঝে কি পার্থক্য।

ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) তার কিতাব 'মাযালিম'–এর মধ্যে লিখেছেন যে, যদি ক্ষমতাশীন বাদশার পক্ষ থেকে শহরের বাসিন্দাদের প্রতি কোন অন্যায় কর বা ট্যাক্স ধার্য করে দেয়া হয়, তবে সর্বাবস্থায় নিজে নিজেকে সে ট্যাক্স থেকে মুক্ত রাখা জায়েয নয়। বরং এ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা হলো, যদি শহর থেকে সামগ্রিকভাবে একটি নির্ধারিত পরিমাণ ট্যাক্স আদায় করার ব্যাপারে সরকারীভাবে কোন পরিমাণ নির্ধারণ করা না থাকে (যেমন এ শহর থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ট্যাক্স আদায় করতে হবে) তবে সেক্ষেত্রে নিজেকে ঐ ট্যাক্স থেকে বাঁচিয়ে নেয়া জায়েয হবে। কিন্তু যদি বিশেষভাবে নির্ধারিত পরিমাণ টাকা ট্যাক্স হিসাবে আদায়ের বিষয়টি বিধিবদ্ধ করা থাকে তবে সেক্ষেত্রে নিজেকে ট্যাক্স থেকে বাঁচিয়ে রাখা জায়েয হবে না। কেননা এক্ষেত্রে সে যদিও ট্যাক্স থেকে বেঁচে গেলো। কিন্তু তার সে পরিমাণ টাকা সরকার অন্য মুসলমানদের কাছ থেকে আদায় করে সে নির্ধারিত পরিমাণ পূর্ণ করবে। এর ফলে তারা অতিরিক্ত যুলমের শিকার হবে এবং এই ব্যক্তি হবে তার কারণ।

উপরোক্ত অবস্থায় হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ বলে থাকেন যে, সরকারের ঐ অন্যায় ট্যাক্স থেকে যে বেঁচে থাকতে পারে তার জন্য সর্বাবস্থায় বেঁচে থাকা জায়েয এবং তার বেঁচে থাকার কারণে যে অতিরিক্ত ট্যাক্স অন্য মুসলমানদের দিতে হবে তার কারণ তো নিঃসন্দেহে এ ব্যক্তিই। কিন্তু এ যুলমের বাস্তবায়নকারী তো আর সে নয় বরং ট্যাক্স আদায় করে এ যুলমকে বাস্তবে রূপদানকারী হলো বাদশাহ নিজে অথবা তার কোন প্রতিনিধি। আর স্বেচ্ছায় যুলমকে বাস্তবায়নকারী ব্যক্তি থাকা অবস্থায় সে যুলমকে 'সবব' বা কারণে দিকে সম্পৃক্ত করা হয় না (অর্থাত যে ব্যক্তি সে যুলমের কারণ হলো তাকে প্রকৃত দোষী বলে সাব্যস্ত করা হয় না) এ কারণে উপরোক্ত অবস্থাতে ঐ অতিরিক্ত যুলমের জন্য সে বাদশাহ কিংবা তার প্রতিনিধিই গুনাহগার হবে কেননা তার নির্দেশেই এই ট্যাক্স আদায় করা হয়েছে। এখন আপনি ইনসাফের সাথে বলুন যে, কার ইজতিহাদ বেশী ভাল। ঐ আলিম সাহেব তখন পরিস্কার শব্দে একথা

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

স্বীকার করে নিলেন যে, নিঃসন্দেহে ইবনে তাইমিয়্যাহ এ পর্যায়ে পৌঁছতে পারেননি।

এরপর হযরত থানবী (রহঃ) বললেন, হানাফী মাযহাবের ইমামগণের ইজতিহাদের পক্ষে আমি একটি হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করছি। হাদীস হলো এই যে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদতের ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন—

وَدِدْتُ اَنْ اُقْتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ.

অর্থাত, আমার আকাংখা হয় যে, আমি আল্লাহ পাকের পথে শহীদ হয়ে যাই। এরপর পুনরায় আমাকে জীবিত করা দেয়া হোক অতঃপর পুনরায় আমি শহীদ হয়ে যাই। এরপর আবার আমাকে জীবিত করা হোক আবারও আমি শহীদ হয়ে যাই।

এ হাদীসে প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে নিহত হওয়ার জন্য দু'আ করছেন। আর যখনই তিনি নিহত হবেন তখন অবশ্যই কোন একজন তাকে নিহতকারী হবে আর একথাও পরিস্কার যে, নবী (আঃ)–এর হত্যাকারী বধ ধরনের কাফের এবং জাহান্নামী হবে। তবে এক্ষেত্রে যেন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ঐ দু'আর ফলে একজন লোক জাহান্নামী হওয়ার জন্য কারণ হলেন। এমনটিকে যদি গুনাহ বলা হয় তবে একথা নবী (আঃ)গণের নিষ্পাপ হওয়ার মূলনীতি পরিপন্থী হবে। সুতরাং এক্ষেত্রে এছাড়া আর কি জবাব দেয়া যায় যে, 'সবব' বা কারণের দিকে কোন কাজের সম্পৃক্ততা তখনই হয় যখন স্বেচ্ছায় সে কাজ সম্পাদনকারী কোন ফায়েল বা কর্তা না থাকে।

অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, কোন কোন গাইরে মুকাল্লিদ বলে থাকেন যে, আমরা নাকি তাদেরকে ঘৃণা করি। আচ্ছা এটা কি করে সম্ভব? কারণ আমরা নিজেরাই তো একজন গাইরে মুকাল্লিদের ভক্ত ও অনুসারী। কেননা ইমামে আযম ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) গাইরে মুকাল্লিদ হওয়ার ব্যাপারে তো কারো কোন সন্দেহ নেই। অতঃপর বলেন, তবে তার তাকলীদ বা অনুসরণ এজন্য করি যে, তিনি নিজেই দুনিয়ার

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

একজন দক্ষ ও প্রসিদ্ধ মুজতাহিদ। আর এ কারণে তার তাকলীদ ও অনুসরণ জায়েযও ছিলো। বর্তমানে মূর্খ লোকেরা কিংবা সাধারণ আরবী সম্পর্কে অবগত লোকেরা নিজেরাই নিজেদেরকে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)–এর সাথে তুলনা করে কারো তাকলীদ করা থেকে বিরত থাকে, তবে এটা তাদের ভুল ও ভ্রষ্টতা।

সম্মান ও মর্যাদা কামনার নিন্দনীয়তা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) বলতেন, মানুষ সৃষ্টির কাছে উচ্চপদ বা মর্যাদা কামনা করা তো অবশ্যই নিন্দনীয় ও নাজায়েয। আর এটা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে স্বয়ং স্রষ্টা তথা আল্লাহ পাকের কাছেও সম্মান–মর্যাদা কামনা করা নিন্দনীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ যেমন কেউ যদি এরূপ আকাংখা করে যে, আমি একজন মকবুল দরবেশ হয়ে যাবো (তবে এটাও নিন্দনীয়)। কারণ যে ব্যক্তি নিজেকে দরবেশ মনে করে সে মহান আল্লাহর সামনে অহংকার প্রকাশকারী।

হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)–এর কাছে একবার একজন লোক এসে বললো, আমার প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার খুব আগ্রহ। আমাকে কোন আমল বাতলে দিন (যার দ্বারা আমি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর দর্শন লাভ করতে পারি।) হযরত (রহঃ) বললেন, মাশাআল্লাহ আপনি তো অনেক 'হিম্মতওয়ালা' মানুষ। আমরা তো (প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর রওযা শরীফের উপর প্রতিষ্ঠিত) সবুজ গম্বুজ দেখার যোগ্যতাও রাখি না।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, এ কথাটি এমন একটি বিষয় যে, এর উপর যদি তালেবে ইলমসুলভ প্রশ্ন করতে থাকি তবে এতে অনেক দ্বিধা সংশয় রয়েছে। কিন্তু সে কথার উৎস ও লক্ষ্য যা ছিলো অর্থাত পরিপূর্ণ 'আবদিয়্যত' ও গোলামীর বহিঃপ্রকাশ তা তো শুধু সে ধরনের অন্তরের অধিকারীরাই বুঝতে পারে। শুধু যে ছাত্র সে তার বুঝবে কি?

ذوق وصال وشوق کنارآرزوئ کیست   ماعیم وخذف بوی آن آستان بلب

অর্থাত, তার সাথে মিলিত হওয়ার আকাংখা পোষণ করার যোগ্যতা

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

আমার নেই, তবে শুধু তার দরবারে হাযির হয়ে আমার ঠোট দ্বারা তার পদ চুম্বনের সুযোগ পেলেই আমি ধন্য।

কাশফ মানুষের জন্য কোন কামাল নয়

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করে যে, কাশফ এমন একটি বিষয় যা মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীদেরও হয়ে থাকে। এবং মরার পরে কাফেরদেরও হবে। সুতরাং এটা মানুষের জন্য কোন কামাল বা বুযুর্গী নয়। অতঃপর বলেন যে, যদি কামাল বা বুযুর্গীও হয় তবে এই বুযুর্গী বা কামালও মানুষের আসল কোন উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো 'আবদিয়াত' বা গোলামী, আর এ আবদিয়্যত ও গোলামী কামাল (তথা যোগ্যতার) বিপরীত।

মজাদার খানা পরিত্যাগ করা আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের কারণ হয় না

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, কোন কোন বুযুর্গানে দ্বীন সুস্বাদু খাবার গ্রহণকে পরিত্যাগ করেছেন। এবং তা তারা শুধু এলাজ বা চিকিৎসা হিসেবেই করেছেন। আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে তার মোটেও কোন দখল বা অবদান নেই। আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জন একমাত্র রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর অনুসরণের দ্বারাই হয়ে থাকে। আর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর অবস্থা আমাদের জানা আছে যে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে কখনো মজাদার সুস্বাদু খাবার পরিত্যাগ করতেন না।

আর বর্তমানে তো এলাজ হিসেবেও মজাদার খাবার পরিত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ বর্তমানে মানুষ শক্তির দিক থেকে খুবই দুর্বল হয়ে গেছে। বরং বর্তমানে যদি কোন হালাল খাবার নিজের গভীর মনোনিবেশ এবং খুব অন্বেষণ ব্যতিরেকে পাওয়া যায়, তবে খুব ভালভাবে খেয়ে নেয়া উচিত। তবে খাওয়ার পর তার হক আদায় করবে অর্থাত অলসতায় লিপ্ত হয়ে পড়বে না বরং আল্লাহ পাকের যিকির এবং ইবাদতের মধ্যে লিপ্ত থাকবে। হাদীস শরীফে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

অর্থাত, মহান আল্লাহ এটাও পসন্দ করেন যে, তার দেয়া 'রুখসাত' বা শিথিল ব্যবস্থার উপর আমল করা হোক। যেমনিভাবে এমনটিও পসন্দ করেন যে, তার দেয়া 'আযীমত' তথা উত্তম ব্যবস্থার উপর আমল করা হোক।

হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন, শুধু রুখসাত বা সহজ ও শিথিল ব্যবস্থা অনুসন্ধান করতে থাকা যাকে ফকীহ এবং আলিমগণ নিন্দনীয় বলে আখ্যায়িত করেছেন সেটা সাধারণ রুখসাতসমূহের উপর আমল করা নয় বরং সে নিন্দাবাদ ঐ সকল রুখসতের ব্যাপারে যা প্রবৃত্তির চাহিদা মুতাবিক কুরআন শরীফের আয়াত বা হাদীস শরীফের মাঝে বিভিন্ন বাহানা ও বক্র ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে বের করা হয়।

এসব কথা আলোচনার পর হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, আমি 'রুখসাত' তথা তুলনামূলক শিথিল ব্যবস্থাপনার উপর আমল করার যে ভাল ও মঙ্গলের দিক বর্ণনা করেছি, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—যারা খুব বেশী কঠোরতা করে তাদের এলাজ করা। একথা আলোচনা করতে গিয়ে আবার ভয়ও লাগে যে, এর দ্বারা আবার 'নফস পরওয়ারী' তথা নফসের গোলামী করার একটা অজুহাত তৈরী হয়ে যায় কিনা।

হযরত থানবীর (রহঃ) ইসলাহ ও তারবীয়্যতের বিশেষ ধরন

এমন এক ব্যক্তি যে পূর্বে অপর এক শাইখের তত্ত্বাবধানে ছিলো এবং অনেক কঠিন মুজাহাদা ও সাধনার কারণে প্রায় পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলো, সে হযরত থানবী (রহঃ)–এর খিদমতে হাযির হলো। হযরত থানবী (রহঃ) তার অবস্থা শুনার পর। তার অবস্থা অনুযায়ী আমল ও নীতিমালা বাতলে দিলেন। সে একদিন বলতে লাগলো যে, আমার লতীফাসমূহ আগে তারকার মত চমকাতো বর্তমানে সে অবস্থাটা আর নাই। আপনি সেগুলো চমকানোর ব্যবস্থা করে দিন।

হযরত থানবী (রহঃ) বললেন যে, নিয়মতান্ত্রিক জবাব তো ছিলো এরূপ যে, আমার নিজের লতীফাসমূহই তো চমকায় না আমি আপনার লতীফা চমকানোর ব্যবস্থা করবো কিভাবে। হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন যে, হাকীকত বা প্রকৃত কথা হচ্ছে এ বিষয়টিই এই তরীকতের লাইনে ডাকাত তুল্য। যাকে লোকেরা তরীকতের উদ্দেশ্য বানিয়ে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

নিয়েছে। তবে হ্যাঁ যদি কোন শাইখে কামেল কারো ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত করেন (যে তার লতীফা চমকানোর ব্যবস্থা করবেন) তবে আমি তা অস্বীকার করি না। কারণ এটাও উপকারী হতে পারে। কিন্তু যার উপর এর ক্ষতি প্রকাশ পেতে থাকে তার ক্ষেত্রে তখন শাইখে কামেলের দায়িত্ব হয়ে যায় যে সে অবস্থা বন্ধ করে দেয়া। কারণ এটাও এক ধরনের হিজাব বা পর্দাস্বরূপ। তবে এটা হলো নূরানী পর্দা বা আলোর পর্দা। আর হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) বলতেন নূরানী বা আলোর পর্দা 'হিজাবে যুলমানী' তথা অন্ধকারের পর্দার চাইতে বেশী কঠিন হয়ে থাকে। কারণ হিজাবে নূরানী বা আলোকিত পর্দার প্রতি চাহিদা ও আকর্ষণ থাকে ফলে লোক তার ভক্ত ও অনুসারী হতে শুরু করে। যা তার জন্য তরীকতের ডাকাত হয়ে দাঁড়ায়। (৬ জুমাদাল উলা, ১৩৫৪ হিজ্‌রী)

মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)–এর কাশফ

হযরত থানবী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)–এর একটি মহান কাশফের কথা এখানে আলোচনা করা হবে যা হুবহু বাস্তবায়িত হয়েছে। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব (রহঃ)–এর কাশফসমূহ এবং ভবিষ্যদ্বাণী খুবই প্রসিদ্ধ যা একেবারে পরিষ্কারভাবে সত্য ও বাস্তব। আর কাশফকে গোপন রাখাও তার অভ্যাস ছিলো না। ইংরেজ শাসন বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব (রহঃ)–এর ভবিষ্যদ্বাণী দীর্ঘ সময় পর্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলো।

(অধম সংকলকের (মুফতী শফী সাহেব) মুহতারাম পিতা যিনি হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)–এর বিশেষ সাগরেদ ছিলেন। অধম তার কাছেও এই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা শুনেছিলো) হযরত (রহঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ইংরেজ শাসন এমন এক মৌসুমে বদলে যাবে, যখন লোকেরা কাঁচা আমের তৈরী চাটনী খেতে থাকবে। এবং বিপ্লবও এমন হঠাৎ ও অল্প সময় সংঘটিত হবে যেমন কেউ বিছানা গুটিয়ে রাখলো। লোকেরা এ শাসনাধীনে ঘুমাবে সকালে অন্য শাসনাধীনে ঘুম থেকে জাগবে (অর্থাত, একরাতের মধ্যেই এমন পরিবর্তন ঘটবে যে, রাতে ঘুমানোর সময় এক শাসন দেখে ঘুমাবে এরপর ঘুম থেকে উঠে সকালে দেখবে শাসন বদলে গেছে)।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব (রহঃ)–এর এই ভবিষ্যদ্বাণী দেওবন্দে খুব প্রসিদ্ধ ও আলোচিত বিষয় ছিলো। কিন্তু অবস্থা তখনো ছিলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহলো, চতুর্দিকে ইংরেজ শাসনের তখনো ছিলো ব্যাপক দাপট এবং জয়জয়কার। এমনি অবস্থায় কোন এক বছরের এপ্রিল মাসে যখন জিলাসমূহের নতুনভাবে বিভক্তি এবং রাষ্ট্রীয় মন্ত্রণালয়সমূহের নতুন আইন পাশ করা হলো, তখন অনেকে জটিল ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে এটাকেই হযরত (রহঃ)–এর ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন বলে আখ্যায়িত করলো। কিন্তু ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের বিভক্তির সময় হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব (রহঃ)–এর ভবিষ্যদ্বাণীর সঠিক উদ্দিষ্ট বিষয়টি হুবহু বাস্তবায়িত হলো। কেননা সে বিপ্লবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে এমন এক সময়েই গ্রহণ করা হয়েছিলো, যখন আম গাছে কাঁচা আম ধরছিলো। অতঃপর ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসের ১৪ তারিখ রাতে তা পূর্ণ সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলো। অর্ধরাতে যখন রাত ১২টা তখন পাকিস্তানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলো। যেসব মুসলমান রাত ১২টার পূর্বে ঘুমিয়ে পড়েছিলো, তারা ইংরেজদের শাসনামল দেখে ঘুমিয়েছিলো এবং সকালে তারা ঘুম থেকে উঠে ইসলামী শাসন দেখতে পেয়েছে।

অনুরূপ এক ভবিষ্যদ্বাণী তিনি দেওবন্দের ব্যাপক মহামারী সম্পর্কে করেছিলেন। কাশফের দ্বারা হযরত বুঝতে পারলেন যে, দেওবন্দে এক মারাত্মক মহামারী দেখা দিবে। কিন্তু তখন ছিলো রমযান মাস। মাহে রমযানের রহমত ও বরকতে মহামারী বিলম্বিত হবে এবং রমযান শেষ হওয়ার পরপরই মহামারী শুরু হবে। এবং কাশফের দ্বারা তার প্রতিশোষধ জানতে পারলেন যে, মানুষের সকল বস্তু থেকেই কিছু কিছু সদকা করতে হবে টাকা পয়সা থেকে কিছু টাকা পয়সা খাদ্য–পানীয় থেকে খাদ্য পানীয় এবং পরিধেয় এবং ব্যবহার্য্য জিনিসপত্র থেকেও কিছু কিছু সদকা করতে হবে। এ ধরনের বুযুর্গানে দ্বীনের স্নেহ–মমতা যেহেতু সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি ব্যাপক হয়ে থাকে তাই তিনি ঘোষণা করে দিলেন, সকলেই যেন উপরোক্ত পন্থায় সদকা করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দেওবন্দের নেতা পর্যায়ের একজন লোক হযরত (রহঃ)–এর এ ঘোষণা শুনে বলে ফেললো, হাঁ মাদরাসায় মনে হয় কিছু চাঁদার দরকার হয়েছে এ কারণে এই দান–সদকা করার ফরমান জারী করা হয়েছে। তার এ

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

বিষোদগারমূলক কথাটি হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব (রহঃ)–এর কানেও পৌঁছলো। ফলে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব (রহঃ) অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং সেই ব্যথিত ও মর্মাহত অবস্থায় আকাশের দিকে দেখলেন এবং অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেই তাঁর পবিত্র মুখ থেকে উচ্চ আওয়াযে বারবার এ বাক্য উচ্চারিত হতে থাকলো, 'ইয়াকুব, ইয়াকুবের বংশ এবং সারা দেওবন্দ'। উচ্চ আওয়াযে বারবার এ বাক্য উচ্চারণের শব্দ হযরত হাজী আবিদ হুসাইন সাহেব শুনতে পেলেন যিনি ছিলেন দেওবন্দের একজন প্রসিদ্ধ বুযুর্গ, এবং দারুল উলূম প্রতিষ্ঠার কাজেও তিনি শরীক ছিলেন। তিনি সেই ছাত্তা মসজিদেই থাকতেন যেখানে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)ও অবস্থান করছিলেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)–এর মুখ থেকে উচ্চারিত বাক্য শুনতে পেয়ে ঘাবড়ে গিয়ে তিনি হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)–এর কাছে এলেন এবং হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)–এর খিদমতে আরয করলেন, 'হযরত আপনি একি বলছেন, একটু দয়া করুন।'

তখন হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি বলেছি? তখন হাজী আবিদ সাহেব (রহঃ) ঐ কথাগুলো হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)কে শুনালেন, যা তিনি তাঁর মুখ থেকে বারবার উচ্চারিত হতে শুনেছেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) তখন বললেন, এখন তো মুখ থেকে বের হয়েই গেছে এখন এমনই হবে।

সুতরাং রমযান মাস শেষ হওয়ার সাথে সাথেই সমস্ত দেওবন্দে কলেরার কঠিন মহামারী ছড়িয়ে পড়লো। দেওবন্দের কোন একটি ঘরও তা থেকে রেহাই পেলো না এবং হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)–এর কথামত স্বয়ং তার নিজের বংশের চৌদ্দজন লোকের ইন্তিকাল হয়ে গেলো। এবং হযরত নিজেও সে সময়ই ইন্তিকাল করলেন।

অধম সংকলক (মুফতী শফী সাহেব) বলছে, আমার মুহতারম পিতা মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসীন সাহেব (রহঃ) এ মহামারী শুরু হওয়ার পূর্বে একটি খাব দেখেছিলেন। তিনি দেখলেন, ভয়ানক আকার আকৃতির কিছু লোক এসে শহরের লোকদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দিয়ে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

ঘরগুলোকে খালি করে দিচ্ছে। পিতা মুহতারম এ খাবের কথা যখন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)-এর খিদমতে আরয করলেন, তখন হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) বললেন, যে জিনিসের আশঙ্কা ছিলো তা এসে গেছে।

এরপর হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) নিজে অসুস্থ হয়ে যখন নিজ এলাকা নানুতায় রওয়ানা করলেন, তখন তিনি আমার পিতা মুহতারমকে বললেন, ভাই! আমার কবরের মাটি আমাকে আকর্ষণ করছে। এটাই আপনার সাথে আমার শেষ সাক্ষাত। কিছু লোক (আমার ইন্তিকালের পূর্বে) নানুতা গিয়ে পৌছতে সক্ষম হবে ঠিক কিন্তু আপনি যেতে পারবেন না।

পরবর্তীতে দেখা গেলো ঠিক তাই হয়েছে। যখন হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)-এর রোগ খুব বেড়ে যাওয়ার খবর দেওবন্দে এলো, তখন অনেকে নানুতা চলে গেলেন কিন্তু পিতা মুহতারম তখন কঠিন রোগে আক্রান্ত ছিলেন বিধায় তিনি নানুতা সফর করতে পারলেন না।

উস্তাদ ও বুযুর্গানে দ্বীনের প্রতি হযরত থানবী (রহঃ)-এর মহব্বত

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, আত্মিক দিক থেকে তো আমার সবচাইতে বেশী মহব্বত হলো, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)-এর প্রতি। তবে ভক্তি বেশী হলো, হযরত মাওলানা গাংগুহী (রহঃ)-এর প্রতি। আর হযরত নানুতবী (রহঃ)-এর দরবারে খুব বেশী যাওয়ার সুযোগ হয়নি, তবে যখনই তার দরবারে হাযির হয়েছি তিনি আমাকে খুব আদর ও স্নেহ করেছেন।

হযরত নানুতবী (রহঃ)-এর একটি বাণী

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, একবার হযরত নানুতবী (রহঃ) আমাকে বললেন, পড়ার চাইতে বেশী হিসাব করার চেষ্টা করা উচিত। (অর্থাত কি পড়লাম এর দ্বারা কি কি শিখলাম ইত্যাদি) এবং এ সম্পর্কে একটি ঘটনাও তিনি বর্ণনা করলেন যে, একজন তালেবে ইলম যার পুরা হিদায়া কিতাব মুখস্থ ছিলো। আর তার অপর এক সাথী

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

যার হিদায়া মুখস্থ ছিলো না, সে দেখে দেখে পাঠ করতো। একটি মাসআলা জানার প্রয়োজন দেখা দিলে অপর সাথী যার হিদায়া মুখস্থ নেই সে মাসআলাটি বলে দিলো।

এবার হিদায়ার হাফেয সাথীটি তাকে জিজ্ঞাসা করলো, এ মাসআলাহ কোথায় লিখা আছে? গায়রে হাফেয সাথী জবাব দিলো, হিদায়ার মধ্যে আছে। তখন হিদায়ার হাফেয সাথীটি সে কথা অস্বীকার করে বললো, এ মাসআলাহ হিদায়ার মধ্যে নেই। তখন অপর সাথী বললো, আমি তো হিদায়ার হাফেয নই, কিতাব এনে দিন আমি বের করে দেখিয়ে দিবো। কথা মত কিতাব আনা হলে সে মাসআলাটি বের করলো। মাসআলাটি যদিও পরিস্কার শব্দে আলোচিত ছিলো না। কিন্তু হিদায়া কিতাবের বাক্যের পরিস্কার ইশারা দ্বারা মাসআলাটি প্রমাণিত হয়। অর্থাত বাক্যের মর্ম থেকে বিষয়টি সাব্যস্ত হয়। এবার হিদায়ার হাফেয সাথীটি বললো, ভাই! আমি তো হিদায়া মুখস্থ করেছি ঠিক কিন্তু হিদায়া বুঝেছেন আপনি।

হযরত মাদানী (রহঃ) সম্পর্কিত একটি স্বপ্ন প্রসঙ্গে

এক বুযুর্গের সাহেবজাদা একটি স্বপ্ন দেখলো। যে স্বপ্নে হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) সম্পর্কে একটি অপসন্দনীয় অবস্থা প্রকাশ পায়। বিষয়টি মানুষের মাঝে আলোচিতও হলো। একজন চিঠির মাধ্যমে বিষয়টি হযরত থানবী (রহঃ)কেও অবগত করলো এবং কেউ কেউ মৌখিকভাবেও ব্যাপারটি হযরত থানবী (রহঃ)-এর সামনে আলোচনা করলো।

হযরত থানবী (রহঃ) তার জবাবে বললেন, প্রথম কথা হলো, আমাদের স্বপ্নের মূল্যই বা কতটুকু। এরপরও যদি সেটা খাব হিসেবে ধরা হয় তবুও তো তা শরীয়তসম্মত কোন দলীল নয়। আর যে বিষয়কে শরীয়ত কোন দলীল বলে স্থির করেনি, আমরা যদি সেটাকে কোন ব্যক্তির প্রতি কুধারণা সৃষ্টির মাধ্যম বানিয়ে নেই তবে সেটা বড়ই বেইনসাফী হবে। রাজনীতির ব্যাপারে হযরত মাদানী (রহঃ)-এর কর্মপদ্ধতি হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ)-এর পসন্দনীয় ছিলো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরোধিতা ও মতপার্থক্যের সীমা সর্বদা ঐ বিষয়ের মাঝেই সীমিত ছিলো। এজন্যই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ – سورة نساء ١٣٥

'অর্থাত, হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকো, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে হয়।

অতঃপর হযরত (রহঃ) বলেন, এটা তো একটা স্বপ্নের কথা। যার মধ্যে কোন প্রামাণ্যতা নেই। আমি তো ঐ সকল অবস্থা ও ঘটনাবলী যেগুলো খারাপ হওয়ার বিষয়টি আমার কাছে শরীয়তের প্রমাণাদি দ্বারা সাব্যস্ত, সেগুলোর আলোচনাও পসন্দ করি না। কেননা, এ জাতীয় অবস্থার আলোচনার ক্ষেত্রে নিজ প্রবৃত্তির আনন্দ ও স্বাদ এবং অপরদিকে অন্যের দোষের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশের আশঙ্কা সামনে থাকে। যে ব্যাপারে হাদীস শরীফে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে—

لا تظهر الشماتة لاخيك فيرحمه الله ويبتليك

অর্থাত, তুমি তোমার কোন মুসলমান ভাইয়ের দোষের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করো না। কারণ এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ পাক তাকে ঐ দোষ থেকে মুক্তি দিয়ে তোমাকে সে দোষের মধ্যে লিপ্ত করে দিবেন।

অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন, আমরা অপরের দোষ দেখবো কি, নিজেদের অবস্থাই তো জানা নেই যে, আমাদের শেষ পরিণতি কি হবে, আমার খুবই ভয় লাগে, যদি আল্লাহ পাক নিজ অনুগ্রহে নাজাত দান করেন। তবেই তো বেড়াপার হতে পারবো। কবির ভাষায়—

گہ رشک برد فرشتہ بر پاکی ما گہ خندہ زند دیو ز ناپاکی ما

ایمان جو سلامت بہ لب گور بریم احسنت برین چستی و چالاکی ما

অর্থাত, কখনো আমরা ফিরিশতা স্বভাবের এত কাছাকাছি হয়ে যাই, যখন স্বয়ং ফিরিশতাগণ পর্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয়ে যায়। আবার কখনো শয়তানী স্বভাব আমাদের মাঝে এতই প্রবল হয়ে যায়, যাতে স্বয়ং শয়তানেরও হাসি পায়। ঈমান সহকারে যখন কবরে যেতে পারবো, শুধু সেদিনই নিজের বুদ্ধিমত্তা ও সৌভাগ্যের উপর নিজেকে ধন্যবাদ জানাবো।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

আল্লাহ্ পাকের নি'আমতসমূহের হিফাযত

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) অত্যন্ত ছোট কোন উপকারী জিনিসকেও নষ্ট করতেন না। ডাকসামগ্রীর সাথে আসা ছোট ছোট সাদা কাগজের টুকরা এবং সুতলীর টুকরাকেও সংরক্ষণ করতেন। কাগজের ছোট ছোট টুকরাগুলো তাবীয লেখা এবং প্রতিদিনের টুকিটাকি প্রয়োজনে চিরকুট–পারচা ইত্যাদি লোকদের কাছে পাঠানোর কাজে ব্যবহার করতেন। কাগজের টুকরা একটু বড় হলে তা একত্রে সেলাই করে খাতা, নোটবুক ইত্যাদি বানিয়ে নিতেন।

গতকাল (তখনকার কথা) এমনি একটি খাতা তৈরী করলেন। যার মধ্যে পাতা কিছুটা ছোট–বড় ছিলো এবং কোন পাতা আগে কোনটা পিছে ছিলো। তখন তো তিনি সেটা রেখে দিলেন কিন্তু আজকে সে খাতাটির ব্যাপারে বললেন, বার বার মনে ইচ্ছা হয় যে, পৃষ্ঠাগুলোকে কেটে সমান করে নেই। কিন্তু তার পরেও আমি এই কথা ভেবে সে ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করি যে, এটা একটা বেহুদা কাজ। কিন্তু তা সত্ত্বেও বার বার মনের মাঝে এ ইচ্ছা সৃষ্টি হতেই থাকলো। শেষ পর্যন্ত সেটা নিয়ে পৃষ্ঠাগুলো কেটে সমান করে নেয়া হলো। কেননা এ কারণে অযথা অন্তর অস্থির হচ্ছিলো।

অতঃপর হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, মানসিকতা গড়েই উঠেছে এমনভাবে যে, বেঢংগা কিছু দেখলেই মনের মাঝে একটা অস্থিরতা ও আতঙ্কের ভাব সৃষ্টি হয়ে যায়।

একটি খাব ও তার তা'বীর

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, একবার হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)–এর খিদমতে এক লোক এসে তার একটি স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলো। সে বললো, আমাদের এক বুযুর্গকে সে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় দেখেছে। হযরত (রহঃ) বললেন, এ স্বপ্ন ঐ বুযুর্গের দুনিয়া ত্যাগী হওয়ার প্রতি ইশারা করে। অতঃপর তিনি বলেন, এ জাতীয় স্বপ্ন সাধারণ লোকদের মজলিসে আলোচনা করা অনুচিত। কেননা বলা তো যায় না যে, এর দ্বারা শ্রোতারা কে কি বুঝে নিবে।

আরেকবার অপর এক লোক এসে হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)–এর কাছে তার খাবের কথা আলোচনা করলো। সে বললো, আমি খাবে

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

দেখেছি যে, আমি মসজিদের মধ্যে পায়খানা করছি। হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) তখন লোকটিকে বললেন, তুমি মসজিদে বসে দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্য নিয়ে হয়তো কোন ওযীফা পাঠ করে থাকো। সেমতে জানা গেলো যে, বিষয়টি আসলেও বাস্তব ছিলো।

জালিম শাসকদের সাথে ন্যায় ও স্থিতিশীল আচরণ

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আমরা আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনকে এই নীতির উপর পেয়েছি যে, তারা জালিম শাসকগণের সাথেও কখনো অসৌজন্যমূলক এবং কঠোর আচরণ করতেন না। বরং তাদের অভ্যাস ছিলো এমন যেমনটি নিম্নের শে'রে বর্ণনা করা হয়েছে—

ناکسانے واکہ بینی بختیار عاقلاں تسلیم کردند اختیار

অর্থাত, অযোগ্য ও অধম লোকেরা যদি কখনো কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন হয়ে যায়, তবে জ্ঞানী লোকেরা বাহ্যিক আচরণে তাদের কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে থাকেন (এবং সেমতে তাদের প্রতি সম্মানও দেখিয়ে থাকেন)।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)-এর কাফিরদের প্রতি বিশেষতঃ ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণার বিষয়টি সর্বজনবিদিত ও প্রসিদ্ধ ছিলো। কিন্তু একবার এক ইংরেজ কালেক্টর মাদরাসায় আসবে বলে সংবাদ পাঠালে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব (রহঃ) তখন ঐ কালেক্টরের (দুনিয়ার বিচারে) মর্যাদা অনুপাতে ইন্তিজাম ও ব্যবস্থা করলেন।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আমি তখন হযরত মাওলানা মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব (রহঃ)-এর খিদমতে জানতে চাইলাম যে, সে যদি আসে তবে আপনি কি করবেন? তিনি বললেন যে, তাকে মাদরাসা দেখাবো। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব (রহঃ) আবার জিজ্ঞাসা করলেন, সে যদি মাদরাসার ব্যাপারে কোন পরামর্শ দেয় তবে আপনি কি করবেন? তিনি জবাব দিলেন, আমি বলে দিবো, বিষয়টি আমার একার ইচ্ছাধীন নয় বরং এটি একটি মজলিসে শূরা (পরামর্শ পরিষদ)-এর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। আপনার পরামর্শ আমি আমাদের মজলিসে শূরায় উপস্থাপন করবো। সকলে যদি তা গ্রহণ

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

করেন তবে তা বাস্তবায়িত করবো। অন্যথায় আমি তা বাস্তবায়নে অপারগ।

হযরত থানবী (রহঃ) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন যদি সে মাদরাসায় কোন চাঁদা দেয় তবে কি করা হবে? তিনি জবাব দিলেন সেটা গ্রহণ করে নিবো এবং সুইপার ও মেথরদের বেতন হিসেবে দিয়ে তা খরচ করে ফেলবো।

একবার মুজাফফর নগরের কালেক্টর থানাভোনে এসেছিলো। কোনরূপ সংবাদ দেয়া ছাড়াই সেখানকার দরজা পর্যন্ত এসে পৌছে গেছে যখন বিষয়টি হযরত থানবী (রহঃ)কে জানানো হলো তখন হযরত থানবী (রহঃ) উঠে দরজার কাছে চলে গেলেন। এবং তার সাথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বললেন। সে মাদরাসার সংক্ষিপ্ত অবস্থা জানতে চাইলো। হযরত (রহঃ) তাও বললেন। হযরত থানবী (রহঃ) তাকে বললেন, যদি আপনি বসেন তবে আপনার জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা করে দিবো। কিন্তু সে বললো, এখন সময় নেই। অতঃপর সে দরজা থেকেই বিদায় নিয়ে চলে গেলো। ফেরার পথে সে নিজের সফরসঙ্গীদের কাছে বললো যে, বাস্তবিক পক্ষেই একজন বুযুর্গ মানুষ। আমার অন্তরে তার বিশেষ প্রভাব ও ভীতির ভাব সৃষ্টি হয়েছে।

অনুরূপভাবে একবার এক ডেপুটি সাহেব সংবাদ পাঠান যে, আমি মাদরাসা দেখতে আসতে চাই। হযরত থানবী (রহঃ) তার জন্য মাদরাসার বাইরের একটি ঘরে চেয়ার দিয়ে বসার ব্যবস্থা করলেন। এবং সেখানেই তার মেহমানদারীর ব্যবস্থা করলেন। এবং তিনি নিজে রামপুর শহরে চলে গেলেন। এখানকার লোকদেরকে বলে গেলেন, সে আসলে মেহমানের সম্মানের প্রতি খেয়াল করে মাদরাসা দেখিয়ে দিবে। অসৌজন্যমূলক (ভদ্রতা পরিপন্থী) কোন আচরণ যাতে প্রকাশ না পায়।

কিন্তু হযরত থানবী (রহঃ)–এর মনের ইচ্ছা ছিলো, সে যাতে না আসে এবং সেজন্য তিনি দু'আও করলেন। আল্লাহ পাকের কুদরতে সেখানে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। তাহলো, ঐ ডেপুটি সাহেব থানাভোন আসলো এবং মাদরাসা পর্যন্তও পৌছে গেলো। হঠাৎ মাদরাসার গেইটে দাঁড়িয়ে কি যেন চিন্তা করে সেখান থেকেই ফিরে চলে গেলো।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

যারা খারাপ কথা বলে তাদের এলাজ

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, আমি তো আমার দোস্ত–আহবাবদের কাছে বলে রেখেছি যে, যদি কোন ব্যক্তি আপনাদের সামনে কোন অপসন্দনীয় বা খারাপ কথা বলে, তবে তাকে এতটুকু কথা শুধু বলে দিবেন যে, ভাই! আমার সামনে বলবেন না। এটা বলার অধিকার আপনার আছে। এর দ্বারা সে কথার অপসন্দনীয়তাও প্রকাশ পেয়ে যাবে এবং কথাও আর বেশী বাড়বে না।(৭, জুমাদাল উলা ১৩৫৮ হিঃ)

মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) ও সংগীত বিদ্যা

হযরত থানবী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) প্রথম জীবনে একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডেপুটি ইন্সপেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অনেক সময় অতীত হওয়ার পর ইলমের দরস শুরু করেছেন। কিন্তু তাঁর যোগ্যতা এবং স্মরণশক্তি এত ভালো ছিলো যে, দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইলমের সাথে সম্পর্কহীন অবস্থায় থাকার পরেও তাঁর ইলম ও বিভিন্ন বৈষয়িক জ্ঞান সবই তার পুরোপুরিভাবে স্মরণ ছিলো। আরবী ইলমের দরস যখন শুরু করলেন তখন তার ইলমী ময়দানে মুহাক্কিকসুলভ অবস্থান ও মর্যাদা সকল আলিমের কাছেই একটি স্বীকৃত বিষয় ছিল।

ডেপুটি ইন্সপেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সে সময় তার অবস্থান ছিলো আজমীর শরীফে। সেখানে একজন সরকারী কর্মচারী ভদ্র ব্যক্তি সংগীত বিদ্যায় খুবই পারদর্শী ছিলো। আর হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)–এর মাঝেও বৈষয়িক বিচারে প্রত্যেক বিষয়কে বুঝার একটা আগ্রহ ছিলো। সরকারী সে লোকটি এ সংগীত বিদ্যাও মাওলানাকে শিখিয়ে দিলেন। হযরত মাওলানা কখনো কখনো তার মাঝে লিপ্ত হতেন এবং তার চর্চাও করতেন।

একবার তিনি বালাখানার উপর বসে সংগীত চর্চার মাঝে লিপ্ত ছিলেন। এমন সময় বালাখানার নিচে একজন মাজযূব ধরনের লোক এসে দাঁড়িয়ে গেলো। যখন আওয়ায কিছুটা উঁচু হয়ে গেলো তখন সে লোকটি ডাক দিয়ে বললো, আরে মৌলভী! তুমি তো এ কাজের জন্য নও, তুমি তো অন্য কাজের লোক। একথা শুনার সাথে সাথেই হযরত

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)–এর উপর একটি বিশেষ প্রভাব ও অনুভূতির সৃষ্টি হলো। সাথে সাথে তিনি তাওবা করে নিলেন এবং চিরদিনের জন্য তা পরিত্যাগ করলেন। কিন্তু আল্লাহ পাক যেহেতু তাকে একটি সুতীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী করে সৃষ্টি করেছিলেন ফলে সে বিষয়েও তার পরিপূর্ণ দক্ষতা এসে গিয়েছিলো।

অধম সংকলক (মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব রহঃ) বলছে, আমার মুহতারম পিতা বর্ণনা করেন, একবার দেওবন্দে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)–এর মহল্লায় কাওয়ালীর অনুষ্ঠান হচ্ছিলো, হযরত মাওলানা তখন ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে আসছিলেন। এ সময় যখন কানে সে কাওয়ালীর আওয়ায আসলো, তখন তিনি বললেন, এ কাওয়ালীর গায়ক কাওয়ালীর নিয়ম–নীতি ছেড়ে অন্যদিকে চলে গেছে। অতঃপর হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) বললেন, তবে তার কিছুটা জানা আছে এবং সে ঠিক করার চেষ্টায় আছে। অতঃপর বললেন, এখন আর সংশোধন করা তার সাধ্যের আওতায় নেই।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) নিজের জন্য বিশেষত্বকে পসন্দ করতেন না। বরং তার মানসিক চাহিদা ছিলো, সকলের সাথে মিলে মিশে থাকা। একদিন তিনি বললেন, কি আর বলবো দু' হরফ ইলমের কারণে প্রসিদ্ধি ঘটে গেছে, তা না হলে আমি তো অন্যভাবে জীবন যাপন করতাম (অর্থাত, খুবই গোপনীয় জীবন অবলম্বন করতাম)।

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ) তার সম্পর্কে বলেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তির মাঝেই কিছু না কিছু রোগ থাকে। মুজাহাদা তথা সাধনা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে যার শুদ্ধি সাধন করতে হয়। কিন্তু মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব (রহঃ) জন্মগতভাবেই রোগহীনভাবে সৃষ্টি হয়েছেন। হযরত মাওলানার সমসাময়িক লোকেরা বলতেন, হযরত মাওলানা শৈশবকাল থেকেই পরিপূর্ণভাবে পবিত্র ছিলেন।

(৯ জুমাদাল উলা, ১৩৫৮ হিজরী)

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম সাহেব নানুতবী (রহঃ) ও মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব নানুতবী (রহঃ)

নবাব সিদ্দীক হাসান খান সাহেব ভুপাল রাজ্যে একটি বড় মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তার ইচ্ছা ছিলো সে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী (রহঃ)কে সে মাদরাসার মুহতামিম এবং হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)কে সে মাদরাসার 'সদরুল মুদার্রিস' (প্রধান শিক্ষক) নিয়োগ করবেন। সেমতে মাওলানা নানুতবী (রহঃ)–এর ওযীফা প্রতি মাসে তিনশত টাকা আর মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ)–এর ওযীফা প্রতি মাসে একশত টাকা হারে নির্ধারণ করে তাদের খিদমতে আবেদন করা হলো। কিন্তু দু'জনের কোন একজনেরও সেখানে যাওয়ার মত ইচ্ছা হলো না। মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী (রহঃ) তো জবাবে সাফ লিখে দিলেন যে, "বর্তমানে আমি মুজতাবায়ী প্রকাশনীতে সম্পাদনার খিদমত করছি। সেখানে আমি প্রতি মাসে দশ টাকা হারে ওযীফা পাই। যা আমার প্রয়োজনের চাইতেও বেশী। পাঁচ টাকাতেই আমার এবং আমার পরিবার–পরিজনের প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায়। বাকী পাঁচ টাকা নিয়ে চিন্তা করতে হয় যে, তা কোথায় খরচ করবো। আল্লাহ পাক ঐ সকল তালিবে ইলমদের মঙ্গল করুন যারা আমাকে এক্ষেত্রে চিন্তা মুক্ত করে দেয়। তাদের পিছনে বাকী পাঁচ টাকা খরচ করে আমি দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাই। আপনি তিনশত টাকা ওযীফার কথা লিখেছেন। যদি আমি সেটা গ্রহণ করি, তবে আরো দুইশত পঁচানব্বই টাকার চিন্তা আমার মাথায় এসে পড়বে। এমনটি আমার জন্য ধৈর্যের বাইরে।"

আর হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) উক্ত আবেদনের কথা শুনে বললেন, কথা যা আপনার লিখার ছিলো তাতো আপনি লিখে দিয়েছেন। এখন আমি আর কি লিখবো? তিনি বলেন, তা সত্ত্বেও আমি লিখছি যে, আমি এই শর্তের উপর আসতে পারি যে, মাসে আমার ওযীফা হবে তিনশত টাকা। এবং আমার উপর কোন ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা থাকতে পারবে না। যখন মনে চাইবে তখন আমি আমার বাড়ীতে এসে পড়বো।

উভয়ের লেখাই যখন তাদের হাতে পৌছলো, তখন তার দ্বারা তারা ঐ কথাই বুঝলো যা চিঠির জবাব লেখকদের উদ্দেশ্য ছিলো। অর্থাত,

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

তারা কেউ আসার জন্য প্রস্তুত নন। নবাব সিদ্দীক হাসান খান সাহেব ছিলেন আহলে হাদীস। মাসলাক বা তরীকার ক্ষেত্রে মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও উল্লেখিত বুযুর্গদ্বয়কে তার মাদরাসার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আহবান জানানো তার হকপসন্দী মানসিকতা ও উদারচিত্ততা এবং উপরোক্ত বুযুর্গানে দ্বীনের মাকবুলিয়্যতের নিদর্শন।

সুয়ালের হাত বাড়ানোই প্রকৃত অপমান

হযরত থানবী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, ফাটা এবং তালি লাগানো কাপড় আর ছিঁড়া জুতা আমার কাছে মোটেও অপমানকর নয়। তবে অপমানের বিষয় হচ্ছে, কারো সামনে কিছু পাওয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়া (সুয়াল করা)। সেটা প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য হোক, কারণ অনেক সময় প্রকাশ্যে যদিও চাওয়া হয় না। কিন্তু মনের মধ্যে চাওয়ার ইচ্ছা থাকে তারও একটা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। আল্লাহ্ পাকতো অন্তরের রহস্য ও গোপন বিষয় সম্পর্কেও অবগত আছেন। তিনি মনের মাঝে থাকা সুয়ালেরও ঐরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে দেন যা প্রকাশ্য সুয়ালের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। অর্থাত সম্বোধিত ব্যক্তির কাছে অপমান ও অপদস্ততা।

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

শেষ কথা

১৩৫৮ হিজরীর ৫, রবিউস সানী থেকে ৯ জুমাদাল উলা পর্যন্ত হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ)-এর মাজালিস (বৈঠকসমূহ) থেকে আমি আমার বুঝ এবং যোগ্যতা অনুযায়ী হযরত থানবী (রহঃ)-এর মূল্যবান বাণীসমূহ সংকলন করেছিলাম। এ সময় দেশে ইনায়াতুল্লাহ মাশরেকীর নাস্তিকতাপূর্ণ বইসমূহের কারণে খুব অস্থিরতা বিরাজ করছিলো, এজন্য হযরত থানবী (রহঃ) তার সব বইপুস্তক দেখে সে ব্যাপারে একটা ন্যায়সংগত সিদ্ধান্ত দেয়ার ইচ্ছা করলেন এবং মুসলমানদেরকে উক্ত ফিৎনা সম্পর্কে সজাগ করার খেয়াল করলেন। আর সে কাজের দায়িত্ব দেয়া হলো অধম (মুফতী মুহাম্মদ শফী)কে। আলহামদুলিল্লাহ ১৮ই জুমাদাল উলা পর্যন্ত বিষয়টির উপর গবেষণা ও তাহকীক করে ১৯দিনে একটি পুস্তিকা তৈরী হয়ে গেলো। হযরত থানবী (রহঃ) যার নাম দিলেন الارشاد فى بعض احكام الالحاد (নাস্তিকতাপূর্ণ বক্তব্য সম্পর্কে কিছু কথা) আলহামদুলিল্লাহ সে সময়েই উক্ত পুস্তিকাটি প্রকাশও করা হলো।

সেই চল্লিশ দিন অবস্থানের সময়ে অধম হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ)-এর মজলিসসমূহ থেকে যেসব মালফূয সংরক্ষণ করেছিলাম তার কিছু অংশ পূর্বেও 'আল বালাগ' পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। বাকীটা এখানে একত্রে সংকলন করা হয়েছে। এরপর ১৩৫৭ হিজরীর পর ১৩৫৯, ১৩৬০, ১৩৬১ এবং ১৩৬২ হিজরীর বিভিন্ন সময়ে যেসব মালফূয লেখা হয়েছে তাও পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। যেহেতু মালফূযাতের মধ্যে তারিখের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার কোন বিশেষ প্রয়োজন ছিলো না। এ কারণে প্রাথমিকভাবে প্রকাশের সময় এ ধারাবাহিকতা সংরক্ষিত থাকেনি। প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে আগের মালফূয পড়ে এবং পরেরটা আগে এসে গেছে। তা সত্ত্বেও অনেক জায়গায় তারিখের উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে।

অধমের (মুফতী শফী) কাছে হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ)-এর যেসব মালফূযের একটি সংক্ষিপ্ত ভাণ্ডার খসড়া হিসেবে সংকলিত ছিলো, তার মধ্য হতে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সহ বর্তমান গ্রন্থটি আজ পূর্ণ হলো। যার দ্বারা হযরত থানবী (রহঃ)-এর সেই মুবারক মজলিসসমূহের সম্পর্কে কিছুটা ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। আর প্রকৃত কথা

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

হলো, তার চিত্র উপস্থাপন আমাদের সাধ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। কবি বলেন—

دیکھا تھا بس اک خواب سا معلوم نہیں کیا!
اب تک اثر خواب ہے معلوم نہیں کیوں

অর্থাত, যেন একটি খাবের মতই দেখেছিলাম। জানিনা তা কি ছিলো, আর সে খাবের প্রতিক্রিয়া এখনও বিদ্যমান রয়ে গেছে। জানি না তা কেন।

فلله الحمد اوله واخره وظاهره وباطنه واساله التوفيق لمحابة من الاعمال وصدق التوكل عليه و حسن الظن به و صلى الله تعالے على خير خلقه و صلوة رسله محمد واله و صحبه اجمعين و سلم تسليما كثيرا كثيرا

বান্দাহ মুহাম্মদ শফী
খাদেম, দারুল উলূম করাচী (পাকিস্তান)
১৩, মুহাররমুল হারাম, ১৩৯৩ হিজরী, শনিবার।

সমাপ্ত

www.banglakitab.weebly.com www.islamfind.wordpress.com

সূচীপত্র

www.banglakitab.weebly.com - www.islamfind.wordpress.com